পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা ১৩৮১

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : রতীশ সরকার ও রাজর্ষী সরকার

স্ক্যান : মাধব রায়

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল

মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স

everest/800/PP-BN

পুজোয় চাই নতুন জুতো
ছোটদের কাছে নতুন জুতো মানেই বাটার জুতো। এর কারণ, বাটার জুতো ওদের নরম কচি পা'কে যেমন আরাম আর সুখে জড়িয়ে রাখে তেমনি দেয় অবাধে বাড়বার স্বাধীনতা। তার উপর, নতুন নতুন ডিজাইন, বাহারী রঙ আর মজবুত গঠন তো আছেই। তাই পছন্দের ভারটা ওই ছোটদের উপরই ছেড়ে দিন। দেখবেন ওরা অনায়াসেই আসল জিনিসটা ঠিক চিনে নেবে।
বাড়ন্ত পায়ের জন্য নরম রঙিন আরাম
লিটল্ স্টার ০১
সাইজ ২-৫
লিলিপুট ৯১
সাইজ ৪-৮
লিলিপুট ৪১
সাইজ ৪-৮
Bata
Bata
Bata
Bata

নতুন সিগন্যাল শুধু ফাঁকা দাবীই করেনা।

এই তার প্রমান:
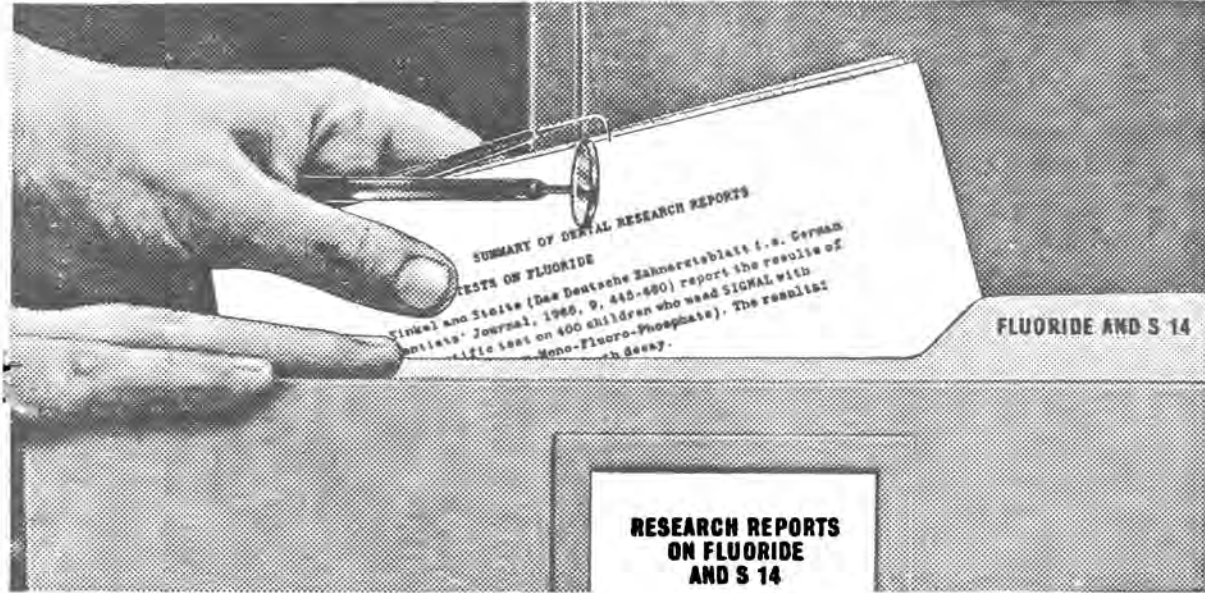
একমাত্র নতুন সিগন্যাল সত্যি সত্যি

ফ্লোরাইড যুক্ত

দন্তক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধ রোধ করতে পারে

দাঁত পরিষ্কার করার অনন্য এক নতুন মূল উপাদানে

(পেটেন্ট নং ১১৪৭১৮ অনুসারে, নতুন সিগন্যাল একমাত্র টুথপেষ্ট যা দাঁত পরিষ্কার করার এই অনন্য মূল উপাদানের সঙ্গে ফ্লোরাইড সংযুক্ত করতে পারে)।

আপনার দাঁতের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন

তিনিই আপনাকে বলে দেবেন নতুন সিগন্যালের **পরীক্ষিত অসাধারণ** উপকারিতার কথা।

ফ্লোরাইডের ওপর ডাক্তারী পরীক্ষা

বৈজ্ঞানিক কিনকেল এবং স্টোল্ট রিপোর্ট দিয়েছেন যে ফ্লোরাইডযুক্ত নতুন সিগন্যাল ব্যবহার করে ৪০০ শিশুর ৩৩% পর্যান্ত দন্তক্ষয় কমে গেছে।

এস--১৪--র ওপর ডাক্তারী পরীক্ষা

(5-amino-1, 3-di (2-ethytheryl) hexa-hydro-5-methyl pyrimidine)) এস – ১৪ ভারতের টুথপেস্টে এই প্রথম ব্যবহৃত হল এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে (পরীক্ষা করেছেন ম্যাসাচুসেটস্ —এর এস আই এ এস ল্যাবরেটরীর ডাইরেক্টর ডাঃ লিগু) ব্যবহার করার ১৫ মিনিটের মধ্যেই **মুখের দুর্গন্ধ ৯৫% কমে গেছে।**

পরিষ্কার করার যোগ্যতায় বিরাট সাফল্য:

নতুন সিগন্যালে ফ্লোরাইড এবং এস--১৪ – দাঁত পরিষ্কার করার এক অনন্য মূল উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যার দরুণ আপনার দাঁত স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। **অন্য কোনো টুথপেষ্ট এমন সামগ্রিক মিশ্রণ যোগাতে পারে না। বিনামূল্যে! চমকপ্রদ!**

দাঁতের সম্পূর্ণ পরিচর্য্যা সম্পর্কে সচিত্র পুস্তিকার জন্যে এখানে লিখুন:

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, ক্লিনিকাল ডিপার্টমেন্ট, পোঃ বঃ নং ৪০৯, বম্বে ৪০০--০০১।
(ডাক খরচের জন্যে ২৫ পঃ ডাকটিকিট সঙ্গে পাঠাবেন।)।

সিগন্যাল সম্পর্কে গ্যারেন্টী দিচ্ছে— হিন্দুস্থান লিভার

লিনটাস-SGF. 64C-140 BG

সেদিন দুপুরে না-ঘুমিয়ে কুমু বাগানে মাটি খুঁড়ছিল একমনে। তার দাদা দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

–কি করছিস রে কুমু? মাটি খুঁড়ে?

–ভুগভ্যো রেল বানাচ্ছি।

–তার মানে?

–আহা, ধেড়ে ছেলে ভুগভ্যো রেল জাননা? মাটির তলা দিয়ে রেল গাড়ি ছুটে চলে হুস্ হুস্। পৃথিবীর কত দেশে আছে। কলকাতাতেও হবে।

–তুই কি করে জানলিরে পাকা বুড়ি?

–জানি। বাবা বলেছে। ভুগভ্যো রেল হলে বাবাকে আর ভীড় ঠেলে ট্রামে বাসে উঠতে হবে না। রেলে চাপলেই হুউস্ করে পৌঁছে দিয়ে যাবে স্টেশনে। রোজ কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বাবা। কি মজা হবে তখন। তাই না?

medium
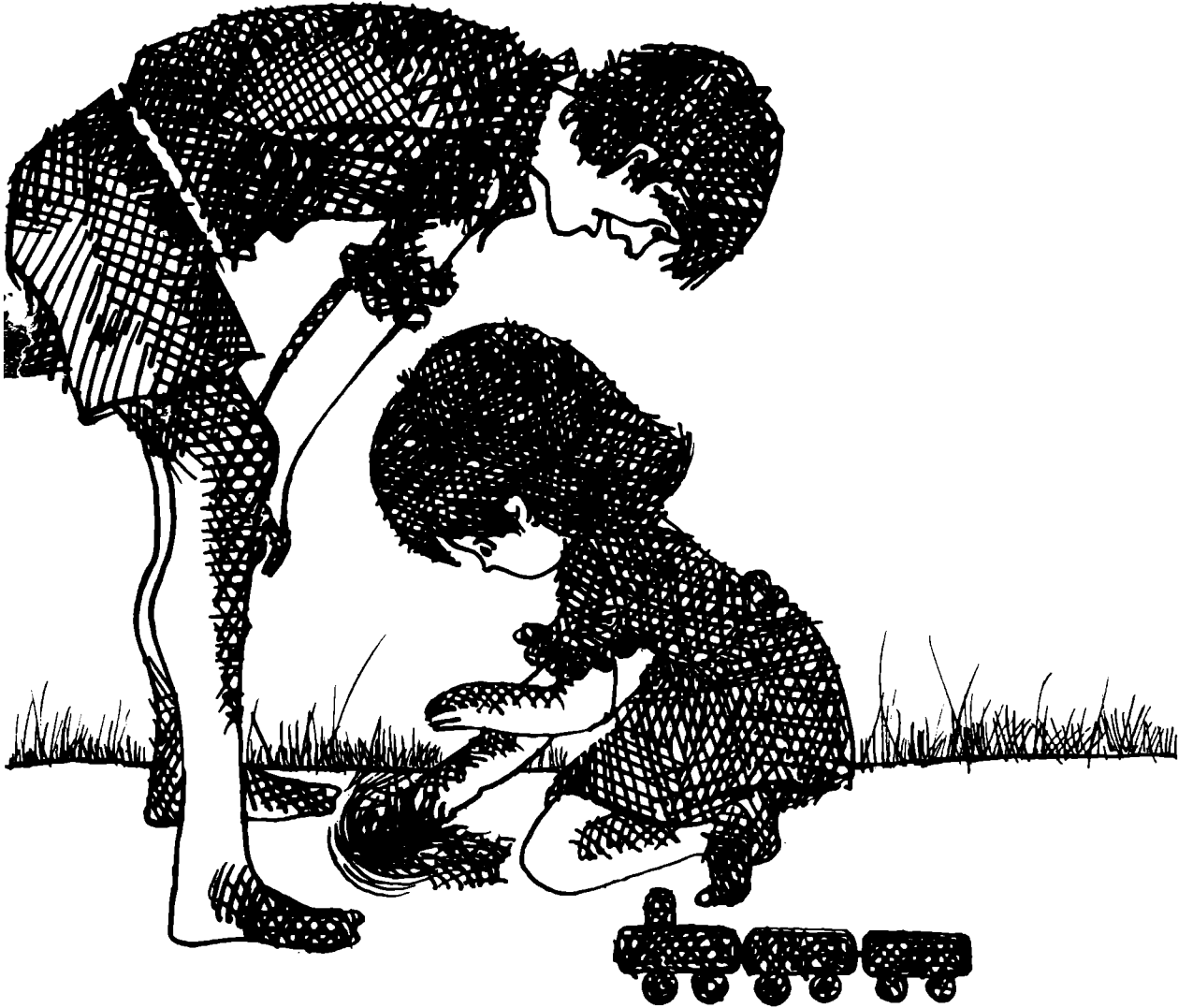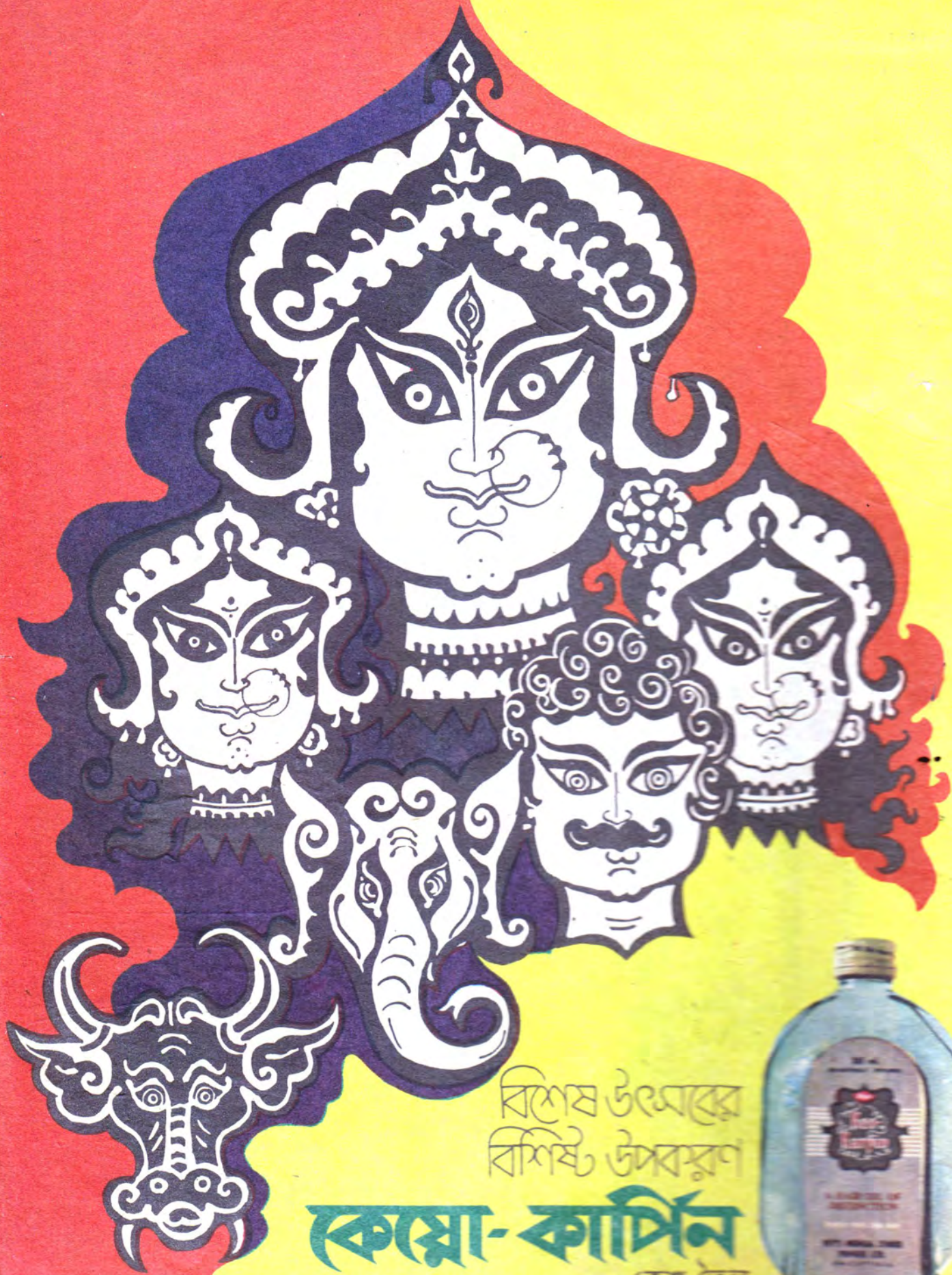
বিশেষ উৎসবের
বিশিষ্ট উপকরণ
কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল
Dey's
দে'জ মেডিক্যালের তৈরী

হাফ ডজন ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়/ছড়া/১০
ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

বনফুল/ছড়া/৬০
ছবি এঁকেছেন শুভেন্দু দেব

অমিতাভ চৌধুরী/ছড়া/৯৮
ছবি এঁকেছেন তমাল মৈত্র

রূপকথা

শৈলেন ঘোষ/আজব বাঘের আজগুবি/৩৪
ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী/রাজকুমারের পোশাকে/৬২
ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

সমরেশ বসু/মোক্তারদাদুর কেতুবধ/১১০
ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

মতি নন্দী/কোনি/১৭৪
ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

আনন্দমেলা

বড় গল্প

সত্যজিৎ রায়/ডক্টর শেরিং-এর স্মরণ শক্তি/১৪
ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র/গান/২৪
ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কমিক্‌স

চণ্ডী লাহিড়ী/শজারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব/৫৮
ছবি এঁকেছেন চণ্ডী লাহিড়ী

সিদ্ধার্থ সরকার/সিনেমার অভিনয়/১০১
ছবি এঁকেছেন সিদ্ধার্থ সরকার ॥ বয়স ৮ বছর

গল্প

সতীকান্ত গুহ/বড় হওয়ার মন্ত্র/৮৯
ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

মনোজ বসু/দানো বাঘ/১০৫
ছবি এঁকেছেন প্রণবেশ মাইতি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়/শোধ বোধ/১৪৫
ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/জ্যান্ত খেলনা/১৫২
ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

বুদ্ধদেব গুহ/নাগেশ্বরোয়া/১৫৯
ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

শিবরাম চক্রবর্তী/দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ/১৬৯
ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

শক্তি চট্টোপাধ্যায়/মুড়ি/২৫১
ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

লীলা মজুমদার/সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশনস লিমিটেড/২৩১
ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

বিমল মিত্র/কর্ণেল মিত্র/২৩৫
ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু/রামায়ণে নেই/২৬১
ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

বিশেষ রচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/মজার রাজা ক্রিকেট/২২০
পুর্ণেন্দু পত্রী/কলকাতার রাজকাহিনী/২৫৩
চিরঞ্জীব/ফুটবলের তিন রাজা/২৬৫
ধাঁধাঁ/২৩৪

প্রতিযোগিতা/২৪১
পরাগ রায়/ছবি
পুপু রায়/ছবি
অবুল সালাম মহম্মদ নুরুল গণি/ছবি
তারককুমার রায়/গল্প
মৌসুমী শেঠ/গল্প
নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত/গল্প
মহুয়া মিত্র/গল্প
সৌগত মিত্র/ছড়া
ঝুমুর সোম/ছড়া
কেতকী নাগ/ছড়া
মুক্তি সমাদ্দার/ছড়া

অলঙ্করণ
বিপুল গুহ, অসিত পাল
অহিভূষণ মালিক

প্রচ্ছদ
বর্ণা সেনগুপ্ত

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা: লি:-এর
পক্ষে ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলি-৭০০০০১ থেকে রামকৃষ্ণ ঘোষ
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—অশোককুমার সরকার
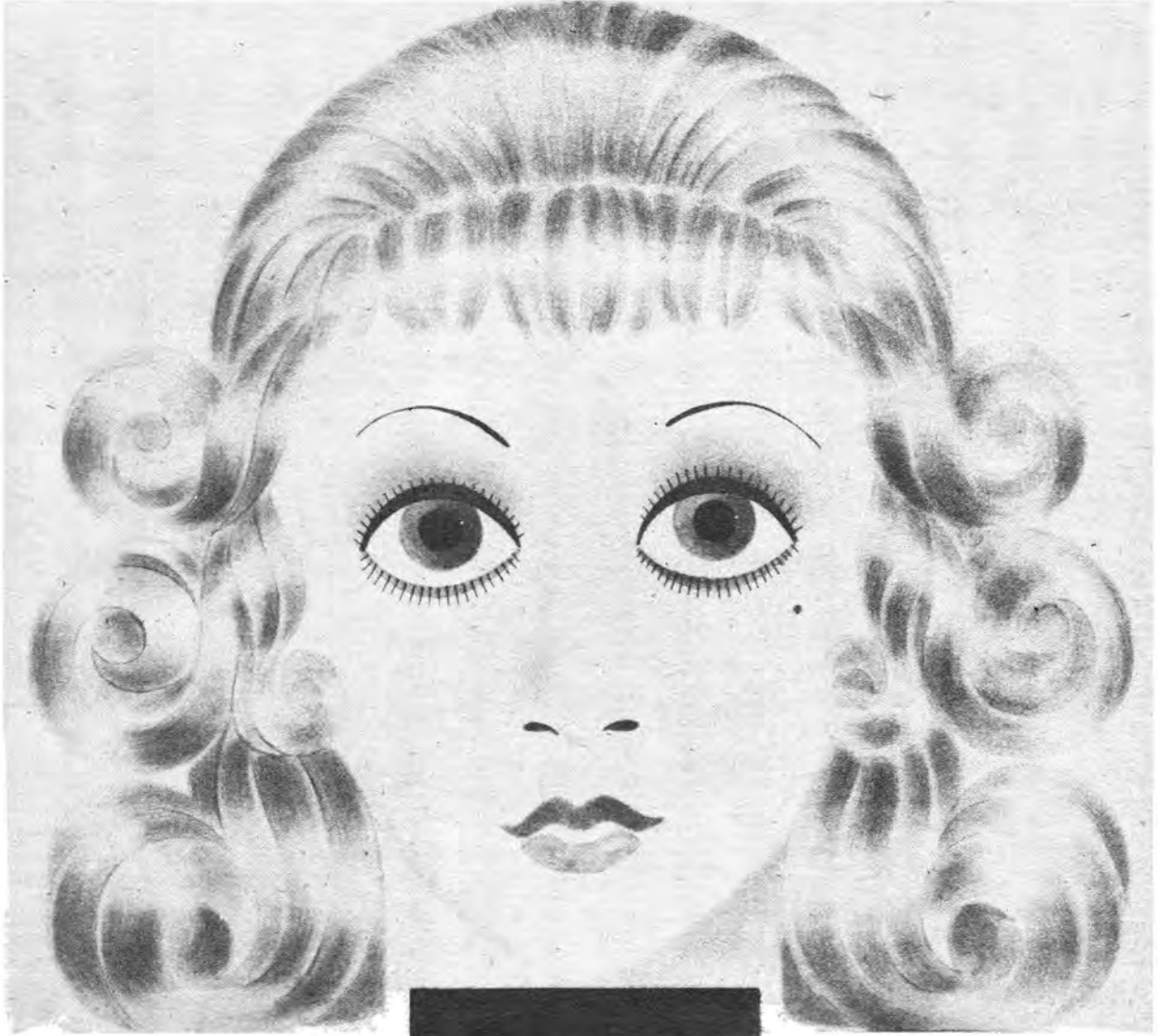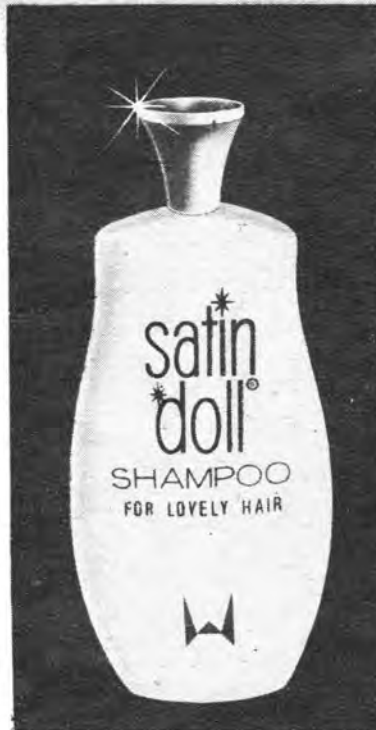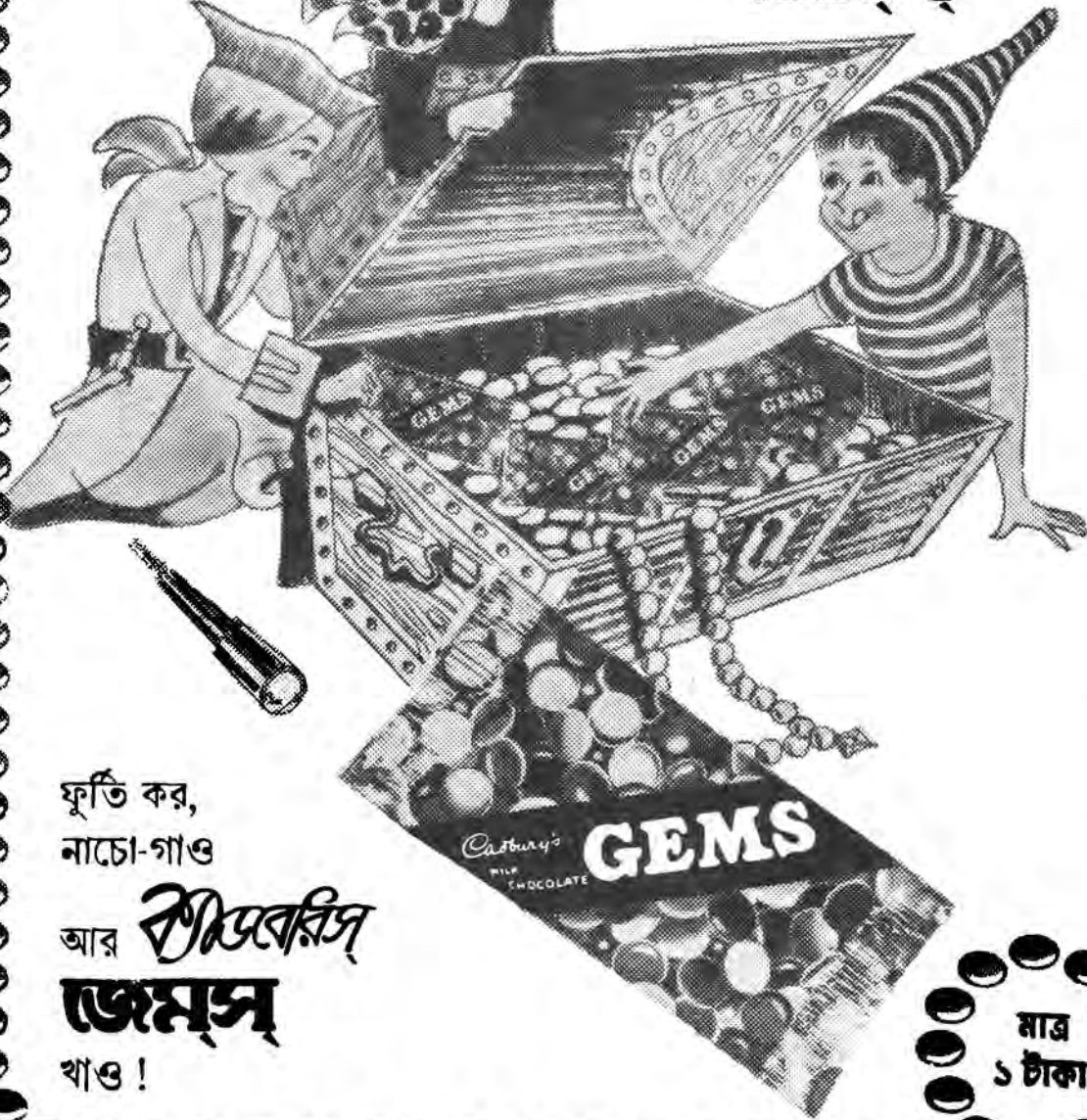
বাঃ!
কি মিষ্টি, কি চমৎকার!
রং-বেরং
ক্যাডবেরিস্
মিল্ক চকোলেট
জেম্‌স্
GEMS
GEMS
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
ফুর্তি কর,
নাচো-গাও
আর ক্যাডবেরিস্
জেম্‌স্
খাও!
মাত্র
১ টাকা
AIYARS-C.165 BN

অন্নদাশঙ্কর

১

আধমণী কৈলাস

আধমণ চাল তার
এক থালা ভাত
কে খায়? কে খায়?
কৈলাসনাথ।
আধমণী কৈলাস
খায় আর কী?
একসের আন্দাজ
ভঁয়সা ঘী।
ঘী দিয়ে ভাত খায়
সঙ্গে কী এর?
অড়হর ডাল খায়
চার পাঁচ সের।
এতেই কি পেটুকের
পেট ভরে যায়?
ঝোল ঝাল অম্বল
মিষ্টিও খায়।
নিরামিষভোজী ছিল
ডাইনোসর
তেমনি এ যুগে এই
কৈলাসর।
আজকাল এই জীব
বাঁচবে কেমনে?
এ বাজারে খাবে কী এ?
কী পাবে রেশনে?
এরই খোরাকে বাঁচে
ত্রিশজন লোক
তাই আমি এর তরে
করব না শোক।

২

তাসের আড্ডা

খেলব না তো গোলামচোর
সবাই তোরা চালাক ঘোর
গোলাম ধরাস্ হাতে।
যতবারই পাঠাই পাশে
ততবারই ঘুরে আসে
থাকে আমার সাথে।

খেলব না তো গাধার ব্রে

রায়ের ছড়া

ভুলেও তোরা টানিস্ নে
পেলে আমায় দিবি
যতবারই পাঠাই পাশে
ততবারই ঘুরে আসে
ইস্কাবনের বিবি।

৩

ঝড়খালির বাঘ

বাঘা ঘুমোল পাড়া জুড়োল
শান্তি এল দেশে
ঝড়খালিতে ঝড় থেমেছে.
আটাশ দিনের শেষে।

৪

জলসা

ওই দ্যাখ, আসছেন রুরু
এইবার নাচ হোক শুরু।
রুরুবাবু নাচছেন।
ঘুরে ঘুরে নাচছেন
সুরে সুরে নাচছেন
তালে তালে নাচছেন
তাক তাক ধিন ধিন
ধিন ধিন তাক
রুরুবাবু খান ঘুরপাক।
তারপর পড়ে যান ধপাস্।
সাবাস! সাবাস!

ওই দ্যাখ, আসছেন বিবি
তোরা সবে গান জুড়ে দিবি।
হাম্পটি ডাম্পটি
স্যাট অন এ ওয়াল
লে আও ঢাল আর
লাও তরোয়াল।
হাম্পটি ডাম্পটি
হ্যাড এ গ্রেট ফল
পড়েছে রে মরেছে রে
চল চল চল।
হাট্টি মাটিম টিম
ওরা মাঠে পাড়ে ডিম।
কান হলো ঝালাপালা
শেষ কর এই পালা
ভঙ্গ হোক সভা।
বাহবা! বাহবা!

৫

হিংসুটে

পিসী, তুমি মাসী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মাসী?
পিসী, তুমি ওদের মাসী হলে
কেমন করে তোমায় ভালোবাসি!
হিসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না।
পিসী তুমি, নও মাসী।

পিসী, তুমি মামী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মামী?
পিসী, তুমি ওদের মামী হলে
কেমন করে ভালোবাসি আমি!
হিসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না।
পিসী তুমি, নও মামী।

পিসী, তুমি কাকী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন কাকী?
পিসী, তুমি ওদের কাকী হলে
কেমন করে পিসী বলে ডাকি!
হিসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না।
পিসী তুমি, নও কাকী।

৬

টোগো

বাপের নাম বাচ্চা
মায়ের নাম মেরী আর
কান দুটি তার আচ্ছা
ভালো জাতের বাচ্চা
কালা ধলা টেরিয়ার।
নাম রাখা হয় টোগো
জাপানের সেই হীরো
ডাকে কেমন ঘো ঘো
মহাবীর টোগো
থাকে কেমন ধীর ও
শেখাই ওকে সার্কাস
মুখে ধরাই লাঠি
খেলাঘরের চার পাশ
দেখাই কেমন সার্কাস
সঙ্গে নিয়ে হাঁটি।
সেদিন বেলা সাতটায়
লাঠি দিলেম মুখে
লাঠি ছেড়ে হাতটায়
সকাল বেলা সাতটায়
কামড় দিল ঠুকে।
হায়রে সে কী ঝকমারি
জলাতঙ্ক রোগ ও
আমার হলো ডাক্তারি
হায়রে সে কী ঝকমারি
মারা গেল টোগো।
সবাই বলে, বিষেই
তোমার কী হয় দেখো
টোগোর সঙ্গে মিশেই
তোমায় ধরবে বিষেই
তুমিও এবার শেখো।
ভয়ে ভয়ে দিন যায়
পাগলা না হই শেষটা
কসৌলী না পাঠায়
ভয়ে ভয়ে মাস যায়
সেকালে শেষ চেষ্টা।
বয়স ছিল বছর আট
টোগো ছিল সাথে
বেঁচে আছি বছর ষাট
চুকে গেছে খেলার পাট
দাগ রয়েছে হাতে।
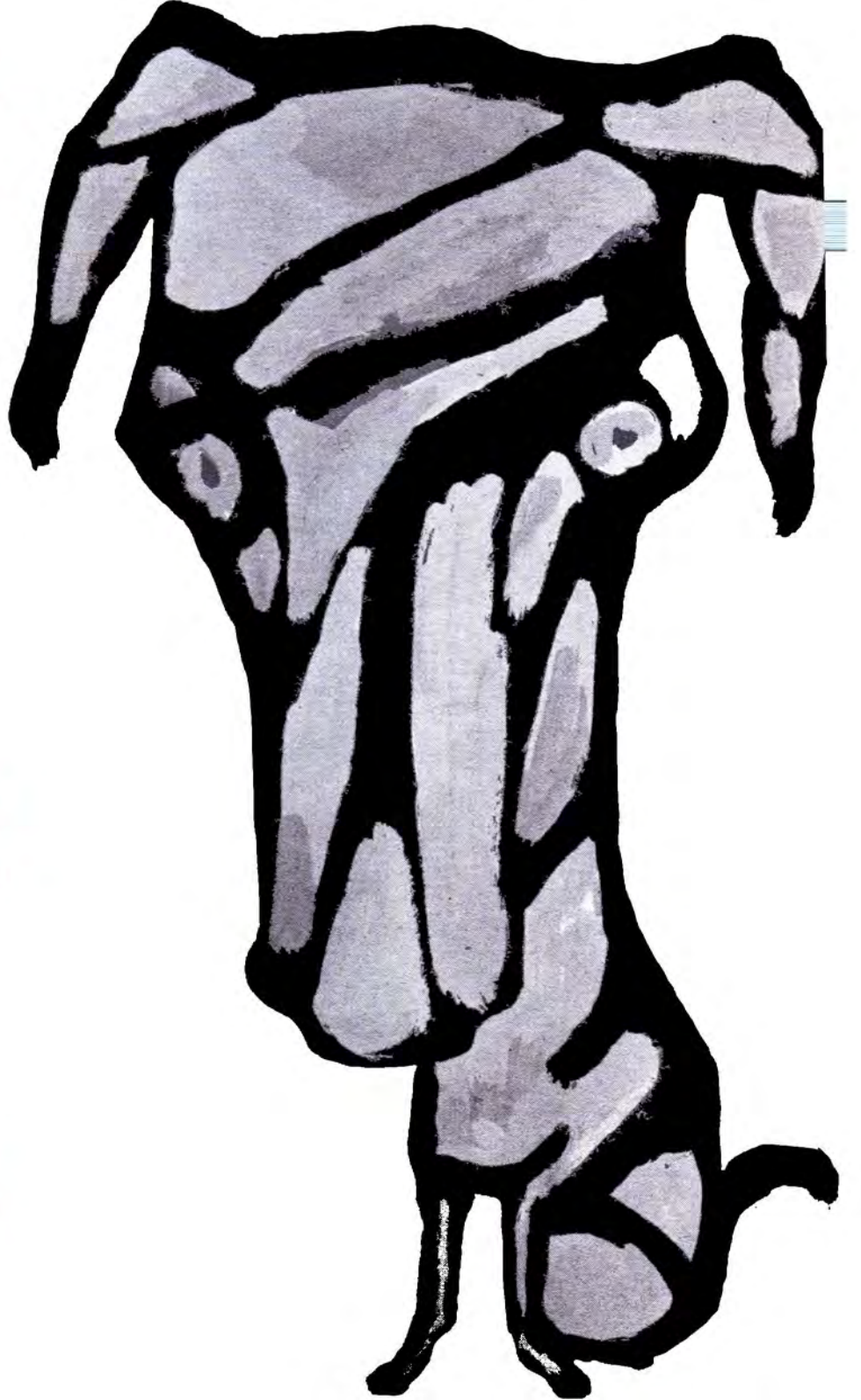
প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার
ডক্টর শেরিং-এর স্মরণশক্তি
সত্যজিৎ রায়

২রা জানুয়ারি

আজ সকালটা বড় সুন্দর। চারিদিকে ঝলমলে রোদ, নীল আকাশে সাদা সাদা হৃষ্টপুষ্ট মেঘ. দেখে মনে হয় যেন ভুল করে শরৎ এসে পড়েছে। সদ্য-পাড়া মুরগীর ডিম হাতে নিলে যেমন মনটা একটা নির্মল অবাক আনন্দে ভরে যায়, এই আকাশের দিকে চাইলেও ঠিক তেমনি হয়।

আনন্দের অবিশ্যি আরেকটা কারণ ছিল। আজ অনেকদিন পরে বিশ্রাম। আমার যন্ত্রটা আজই সকালে তৈরি হয়ে গেছে। বাগান থেকে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থেকে একটা গভীর প্রশান্তি অনুভব করেছি। জিনিসটা বাইরে থেকে দেখতে তেমন কিছুই নয়। মনে হবে যেন হাল ফ্যাসানের একটা টুপি বা হেলমেট। এই হেলমেটের খোলের ভিতর রয়েছে বহু হাজার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারের জটিল স্নায়বিক কেন্দ্র সাড়ে তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই যন্ত্র এটা কী কাজ করে বোঝানোর জন্য একটা সহজ উদাহরণ দিই

এই কিছুক্ষণ আগেই আমি চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে আমার চাকর প্রহ্লাদ এসেছিল কফি নিয়ে। আমি তাকে জিগ্যেস করলাম গত মাসের ৭ই সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে। প্রহ্লাদ মাথাটাথা চুলকে বলল, 'এজ্ঞে সে ত স্মরণ নেই বাবু।' আমি তখন তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হেলমেটটা মাথায় পরিয়ে দিয়ে একটা বোতাম টিপতেই প্রহ্লাদের শরীরটা মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠে একেবারে স্থির হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার চোখ দুটো একটা নিষ্পলক দৃষ্টিহীন চেহারা নিল। এবার আমি তাকে আবার প্রশ্নটা করলাম।

'প্রহ্লাদ, গত মাসের সাত তারিখে সকালে বাজার থেকে কী মাছ এনেছিলে?'

প্রশ্নটা করতে প্রহ্লাদের চাহনির কোনো পরিবর্তন হল না; কেবল তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে জিভটা নড়ে উঠে শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হল—'ট্যাংরা'।

টুপি খুলে দেবার পর প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে একগাল হেসে বলল, 'মনে পড়েছে বাবু—ট্যাংরা!'

এইভাবে শুধু প্রহ্লাদ কেন, যে-কোনো লোকেরই যে-কোনো হারানো স্মৃতিকে এ যন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারে। একজন সাধারণ লোকের মাথায় নাকি প্রায় ১00,000,000,000,000—অর্থাৎ এক কোটি কোটি—স্মৃতি জমা থাকে, তার কোনোটা স্পষ্ট, কোনোটা আবছা। তার মধ্যে দৃশ্য, ঘটনা, নাম, চেহারা, স্বাদ, গন্ধ, গান, গল্প, অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য—সব কিছুই থাকে! সাধারণ লোকের দু বছর বয়সের আগের স্মৃতি, খুব অল্প বয়সেই মন থেকে মুছে যায়। আমার নিজের স্মরণশক্তি অবিশ্যি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। আমার এগার মাস বয়সের ঘটনাও কিছু কিছু মনে আছে। অবিশ্যি কয়েকটা খুব ছেলেবেলার স্মৃতি আমার মনেও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। যেমন, এক বছর তিন মাস বয়সে একবার এখানকার সেযুগের ম্যাজিস্ট্রেট ব্র্যাকওয়েল সাহেবকে ছড়ি হাতে কুকুর নিয়ে উশ্রীর ধারে বেড়াতে দেখেছিলাম। কুকুরটার রং ছিল সাদা, কিন্তু জাতটা মনে ছিল না। আজ যন্ত্রটা মাথায় দিয়ে দৃশ্যটা মনে করতেই তৎক্ষণাৎ কুকুরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে জানিয়ে দিল সেটা ছিল বুল টেরিয়ার।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি রিমেমব্রেন। অর্থাৎ ব্রেন বা মস্তিষ্ককে যে যন্ত্র রিমেমবার বা স্মরণ করতে সাহায্য করে। কালই এটার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি ইংল্যান্ডের নেচার পত্রিকায়। দেখা যাক কী হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

আমার লেখাটা নেচারে বেরিয়েছে, আর বেরোনর পর থেকেই অজস্র চিঠি পাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া জাপান সব জায়গা থেকেই যন্ত্রটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ৭ই মে ব্রাসেল্‌স শহরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন আছে, সেখানে যন্ত্রটা ডিমনস্ট্রেট করার জন্য অনুরোধ এসেছে। এমন একটা যন্ত্র যে হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না, যদিও আমার ক্ষমতার কথা এরা অনেকেই জানে। আসলে হয়েছে কি, স্মৃতির গূঢ় রহস্যটা এখনো বিজ্ঞানের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। আমি নিজেই শুধু এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে, কোনো একটা তথ্য মাথার মধ্যে ঢুকলেই সেটা সেখানে স্মৃতি হিসাবে নিজের জন্য খানিকটা জায়গা করে নেয়। আমার বিশ্বাস এক একটি স্মৃতি হল এক একটি পরমাণুসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ, এবং প্রত্যেক স্মৃতিরই একটি করে আলাদা রাসায়নিক চেহারা ও ফরমুলা আছে। যত দিন যায়, স্মৃতি তত ঝাপসা হয়ে আসে। কারণ কোনো পদার্থই চিরকাল এক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমার যন্ত্র মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করে স্মৃতি নামক পদার্থটিকে তাজা করে তুলে পুরোন কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনেকে প্রশ্ন করবে স্মৃতির রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ না করেও আমি কী করে এমন যন্ত্র তৈরী করলাম। উত্তরে বলব যে, আজকের দিনে আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে যতটা জানি, আজ থেকে একশো বছর আগে তার সিকি ভাগও জানা ছিলনা, অথচ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আশ্চর্য আশ্চর্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই তৈরি হয়েছে আমার রিমেমব্রেন যন্ত্র।

নেচারে লেখাটা বেরোবার ফলে একটা চিঠি পেয়েছি, যেটা আমার ভারি মজার লাগল। আমেরিকার ক্রোড়পতি শিল্পপতি হিরাম হোরেনস্টাইন জানিয়েছেন যে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসে দেখছেন যে তাঁর সাতাশ বছর বয়সের আগের ঘটনাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে না। আমার যন্ত্র ব্যবহার করে এই সময়কার ঘটনাগুলো মনে করতে পারলে তিনি আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন। সৌখীন মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের শখ মেটানোর জন্য আমি এ যন্ত্র তৈরি করিনি। এই কথাটাই তাকে আমি একটু নরম ভাষায় লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

৪ঠা মার্চ

আজ খবরের কাগজে সুইটজারল্যান্ডে একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্টের কথা পড়ে মনটা ভার হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে বিষয়ে একটা দীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে হাজির। একেই বোধহয় বলে টেলিপ্যাথি। খবরটা হচ্ছে এই।—একটা গাড়িতে দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—সুইটজারল্যান্ডের অটো লুবিন ও অস্ট্রিয়ার ডক্টর হিয়েরোনিমাস শেরিং—অস্ট্রিয়ার লান্ডেক শহর থেকে সুইটজারল্যান্ডের ওয়ালেনস্টাট শহরে আসছিলেন। এই দুই বৈজ্ঞানিক কিছুদিন থেকে কোনো একটা গোপনীয় বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে সামনে ছিল ড্রাইভার, পিছনে লুবিন আর শেরিং। পাহাড়ে পথ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ি খাদে পড়ে। নিকটবর্তী গ্রামের এক মেষপালক চূর্ণবিচূর্ণ গাড়িটিকে দেখতে পায় রাস্তা থেকে প্রায় হাজার ফুট নিচে। গাড়ির কাছাকাছি ছিল লুবিনের হাড়গোড় ভাঙা মৃতদেহ। আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছিলেন ডক্টর শেরিং। রাস্তা থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট নিচে একটি ঝোপে আঁটকে যায় তাঁর দেহ। দুর্ঘটনার খবর ওয়ালেনস্টাটে পেঁৗছান মাত্র সুইস বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশ সেখানে গিয়ে

উপস্থিত হন। লুবিন ও শেরিং বুশের কাছেই যাচ্ছিলেন কিছু-দিনের বিশ্রামের জন্য। বুশ তার সুপ্রশস্ত মার্সেডিস গাড়িতে শেরিংকে অজ্ঞান অবস্থায় তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। এইটুকু খবর কাগজে বেরিয়েছে। বাকিটা জেনেছি বুশের টেলিগ্রামে। এখানে বলে রাখি যে বুশকে আমি চিনি আজ দশ বছর থেকে; ফ্লোরেন্সে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। বুশ লিখেছে—যদিও শেরিং-এর দেহে প্রায় কোনো জখমের চিহ্ন নেই, তার মাথায় চোট লাগার ফলে তার মন থেকে স্মৃতি জিনিসটাই নাকি বেমালুম লোপ পেয়ে গেছে। আরো একটা খবর এই যে, গাড়ির ড্রাইভারটি নাকি উধাও এবং সেই সঙ্গে গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র। শেরিং-এর স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ডাক্তার, মনস্তাত্ত্বিক, হিপ্‌নটিস্ট ইত্যাদির চেষ্টা নাকি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বুশ আমাকে পত্রপাঠ আমার যন্ত্রসমেত ওয়ালেন-স্টাট চলে যেতে বলেছে। খরচপত্র সেই দেবে। টেলিগ্রামের শেষে সে বলছে—'ডঃ শেরিং একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। তাঁকে পুনর্জীবন দান করতে পারলে বিজ্ঞানীমহল তোমার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ থাকবে। কী স্থির কর সত্বর জানাও।'

আমার যন্ত্রের দৌড় কতদূর সেটা দেখার এবং দেখাবার এমন সুযোগ আর আসবে না। ওয়ালেনস্টাট যাবার তোড়জোড় আজ থেকেই করতে হবে। আমার যন্ত্র ষোল আনা পোর্টেবল। এর ওজন মাত্র আট কিলো। প্লেনে অতিরিক্ত ভাড়া দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৮ই মার্চ

আজ সকালে জুরিখে পৌঁছে সেখান থেকে বুশের মোটরে করে মনোরম পাহাড়ী পথ দিয়ে ৬০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট ওয়ালেনস্টাট শহরে এসে পৌঁছলাম পৌনে নটায়। একটু পরেই প্রাতরাশের ডাক পড়বে। আমি আমার ঘরে বসে এই ফাঁকে ডায়রি লিখে রাখছি। গাছপালা ফুলেফলে ভরা ছবির মতো সুন্দর পরিবেশের মধ্যে চোদ্দ একর জমির উপরে বায়োকেমিস্ট নরবার্ট বুশের বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল। আমি দোতলায় পশ্চিমের একটা ঘরে রয়েছি, ঘরের জানালা খুললেই পাহাড়ে ঘেরা ওয়ালেন লেক দেখা যায়। আমার যন্ত্রটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে খাটের পাশেই একটা টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না। এইমাত্র বুশের তিন বছরের ছেলে উইলি আমাকে এক প্যাকেট চকোলেট দিয়ে গেল। ছেলেটি ভারি মিষ্টি ও মিশুকে—আপন মনে ঘুরে ঘুরে সুর করে ছড়া কেটে বেড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে সকলকে অভিবাদন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমার দিকে এগিয়ে এসে একটা কালো চুরুটের কেস সামনে ধরে বলল, 'সিগার খাবে?' আমি ধূমপান করি না, কিন্তু উইলিকে নিরাশ করতে ইচ্ছে করল না, তাই ধন্যবাদ দিয়ে একটা চুরুট বার করে নিলাম। খেলে অবিশ্যি এরকম চুরুটই খেতে হয়; অতি উৎকৃষ্ট ডাচ সিগার।

এ বাড়িতে সবশুদ্ধ রয়েছে ছ'জন লোক—বুশ, তার স্ত্রী ক্লারা, শ্রীমান উইলি, বুশের বন্ধুস্থানীয় স্কুলের শিক্ষক অমায়িক স্বল্পভাষী হান্‌স উলরিখ, ডাঃ শেরিং ও তাঁর পরিচারিকা—নাম বোধহয় মারিয়া। এ ছাড়া দুজন পুলিশের লোক বাড়িটাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে।

শেরিং রয়েছে পুবদিকে একটা ঘরে। আমাদের দু'জনের ঘরের মধ্যে রয়েছে ল্যান্ডিং ও একতলায় যাবার সিঁড়ি। আমি অবিশ্যি এসেই শেরিংকে একবার চাক্ষুষ দেখে এসেছি। মাঝারি হাইটের মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, মাথার সোনালি চুলের পিছন দিকে টাক পড়ে গেছে। মুখটা চৌকো ও গোলের মাঝামাঝি। তাকে যখন দেখলাম তখন সে জানালার ধারের একটা চেয়ারে বসে হাতে একটা কাঠের পুতুল নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। আমি ঘরে ঢুকতে সে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না। বুঝলাম ঘরে লোক ঢুকলে উঠে দাঁড়ানর সাধারণ সাহেবী কেতাটাও সে ভুলে গেছে। চোখের চাহনি দেখে কিরকম খট্‌কা লাগল। জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি চশমা পর?'

শেরিং-এর বাঁ হাতটা আপনা থেকেই চোখের কাছে উঠে এসে আবার নেমে গেল। বুশ বলল, 'চশমাটা ভেঙে গেছে। আরেকটা বানাতে দেওয়া হয়েছে।'

শেরিংকে দেখে এসে আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। একথা সেকথার পর বুশ সলজ্জভাবে বলল, 'সত্যি বলতে কি, আমি যে তোমার যন্ত্রটা সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম তা নয়। কতকটা আমার স্ত্রীর অনুরোধেই তোমাকে আমি টেলি-গ্রামটা করি।'

'তোমার স্ত্রীও কি বৈজ্ঞানিক?' আমি ক্লারার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্নটা করলাম। ক্লারাই হেসে উত্তর দিল।

'একেবারেই না। আমি আমার স্বামীর সেক্রেটারির কাজ করি। আমি চাইছিলাম তুমি আস, কারণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা। তোমার দেশের বিষয় অনেক বই পড়েছি আমি, অনেক কিছু জানি।'

বুশের যদি আমার যন্ত্র সম্বন্ধে কোনো সংশয় থেকে থাকে ত সেটা আজকের মধ্যেই কেটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আজ বিকেলে শেরিং-এর স্মৃতির বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা হবে।

এবার ড্রাইভারের কথাটা না জিগ্যেস করে পারলাম না। বুশ বলল, 'পুলিশ তদন্ত করছে। দুটি জায়গার একটিতে ড্রাইভার লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা হল দুর্ঘটনার জায়গার সাড়ে চার কিলোমিটার পশ্চিমে—নাম রেমুস. আরেকটা হল সাড়ে তিন কিলোমিটার পুবে—নাম প্লাইনস্‌ দুটো জায়গাতেই অনু-সন্ধান চলছে; তাছাড়া পাহাড়ের গুহা কন্দরেও খোঁজা হচ্ছে।'

'দুর্ঘটনার জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে?'

'পঁচাশি কিলোমিটার। সে ড্রাইভারকে কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতেই হবে, কারণ. ওদিকে রাত্রে বরফ পড়ে। ভয় হয়, তার যদি কোনো সাকরেদ থেকে থাকে এবং ড্রাইভার যদি কাগজ-পত্রগুলো তাকে চালান করে দিয়ে থাকে

৮ই মার্চ, রাত সাড়ে দশটা

ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস বইছে। জানালা বন্ধ থাকা সত্বেও বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

বুশ আজ আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত। এখন বলা শক্ত কে আমার বড় ভক্ত—সে, না তার স্ত্রী।

আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা আমার যন্ত্র নিয়ে শেরিং-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। সে তখনও সেই চেয়ারে গুম্ হয়ে বসে আছে। আমরা ঘরে ঢুকতে আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল। বুশ তাকে অভিবাদন জানিয়ে হালকা রসিকতার সুরে বলল, 'আজ আমরা তোমাকে একটা টুপি পরাব. কেমন? তোমার কোনো কষ্ট হবে না। তুমি ওই চেয়ারে যেমনভাবে বসে আছ, সেই ভাবেই বসে থাকবে।'

'টুপি? কিরকম টুপি?' শেরিং তার গম্ভীর অথচ সুরেলা গলায় একটু যেন অসোয়াস্তির সঙ্গেই প্রশ্নটা করল।

'এই যে, দেখ না।'

আমি ব্যাগ থেকে যন্ত্রটা বার করলাম। বুশ সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে শেরিং-এর হাতে দিল। শেরিং সেটাকে সকালের খেলনাটার মতো করেই নেড়েচেড়ে দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে দিল।

'এতে ব্যথা লাগবে না ত? সেদিনের ইঞ্জেকশনে কিন্তু ব্যথা লেগেছিল।'

ব্যথা লাগবে না কথা দেওয়াতে সে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে শরীরটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাত দুটোকে চেয়ারের

পাশে নামিয়ে দিল। তার ঘাড়ে একটা জায়গায় ক্ষতের উপরে প্লাস্টার ছাড়া শরীরের অনাবৃত অংশে আর কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন দেখলাম না।

শেরিংকে হেলমেট পরাতে কোনো অসুবিধা হল না। তারপর লাল বোতামটা টিপতেই হেলমেট-সংলগ্ন ব্যাটারিটা চালু হয়ে গেল। শেরিং একটা কাঁপুনি দিয়ে শরীরটাকে কাঠের মতো শক্ত ও অনড় করে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঘরের ভিতরে এখন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। এক শেরিং ছাড়া প্রত্যেকেরই দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ক্লারা দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে। নার্স খাটের পিছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে শেরিং-এর দিকে চেয়ে আছে। বুশ ও উলরিখ শেরিং-এর চেয়ারের দু'পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আমি বুশকে মৃদুস্বরে বললাম, 'তুমি প্রশ্ন করতে চাও? না আমি করব? তুমি করলেও কাজ হবে কিন্তু।'

'তুমিই শুরু কর।'

আমি ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট টুল টেনে নিয়ে শেরিং-এর মুখোমুখি বসলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম—

'তোমার নাম কী?'

শেরিং-এর ঠোঁট নড়ল। চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় উত্তর এলো।

'হিয়েরোনিমাস হাইনরিখ শেরিং।'

'এই প্রথম!'—রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল বুশ—'এই প্রথম নিজের

নাম বলেছে!'

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম।

'তোমার পেশা কী?'

'পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।'

'তোমার জন্ম কোথায়?'

'অস্ট্রিয়া।'

'কোন্ শহরে?'

'ইন্‌স্‌ব্রুক।'

আমি বুশের দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলাম। বুশ মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল—মিলছে। আমি আবার শেরিং-এর দিকে ফিরলাম।

'তোমার বাবার নাম কী?'

'কার্ল ডীট্রিখ শেরিং।'

'তোমার আর ভাইবোন আছে?'

'ছোট বোন আছে একটি। বড় ভাই মারা গেছে।'

'কবে মারা গেছে?'

'প্রথম মহাযুদ্ধে। পয়লা অক্টোবর, উনিশ শ সতেরো।'

আমি প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে বিস্ময়বিমুগ্ধ বুশের দিকে চেয়ে তার মৃদু মৃদু মাথা নাড়া থেকে বুঝে নিচ্ছি শেরিং-এর উত্তরগুলো সব মিলে যাচ্ছে।

'তুমি লান্ডেক গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে?'

'প্রোফেসর লুবিনের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'কী কাজ?'

'গবেষণা।'

'কী বিষয়?'

'বি-এক্স থ্রি সেভ্‌ন সেভ্‌ন।'

বুশ ফিস্‌ফিস্ করে জানিয়ে দিল এটা হচ্ছে গবেষণাটির সাংকেতিক নাম। আমি প্রশ্নে চলে গেলাম।

'সেই গবেষণার কাজ কি শেষ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সফল হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'গবেষণার বিষয়টা কী ছিল?'

'আমরা একটা নতুন ধরনের আণবিক মারণাস্ত্র তৈরি করার ফরমুলা বার করেছিলাম।'

'কাজ শেষ করে তোমরা ওয়ালেনস্টাট আসছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের সঙ্গে গবেষণার কাগজপত্র ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ফরমুলাও ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল?'

বুশ আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি জানি কেন। কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছি শেরিং-এর মধ্যে একটা চাপা উস্‌খুসে ভাব। একবার জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল। একবার যেন চোখের পাতা পড়ো পড়ো হল। কপালের শিরাগুলোও যেন ফুলে উঠেছে।

'আমি...আমি...'

শেরিং-এর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। আমার বিশ্বাস গোপনীয় গবেষণার বিষয়টা প্রকাশ করে ফেলে ওর মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব জেগে উঠেছে।

আমি সবুজ বোতাম টিপে ব্যাটারি বন্ধ করে দিলাম। এই অবস্থায় আর প্রশ্ন করা উচিত হবে না। বাকিটা কাল হবে।

হেলমেট খুলে নিতেই শেরিং-এর মাথা পিছনে হেলে পড়ল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে পরমুহূর্তেই আবার চোখ খুলে এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'চুরুট...একটা চুরুট...'

আমি শেরিং-এর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলাম। বুশ যেন অপ্রস্তুত। গলা খাক্‌রিয়ে বলল, 'চুরুট ত নেই। এ-বাড়িতে কেউ চুরুট খায় না। সিগারেট খাবে?'

উলরিখ তার পকেট থেকে সিগারেট বার করে এগিয়ে দিয়েছে। শেরিং সিগারেট নিল না।

আমি বললাম, 'তোমার কাছে কি তোমার নিজের কোনো চুরুটের বাক্স ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল!' বলল শেরিং। সে যেন ক্লান্ত, অস্থির।

'কালো রঙের কেস কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তাহলে সেটা উইলির কাছে আছে। ক্লারা, একবার খোঁজ করে দেখবে কি?'

ক্লারা তৎক্ষণাৎ তার ছেলের খোঁজে বেরিয়ে গেল।

নার্স শেরিং-এর হাত ধরে তুলে তাকে খাটে শুইয়ে দিল। বুশ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল, 'এবার তোমার মনে পড়েছে ত?'

উত্তরে শেরিং যেন অবাক হয়ে বুশের দিকে চাইল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'কী মনে পড়েছে?'

শেরিং-এর এই পাল্টা প্রশ্ন আমার মোটেই ভালো লাগল না। বুশও যেন হতভম্ব। সে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সহজ ভাবেই বলল, 'তুমি কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিয়েছ।'

'কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন করেছ আমাকে?'

এবার আমি গত কয়েক মিনিট ধরে যে প্রশ্নোত্তর চলেছে তার একটা বিবরণ শেরিংকে দিলাম। শেরিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর তার ডান হাতটা আলতো করে নিজের মাথার উপর রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমার মাথায় কী পরিয়েছিলে?'

'কেন বল ত?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে অজস্র পিন ফুটছে।'

'তোমার মাথায় এমনিতেই চোট লেগেছিল। পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় তুমি মাথায় চোট পাও, তার ফলে তোমার পূর্বস্মৃতি লোপ পায়।'

শেরিং বোকার মত আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কী সব বলছ তুমি? পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ব কেন?'

আমরা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ক্লারা ফিরে এসেছে। তার হাতে আমার দেখা চুরুটের কেস। সে সেটা শেরিং-এর হাতে দিয়ে বিনীতভাবে বলল, 'আমার ছেলে কখন জানি এটা নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল। তুমি কিছু মনে কোর না।'

বুশ আবার গলা খাক্‌রিয়ে বলল, 'তুমি যে চুরুট খাও সে কথাটা মনে পড়েছে নিশ্চয়ই?'

চুরুটের কেস হাতে নিয়ে শেরিং-এর চোখ বুজে এল। তাকে সত্যিই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম আমাদের এবার এঘর থেকে চলে যেতে হবে।

রিমেমব্রেন যন্ত্র ব্যাগে পুরে নিয়ে আমরা চারজন এসে বৈঠকখানায় বসলাম। খুশি ও খটকা মেশানো অদ্ভুত একটা অবস্থা আমার মনের। হেলমেট পরা অবস্থায় হারানো স্মৃতি ফিরে এলে হেলমেট খোলার পর সে স্মৃতি আবার হারিয়ে যাবে কেন? শেরিং-এর মাথার কি তাহলে খুব বেশিরকম কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

এদের তিনজনকে কিন্তু ততটা হতাশ মনে হচ্ছে না।

উলরিখ ত যন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল, 'এটা যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানে স্মৃতির ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল, সেখানে

পর পর এতগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেওয়া কি সহজ কথা?'

বুশ বলল, 'আসলে মনের দরজা এমন ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সেটা খুলেও খুলছে না। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে কালকের জন্য অপেক্ষা করা। কাল আবার ওকে টুপি পরাতে হবে। আমাদের দিক থেকে কাজটা হবে শুধু প্রশ্নের উত্তর আদায় করা। অ্যাক্সিডেন্টের আগে গাড়িতে কী ঘটেছিল সেটা জানা দরকার। বাকি কাজ করবে পুলিশে।'

আটটা নাগাদ বুশ একবার পুলিশে টেলিফোন করে খবর দিল। ড্রাইভার হাইন্‌ৎস নয়মানের কোনো পাত্তা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাহলে কি বি-এক্স থ্রি সেভ্‌ন সেভ্‌নের ফরমুলা সমেত নয়মানের তুষার সমাধি হল?

৯ই মার্চ

কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত ঘুম আসছেনা দেখে শেষটায় আমারই তৈরি সম্‌নোলিনের বড়ি খেয়ে একটানা সাড়ে তিন ঘন্টা গাঢ় ঘুম হল। আজ সকালে উঠেই আমার যন্ত্রটা একটু নেড়ে চেড়ে তাতে কোনো গন্ডগোল হয়েছে কিনা দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে কাজটা করার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি শেরিং-এর নার্স। ভদ্রমহিলা রীতিমত উত্তেজিত।
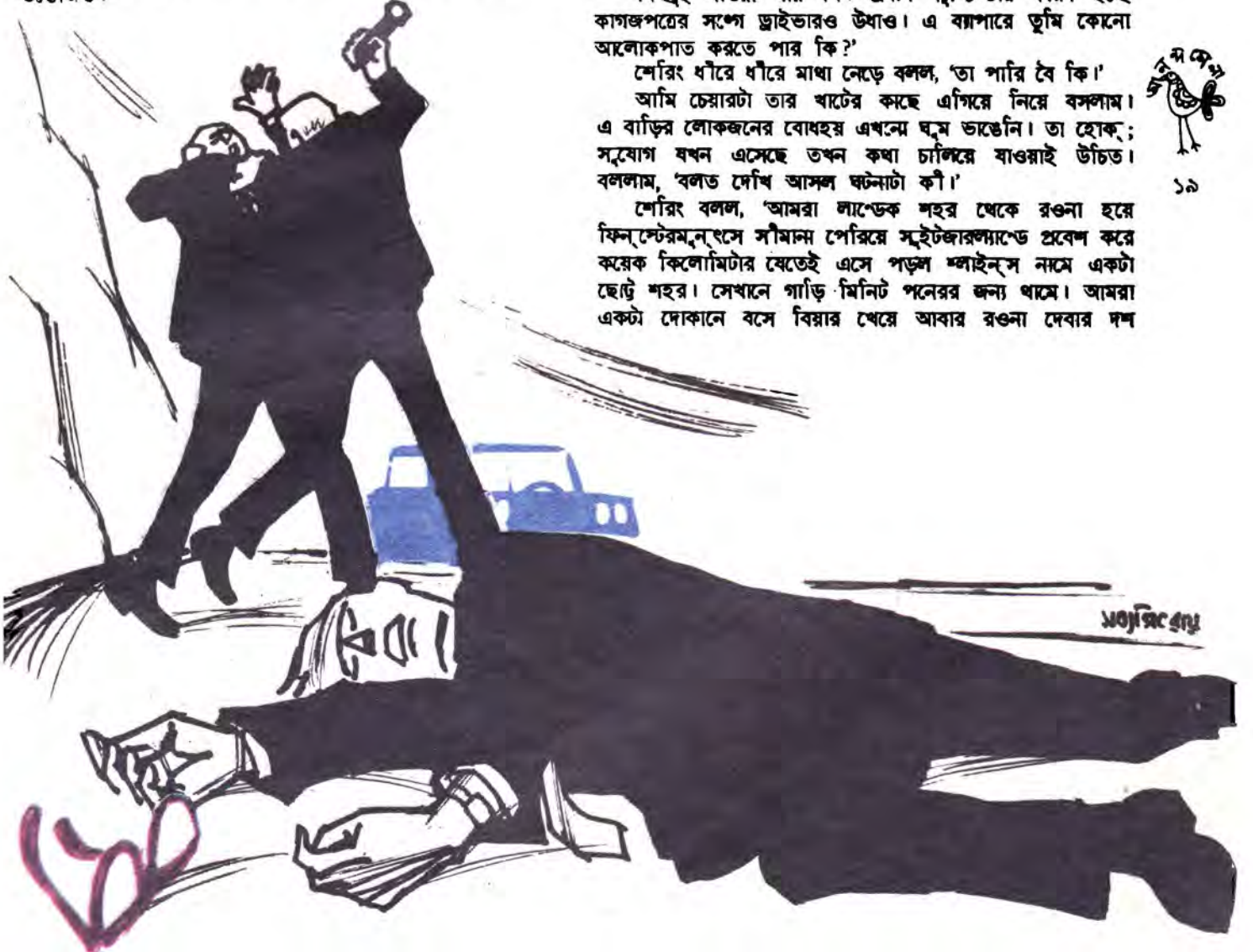
'ডঃ শেরিং তোমাকে ডাকছেন। বিশেষ দরকার।'

'কেমন আছেন তিনি?'

'খুব ভালো। রাত্রে ভালো ঘুমিয়েছেন। মাথার যন্ত্রণাটাও নেই। একেবারে অন্য মানুষ।'

আমি আলখাল্লা পরা অবস্থাতেই শেরিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে ইংরিজিতে গুড মর্নিং বলল। জিগ্যেস করলাম, 'কেমন আছ?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সমস্ত স্মৃতি ফিরে এসেছে। আশ্চর্য যন্ত্র তোমার। শুধু একটা কথা। কাল তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি আমাদের গবেষণা সম্পর্কে যা বলেছি, সেটা তোমাদের গোপন রাখতে হবে।'

সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'আরেকটা কথা। লুবিনের কী হল জানার আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি জানতে চাই সে কোথায়। সেও কি জখম হয়ে পড়ে আছে?'

'না। লুবিন মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

শেরিং-এর চোখ কপালে উঠে গেল। আমি বললাম, 'তুমি যে বেঁচেছ সেটাও নেহাৎই কপাল জোরে।'

'আর কাগজপত্র?' শেরিং ব্যাগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

'কিছুই পাওয়া যায় নি। প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে কাগজপত্রের সঙ্গে ড্রাইভারও উধাও। এ ব্যাপারে তুমি কোনো আলোকপাত করতে পার কি?'

শেরিং ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'তা পারি বৈ কি।'

আমি চেয়ারটা তার খাটের কাছে এগিয়ে নিয়ে বসলাম। এ বাড়ির লোকজনের বোধহয় এখনো ঘুম ভাঙেনি। তা হোক; সুযোগ যখন এসেছে তখন কথা চালিয়ে যাওয়াই উচিত। বললাম, 'বলত দেখি আসল ঘটনাটা কী।'

শেরিং বলল, 'আমরা লান্ডেক শহর থেকে রওনা হয়ে ফিন্‌স্টেরমুন্‌ৎসে সীমানা পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ডে প্রবেশ করে কয়েক কিলোমিটার যেতেই এসে পড়ল শ্লাইন্‌স নামে একটা ছোট্ট শহর। সেখানে গাড়ি মিনিট পনেরর জন্য থামে। আমরা একটা দোকানে বসে বিয়ার খেয়ে আবার রওনা দেবার দশ

মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে কী জানি গণ্ডগোল হওয়ায় ড্রাইভার নয়মান গাড়ি থামায়। তারপর নেমে গিয়ে সে বনেট খুলে কী যেন দেখে লুবিনকে ডাক দেয়। লুবিন নেমে নয়মানের দিকে এগিয়ে যেতেই নয়মান তাকে একটা রেঞ্চ দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে। স্বভাবতই আমিও তখন নামি। কিন্তু নয়মান শক্তিশালী লোক। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আমি হেরে যাই, সে আমারও মাথায় রেঞ্চের বাড়ি মেরে আমায় অজ্ঞান করে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।'

আমি বললাম, 'পরের অংশ তো সহজেই অনুমান করা যায়। নয়মান তোমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলে দিয়ে গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে পালায়।'

টেলিফোন বাজার একটা আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই শুনেছিলাম, এখন শুনলাম কাঠের মেঝের উপর দ্রুত পা ফেলার শব্দ। বুশ দৌড়ে ঘরে ঢুকলো। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় খাদের মধ্যে কিছু কাগজ পাওয়া গেছে। লেখা প্রায় মুছে গেছে, কিন্তু সেটা কী কাগজ তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।'

'তাহলে ফরমুলা হারায়নি?' শেরিং চেঁচিয়ে উঠল।

শেরিং-এর মুখে এ প্রশ্ন শুনে বুশ রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা। আমি তাকে সকালের ব্যাপারটা বলে দিলাম। বুশ বলল, 'তার মানে বুঝতে পারছ তো?—নয়মান হয়ত ফরমুলা নেয়নি। শুধু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দামী জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।'

'সেটা কী করে বলছ তোমরা,' শেরিং ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল—'গবেষণা সংক্রান্ত কাগজ ছাড়া অন্য অদরকারী কাগজও তো ছিল আমাদের সঙ্গে। খাদে যে কাগজ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে তো গবেষণার কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।'

শেরিং ঠিকই বলেছে। কতগুলো লেখা-ধুয়ে-যাওয়া কাগজ থেকে এটা মোটেই প্রমাণ হয়না যে নয়মান ফরমুলা নেয়নি। যাই হোক, আমি আর বুশ স্থির করলাম যে উলরিখ্‌কে শেরিং-এর সঙ্গে রেখে আমরা দুজন ব্রেকফাস্ট সেরেই চলে যাব অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়। আরো কিছু কাগজ পাওয়া যেতে পারে, এবং তার মধ্যে ফরমুলাটাও থাকতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে আমাদের মনে। রেমুস আর শ্লাইন্‌সের মধ্যবর্তী অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা এখান থেকে পঁচাশি কিলোমিটার। খুব বেশিতো সোয়া ঘন্টা লাগবে পেঁছতে। আমার মতে ড্রাইভার খোঁজার চেয়েও বেশি জরুরী কাজ হচ্ছে কাগজ খোঁজা। লেখা ধুয়ে মুছে গেলে ক্ষতি নেই। সে লেখা পাঠোদ্ধার করার মতো রাসায়নিক কায়দা আমার জানা আছে।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। আমরা আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কেন জানিনা কিছুক্ষণ থেকে আমার মনটা মাঝে মাঝে খচ্ খচ্ করে উঠছে। কোথায় যেন ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু সেটা যে কী সেটা বুঝতে পারছি না।

কেবল একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমার যন্ত্রে কোনো গণ্ডগোল নেই।

১০ই মার্চ, রাত ১১টা

একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটেনি, কাটবে সেই গিরিডিতে আমার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে গিয়ে। এমন ছবির মতো সুন্দর দেশে এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

গতকাল সকালে আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমি, বুশ আর সুইস পুলিশের হান্স বার্গার যখন দুর্ঘটনার জায়গায় রওনা হলাম তখন আমার ঘড়িতে পৌনে ন'টা। রাস্তার এখানে সেখানে বরফ জমে আছে, চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে আর চুড়োয় বরফ। গাড়ির কাঁচ তোলা থাকলেও গাছ পালার অস্থির ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম বেশ জোরে হাওয়া বইছে। বুশই গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে আমি, পিছনের সীটে বার্গার।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে লাগল একঘন্টা দশ মিনিট। রেমুসে একবার মিনিট তিনেকের জন্য থেমেছিলাম। সেখানে পুলিশের লোক ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম নয়মানের কোনো খবর এখনো পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পুরোদমেই চলেছে, এমন কি নয়মানকে ধরিয়ে দেবার জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তার পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে সাড়ে তিন হাজার ফুট। নিচের দিকে চাইলে একটা সরু নদী দেখতে পাওয়া যায়। মনে মনে বললাম, কাগজ পত্র যদি ওই নদীর জলে ভেসে গিয়ে থাকে তাহলে আর উদ্ধারের কোনো আশা নেই। রাস্তাটা এখানে এত চওড়া যে জোর করে ঠেলে না ফেললে, বা ড্রাইভারের হঠাৎ মাথা বিগড়ে না গেলে গাড়ি খাদে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের গায়ে পুলিশের লোক দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপরেও কিছু জীপ ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম খানাতল্লাসীর কাজে কোনো ত্রুটি হচ্ছে না। আমরাও দুজনে পাহাড়ের গা দিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম।

পায়ে-হাঁটা পথ রয়েছে, ঢালও তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। দূর থেকে সুরেলা ঘন্টার শব্দ পাচ্ছি।; বোধহয় গোরু চরছে। সুইস গোরুর গলায় বড় বড় ঘন্টা বাঁধা থাকে। তার শব্দ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরো মনোরম করে তোলে।

গাড়ি যেখানে পড়েছিল, আর লুবিনের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, এই দুটো জায়গা আগে দেখা দরকার। এদিকে ওদিকে বরফের শুভ্র কার্পেট বিছানো রয়েছে, মাঝে মাঝে ঝাউ, বীচ আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ঝুপ্ ঝুপ্ করে বরফ মাটিতে খসে পড়ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট খুঁজেও এক টুকরো কাগজও পেলাম না, কিন্তু গাড়ির জায়গা থেকে আরো প্রায় পাঁচশো ফুট নেমে গিয়ে যে জিনিসটা আবিষ্কার করলাম সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

আবিষ্কারটা আমারই। সবাই মাটিতে খুঁজছে কাগজের টুকরো; আমার দৃষ্টি কিন্তু গাছের ডাল পাতা ফোকর ইত্যাদিও বাদ দিচ্ছেনা। একটা ঘন পাতাওয়ালা ওক গাছের নিচে এসে দৃষ্টি উপরে তুলতেই পাতার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট সাদা জিনিস চোখে পড়ল যেটা কাগজও নয়, বরফও নয়। আমার দৃষ্টি যে কোনো পুলিশের দৃষ্টির চেয়ে অন্তত দশ গুণ বেশি তীক্ষ্ন। দেখেই বুঝলাম ওটা একটা কাপড়ের অংশ। বার্গারকে ইশারা করে কাছে ডেকে গাছের দিকে আঙুল দেখালাম। সে সেটা দেখা মাত্র আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডাল বেয়ে উপরে উঠে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে চেঁচিয়ে উঠেছে তার মাতৃভাষা জার্মানে—

'ডা ইস্ট আইনে লাইখে!'

অর্থাৎ—এ যে দেখছি একটা মৃতদেহ'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহ নিচে নেমে এল। বরফের দেশ বলেই মৃত্যুর এতদিন পরেও দেহ প্রায় অবিকৃত রয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ হল ড্রাইভার হাইন্‌ৎস নয়মানের মৃতদেহ । তার কোটের পকেটে রয়েছে তার গাড়ির লাইসেন্স ও তার ব্যক্তিগত আইডেন্টিটি কার্ড। নয়মানেরও হাড়গোড় ভেঙেছে, হাতে মুখে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। সেও যে গাড়ি থেকে

ছিট্‌কে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে এসে এই ওক গাছের ডাল পালার ভিতরে এতদিন মরে পড়ে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাহলে কি নয়মান লুবিন ও শেরিংকে অজ্ঞান করে গাড়িতে তুলে গাড়ি ঠেলে খাদে ফেলার সময় নিজেই পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল? নাকি অন্য কোনো অচেনা লোক এসে তার এই দশা করেছে? যাই হোক্ না কেন, নয়মানকে খোঁজার জন্য পুলিশের আর মেহনত করতে হবে না।

এটাও বলে রাখি যে নয়মানের জামার পকেটে গবেষণা সংক্রান্ত কোনো কাগজ পাওয়া যায় নি। সে কাগজ যদি খাদের মধ্যে পাওয়া যায় তো ভাল, নাহলে বি-এক্স তিনশো সাতাত্তরের মামলা এখানেই শেষ......

* * *

আমরা এগারোটার সময় ওয়ালেনস্টাট রওনা দিলাম। আমাদের দুজনেরই দেহমন অবসন্ন। সেটা কিছুটা পাহাড়ে ওঠানামার পরিশ্রমের জন্য, কিছুটা দুর্ঘটনার কথা মনে করে। সেই সঙ্গে কাল রাত্রের মতো আজও কী কারণে জানি আমার মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করছে। কী একটা জিনিস, বা জিনিসের অভাব, লক্ষ্য করে মুহূর্তের জন্য আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যেটা আবার স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। সঙ্গে রিমেমব্রেন যন্ত্রটা আছে—ওটা হাতছাড়া করতে মন চায়না—একবার মনে হল যন্ত্রটা পরে বুশকে দিয়ে প্রশ্ন করিয়ে দেখি কী হয়, কিন্তু তার পরেই খেয়াল হল কী ধরনের প্রশ্ন করলে স্মৃতিটা ফিরে আসবে সেটাও আমার জানা নেই। অগত্যা চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হল।

বাড়ি পৌঁছানর কিছু আগে থেকেই মেঘ করেছিল, গাড়ি গেটের সামনে থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

শেরিং নয়মানের মৃতদেহ আবিষ্কারের কথা শুনে আমাদেরই মতো হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, 'দুটি লোকের মৃত্যু, আর তার সঙ্গে সাত বছরের পরিশ্রম পণ্ড।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এক হিসেবে ভালই হয়েছে।'

আমরা একটু অবাক হয়েই শেরিং-এর দিকে চাইলাম। তার দৃষ্টিতে একটা উদাস ভাব দেখা দিয়েছে। সে বলল, 'মারণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। লুবিনই প্রথমে করে প্রস্তাবটা। আমি গোড়ায় আপত্তি করলেও, পরে নিজের অজান্তেই যেন জড়িয়ে পড়ি, কারণ লুবিন ছিল কলেজ জীবন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

শেরিং একটু থেমে আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলল, 'এই যন্ত্রের প্রেরণা কোত্থেকে এসেছিল জান? তুমি ভারতীয় তাই তোমাকেই বিশেষ করে বলছি। লুবিন সংস্কৃত জানত। বার্লিনের একটি সংগ্রহশালায় রাখা একটি আশ্চর্য সংস্কৃত পুঁথি লুবিন পড়েছিল কিছু কাল আগে। এই পুঁথির নাম সমরাঙ্গনসূত্রম। এতে যে কত রকম যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা আছে তার হিসেব নেই। সেই পুঁথি পড়েই লুবিনের মাথায় এই অস্ত্রের পরিকল্পনা আসে।...যাক্ গে, যা হয়েছে তাতে হয়ত আখেরে মঙ্গলই হবে।'

আমি সমরাঙ্গনসূত্রের নাম শুনেছি, কিন্তু সেটা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। অবিশ্যি ভারতীয়রা যে মারণাস্ত্র নিয়ে এককালে বিশেষভাবে চিন্তা করেছে সেটা তো মহাভারত পড়লেই বোঝা যায়।

শেরিংকে আর এখানে ধরে রাখার কোনো মানে হয় না। আমরা যখন বেরিয়েছিলাম, সেই সময় সে নাকি আল্‌টডর্ফ শহরে তার এক বন্ধুকে ফোন করে বলেছে তাকে যেন এসে নিয়ে যায়। আল্‌টডর্ফ এখান থেকে পশ্চিমে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে। শেরিং-এর বন্ধু বলেছে বিকেলের দিকে আসবে।

সারা দুপুর আমরা চারজন পুরুষ ও একটি মহিলা বৈঠকখানায় বসে গল্প গুজব করলাম। সাড়ে তিনটার সময় একটা হাল ফ্যাশানের লাল মোটর গাড়ি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। তার থেকে নামলেন একটি বছর চল্লিশেকের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, লম্বায় ছ ফুটের ওপর, পরনে চামড়ার জার্কিন ও কর্ডের প্যান্ট। রোদে পোড়া চেহারা দেখে আন্দাজ করেছিলাম, পরে শুনলাম সত্যিই এঁর পাহাড়ে ওঠার খুব শখ, সুইটজারল্যান্ডের উচ্চতম তুষারশৃঙ্গ মন্টে রোজায় চড়েছেন বার পাঁচেক—যদিও পেশা হল ওকালতি। বলা বাহুল্য ইনিই শেরিং-এর বন্ধু, নাম পিটার ফ্রিক্। শেরিং আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আরেকবার আমার যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আল্‌টডর্ফের দিকে রওনা দিয়ে দিল।

সে যাবার মিনিট দশেক পরে—সবেমাত্র ক্লারা সকলের জন্য লেমন-টি ও কেক এনে টেবিলে রেখেছে—এমন সময় হঠাৎ ভেল্‌কির মতো আমার মনের সেই অসোয়াস্তির কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর হওয়া মাত্র আমি সবাইকে চম্‌কে দিয়ে তড়াক্ করে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুশের দিকে ফিরে বললাম, 'এক্ষুনি চলো। আল্‌টডর্ফ যেতে হবে।'

'তার মানে?' উলরিখ আর বুশ একসঙ্গে বলে উঠল।

'মানে পরে হবে। আর এক মুহূর্ত সময় নেই!'

আমার এই বয়সে এই তৎপরতা দেখেই বোধহয় বুশ ও উলরিখ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে তিনটে করে ধাপ উঠতে উঠতে বুশকে বললাম, 'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে? আমারটা আনিনি।'

'একটা লুগার অটোম্যাটিক আছে।'

'ওটা নিয়ে নাও। আর পুলিশের লোকটি থাকলে তাকেও বলে দাও সঙ্গে আসতে। আর আল্‌টডর্ফেও জানিয়ে দাও—সেদিকেও যেন পুলিশ তৈরি থাকে।'

আমার যন্ত্রটাকে ঘর থেকে নিয়ে আমরা চারজন পুরুষ বুশের গাড়িতে উঠে ঝড়ের বেগে ছুটলাম আল্‌টডর্ফের উদ্দেশে। বুশ মোটর চালনায় সিদ্ধহস্ত—স্টিয়ারিং ধরে এক মিনিটের মধ্যে একশো কুড়ি কিলোমিটার স্পীড তুলে দিল। এদেশে যারা গাড়ির সামনের সীটে বসে, তাদের প্লেন যাত্রীর মতো কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে হয়। এ গাড়িটাতো এমনভাবে তৈরি যে বেল্ট না বাঁধলে গাড়ি চলেই না। শুধু তাই না—গাড়িতে যদি আচমকা ব্রেক কষা হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ ড্যাশবোর্ডের দুটো খুপরি থেকে দুটো নরম তুলোর মতো জিনিস লাফিয়ে বেরিয়ে এসে চালক ও যাত্রীকে হুমড়ি খেয়ে নাক মুখ থ্যাঁৎলানোর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

আমাদের অবিশ্যি আচমকা ব্রেক কষার প্রয়োজন হয়নি। ত্রিশ কিলোমিটারের ফলক পেরোবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা শেরিং-এর লাল গাড়ি দেখতে পেলাম। তার চলার মেজাজে চালকের নিরুদ্বেগ ভাবটা স্পষ্ট। আমি বললাম, 'ওটাকে পেরিয়ে গিয়ে থামো।'

বুশ হর্ণ দিতে দিতে লালগাড়িকে পাশ কাটিয়ে খানিকদূর গিয়ে হাত দেখিয়ে গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে ট্যারচা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। ফলে শেরিং-এর গাড়ি বাধ্য হয়েই থেমে গেল।

আমরা চারজন গাড়ি থেকে নামলাম। শেরিং আর তার বন্ধুও নেমে অবাক ভাব করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

'কী ব্যাপার?' শেরিং প্রশ্ন করল।

পথে আসার সময় আমাদের চারজনের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। হয়ত আমার গম্ভীর ভাব দেখেই অন্য তিনজন সাহস করে কিছু জিগ্যেস করতে পারেনি। কাজেই আমরা কেন যে এই অভিযানে বেরিয়েছি সেটা একমাত্র আমিই জানি, আর তাই কথাও বলতে

হবে আমাকেই।

আমি এগিয়ে গেলাম। শেরিং যতই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করুক না কেন, তার ঠোঁটের ফ্যাকাসে শুক্‌নো ভাবটা সে গোপন করতে পারছে না। তার তিন হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধু পিটার ফ্লিক্‌।

'একটা চুরুট খেতে ইচ্ছে করল,' আমি শান্তভাবে বললাম, 'কাল তোমার ডাচ চুরুট পান করে আমার নেশা হয়ে গেছে। আছে তো চুরুটের কেসটা?'

আমার এই সহজভাবে বলা সামান্য কয়েকটা কথায় যেন ডিনামাইটে অগ্নি সংযোগ হল। শেরিং-এর বন্ধুর হাতে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একটা রিভলভার, আর সেই মুহূর্তেই সেটা গর্জিয়ে উঠল। আমি অনুভব করলাম আমার ডান কনুই ঘেঁষে গুলিটা গিয়ে লাগল বুশের মার্সেডিস গাড়ির ছাতের একটা কোনে। কিন্তু সে রিভলভার আর এখন পিটার ফ্লিকের হাতে নেই, কারণ দ্বিতীয় আরেকটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লিকের রিভলভারটা ছিট্‌কে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে, আর ফ্লিক্‌ তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জিটা চেপে মুখ বিকৃত করে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছে।

আর শেরিং? সে একটা অমানুষিক চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে উল্টোমুখে দৌড় লাগাতেই বুশ ও উলরিখ তীর-বেগে ছুটে গিয়ে বাঘের মতো লাফিয়ে তাকে বগলদাবা করে ফেলল। আর আমি—জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—আমার অদ্বিতীয় আবিষ্কার রিমেমব্রেন যন্ত্রটি শেরিং-এর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বোতাম টিপে ব্যাটারি চালু করে দিলাম।

শেরিং দুজনের হাতে বন্দি হয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তার নিষ্পলক দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে দূরে তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়োর দিকে চেয়ে আছে।

এবার আমার খেলা।

আমি প্রশ্ন করলাম শেরিং-কে উদ্দেশ্য করে।

'ডক্টর লুবিন কী ভাবে মরলেন?'

'দম আটকে।'

'তুমি মেরেছিলে তাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কী ভাবে?'

'টুঁটি টিপে।'

'তখন গাড়ি চলছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার নয়মান কী ভাবে মরল?'

'নয়মানের সামনে আয়না ছিল। আয়নায় সে লুবিনের হত্যাদৃশ্য দেখে। সেই সময় তার স্টিয়ারিং ঘুরে যায়। গাড়ি খাদে পড়ে।'

'তার সঙ্গে তুমিও পড়?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি ভেবেছিলে লুবিন ও নয়মানকে খুন করে তাদের খাদে ফেলে দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ফরমুলা নিয়ে পালাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করতে তুমি ওটা দিয়ে?'

বিক্রী করতাম।'

'কাকে?'

'যে বেশি দাম দেবে তাকে।'

'ফরমুলার কাগজ কি তোমার কাছে আছে?'

'না।'

'তবে কী আছে?'

'টেপ।'

'তাতে ফরমুলা রেকর্ড করা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে সে টেপ?'

'চুরুটের কেসে।'

'ওটা কি আসলে একটা টেপ রেকর্ডার?'

'হ্যাঁ।'

আমি শেরিং-এর মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিলাম। পুলিশের লোকটি ভিজে রাস্তার উপর জুতোর শব্দ তুলে শেরিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

এখন মনে হচ্ছে কী আশ্চর্য এই মস্তিষ্ক জিনিসটা, আর কী অদ্ভুত এই স্মৃতির খেলা। কাল শেরিং চুরুট চাইল, ক্লারা তাকে কেসটা এনে দিল, কিন্তু সে চুরুট খেল না। তখনই ব্যাপারটা পুরোপুরি আঁচ করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। আজ সকালেও তার ঘরে চুরুটের কোনো গন্ধ বা কোনো চিহ্ন দেখিনি। চুরুটের কেসটা নিয়মমত খাটের পাশের টেবিলে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু ছিলনা। আজ দুপুরে এতক্ষণ বসে গল্প করলাম, কিন্তু তাও শেরিং চুরুট খেল না।

গান-মেটালের তৈরি চুরুট কেসটা এখন আমার ঘরে আমার টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। এর ঢাকনাটা খুললে বেরোয় চুরুট, আর নিচের দিকে একটা প্রায় অদৃশ্য বোতাম টিপলে তলাটা খুলে গিয়ে বেরোয় মাইক্রোফোন সমেত একটা মিনি-টেপ রেকর্ডার। টেপটা চালিয়ে দেখেছি তাতে বি-এক্স তিনশো তিয়াত্তরের সব তথ্যই রেকর্ড করা আছে শেরিং-এর নিজের গলায়। এরই উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করা যায় তাহলে শেরিং-এর এই অপদার্থ ফরমুলাটি চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উইলির গলা না? সে আবার সুর করে ছড়া কাটছে।

মাইক্রোফোনটা বার করে রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম।

গান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাংঘাতিক অবস্থা বাহাত্তর নম্বরের।

কেন কি হল?

কি আবার হবে! খেয়ে বসে সুখ নেই। রাত্রে ঘুম নেই।

কি হয়েছে কি আসলে?

যা হয়েছে তাই জানাতেই ত টঙের ঘরে সাত সকালে গিয়ে হাজির হয়েছি।

আমাদের চেহারাগুলোই আমাদের বক্তব্যের বিজ্ঞাপন।

শিশিরের চুলে অন্ততঃ হপ্তাখানেক তেল পড়েনি। মাথাটা যেন কাকের বাসা।

গৌর দাড়ি কামায়নি ক'দিন তা কে জানে। জামাটা যে ময়লা আর বোতামগুলো যে ছেঁড়া তাও তার খেয়াল নেই।

শিবু গালে ক্ষুর লাগাইনি মাথায়ও তেল ছোঁয়ায়নি ত বটেই, তার ওপর ক'দিন ক'রাত্রি ঘুম না হওয়ায় প্রমাণ স্বরূপ দু চোখের কোলে এমন কালি লাগিয়েছে।

আর আমি? ভয়ে ভাবনায় দিশাহারা হয়ে দু পাটির দুটো আলাদা জুতো দুপায়ে গলিয়ে ভুল করে শিবুর ঢাউস সার্টটাই গায়ে চড়িয়ে এসেছি।

টঙের ঘরে প্রায় ফাঁসির আসামীর মতো কালিমাড়া মুখে ঢুকে তক্তপোষের ধারে কোন রকমে বসেও আমরা প্রথমটা যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছি।

যা বলতে এসেছি আমাদের ভয়ে শুকনো গলা ঠেলে তা যেন বেরুতেই চায়নি।

কি করেছেন তখন ঘনাদা?

না, একেবারে নির্বিকারভাবে তাঁর তক্তপোষটির ওপর বসে গড়গড়ায় টান দেননি। এমন কি তাঁর কেরাসিন কাঠের শেলফ হাতড়ে আশ্চর্য কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টাও তাঁর দেখা যায়নি।

একটু ভালো করে শার্লকী দৃষ্টিতে মেঝেটা লক্ষ্য করলে একটু যেন সন্দেহজনক ব্যাপারেরই আভাস পাওয়া যায়।

মেঝের ওপর গড়গড়ার কলকেটা টিকে ছাই ইত্যাদি ছড়িয়ে যেভাবে পড়ে আছে তাতে মনে হয় কেউ যেন অসাবধানে তাড়াতাড়ি সেটা পা দিয়ে লাথিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তাঁর অত আদরের গড়গড়া আর সাজা কলকেতে তাড়াতাড়ি অসাবধানে পা লাগানো কি ঘনাদার পক্ষে সম্ভব?

অমন অসাবধান তিনি হবেনই বা কেন হঠাৎ বিচলিত না হলে?

ছাদের ওপরে দেখার আগেই সিঁড়িতে আমাদের পদশব্দ আর হাহাকার শুনেই ঘনাদা হঠাৎ বেশ একটু বিচলিত হয়ে তাঁর ঘরের দরজাটাই বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, আর তাতেই পা লেগে তাঁর গড়গড়া কলকে উল্টে পড়েছে এমন একটা সিদ্ধান্ত কি করা যায় না!

আর সে সিদ্ধান্ত সঠিক হলে আমাদের সঙ্গে ঘনাদার একটা সমব্যথীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না কি?

সম্পর্কের সুতোটা অবশ্য এখনো অতি সূক্ষ্ম। খুব সাবধানে পাকাতে হবে, একটু চালের ভুল হলেই ছিঁড়ে যেতে পারে।

খুব সাবধানে পাকটা দেওয়া হয়।

হাহাকারটা সিঁড়িতেই শেষ করে এসেছি। টঙের ঘরে ঢুকে তক্তপোষের ওপর বসবার পর ঘনাদাকে দেখেই যেন মুখে আর কথা ফুটতে চাইছে না।

শিবুই যেন প্রথম কোন রকমে কথাটা তোলে। হতাশ ভাঙা গলায় বলে,—কালও ঘুম হয়নি ঘনাদা!

ঘুম হয়নি! ঘুম হয়নি!—তিরিক্ষি মেজাজে খিঁচিয়ে ওঠে গৌর। ভাল লাগেনা রোজ এই প্যানপ্যানানি। খালি নিজের সুখটুকুর ভাবনাই সারাক্ষণ। ঘুম আমাদের কার হচ্ছে শুনি!

আহা শিবুকে মিছিমিছি গাল দিয়ে লাভ কি!—শিশির ক্লান্ত গলায় শিবুকে একটু সমর্থন করে—শুধু ওর নিজের কথা নয় ও আমাদের সকলের অবস্থাটাই বোঝাতে চেয়েছে। মুখফুটে গুলিয়ে মরছে বলে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারেনি।

থাক! শিবুর হয়ে আর ওকালতি তোমায় করতে হবে না।—আমি গৌরের পক্ষ নিয়ে গরম হয়ে উঠি,—আমাদের অবস্থা কি শুধু এই ঘুম-না-হওয়া দিয়ে বোঝাবার। কেন ঘুম হচ্ছে না তার কিছু ঘনাদাকে দেখিয়েছ?

আমি পকেট থেকে একটা চৌকো কার্ড বার করে ঘনাদার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলি—দেখুন ঘনাদা

গড়গড়াতে টান বা শেলফ হাঁটকাবার মতো কোনো কিছুতে তন্ময় হবার ভান না করলেও আমরা ঢোকবার পর ঘনাদা বেশ একটু ছাড় ছাড় ভাবই দেখাবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু আমি চৌকো কার্ডটা বার করবার পর সে নির্লিপ্ত দূরত্ব আর রাখতে পারেন না।

হাতের যে আয়নাটা অকারণেই সামনে তুলে রেখে মুখের কিছু যেন দেখবার ছল করছিলেন সেটা তাড়াতাড়ি ফতুয়ার পকেটে রেখে বেশ ব্যস্ত হয়ে আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন।

তিনি যখন কার্ডটা দেখতে তন্ময় আমরা তখন মনসায় ধুনোর গন্ধ দিতে ত্রুটি করি না।

শিশির যেন সভয়ে বলে—ও কার্ড তুইও তাহলে পেয়েছিস?

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে একটা ভিন্ন রঙের অনুরূপ কার্ড শিশির বার করে দেখায়।

শিবু ও গৌর কেউ পেছপাও থাকে না।

আমরাই কি পাইনি!—বলে দুজনেই দুটো কার্ড বার করে তক্তপোষের ওপর মেলে ধরে।

ঘনাদাকে এবার তক্তপোষেরই অন্য প্রান্তে বসে পড়ে কার্ড চারটে মিলিয়ে দেখতে হয়।

চার রঙের হলেও কার্ডগুলো মাপে এক আর প্রত্যেকটির ওপর এক পিঠে যা আঁকা তা একই ছবির নক্সা।

আর কি সে নক্সা! দেখলেই গায়ে আপনা থেকে কাঁটা দেবার কথা।

কার্ডের তলা থেকে ফনা-তলা একটা সাপের মাথা উঠে চেরা জিভের সঙ্গে যেন মুখের ভেতর থেকে বিষের হল্‌কা বার করছে।

কার্ডের মাথায় শুধু তিনটি শব্দ লাল হরফে লেখা,—এখনো সময় আছে।

এ সবের মানে কি বলতে পারেন?—কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে শিবু,—ক্রমশঃ ত অসহ্য হয়ে উঠল।

কারুর বিদঘুটে ঠাট্টা টাট্টা হতে পারে?—আমি যেন হতাশার আশা হিসেবে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করবার চেষ্টা করি।

ধমকও খাই তৎক্ষণাৎ।

ঠাট্টা!—খিঁচিয়ে ওঠে গৌর,—এই সব ভয়ঙ্কর হুমকিকে ঠাট্টা ভাবছ! ঠাট্টা হলে স্বয়ং যমরাজই করছেন জেনে রাখো।

হ্যাঁ বেনেপুকুরে ওই ভুল করে একজনদের সর্বনাশও হয়েছে।—শিবু গৌরের সমর্থনে এবার একটা জবর গোছের নজিরই হাজির করে,—এক হপ্তা দু হপ্তা তিন হপ্তা বাড়ির কেউ গ্রাহ্য করেনি, পাড়ার বকা ছেলেদের বাঁদরামি ভেবেই উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর,—

তারপর কি?—শিবুর নাটকীয়ভাবে থেমে যাওয়ার পর আড় চোখে একবার ঘনাদার দিকে চেয়ে নিয়ে প্রায় বুজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করি,—কি হয়েছে তারপর?

ওই উড়িয়েই দিয়েছে!—শিবুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

উড়িয়েই দিয়েছে মানে!—আমরা অস্থির হয়ে উঠি,— বকা ছেলের বাঁদরামি বলে উড়িয়েই দিয়েছিল সেই বেনেপুকুর-ওয়ালারা। তাহলে আর হলটা কি?

উড়িয়ে-দেওয়া জবাবই গেল তাদের আহাম্মকির!—শিবু এবার একটু ব্যাখ্যা করে বোঝায়,—প্রথমে চিলকোঠার ঘরটাই দিলে উড়িয়ে।

চিলকোঠার ঘর!—আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাই,—তার মানে এই ছাদের ঘরটাই!

শিশির এই শুনেই গরম হয়ে ওঠে অদেখা অজানা আততায়ীদের ওপর,—তা ওড়াতে হলে ছাদের ঘরটাই কেন? আর ঘর ছিল না সে বাড়িতে—!

ঘর ত ছিলই!—শিবু বুঝিয়ে দেয়—সে সবের কি হবে তার ইসারাও ছিল ওই উড়ে যাওয়া ঘরের বাইরেই পাওয়া একটা চিরকুটে। তাতে লেখা ছিল—যা হবে তার প্রথম নমুনা।

কিন্তু আমাদেরও সেরকম নমুনা দেখাবে নাকি?— আমার মুখখানা ঠিক ফ্যাকাশে না মেরে যাক গলাটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে,—তাহলে ত...

বাকি কথাটা উহ্য রেখে আমি সভয়ে ঘনাদার কাছেই যেন পাদপূরণটা চাই।

ঘনাদা পাদপূরণ করেন না, তবে কার্ডগুলো তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করেন,—এ কার্ডগুলো কবে এসেছে?

আজ্ঞে, একদিনে ত আসেনি।—শিশির ঘনাদাকে সঠিক খবর দেয় ব্যস্ত হয়ে,—প্রথম শিবুর নামে একটা কার্ড আসে ডাকে, আমাদের সেটা দেখাতে আমরা তা নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করেছি। তার পরে পায় গৌর...

ডাকে টাকে নয়!—গৌর রিলে রেসের ব্যাটনের মতো শিশিরের কথার খেই-টা ধরে নেয়,—খেলার মাঠ থেকে বাড়িতে এসে জামা খুলতে গিয়ে এক পকেটে শক্ত মতো কি একটা টের পেলাম। পকেট থেকে বার করে দেখি এই কার্ড।

আমারটা আরো বিশ্রীভাবে পেয়েছি।—গৌর থামতেই শিশির সুরু করে দিতে দেরী করে না।—এই ত আর মঙ্গলবার নটার শো দেখে ফিরছি হঠাৎ এই গলির মুখেই 'দাঁড়ান' শুনে চমকে গেলাম। গলির আলোটার অবস্থা'ত দেখেছেন। সেই যে কবে বাল্ব চুরি গেছে তারপর থেকে আর করপোরেশনের দয়া হয়নি। জায়গাটা ঘুটঘুটি অন্ধকার। তারই মধ্যে ইলেকট্রিক পোস্টটার পাশেই দুটি ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে এল। দুজনের গায়ে রেনকোট বা ওভারকোট গোছের কিছু, মাথার টুপিও মুখের ওপর টানা। আমার বেশ কাছে এসে দাঁড়াবার পরও তাদের মুখগুলো দেখতে পেলাম না। শুধু গলার স্বর যা শুনতে পেলাম তাতেই যেন ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে কি দারুণ খাদের গলা। যেন পাতাল গুহা থেকে ভুতুড়ে চাপা আওয়াজ উঠে আসছে। সেই গলাতেই শুনতে পেলাম,—আর পোনেরো দিন মাত্র সময় পাবে. এই নাও তার পরোয়ানা।

এই বলেই আমার হাতে কি একটা দিয়ে ওদিকের অন্ধকারেই যেন মিলিয়ে গেল।

কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে পৌঁছে আলো জেবলে দেখি এই কার্ড!

আর আমার বেলা!—শিশিরের বিবরণটায় উৎসাহিত হয়ে আমি তক্ষুনি শুরু করি,—সে যা হয়েছিল তা ভাবলেই গায়ে এখনো কাঁটা দেয়।

তাহলে এখন আর ভেবে দরকার নেই।—শিবু হিংসুকের মতো আমায় থামিয়ে দিয়ে বলে,—তুইও কার্ড পেয়েছিস এই-টুকুই আসল খবর। এখন কথা হচ্ছে,—এগুলো পাঠাচ্ছে কারা?

কারা আবার?—দাঁত খিঁচিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে কি না,—এ কীর্তি আমাদের এই চার জাম্বুবানের!

নিজেরা সব ফলাও করে যে যার গল্প সাজালেন আর আমার বেলাতেই শুধু খবরটাই যথেষ্ট! আমাকে বলতে দিলে নিজেদের গল্পগুলো যে কানা হয়ে যাবে!

এমন হিংসুটেদের সঙ্গে এক দণ্ড আর থাকতে ইচ্ছে করে' না, তবু যে থাকি সে নেহাৎ আমার মহানুভবতায়। ওদের হিংসের বিরুদ্ধে আমার মহত্ত্বেরই জয় হয়। এবারও তাই উদার হয়ে ওদের ক্ষমা করে ফেলি শেষ পর্যন্ত।

তবু ফাঁস যখন হয়েই গেছে ব্যাপারটা তখন এখানেই খুলে বলি।

এবারের ষড়যন্ত্র ঘনাদাকেই বাগ মানাবার জন্যে। তবে প্যাঁচটা একটু নতুন আর চালটাও আলাদা।

আগে থাকতে উদ্দেশ্যটা জানাবার দরুন আমাদের অনেক প্ল্যান ঘনাদা এ পর্যন্ত ভেস্তে দিয়েছেন। এবার তাই একেবারে চোরা লড়াই-এর ব্যবস্থা। আমাদের আসল মতলব না জানিয়ে আচমকা হামলায় কাবু করে ফেলব। ঘনাদা ভেবে চিন্তে পিছলে পালাবার সময়ই পাবেন না।

প্ল্যানটা খুব ভালো করেই ছকা হয়েছে। তার প্রথম বুদ্ধিটা এক হিসেবে ঘনাদা নিজেই দিয়েছেন নিজের অজান্তে। সেদিন ছুটির সকালে তাঁর কাছে দুপুরের ভোজের মেনু ঠিক করতে গিয়ে তাঁকে একটু বিচলিতই মনে হয়েছিল। কারণটাও জানতে দেরী হয়নি। হাতের খবরের কাগজটা থেকে অত্যন্ত চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিলেন,—জঙ্গল! জঙ্গল! জঙ্গল হয়ে গেল কলকাতা শহর!

রসালো কিছুর আশায় তক্তপোষে চেপে বসে মুখ চোখে যতদূর সাধ্য আতঙ্ক ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—কোথায়? কোন পাড়ায়—ঘনাদা, বাঘটাঘ বেরিয়েছে নাকি? সেই ঝাড়খালির সুন্দরী থুড়ি সুন্দর বাঘ এই কলকাতায়?

বাঘ নয় তার চেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার!—গম্ভীর মুখে বলেছেন ঘনাদা,—বুঝলে কিছু?

আমরা হাঁ-করা হাঁদা সেজেছি।

মানুষ! মানুষ!—ঘনাদা আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন,—এই কলকাতা শহরে তারই উপদ্রব বেড়েছে। এই দেখো না বুড়ো মানুষ পেনসন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির দোর গোড়ায় পিস্তল ছোরা দেখিয়ে তাঁর সব সম্বল কেড়ে নিয়েছে, আর হুমকি দিয়ে আরেক পাড়ায় একটা গলির মুখই দিয়েছে বন্ধ করে। লোকজনকে আধঘন্টার হাঁটুনি হেঁটে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।

ঘনাদার বিক্ষোভ শুনতে শুনতে কথাটা একেবারে জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সামলেছি নিজেদের। ঘনাদার কাছে দুপুরের মেনুর ফর্দের সঙ্গে কলকাতার জঙ্গল সম্বন্ধে দামী দামী সব টিপ্পুনি শুনে এসেই বসে গিয়েছিলাম আমাদের লক্ষ্যভেদের প্ল্যান ছকতে।

হ্যাঁ এবারেও ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বর থেকে সরানোই আসল লক্ষ্য।

তবে সেই 'ঘনাদাকে ভোট দিন' আন্দোলনের মতো চিরকালের জন্যে বাহাত্তর নম্বর ছাড়াবার মতলবে নয়, দীঘা কি দার্জিলিঙের দ্বিধার মতো সখের বেড়াতে যাওয়া নিয়ে রেষারেষিও এর মধ্যে নেই। মাত্র মাসখানেকের জন্যে ঘনাদাকে

এখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে পারলেই হয়। অনুরোধটা আমাদের বাড়িওয়ালার আর গরজটা আমাদের নিজেদেরও।

বাড়িটার অনেকদিন ধরে পুরোপুরি সংস্কার হয়নি। খাপছাড়া তালিমারা এখানে সেখানে একটু আধটু মেরামত হয়েছে মাত্র।

আমাদের পেড়াপিড়িতে এই চড়া বাজারেও বাড়িওয়ালা চুন বালি সিমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি বাহাত্তর নম্বরের ছাল চামড়া বদলাতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু আধাখেঁচড়া ভাবে সে কাজ'ত আর হয় না। তাই পাছে হঠাৎ বেঁকে বসে বাধা দেন এই ভয়ে বাড়িওয়ালা ঘনাদাকে কোনরকমে মাসখানেকের জন্যে সরাবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ অনুরোধ না রাখলেই নয়, কিন্তু ঘনাদা'ত আর শান্ত সুবোধ ছেলেটি নয় যে একবার সাধলেই সুড়সুড় করে বাহাত্তর নম্বর থেকে বেরিয়ে আসবেন!

ঘাড় তিনি যাতে না বাঁকাতে পারেন তার চাল ভেবে যখন সারা হচ্ছি তখন তাঁর নিজের কাছ থেকেই হদিসটা পেয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, 'কলকাতা মানে জঙ্গল' এই সুরটাই খেলিয়ে ঘনাদাকে কাবু করতে হবে। আর ঘুণাক্ষরে আগে থাকতে ঘনাদাকে কিছু না জানিয়ে। বাহাত্তর নম্বর তেমন বিভীষিকা করে তুলতে পারলে উনি 'মানুষ নামে জানোয়ারের' কলকাতা ছেড়ে খোকা বাঘ সুন্দরের ঝাড়খালিতে যেতেও বোধহয় আপত্তি করবেন

না। শুধু ভয়টাকে ঠিক মতো পাকিয়ে তুলে একেবারে স্ফুটনাঙ্কে মানে ফুট ধরতেই কথাটা পাড়া দরকার।

তাই জন্যেই এই সব পাঁয়তাড়া। শুধু শিউরে তোলবার ছবি আঁকা কার্ডই নয় আরো অনেক রকম আয়োজনই হয়েছে। সাপের ছোবল আঁকা কার্ড ঘনাদাও পেয়েছেন স্বীকার করুন আর না করুন। মাঝ রাত্রে বাইরের দরজায় বিদঘুটে কড়া নাড়াও শুনেছেন সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, ওই এক মোক্ষম প্যাঁচ কষা হচ্ছে দু একদিন বাদে বাদে প্রায় হপ্তা খানেক ধরে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। প্রথমে আস্তে, তারপর বাড়তে বাড়তে একেবারে পাড়া কাঁপানো আওয়াজ।

কে? কে?—যেন ঘুম থেকে উঠে আমরা বারান্দা থেকেই চিৎকার করি। নেমে যাবার সাহস যেন কারুরই হয় না।

ঘনাদা যে তাঁর টঙের ঘর থেকে বেরিয়ে ন্যাড়া সিঁড়ির ধারে আলসের কাছে দাঁড়িয়েছেন তা টের পেয়ে আমরা আরো একটু হৈ চৈ বাড়াই।

বনোয়ারী—! বনোয়ারী—! রামভুজ—! রামভুজ—! কোথায় গেল সব ওরা! সাড়া দেয়না কেন?

সাড়া দেবে কোথা থেকে!—আমাদেরই একজনের হঠাৎ যেন স্মরণ হয়।—ওরা যে ক'দিন রাত্রে দেশোয়ালীদের গানের মজলিশে যাবার জন্যে বাসায় থাকছে না সে কথা ভুলে গেছ!

তাহলে?—তাহলে,—শিবু যেন একটু ভেবে আমার দিকে চেয়েই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলে,—হ্যাঁ তুই-ই একবার দেখে আয় না নিচে গিয়ে দরজাটা খুলে!

আমি? আমি যাব!—আমায় আর ভয়তরাসের অভিনয় করতে হয় না,—তার চেয়ে,—কি বলে সবাই মিলেই-ত গেলে হয়।

প্রথম রাত্রে সবাই মিলেই নেমে গেছলাম। গিয়ে বড় রাস্তার চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে কথা মতো একটা আধুলি দিয়ে, এর পর থেকে এখানে নয় দোকানেই পাওনা মিলবে জানিয়ে ফিরে এসেছিলাম যেন ভয়ে বেসামাল হয়ে।

ওপরে এসে কাঁপা গলায় এলোমেলো এমন আলাপ চালিয়েছিলাম যাতে ব্যাপারটার রহস্য যেমন দুর্বোধ্য তেমনি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

কই, কেউ মানে কাকেও ত দেখতে পেলাম না!

এতো রাত্রে অমন কড়া নাড়ার মানেটা কি!

এখনো মানে জিজ্ঞাসা করছ? এখনো বুঝতে কিছু বাকি আছে!

তার মানে,—মানে আমাদের এখানে থাকতে দেবে না!

না। আপাততঃ ত নয়।

চুপ চুপ আস্তে!—এর মধ্যে আবার ঘনাদার জন্যে স্পেশ্যাল তীরও ছাড়া হয়েছে—ঘনাদা না জেগে ওঠেন।

ন্যাড়া সিঁড়ির ওপর থেকে ছায়াটা সরে যাবার আভাস পেয়ে মনে হয়েছে প্যাঁচটা নেহাৎ বিফল হয়নি।

ওষুধ যে ধরতে সুরু করেছে তা টের পেয়েছি পরের দিন থেকেই। ঘনাদা তাঁর সন্ধ্যের আসরে যাচ্ছেন না এমন নয়, কিন্তু ফিরছেন একটু বেশী তাড়াতাড়ি। সেই সঙ্গে সারাদিন সদর দরজা বন্ধ রাখা সম্বন্ধে যেন একটু অতিরিক্ত সজাগ হয়ে উঠেছেন।

এ কয়দিনের প্রস্তুতি পর্বের পর আজ হাওয়াটা সব দিকেই অনুকূল মনে হচ্ছে। বক্তার বদলে এমন মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় ঘনাদাকে বড় একটা দেখা যায় না।

আপাততঃ এ কাজ কাদের হতে পারে সেই গবেষণাই চলছে।

শিশির বুঝি ওয়াগন ব্রেকারদের কথা বলেছিল। কোন একটা গ্যাং, তাদের মালগাড়ি লুটের মাল রাখবার জন্যে এ বাড়িটা হাত করতে চাচ্ছে, এই তার অনুমান!

ছো! বলে এ অনুমান নস্যাৎ করে দিয়ে গৌর তখন বলছে,—ওয়াগন ব্রেকার! ওয়াগন ব্রেকার এখানে আসবে কোথা থেকে? কাছে পিঠে রেল লাইন টাইন আছে কোনো! উঁহু ওসব নয়।

গৌর তার পর রীতিমতো লোমহর্ষক একটা থিওরি খাড়া করে। তার মতে এ কাজ নিশ্চয়ই কোনো আন্তর্জাতিক গুপ্তচর দলের। তারা এক ঘাঁটিতে বেশীদিন থাকে না। একবার এখানে একবার ওখানে আস্তানা বদলায়। আর সে আস্তানা যোগাড় করে এমনি হুমকি দিয়ে। তাদের অসাধ্য কিছু নেই, আর মায়াদয়ারও তারা ধার ধারে না। একটা ঘাঁটি যোগাড় করতে দু দশটা জান খরচ তাদের কাছে ধর্তব্যই নয়।

কিন্তু এদের কাজটা কি? কি করে এরা!—বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করি আমি।

কি না করে!—গৌর যেন সামনে মাইক ধরে বলে যায়,—এই যে দেশে এতো গণ্ডগোল, এতো সমস্যা, চুরি ছিনতাই রাহাজানি, নিশানে নিশানে হানাহানি লাল নীল কালোবাজার ঘাটতি বাড়তি উঠতি পড়তি রকবাজ সাবোটাজ পুরো দামে কম কাজ ধর্মঘট লক আউট তুফান খরা বন্যা চাল তেল কয়লার জন্যে ধরনা এ সব কিছুর মূলে হ'ল তারা। দেশটার আখের যাতে মাটি হয় তাই সারাক্ষণ তুর্কি নাচন নাচিয়ে সব কিছু ভণ্ডুল করে দেওয়াই তাদের মতলব।

তা এমন একটা গুপ্তচরের দলের কথা ঘনাদা কি আর জানেন না!

কথাটা বলে ফেলেই নিজের আহাম্মুকিটা বুঝতে পেরে মনে মনে জিভ কাটি।

এই এক ছুতো পেয়ে ঘনাদা একটি গল্প ফেঁদে বসলেই ত সর্বনাশ! আমাদের আসল উদ্দেশ্যই তাহলে মাটি। আজ ঘনাদার কাছে গল্প ত চাইনা, চাই তাঁকে বেশ একটু ভড়কে দিয়ে বাহাত্তর নম্বরটা ক'দিনের জন্যে ছাড়াতে।

আমার ভুলে এতো কষ্টের আয়োজনের পর ঘাটের কাছে বুঝি ভরাডুবি হয়।

গৌরই সে বিপদ থেকে বাঁচায় অবশ্য।

ঘনাদা এই ছুতোটাই ধরতেন কি না জানি না। কিন্তু তিনি মুখ খোলবার আগেই গৌর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—ঘনাদা জানবেন মানে! এ কি ওপারের সেই সব বনেদি কোনো দল! নেহাৎ চ্যাংড়া গুপ্তচরদের মহলের সেদিনকার উঠতি মস্তান বলা যায়! ঘনাদারই এখনো নাম শোনে নি। তা না হলে বাহাত্তর নম্বরে মামদোবাজি করতে আসে!

সেইজন্যেই ভাবছি,—একটু থেমে গৌর যেন গভীরভাবে কি ভেবে নিয়ে বলে,—এই সব চ্যাংড়াদের'ত যখন বিশ্বাস নেই তখন দুচারদিন মানে মানে একটু সরে গেলে বোধহয় মন্দ হয় না। এদের দৌরাত্ম্যি'ত মাসখানেকের বেশী নয়। তার মধ্যে নিজেরাই খতম হয়েও যেতে পারে। সেই মাসখানেক একটু চেঞ্জে ঘুরে এলে ক্ষতি কি? তাও দীঘা কি দার্জিলিঙ নয়, এই ডায়মণ্ড হারবারে। গাঙের ধারে বাড়িটা মিনিমাগনা পাচ্ছি।

আমরা সবাই সোৎসাহে সরবে এ প্রস্তাব অনুমোদন করি।

বলিস কি ডায়মণ্ড হারবারে এমন বাড়ি!

গাঙের ধার মানে ত মিনি সমুদ্দুর!

আর এক পা বাড়ালেই ত ডায়মণ্ড হারবার। যাওয়া আসার কোনো হ্যাঙ্গামাই নেই।

তাছাড়া ওখানকার টাটকা মাছ! তপসে পারশে ভেট্‌কি ভাঙন আর ইলিশ গুড়জাওয়ালী একবার মুখে দিলে আর ডায়মণ্ড হারবার ছাড়তে ইচ্ছে হবে না।

গদগদ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘনাদার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতেও ভুলি না।

না, বেয়াড়া কোনো লক্ষণ সেখানে দেখা যায়না। একটু গম্ভীর যেন, একটু ভাবিত। তা সেটা'ত স্বাভাবিক।

জো বুঝে আসল কথাটা পেড়ে ফেলে শিশির,—কাল সকালেই তা হলে রওনা হচ্ছি ঘনাদা। যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে পড়ব। আপনি'ত খুব ভোরেই ওঠেন।

ঘনাদা উত্তরে শুধু বলেন,—হ্যাঁ তা উঠি।

ব্যস এর বেশী আর কিভাবে মত দেবেন ঘনাদা। আমাদের মতো দু বাহু তুলে ধেই ধেই করে নৃত্য করবেন নাকি? স্পষ্ট হাঁ তিনি বলেন নি কিন্তু 'নাও'ত তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

আমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নিচে নেমে যাই। সারাদিন তোড়জোড় চলে বাহাত্তর নম্বর ছাড়বার। ঘনাদার সঙ্গে আর কোনো আলাপ আলোচনায় ঘেঁসি না। পাছে কোনো ভুল বোল-চালে পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়।

ঘনাদাকে একবার বিকেলের দিকে বেরুতে দেখি। ফেরবার সময় মুখটা যেন হাসি হাসি মনে হয়। আর আমাদের পায় কে!

মাঝরাত্রে সেদিন বাইরের কড়া নাড়াটা শুধু একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অদ্য শেষ রজনী বলে।

পরের দিন সকালে জিনিষপত্র গুছোনো বাঁধাছাঁদার মধ্যেই একবার ঘনাদাকে দেখে আসা উচিত মনে হয়। যাবার আগে কোনো সাহায্য টাহায্য'ত দরকার হতে পারে।

কিন্তু ন্যাড়া সিঁড়ি দিয়ে চিলের ছাদ পর্যন্ত উঠেই যে পা দুটো সেখানে জমে যায়। টঙের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তাকি সত্যি না দুঃস্বপ্ন!

ঘনাদা নিশ্চিন্ত নির্বিকার হয়ে তাঁর খাটো ধুতির ওপর ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে এক হাতে গড়গড়ার নল ধরে টান দিতে দিতে তক্তপোষের ওপর উবু হয়ে বসে কাগজ পড়ছেন!

এ কি ঘনাদা!—ভেতরে গিয়ে এবার বলতেই হয় হতভম্ব হয়ে,—ভুলে গেছেন নাকি?

ঘনাদা কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বেশ মধুর কণ্ঠে আমাদের আশ্বাস দেন,—না, ভুলব কেন।

তবে এখনো তৈরী হননি যে!—আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

হইনি, দরকার নেই বলে।—ঘনাদার দৃষ্টি এখনো খবরের কাগজের ওপর,—গানটা দিয়ে দিলাম কি না;

গানটা দিয়ে দিলেন!—তক্তপোষের ধারে আমাদের বসতে হয় এবার কিন্তু খুব সানন্দে সাগ্রহে নয়।

বিস্মিত প্রশ্নটা কিন্তু আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল,—গান দিয়ে দিলেন কাকে? কেন?

কেন দিলাম!—এতক্ষণে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ঘনাদা আমাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করলেন—না দিলে এ সব উৎপাত বন্ধ হয় না যে। আর দিলাম মাৎসুয়ো-কে।

কে এক মাৎসুয়োকে কি গান দিলেন আর তাইতে সব উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমাদের আর কোথাও যাবার দরকার নেই বলছেন!

আমরা ঘুরপাক খাওয়া মাথাটাকে একটু থামাবার চেষ্টা করে প্রথম রহস্যটাই জানতে চাইলাম—মাৎসুয়ো আবার কে?

ঘনাদা যেন অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসলেন।

ও, মাৎসুয়ো কে তা'ত তোমরা জান না। কিন্তু মাৎসুয়োর পরিচয় দিতে হলে ইয়ামাদোর কথাও বলতে হয়, আর যেতে হয় প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মাঝামাঝি টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে এমন দুটি ফুটকিতে সাধারণ ম্যাপে অনুবীক্ষণ দিয়েও যাদের পাত্তা পাবার নয়। নাম লিমু আর নিফা, ঠিক কুড়ি অক্ষাংশের দুধারে একশ চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর দ্রাঘিমার মধ্যে দুটি ছেলেখেলার দ্বীপ। একটি দু মাইল আর অন্যটি বড় জোর দেড় মাইল লম্বা কিন্তু এই মহাসমুদ্রে এই দুটি মাটির ছিটে নিয়েই মাৎসুয়ো আর ইয়ামাদোর মধ্যে কাটাকাটি ব্যাপার। লিমু দ্বীপটা মাৎসুয়োর আর নিফার মালিক ইয়ামাদো। গত মহাযুদ্ধের সময় দুজনেই জাপানের নৌ-বাহিনীতে ছিল। ওই অঞ্চলেই যুদ্ধের কাজে থাকতে হয়েছিল বলে দুজনেই ওই দ্বীপমালার রাজ্যকে ভালবেসে ফেলে। যুদ্ধ থামবার পর দেশে ফিরেও সে ভালবাসা তারা ভোলে না। কিছুকাল ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ কিছু রোজগার করে দুই-বন্ধুই ওই অঞ্চলে গিয়ে পাশাপাশি দুটি দ্বীপ কেনে।

দুজনের বন্ধুত্বে সেইখানেই দাঁড়ি। নিজের নিজের দ্বীপকে একেবারে অতুলনীয় স্বর্গ বানিয়ে ফেলার রেষারেষিতে দুজনেই যেন দুজনের মাথা নিতেও পেছপাও নয়।

ঠিক সেই সময় আমার সঙ্গে মাৎসুয়োর দেখা। দেখা না বলে ঠোকাঠুকিই বলা উচিত। জাপানের হোক্কাইদো দ্বীপের পাহাড়ে তুষার ঢাল দিয়ে সে রাত্রে মশাল হাতে নিয়ে আমি স্কি করে নামছি।

কি করে নামছেন?—শিবুর প্রশ্নটার ধরনে ভক্তিভাবের একটু যেন অভাব মনে হল।

স্কি করে—ঘনাদা প্রশান্তভাবেই বলে চললেন—রাত্তিরে মশাল নিয়ে স্কি করায় একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। জাপানে মশাল নিয়ে স্কি করার তাই খুব উৎসাহ। তবে দক্ষিণের সব স্কি-ঘাঁটিতে এ খেলা চললেও ঢাল একটু বেশী আর বিপদজনক বলে হোক্কাইদো-তে মশাল নিয়ে স্কি কেউ বড় করে না।

মশাল নিয়ে মনের আনন্দে নামতে নামতে সেইজন্যেই বেশ একটু অবাক হচ্ছিলাম কিছুক্ষণ থেকে। আমার পেছনে মশাল নিয়ে আরেকজন কে যেন নেমে আসছে। আর নামছে রীতিমত বেগে। হোক্কাইদোর তুষার পাহাড়ের ঢাল রাত্তিরবেলা একেবারে নির্জন। অন্য কোথাও হলে এক আধজন স্কিয়ার তবু দেখা যায়। এখানে ওপরের লজ কেবিন পর্যন্ত বন্ধ। স্কি লিফ্ট নেই বলে আমি সিঁড়ি-পা ফেলে ফেলে পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। আমার মতো এই রাত্রে স্কি করবার বেয়াড়া সখ আবার কার!

কিন্তু সখই শুধু বেয়াড়া নয়, লোকটা যে একেবারে রাম আনাড়ি মনে হচ্ছে! নামছে একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো, কিন্তু কোথায় নামছে তার যেন ঠিক নেই। এত চওড়া তুষার ঢাল পড়ে থাকতে আমারই ঘাড়ের ওপর পড়তে যাচ্ছে যে!

গোঁয়ার্তুমি করে এই রাত্রে স্কি করতে নেমে এখন তাল সামলাতে পারছে না নাকি! সত্যিই পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে'ত সর্বনাশ। দুজনের শরীরে স্কি আর চাকা লাঠিতে জড়ামড়ি হয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাব যে!

এ বিপদ এড়াবার জন্যে যা যা সম্ভব সবই করলাম। প্রথম স্টেম বোগেন নিলাম।

কি নিলেন! স্টেন গান?—আমাদের হাঁ-করা মুখের প্রশ্ন,—গুলি করবার জন্যে!

না, স্টেন গান নয় স্টেম বোগেন!—ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন একটু,—ওটা হল স্কি করার সময় এক রকম বাঁক নেওয়া। মোঙ্গল আর ল্যাপ্দের কাছে বিদ্যেটা শিখলেও নরোয়ে সুইডেনই প্রথম স্কি-টা ইউরোপে চালু করে বলে শব্দটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান।

আমাদের জ্ঞান দিয়ে ঘনাদা আবার তাঁর বিবরণ সুরু করলেন,—স্টেম বোগেন-এ খুব সুবিধা হ'ল না। লোকটার আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়াই যেন নিয়তি।

কিন্তু সত্যি কি তাই!

স্টেম বোগেনের পর স্টেম ক্রিস্টিয়ানা বাঁক নিলাম, কিন্তু লোকটা তখনও যেন আটার মতো পেছনে লেগে আছে। যেরকম আনাড়ি তাকে ভেবেছিলাম তা ও ত সে নয়। শক্ত শক্ত উৎরাই-

এর ঢাল আর বাঁক বেশ ভালোই সামলাচ্ছে। মরিয়া হয়ে নামছে বলে প্রায় ধরেও ফেলেছে আমায়।

তাহলে আমায় জেনে শুনে জখম কি খতম করা কি তার মতলব! কেন? লোকটাই বা কে?

এ সব প্রশ্নের জবাব ভাববার তখন সময় নেই, যেমন করে হোক লোকটার মতলব ভেস্তে দিতে হবে।

তাই দিলাম। পর পর দুটো স্টেম বোগেন আর স্টেম ক্রিশ্চিয়ানা বাঁক নিয়ে তাকে ছেড়ে ফেলতে না পেরে ওই শক্ত তুষারেই নরম তুষারের সুইস টেলেমার্ক বাঁক নিয়ে ঘুরেই লাঙল-পা করে থেমে গেলাম।

লোকটা আমার একেবারে গা ঘেঁসে ছুটকে গিয়ে খানিক-দূরে ঘাড় মুড় গুঁজে পড়ল।

ভাবলাম ঘাড় ভেঙে শেষই হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু তা হয়নি। খুব কড়া জান। হাড়গোড় ভাঙা নয় একটা পা মচকানোর ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে।

ধরে টরে কোন রকমে তুললাম। এখন তাকে নিচে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা।

কিন্তু নিয়ে যাব কাকে? খোঁড়া হয়েও লোকটার কি রোক! আর আমারই ওপরে।

জাপানীতে সে যা বললে বাংলার চেয়ে হিন্দীতে বললেই তার ঝাঁঝটা বুঝি একটু ভালো বোঝানো যায়।

তাকে ধরে তোলবার আগে থেকেই সে আমার ওপর তম্বী সুরু করেছে। তুমকে হাম খুন করেঙ্গে, মারকে কুত্তাকো খিলায়েঙ্গে!—এই হ'ল তার বুলি।

ব্যাপারটা কি? লোকটা পাগল টাগল নাকি!

না, তা'ত নয়। মশালটা ভালো করে মুখের কাছে ধরতে মুখটা চেনা চেনাই লাগল। সঠিক মনে পড়ল তার পরেই।

হ্যাঁ, টোকিওর উয়েনো স্টেশন থেকে রওনা হবার সময় ছুটির দিন পড়ায় স্কিয়াররদের দারুণ ভিড় হয়েছিল। কলেজের ছেলে মেয়ে আর কমবয়সী চাকুরেদের ভিড়ই বেশী। স্কি নিয়ে তারা সবাই জাপানের কোনো না কোনো স্কি রেজর্ট-এ যাচ্ছে। ট্রেন আসবার পর ঠেলাঠেলি করে ওঠবার সময় কে যেন পেছন থেকে আমায় টেনে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তখুনি ফিরে চেয়ে হাতে নাতে কাউকে ধরতে পারিনি কিন্তু এই মুখটাই যেন তার ভেতর দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।

শুধু উয়েনো স্টেশনে কেন তার আগে আরো দুতিন জায়গায় এই মুখটা দেখেছি বলে মনে পড়ল। লোকটা যেন বেশ কিছুকাল ধরে আমায় পিছু নিয়েছে। কেন?

দুটো স্কিকে জুড়ে একটা স্ট্রেচার গোছের বানিয়ে তার ওপর লোকটাকে শোয়াবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি। সেই অবস্থায় তাকে তুষারের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম,—কে তুমি? আমার পিছু নিয়েছ কেন?

ওই অবস্থাতেই লোকটা গজরে উঠল,—তোমায় খুন করবার জন্যে!

বেশ সাধু উদ্দেশ্য!—হেসে বললাম,—কিন্তু খুন করাই যদি তোমার নেশা হয় এই মহৎ কাজটার জন্যে আমার চেহারাটাই পছন্দ হ'ল কেন! এ পৃথিবীতে' ত শুনি তিনশ কোটি মানুষ গিজ গিজ করছে। তাদের কাউকে মনে ধরল না।

না, তুমিই আমার একমাত্র শত্রু!—সে দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো হিস্‌হিসিয়ে উঠল,—ইয়ামাদোর সঙ্গে মিলে তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ জানো না!

ও, তুমি তাহলে মাৎসুয়ো! লিমু দ্বীপের মালিক!—এতক্ষণে অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম,—কিন্তু তোমায়' ত আমি কখনো চোখেও দেখিনি, তোমার লিমুতেও কখনো পা দিইনি।

তা দিলে ত তোমায় কুচি কুচি করে কেটে হাঙরদের খাওয়াতাম!—মাৎসুয়ো যেন মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা ছাড়ল,—তুমি লিমুতে আসোনি কিন্তু ইয়ামাদোর হয়ে তার নিফা থেকে কি বিষ মন্তর ঝেড়ে আমার সোনার লিমু ছারখার করে দিয়েছ—! জানো! আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম আর ইয়ামাদো ত নেহাৎ চাষার ছেলে। আমি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমার লিমুকে মর্ত্যের স্বর্গ বানিয়ে তুলেছিলাম। সেই স্বর্গ তুমি শ্মশান করে দিয়েছ।

তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে!—একটু হেসেই বললাম,—হ্যাঁ ইয়ামাদোর অনুরোধে একবার তার দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে তোমার সঙ্গে তার রেষারেষির কথা শুনেছিলাম বটে। তোমার নামটাও সেই সময়ে শুনি আর তুমি যে তোমার লিমুকে নন্দন কানন বানাবার জন্যে যা কিছু সম্ভব বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছ সে খবরও পাই। তখনই তোমার সম্বন্ধে তোমাদেরই একটা জাপানী প্রবাদ আমার মনে এসেছিল,— 'রঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু!' এখন আমার বিরুদ্ধে তোমার আক্রোশের কারণ শুনেও সেই প্রবাদই আবার শোনাচ্ছি,—রঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু।

তখন তুষার পাহাড়ের ঢাল থেকে নিচের বসতিতে পৌঁছে গেছি। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তুলে মাৎসুয়োকে হাস-পাতালে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করলাম। তার জন্যে যাই করি মাৎসুয়ো কিন্তু তখনো আমার ওপর সমান খাপ্পা। তার ক্যাবিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় গলায় যেন বিষ ঢেলে বললে,—পা খোঁড়া হয়েছে বলে তুমি আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে ভেবেছ! আমি অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে যেমন হোকাইদোর স্কি-ঘাঁটিতে তোমায় খুঁজে বার করেছি তেমনি যেখানেই যাও আমি তোমার নিশ্চিত শমন এই কথাটি মনে রেখো।

আমি তাহলে তোমাদের প্রবাদটাই এবার আমার বাংলা ভাষায় বলি মাৎসুয়ো।—বেশ একটু গম্ভীর হয়েই বললাম,—তোমার বেদ মুখস্থ কিন্তু বুদ্ধি ঢু ঢু। তোমার নিজের সর্বনাশ তুমি নিজেই করেছ এইটুকু শুধু বলে যাচ্ছি আর কথাটা যদি ধাঁধা মনে হয় তাহলে তার উত্তর বার করবার জন্যে কটা ইসারাও দিয়ে যাচ্ছি,—তোমার আখের ক্ষেত, বুফো ম্যারিনাস আর বছরে চল্লিশ হাজার।

এই বলেই চলে এসেছিলাম হোক্কাইদো থেকে। তারপর এতকাল বাদে গোড়িয়া হাটের মোড়ে কাল বিকেলে আবার দেখা। না সে মাৎসুয়ো আর নেই। ভাবনায় চিন্তায় দুনিয়াভর টহলদারির ধকলে পাকা আম থেকে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। সে ক্ষ্যাপা নেকড়েও এখন একেবারে পোষা খরগোস। আমায় দেখে রাস্তার ওপরই পায়ের ধুলো নেয় আর কি!

পায়ের ধুলো! মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েই গেল,—জাপানীরা আজকাল আবার পায়ের ধুলো নিতে শিখেছে নাকি!

আহা মাৎসুয়ো আর কি জাপানী আছে নাকি!—ঘনাদা ঝটপট সামলে নিলেন,—এ বাংলা ও বাংলায় আমায় খুঁজতে খুঁজতে আধা কেন চোদ্দ আনাই বাঙালী হয়ে গেছে। এই তোমাদের মতই প্রায় চেহারা।

ঘনাদা আমাদের চেহারাগুলো একবার যেন 'চেক' করে নিয়ে আবার শুরু করলেন,—আফসোসেরও তার সীমা নেই, আমাকে মিছিমিছি শত্রু না মনে করলে কত আগেই তার সব মুশকিল আসান হয়ে যেত সেই কথা ভেবেই তার বেশী দুঃখ। আমি যে তিনটে ইসারা দিয়েছিলাম তাই থেকেই সে তার লিমু দ্বীপের অভিশাপের রহস্য বার করে ফেলে। কিন্তু তার নিজের অতিবুদ্ধির প্যাঁচই এখন তার নাগপাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে বলতে মাৎসুয়ো রাস্তায় দাঁড়িয়েই হাঁফাচ্ছিল। চীনে হলে হবে না, জাপানী রেস্তোরাঁই বা কোথায় পাব। সামনে যে

ময়রার দোকান পেলাম তাতেই নিয়ে গিয়ে বেশ একটু ভালো করে মাৎসুয়োকে কচুরি সিঙাড়া খাইয়ে চাঙ্গা করে তুললাম।

ঘনাদা থামলেন। ইঙ্গিতটাও মাঠে মারা গেল না। আমরাও বুঝলাম। বাহাত্তর নম্বর থেকে ঠাঁই বদল যখন হবেই না তখন মিছে আর মেজাজ বিগড়ে থেকে লাভ কি! আমাদের দিক দিয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি যাতে না থাকে শিশির তাই চট করে একবার নিচে থেকে ঘুরে এল। তারপর চ্যাঙাড়ি ভর্তি কচুরি সিঙাড়া ত এলোই, টিন ভর্তি সিগারেটও।

ঘনাদা কেমন অন্যমনস্কভাবে গোটা কৌটোটাই হাতাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধেক চ্যাঙ্গাড়ি ফাঁক করে যেন মাৎসুয়োর ক্ষিদের বহরটাই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর শিস দেওয়া কৌটো খুলে শিশিরকে উদার হয়ে একটা বিলিয়ে আর নিজে একটা ধরিয়ে রামটান দিয়ে নতুন করে সুরু করলেন,—হ্যাঁ মাৎসুয়োর দুঃখের কাহিনী শুনে এবার বলতেই হল, তোমার ওই বুফো ম্যারিনাসই যে তোমার লিমু দ্বীপের কাল তা এখন বুঝেছ ত? ইয়ামাদোর নিফা দ্বীপে অতিথি হবার সময়েই আখের ক্ষেতের নারকুলে পোকা মারতে তোমার এই বুফো ম্যারিনাস আমদানির কথা শুনে আমি রঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু বলে তোমাদের প্রবাদটা আওড়েছিলাম। সত্যিই এটা পুকুরের বোয়াল মারতে খাল কেটে কুমীর আনার সামিল আর বেদ মুখস্থ বুদ্ধি ঢুঢু-র দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে গিয়ে তুমি মূর্খের মতো কেঅকুবি-ই করেছ। তোমার আমদানি-করা বুফো ম্যারিনাস এসে প্রথমে আখের ক্ষেতের সব পোকা ঠিকই সাবাড় করেছে, তারপর হয়ে উঠেছে রূপকথার সেই অজর অমর রাক্ষসীর পাল। রক্তবীজের মতো দিন দিন বেড়ে এরা তোমার গোটা লিমু দ্বীপটাকেই পেটে পুরতে চলেছে। লম্বায় এরা আধ হাতেরও ওপরে, ওজনে কম সে কম সওয়া কিলো। ভালো মন্দ সব পোকামাকড় শেষ করেও এদের ক্ষিদে মেটে না,

খাবার মতো সাপ ব্যাঙ যা পায় এরা অম্লান বদনে গিলে ফেলে। এদের গায়ের গ্রন্থির এক রকম রসে কুকুর বেড়াল মারা যায় আর বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার গুণ বেড়ে এরা যেখানে থাকে সেই জায়গাই শ্মশান করে তোলে।

আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন।—আমার কথার পর ককিয়ে উঠল মাৎসুয়ো। ওই বুফো ম্যারিনাস-ই সব সর্বনাশের মূল জানবার পর আমি আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে দ্বীপ থেকে তাদের নির্মূল করবার আয়োজন করেছি। কিন্তু অমন করে মেরে কটাকে শেষ করা যায়। বছরে চল্লিশ হাজার যারা ডিম পাড়ে, তাদের একশটা যখন মারি তখন হাজারটা নতুন করে জন্মায়। নিরুপায় হয়ে আমি টোঙ্গা সামোয়া থেকে ভাড়া করা ধাঙড় আনালাম। একটা বুফো মারলে দশ টাকা। কিন্তু তাতেও রক্তবীজের ঝাড় বেড়েই যাচ্ছে। একেবারে হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত আপনার খোঁজেই এসেছি, এ অভিশাপ কাটাবার উপায় কিছু আছে কি না জানতে। তা যদি না থাকে ত লিমুতে আর ফিরব না। একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।

নিরুদ্দেশ তোমায় হতে হবে না মাৎসুয়ো!—একটু সান্ত্বনা দিয়ে এবার বললাম,—এ সমস্যা তোমার শুধু ওই লিমু দ্বীপের নয়। অস্ট্রেলিয়ার মতো বিরাট দেশও আজ এই সমস্যা নিয়ে দিশাহারা। তবে হতাশ হোয়ো না। উপায় আছে। একমাত্র গান দিয়েই তোমার লিমুকে এখন বাঁচানো যায়।

গান!—আমাদের সকলের চোখই ছানাবড়া,—গান দিয়ে লিমুকে বাঁচাবেন!

হ্যাঁ, মাৎসুয়োও ওই প্রশ্ন করেছিল,—অবোধকে বোঝাবার হাসি হাসলেন ঘনাদা,—তাকে তাই বলতে হল যে ওষুধপত্র গুলি বারুদ কোনো কিছুতে কিছু হবে না। বুফো ম্যারিনাসের সমস্যার ফয়সালা যদি কিছুতে হয়ত গানে-ই হবে। চৌরঙ্গির একটা বড় রেডিও গ্রমোফন ইত্যাদির দোকানে তাকে নিয়ে গিয়ে টেপ রেকর্ডে খানিকটা গান তুলে দিয়ে বললাম,—যেটুকু মনে আছে তাতে এই টেপটুকু যেমনভাবে বলে দিচ্ছি সেইভাবে বাজালেই কাজ হাসিল হবে বলে বিশ্বাস। নির্দেশগুলো তারপর একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। মাৎসুয়ো কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আজ কালের মধ্যেই লিমুর জন্যে রওনা হবে সুতরাং আর কোনো উপদ্রবের ভয় নেই।

তা ত নেই, কিন্তু বুফো ম্যারিনাস কি বস্তু আর আপনি সব সঙ্কট মোচন যে টেপটি তাকে দিলেন সেটি কি গানের?

বুফো ম্যারিনাস হল এক জাতের কোলা ব্যাঙ।—ঘনাদা সদয় হয়েই আমাদের বোঝালেন,—আদি জন্ম দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখান থেকে হাওয়াই ঘুরে অস্ট্রেলিয়ায় আমদানি হয়েই সর্বনাশ করতে সুরু করেছে। টেপে তুলে যে গানটা মাৎসুয়োকে দিলাম সেটা এই ব্যাঙ বাবাজি বুফো ম্যারিনাস-এরই বিয়ের গান বলতে পারো। মদ্দা ব্যাঙ গলা ফুলিয়ে এই গান গাইলে তার টানে দলে দলে কনে ব্যাঙেরা সব হাজির হয়। সুবিধে মতো জায়গায় এ গান বাজিয়ে তাই চল্লিশ হাজারী ডিমের ব্যাঙ-বৌদের ধরে কোতল করা যায়। কিছুদিন এ কাজ করতে পারলেই বুফো ম্যারিনাস-এরা সব নির্বংশ।

কিন্তু ওই কোলা ব্যাঙের বিয়ের গান আপনি গাইলেন কি করে!

ঠিক কি আর গাইতে পেরেছি!—ঘনাদা বিনয় দেখালেন,—তবে দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোরবার সময় বনে বাদাড়ে শুনে যেটুকু মনে ছিল তাই একটু গেয়ে দিয়েছি। ওতেই অবশ্য কাজ যা হবার হবে। ব্যাঙ বরেরা সবাই নিশ্চয় কালোয়াত নয়।

কিন্তু—আমাদের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি—আপনার ওই মাৎসুয়ো আপনার ওপর অত ভক্তি হবার পরও অমন ভয় দেখানো কার্ড পাঠাচ্ছিল কেন?

ওটা ভয়! ভয়!—ঘনাদা যেন স্নেহের প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন,—প্রথমেই সোজাসুজি আমার কাছে আসতে সাহস করেনি। তাই আগেকার ধরনটাই রেখে তারই ভেতর আমায় পরীক্ষা করে দেখবার কায়দা করেছিল। আমি অবশ্য গোড়াতেই কার্ডগুলো দেখেই বুঝেছিলাম। ওতে ছবিগুলো ভয়ের কিন্তু সেই সঙ্গে মাৎসুয়োর নামটাও জাপানী গুপ্ত হরফে লেখা।

তাই লেখা নাকি!

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বেশ একটু ঘুরপাক খাওয়া মাথা নিয়েই নিচে নেমে গিয়েছি এরপর। এ অবস্থায় শিশিরের সিগারেটের গোটা টিনটা-ই ফেলে আসা খুব স্বাভাবিক নয় কি?

শেষ চমকটা অবশ্য তখনো বাকি ছিল।

বড়রাস্তায় চায়ের দোকানে গিয়েই সেটা পেলাম। সেখান-কার চা-পরিবেশনের ছোকরাকে সেদিন থেকে আর রাত্রে কড়া না নাড়বার কথা জানাতে গেছলাম।

তার দরকার হ'ল না।

আমাদের দেখেই একটু বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে এসে সে বললে,—আজ থেকে আর মাঝরাত্রে কড়া নাড়তে হবে না ত বাবু!

না, হবে না। কিন্তু তোমায় বললে কে?

আজ্ঞে ওই আপনাদের বড়বাবু! কাল বিকেলে আর কদিন এ কাজ আছে জানতে যাচ্ছিলাম। উনি তখন বেড়াতে বার হচ্ছেন। ওকেই জিজ্ঞাসা করতে জানিয়ে দিলেন যে আজ থেকে কড়া নাড়া বন্ধ।

সকালে একবারের বেশী চা আমরা কেউ খাই না। কিন্তু এরপর ওইখানেই বসে পড়ে পর পর কড়া করে দু কাপ না গলায় ঢেলে আর উঠতে পারলাম না।

সুচিত্রা দেবী বলেন, "হরলিক্স আমার স্বাস্থ্য রক্ষার একটি বীমা পত্র স্বরূপ। পরিবারের সকলের দেখাশোনার কাজে উৎসাহ যোগাতে এটি আমাকে খুবই সাহায্য করে।"
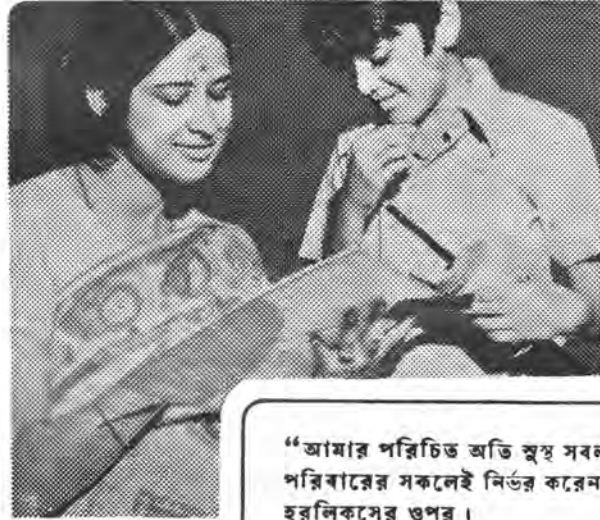
প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে।
স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

সুচিত্রা দেবী ঘরকন্নার কাজ এবং সংসারের সকলের দেখাশোনা করতে ভালবাসেন। তাই কর্ম্মঠ থাকার জন্য তিনি প্রতিদিন খান পুষ্টিকর হরলিক্স।

জীবনী শক্তির উৎস প্রোটিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর হরলিকস, প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দেহে যোগায় বল।

সেই কারণে মায়েদের এবং প্রায় ১০০ বছর যাবৎ ডাক্তারদের ভরসা এই হরলিক্স।

স্বাস্থ্যের অন্যতম উৎস

হরলিক্স

পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

হরলিক্স-রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক।

আজব বাঘের আজগুবি

শৈলেন ঘোষ

আমি আগে কখনও মানুষ দেখিনি। বলতে কী, মানুষের নাম-গন্ধও শুনিনি। প্রথম মানুষের নাম শুনে কেমন যেন একটা অদ্ভুত মজা লেগেছিল আমার। তুমি হলে নিশ্চয়ই হেসে ফেলতে। কিন্তু আমি বাঘ। আমায় কেউ হাসতে শেখায়নি। এমন কী, আমার ঠাকমাকেও আমি কোনদিন হাসতে দেখিনি।

এখন আমার ঠাকমা বুড়ি হয়ে গেছে। তা হলেও, এখনও যদি হাঁক পাড়ে, বন থরহরি। ইচ্ছে করলে এখনও এক থাবায় ইয়া পেল্লাই বুনো-মোষের ঘাড় লটকে দিতে পারে। বুনো-মোষকে পিঠে নিয়ে বন ডিঙিয়ে লাফ মেরে পালাতে পারে।

ঠাকমার যে অনেক বয়েস, তুমি অবশ্য তা দেখলে বুঝতে পারবে না। কারণ, এখনও একটিও দাঁত পড়েনি। চোখের তেজ একটুও কমেনি। থাবার নোখ এতটুকু ভোঁতা হয়নি। আমি হলপ করে বলতে পারি, তুমি দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। আমি নিজেও তো দেখেছি, একটা বড় হরিণ ধরে এনে থাবার নোখ তার গায়ের ওপর একবার শুধু আলতো করে বুলিয়ে দিলো, অমনি হরিণের গায়ের চামড়া দু ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়লো। কিন্তু আমি যদি ঠাকমার পাশে এসে দাঁড়াই, তখনই তোমার মনে হবে, ঠাকমার বয়েস হয়েছে। ঠাকমার পাশে আমাকে দেখলে তুমি ভাববে, বয়েসে আমি নেহাৎই নাবালক।

আসলে তাই। আমার কী আর এমন বয়েস! তা হলেও কিন্তু ঠাকমার চেয়ে আমি অনেক বেশি লাফালাফি করতে পারি। ঠাকমা তো একটু বেশি ছোটাছুটি করলে হাঁপিয়ে পড়ে। আমার ওসব নেই। চুপচাপ বসে থাকতে আমার ধাতে সয় না। তাছাড়া আমার নিজের চেহারার দিকে আমি যখনই তাকাই, আমার তখনই বুক ফুলিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে। আমার গায়ে রঙের বাহার কী! ডোরা ডোরা দাগগুলো ঝকঝক করছে। থাবার নোখগুলো চকচক করছে। আমার নিজেরই নিজেকে এত ভালো লাগে!

আমি আমার ঠাকমার কাছেই প্রথম মানুষের কথা শুনি।

আমার ঠাকমা অনেকবার মানুষ দেখেছে। আমি শুনেছি, আমাদের মত মানুষের চারটে পা নয়। পায়ে থাবাও নেই। মানুষের পায়ের বদলে দুটো হাত। দু পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে হাঁটা-ছোটা, চলা-ফেরা করতে মানুষের কোন অসুবিধেই হয় না। একথা শুনে আমার খুব অবাক লেগেছিল। আমি নিজেও যে দুপায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটা-চলা করতে চেষ্টা করিনি, তা নয়। কিন্তু একেবারে অসম্ভব! তবে আমাদের এখানে ভাল্লুকগুলো পারে। বাচ্চা ছেলেকে বুকে নিয়ে মা-ভাল্লুক যখন হাঁটে, তখন বেড়ে দেখতে লাগে! ভাল্লুকের অমন হাঁটা দেখেই আমি মানুষেরও একটা মোটামুটি চেহারা ধারণা করে নিয়েছিলুম। অবশ্য মানুষের গায়ে যে ভাল্লুক অথবা আমাদের মত লোম নেই, সেটা ঠাকমা আমায় আগেই বলেছিল। ঠাকমার ধারণা মানুষের মাথাটা দেহের একেবারে ওপরে বলে ওদের বুদ্ধি খুব। তবে সাহস নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। কেউ বলে, মানুষ ভীষণ সাহসী, আবার কেউ কেউ বলে, ফুঃ! ওদের হাতে বন্দুক থাকে বলে ওদের এত সাহস। একা-একা লড়ে যাক! তবে ঠাকমা বলে, বাঘকে মানুষ যমের মত ভয় করে। বাঘের সামনে বন্দুক ছাড়া এক পা এগুতে পারে না। কিন্তু ভাল্লুক বলো, কী হাতি বলো, মানুষ ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে সহজেই পোষ মানায়। শুনেছি রাস্তায় রাস্তায় ভাল্লুকের নাচ দেখিয়ে বেড়ায়।

সত্যি বলছি, প্রথম যেদিন নাচের কথা শুনি, মানে ভাল্লুক নাচে এই কথাটা শুনলুম, সেদিন আমি একেবারে থ। প্রথমতো নাচ ব্যাপারটা কী, নাচলে সাপের পাঁচ পা দেখা যায় কিনা, কিম্বা নাচ জিনিষটা চোখে দেখার অথবা পেটে খাওয়ার, তা আমি একদমই জানতুম না। তারপর মশাই, নাচের মানেটা যখন আমার মাথায় ঢুকলো, যখন জানলুম, নাচ মানে পা ঠুকে ঠুকে ধেই ধেই করা আর ধেই ধেই করে কোমর বেঁকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে, লাফ মারা, তখন সত্যিই আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। কারণ, ভাল্লুকের চেহারাটা এমন বিদ্ঘুটে হোক্কাই চমচমের মত যে, সে কোমর বেঁকিয়ে নাচবে, এ আমি ভাবতেই পারি না। আমি ভাবতে পারি চাই নাই পারি, ভাল্লুক নাচে, নাচছে, নাচবে!

সুতরাং, একদিন আমার মনে হলো, ভাল্লুক যদি নাচতে পারে তা হলে আমিও পারি। আর তাই একদিন নিজঝুম চাঁদনি রাতে আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছিল। জানো তো, আমি বাঘ বলে আমার ফ্যাচাং-এর ঠেলা কত! নাচতে হলে আমায় লুকিয়ে-ছাপিয়ে নাচতে হবে। কেননা, কেউ দেখে ফেললে বদনামের একশেষ! বাঘ আবার চ্যাংড়ার মত নাচবে কী! যার হুঙ্কারে বনের পিলে ফাটবার গোত্তর, সে ধেই ধেই করে নাচছে এটা কারো নজরে পড়লে মুখ দেখাবার যো থাকবে! কাজেই আমার নাচ আমি ছাড়া আর যাতে কেউ না দেখতে পায়, সেইজন্যে বনের যেদিকটা সবচেয়ে নিরিবিলি সেইখানেই চার-পা তুলে ধাঁই-ধপাধপ সুরু করে দিলুম। সুখের কথা, আমার নাচ দেখবার জন্যে টিকিট নিয়ে মারামারি কাটাকাটি লেগে যায়নি। কারণ, কেউ জানতেই পারেনি আমি এখানে নাচের আসর বসিয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা, চাঁদনি রাতে আকাশ উপচে সেদিন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লেও, নাচ ব্যাপারটা আমার নিজের কাছে নেহাৎ-ই একটা ফালতু ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, এ-সব উদ্ভুট্টি কান্ডকারখানা ভাল্লুক-টাল্লুকদেরই সাজে! ওসব কম্ম বাঘের জন্যে নয়। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! বাঘ কোমর বেঁকিয়ে নাচবে কী! বাঘ কী যাত্রাপার্টির সন্ত!

সৌভাগ্যই বলো আর দুর্ভাগ্যই বলো, আমি আগে বন্দুক জিনিষটা কী, জানতুমই না। বন্দুক নাকি একটা সাংঘাতিক যন্তর। ঠাকমা বলে, বন্দুকের গুলি গায়ে লাগলে রক্ষে নেই। অজানতে বন্দুকের সামনা-সামনি পড়লে নির্ঘাৎ মরণ! আমার মাকে নাকি আমি সেই বন্দুকের গুলিতেই হারিয়েছি! শুনি, আমার মা ছিল মানুষ-খেকো!

আমি তখন খুব ছোট। জ্ঞান-গম্যি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তাই মা যখন আমায় ছেড়ে চলে গেল, তখনকার কথা আমার আবছা আবছা মনে আছে। আমি মায়ের যেটুকু আদর পেয়েছি, তা-ও আমার স্পষ্ট মনে নেই। ঠাকমা-ই আমাকে বড় করে তুলেছে।

মানুষ-খেকো কথাটা শুনলেই আমার কেমন গা ঘিনঘিন করে। সত্যি বলতে কী, বাঘে মানুষ খায়, এ-কথাটা আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে-যায়। মা পঞ্চাশটার ওপর মানুষ মেরেছিল। মেরে মেরে মানুষের রক্ত খেয়েছিল। দুর্দান্ত সাহস ছিল আমার মায়ের। মা রাত্তিরবেলা বন ডিঙিয়ে মানুষ-পাড়ায় চলে যেতো। মানুষের ঘর থেকে চুপিসাড়ে ষন্ডা ষন্ডা মানুষ ধরে নিয়ে আসতো। শুনেছি, মানুষ শিকার করা নাকি সবচেয়ে সোজা। অবশ্য আমার ঠাকমা মাকে অনেকবার বারণ করেছিল। বলেছিল, "বেশি বাহাদুরি করা ঠিক না।" কিন্তু আমার ঠাকমার কথা মা শোনেইনি। তাছাড়া শুনেছি নাকি, মানুষের রক্ত পেটে পড়লে তার লোভ ছাড়া দায়! মানুষের রক্ত নাকি খুব মিষ্টি! একবার স্বাদ পেলে আর রক্ষে নেই! নেশা ধরে যায়!

মা সাধ করে মানুষ-খেকো হয়নি। মানুষের ওপর মায়ের ছিল ভীষণ রাগ। অবশ্য এর জন্যে আমি মাকে খুব দোষ দিই না। দোষ যদি দিতে হয়, মানুষকেই দেব। যদি বললে কেন, তাহলে বলি, আমার বাবাকে মানুষে ধরে নিয়ে গেছে! নিশ্চয়ই জানো, বাঘ ধরা ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কিন্তু ওই যে বলেছি, ঠাকমা বলে, মানুষ দারুণ চালাক।

বুদ্ধিতে বাবাও কম যেতো না। কিন্তু আমার অমন বুদ্ধিমান বাবাকেও যে মানুষগুলো অমন বোকা বানিয়ে দেবে, এ-কথাটা বাবা কেন, কেউ-ই ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি।

বাবার ছিল দারুণ স্বাস্থ্য, নিটোল। আর খুব চমৎকার গড়ন। গর্জন করতে করতে বন কাঁপিয়ে বাবা যখন হাঁটতো, তখন দেখলে মনে হতো, সত্যিই বাবা বনের রাজা। বাবা কাউকে কেয়ারই করতো না। কেয়ার করার দরকারই ছিল না। কারণ, বাবার মূর্তি দেখলে ধারে-কাছে ঘেঁসে এমন সাধ্যি কার!

কিন্তু এই কেয়ার না করাটাই যে কাল হয়ে দাঁড়াবে, আগে-ভাগে সেকথা আর কে জানতে পারবে? কে বুঝবে, বনের রাজাকে ধরবার জন্যে বনের আনাচে ফন্দি এঁটে মানুষ ঘাপটি মেরে বসে আছে! সত্যিই সেদিন এক মস্ত হার হয়ে গেল আমাদের। বাবা মানুষের হাতে বন্দী হয়ে গেল।

রোজই তো বাবা সন্ধের ঝোঁকে শিকার করতে বেরয়। সেদিনও বেরিয়েছিল। সেদিন হয়তো বাবার ইচ্ছে ছিল হরিণ ধরবে। সত্যি বলতে কী, হরিণ ধরা খুব শক্ত। নজরে পড়লে এমন ছুটবে, শত চেষ্টাতেও তাদের ধরা যাবে না। এক যদি ঐ লম্বা শিংগুলো লতা-পাতায় আটকে না যায়। কিন্তু হরিণ ধরতে গিয়ে বনের অন্ধকারে বাবা যে একটি নধরকান্তি ভেড়া দেখতে পাবে, এটা একেবারেই আচমকা ব্যাপার। সেটি যে মানুষই চালাকি করে ছেড়ে রেখেছিল, তা বাবা একদম বুঝতে পারেনি। তাই ভেড়াটাকে দেখতে পেয়েই বাবা টিপ করে মেরেছে লাফ। অমনি সংগে সংগে, দুম—দুম! আওয়াজটা বন্দুকের নয়, বোমার। প্রচন্ড আওয়াজ। বাবা সাংঘাতিক চমকে উঠেছে। ভেড়াটাকে ছেড়ে মার ছুট! ছুটবে কোন দিকে? যেদিকে ছুটবে সেদিক থেকেই অমনি শ' শ' মানুষ ক্যানেস্তারা, ঘণ্টা পিটিয়ে খেদা লাগালে। বাবার তো চক্ষুচড়কগাছ। সামনে ছুটতে গিয়ে থমকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই, পেছনে ছুটতে গেল। অমনি পেছন থেকেও শ' শ' মানুষ চিলের মত চেঁচিয়ে উঠে বাবাকে তেড়ে এলো। বাবা আকাশ-পাতাল কিছু ভেবে না পেয়ে, চোখ-কান বুজে মারল লাফ। ব্যস! বাবা যে একটা শুকনা পাতা চাপা দেওয়া গর্তের মধ্যে লাফ মেরে পড়বে, সে কি আর জানতো? সত্যি একেবারে হুমড়ি খেয়ে একটা গর্তের

মধ্যে মুখ গুজরে বাবা পড়ে গেল! কী গভীর গর্তটা! সেখান থেকে শত লাফালাফি করেও বাবা উঠতে পারলো না। আকাশ ফাটিয়ে তর্জন-গর্জন করেও কোন লাভ হলো না। বাবা এখন মানুষের ফাঁদে পড়েছে। বাবাকে ধরবে বলে মানুষ গর্ত কেটে, তার ভেতর একটি লোহার খাঁচার ফাঁদ তৈরি করে রেখেছিল। তারা জানতো, আমার বাবা শিকার ধরতে এদিকেই আসবে। তারপর শুকনো পাতা দিয়ে সাজানো এই ফাঁদে পড়ে বন্দী হবে।

বাবা বন্দী হয়েছিল। ওই লোহার খাঁচায় বন্দী করে বাবাকে মানুষের দল ধরে নিয়ে গেল। তারপর যে বাবার কী হলো, কেউ জানে না।

আর এইতেই আমার মায়ের মাথা গেল বিগড়ে। বাবারই কথা। বাবার জন্যে আমার মা এমন মুষড়ে পড়লো যে, মনে হলো মা বুঝি আর বাঁচবেই না। কিছু খেতো না, কোথাও যেতো না। শুধু পড়ে পড়ে গুমরোতো। আমার ঠাকমারও মনে ভীষণ লেগেছিল। ঠাকমা অত দুঃখেও কিন্তু ভেঙে পড়েনি। মাকে বলতো, "বউ, ওঠ। খেয়ে নে। অমন উপোষ করে থাকলে মরবি যে। নিজের কী দশা হয়েছে একবার চেয়ে দেখেছিস? ছেলেটাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে!"

ছেলেটা মানে, আমি। আগেই তো বলেছি, আমি তখন একদম ছোট। আর সেইজন্যেই বাবার কী হলো, না হলো সে-সব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। আমি নিজের খেয়ালেই মত্ত। ছুটি, লাফাই, খেলা করি। বাবাকে দেখতে না পেয়ে, হঠাৎ হঠাৎ যখন বাবার কথা আমার মনে পড়ে যায়, জিগ্যেস করলেই ঠাকমা বলে, "তোর বাবা বে' বাড়ি গেছে নেমন্তন্ন খেতে।" আমি শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে উত্তর দিতুম, "ও।" কিন্তু দেখতুম, আমার কথা শুনে আর আমার মুখের দিকে চেয়ে, মায়ের চোখ ছলছল করছে। আমি ভাবতুম, মায়ের বোধহয় ব্যামো হয়েছে। পেট কামড়াচ্ছে, তাই কাঁদছে। পেট কামড়ালে আমিও কাঁদি। সে তো এক-একদিন। কিন্তু মা-তো রোজই পড়ে পড়ে কাঁদে। তাহলে কী মায়ের ভারী অসুখ করলো!

অনেকদিন কেটে গেল। সত্যিই আর বাবা ফিরে এল না। ফিরে যে আসবে না, এ-তো জানা কথা। তবু তো বলা যায় না। অঘটন ঘটেও তো যেতে পারে। কিন্তু না, কিছুই ঘটলো না। এটা ভাবাও তো মিথ্যে যে, লোহার খাঁচা ভেঙে বাবা পালিয়ে আসবে! এ-তো সবাই জানে, মানুষের খপ্পর থেকে নিস্তার পাওয়া মানে, যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসা। অত সোজা! সোজা নয় ঠিকই, কিন্তু কেউ আশা কী ছাড়ে?

মায়ের আশা যখন সত্যি সত্যি ভেঙে গেল, বাবা যখন সত্যিই ফিরলো না, সেই তখন থেকেই আমার মা মানুষের ওপর খেপে গেল ভয়ংকর রকম। মানুষ দেখলেই তাকে মারো। তার টুঁটি টিপে রক্ত শুষে খেয়ে ফেলো, এই হলো মায়ের গোঁ! আর এই করতে করতেই মা হয়ে উঠেছিল পাকা মানুষ-খেকো। মানুষ মারার জন্যে মা জঙ্গল ডিঙিয়ে চুপিসাড়ে পাড়ি দিয়েছে লোকালয়ে। যাকে পেরেছে খতম করেছে। নিজের গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে। শেষে এমন স্বভাব হয়ে গেল, যেন মানুষ মারাটা কিছুই নয়। হাতের টুসকি।

বেশি গোঁয়ার্তুমি করাটা যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এ-কথা মাকে কে বোঝাবে? মার খেতে খেতে মানুষও যে চুপটি করে হাত গুটিয়ে হরিনাম জপছে না, এতো আর মা জানতো না। তাকে মারবার জন্যে মানুষও যে মতলব আঁটতে পারে, এটা মগজে ঢোকেইনি মায়ের। তাই মায়ের সাহস যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গেল। শেষে একদিন দিন-দুপুরেই এক ভয়ানক কাণ্ড করে বসলো মা।

আমাদের বনটা পেরুলেই যে বস্তীটা নজরে পড়ে, সেখানে যে অনেক লোকজন, তা নয়। দু-চার ঘর। তা হলেও, আমি বলবো, দিনের বেলা সেখানে বাঘ-ভাল্লুকের যাওয়া মোটেই উচিত নয়। আমার মা কিন্তু তাই করে বসলো। হুট করে ভর দুপুরেই সেখানে হাজির হলো। জায়গাটা মোটেই খোলামেলা নয়। কারণ, বস্তীটা বনের একেবারে কোলে। এদিকে বনটা অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড় যথেষ্ট আছে। দেখলে মনে হবে, ঘন জঙ্গলের গায়ে গা ঠেকিয়ে বস্তীটা দাঁড়িয়ে আছে। তখন কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। একটা ছোট ছেলে এই নির্জন দুপুরে ঘোড়াকে খাওয়াবে বলে, বনের ধারে ঘাস কাটতে এসেছিল। ছেলেটা নাকি রোজই আসে। রোজই নাকি তার সঙ্গে কেউ না কেউ সংগী থাকে। মা কদিন ধরেই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু শিকার করার তেমন যুতসই সুযোগ আসেনি। এ-কথাটা তো ঠিক, রাগ দেখিয়ে হুট করে কিছু করতে গেলে বিপদ সবারই হতে পারে। সুতরাং, মা ঝোপের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকে আর সুযোগ খোঁজে।

আজ সুযোগ মিলে গেল। কে জানে কেন, ছেলেটার সঙ্গে আজ কোন সংগী নেই। আজ ছেলেটা একাই এসেছে। মা যেদিক থেকে ছেলেটাকে লক্ষ্য করছিল, সেদিকে পেছন করেই ছেলেটা ঘাস কাটছে। সেইতক্কে মা ছেলেটার ঘাড়ে এক মেরেছে লাফ! লাফ মেরেই থাবার বাড়ি এক ঝটকা। ছেলেটার মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত বেরুলো না। সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। মা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে মুখ দিয়ে চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা ঝোপের মধ্যে। সেখানে লুকিয়ে রাখলে। কারণ, মা জানে এখন এটাকে খাওয়া যাবে না। এক্ষুনি চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে। ছেলেটার খোঁজ করতে দলে দলে লোক এসে পড়বে। এখন এখানে থাকলে বিপদও হতে পারে। অন্ধকার রাত্তির হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময়। তাই রাত্তিরে আসার মতলব এঁটে মা ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখে ওখান থেকে সরে পড়লো। মা নিশ্চিত জানতো, যে-জায়গায় তার শিকার লুকিয়ে রেখেছে, সে-জায়গার হদিশ আর কাউকে পেতে হচ্ছে না।

কিন্তু চালে ভুল করে বসলো মা। মানুষের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে অজানতে নিজের ফাঁদ নিজেই ফেঁদে বসলো। অন্য-অন্যবার মা কাউকে শিকার করে সঙ্গে সঙ্গে শিকারটাকে ঘাড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই মাটিতে কোন চিহ্ন থাকে না। এবার কিন্তু মা তার শিকারকে ঘাড়ে করে নিয়ে গেল না। দিন-দুপুরে বলে কেউ পাছে দেখে ফেলে, তাই মা তাড়িঘড়ি ছেলেটাকে মাটিতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল। তার ফলে হলো কী, টানা-হ্যাঁচড়ার দাগ আর রক্ত সারাটা পথে ছড়িয়ে রইলো। এটা কিন্তু মা জানতেই পারলো না। তাই নিশুতি রাতে মা যখন ছেলেটাকে খাবে বলে সেখানে হাজির হয়েছে, তখন একদম টের পায়নি, ওই হ্যাঁচড়ানি আর রক্তের দাগের হদিশ পেয়ে তাকে মারবার জন্যে গাছের ওপর একটা মানুষ বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে। মা কী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিল, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে! তাই হুমড়ি খেয়ে বসে বসে নিশ্চিন্তে তার শিকারের মাংস খাচ্ছিল। তারপর—

গুড়ুম

একেবারে মায়ের মাথার ভেতর বন্দুকের গুলি ঢুকে গেল। মা গর্জন করতে পেরেছিল একবারটি। তারপর ছিটকে পড়লো ক হাত দূরে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। আর একবার গুলি ছুটলো, মায়ের ছটফটানি নিস্তেজ হয়ে গেল। তারপর যে কী হলো কেউ জানে না।

এ-সব তো আমি বড় হয়ে ঠাকমার কাছে শুনেছি। কিন্তু তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, মা যখন আমায় ছেড়ে চলে যায়, তখন আমি খুব ছোট। তাই সেই ছোটবেলায়, সেদিন মাকে ফিরতে না দেখে আমি ভেবেছি, মা-ও বুঝি বাবার মত বে' বাড়ি

গেছে নেমন্তন্ন খেতে। সে যাই হোক, মা-ও বাবার মত আর কোনদিন ফেরেনি। তখন আমি মনে মনে অবাক হয়ে ভেবেছিলুম, বে' বাড়ি সে কেমন বাড়ি যে, সেখানে কেউ একবার গেলে আর ফেরে না। বে' বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারটা যে কী, সেটি জানার জন্যে তাই আমার মনটা সব সময়েই ছুকছুক করতো। যখনই ফাঁক পেতুম ব্যাপারটা জানার জন্যে তখনই ঠাকমাকে ঘ্যানঘ্যান করে জ্বালাতন করতুম। ঠাকমা কিন্তু কিছুতেই বলতো না। আমিও ছাড়তুম না। শেষে একদিন আমার জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে, এইসা ধমক দিয়েছিল যে, সেইদিন থেকে বে' বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারটা আমার মগজ থেকে একদম হাওয়া। আমি অবশ্য বড় হয়ে, অনেকদিন পরে, বে' বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার মানেটা বুঝেছিলুম। বুঝেছিলুম, ছোটবেলায় আমাকে ভোলাবার জন্যেই ঠাকমা ওই কথাটি পেড়েছিল।

বয়েস হলে সকলের অনেক জ্ঞান বাড়ে। অনেক কিছু জানতে পারে। আমার ঠাকমাও তাই। বাঘ হলে কী হবে, ঠাকমার মানুষের ঘরের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানা ছিল। ঠাকমা জানতো, মানুষ যেমন গাঁয়ে-গঞ্জে থাকে, তেমনি থাকে শহর-পাড়ায়। গাঁয়ে যেমন মাটির বাড়ি, শহরে তেমনি কোঠা বাড়ি। গাঁয়ে লোকজন নাম-মাত্র, শহরে অগুনতি, অসংখ্য। এ-সব কথা কতদিন আমায় ঠাকমা গল্প করেছে। ঠাকমার মুখেই শুনেছি, মানুষের বিয়ে হয় খুব ধুমধাম করে। বর টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে আসে কনেকে। অনেক সব মন্তর-তন্তর পড়া হয়। শাঁখ বাজে। মেয়েরা মুখে হুলু-হুলু করে কী রকম ডাক দেয়। বিস্তর লোক জমায়েৎ হয়ে লুচি, মাংস, রসগোল্লা সব খায়। এইটাকেই নেমন্তন্ন খাওয়া বলে। আমি অবশ্য কাঁচা মাংস অনেক খেয়েছি, কিন্তু রান্না করা মাংস কখনও খাইনি। তাই ওর স্বাদ-গন্ধ আমার জানা নেই। শুনেছি লুচির তেমন কোন স্বাদ নেই। কিন্তু রসগোল্লার স্বাদ নাকি সাংঘাতিক। রস ভর্তি বড় বড় গামলায় যখন রসগোল্লা ভাসে, বসে দেখলে নোলার জল সামলানো দায়!

শেষ-মেষ বাবা মা দুজনকেই যখন আমি হারালুম, তখন ঠাকমার যে কী হলো, আমাকে একদম কাছ-ছাড়া হতে দিত না। সব সময়ে নজরে নজরে রাখতো। আমাকে যেন আরও বেশি করে আদর করতো। কারণ, বাপ-মা-মরা ছেলে তো! ভালো ভালো শিকার ধরে এনে ঠাকমা আমায় খাওয়াতো। কোনদিন হরিণ, কোনদিন মোষের গর্দান আবার কোন-কোনদিন ভাল্লুক-ছানা। একদিন একটা বুনোশুয়োর এনেছিল। বেড়ে খেতে কিন্তু!

কিন্তু তাই বলে তো চিরটাকাল ছোট্ট সেজে আমি থাকতে পারি না। ঠাকমা আমায় শিকার ধরে এনে আমার মুখে তুলে দেবে, আর আমি খাব, এ কেমন কথা! সুতরাং আমিও যখন একটু একটু করে বড় হয়ে উঠলুম, আমারও তখন মনে মনে ইচ্ছে হতো, আমি নিজে নিজে শিকার ধরবো। পরের মুখ চেয়ে থাকতে তখন কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকতো! লজ্জাও করতো! ঠাকমাও জানতো, ছেলেটাকে চিরদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। কুটো নেড়ে কিছু করতে চাইবে না। কুঁড়ের মত শুয়ে-বসে ঝিমুবে। তাই ঠাকমা একদিন আমায় বললে, "চ, শিকার করতে শিখবি চ।" সত্যি বলছি, কথাটা শুনে আমার পা থেকে মাথা অবধি আনন্দে শিউরে উঠলো।

আকাশ থেকে চাঁদটি পেড়ে এনে কে যেন আমার হাতে তুলে দিলে। এখন আমার বয়েসটা এমন যে, সব সময় মনে হয় একটা কিছু করি। এমন একটা কিছু, যাতে বেশ মারামারি আছে। বেশ সাহস দেখানো যায়। কিম্বা বুক কাঁপানো উত্তেজনা। তাই ঠাকমার কথায় রাজি তো হলুমই, এমন কী ঠাকমার কথা মুখ থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে মারলুম লাফ। ঠাকমা চেঁচালে, "একা একা যাসনি।" কিন্তু কে শুনছে কার কথা!

অবশ্য ঠাকমা আমায় একা যেতে দিলো না। দু লাফে আমায় ধরে ফেললে। রেগে ভীষণ ধমক দিলে। বললে, "অমন করলে আর কোনদিন আনবো না। বিপদে পড়লে তখন দেখবে কে?"

আসলে, বিপদেই তো আমি পড়তে চাই। বিপদে না পড়লে মজা কী?! কিন্তু এটাও তো ঠিক, মজা পেতে গিয়ে প্রাণও যেতে পারে। মিথ্যে বলবো না, গা-ছমছম জঙ্গলে ঢুকে একটু একটু ভয়ও পাচ্ছে। যতই হোক প্রথম দিন তো! তাই আমি আর অবাধ্যের মতো বেশি হুটোপাটি না করে, শান্ত শিষ্টের মতো ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল ডিঙিয়ে ঠাকমার সঙ্গে শিকার খুঁজতে লাগলুম।

একটা নির্জন জায়গার কাছে এসে ঠাকমা দাঁড়ালো। আমায় ইসারা করলে, আমিও দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমি ফিস-ফিসিয়ে জিগ্যেস করলুম, "দাঁড়ালে কেন?"

ঠাকমা চাপা-গলায় বললে, "এখানে চুপটি করে বসে থাক!"

আমি গলার স্বর আরও নিচু করে, ঠাকমার গায়ে গা ঘেঁসিয়ে জিগ্যেস করলুম, "বসবো কেন?"

ঠাকমা উত্তর দিলে, "এক্ষুনি শিকার আসবে।"

কথাটা শুনে আমার চোখ দুটো যদিও তক্ষুনি চনমন করে চমকে সামনে তাকিয়েছিল, কিন্তু শিকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কে জানে, ঠাকমা কেমন করে বুঝলো শিকার আসবে! সে যাই হোক, ঠাকমার কথা শুনে আমি বসে পড়লুম ঝোপের মধ্যে। ঠাকমাও উপুড় হয়ে আমার পাশে বসে পড়লো।

বুনো-গাছের আড়াল দিয়ে এ-জায়গাটা এমন ঘেরা যে, শত চেষ্টা করেও কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা ঝোপের মধ্যে দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে সব ঠাওর করতে পারছি। আমার সামনে একটা নালা। নালাটা দিয়ে তিরতির করে জল বয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, দু-একটা মাছও জলে ভাসছে। আমার মাথার ওপর একটা মস্ত বড় ঝাঁকড়া-গাছ। কী গাছ, জানি না। ওপর দিকে চাইতেই দেখি, একটা গিরগিটি গাল ফুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ টকাস টকাস করে এমন ডেকে উঠলো, মনে হলো, আমায় যেন ঠাট্টা করছে। ভেতরে ভেতরে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল! কিন্তু রাগ দেখিয়ে তো কোন লাভ নেই। কেননা, গিরগিটিটাকে ধরা আমার সাধ্যি নয়। কোনখান দিয়ে পালিয়ে গিয়ে যে গর্তে ঢুকে পড়বে, দেখতেই পাবো না। তার চেয়ে ওকে ডাকতে দাও। ডাকতে ডাকতে মুখ ব্যথা হয়ে গেলে আপনিই থামবে।

এই দেখো, ঠাকমা ফুস! ঘুমিয়ে পড়েছে। বয়েস হয়ে গেলে এই এক জ্বালা। একটু ঠান্ডা-জিরোন জায়গা পেলেই গা এলিয়ে নাক ডাকাবে। থাক, ঘুমুক। ঠাকমাকে দেখে বড্ড দুঃখু হয়। ছেলে-বউ সব ছিল। সবাইকে হারিয়ে মনের মধ্যে দুঃখু নিয়েই বেঁচে আছে। এখন বড্ড একা। বুড়ো বয়সে অমন দু-দুটো আঘাত পেয়ে আরও বুড়িয়ে গেছে ঠাকমা। আমিই এক ভরসা, এই যা।

যেন কী একটা নড়ে উঠলো! চকিতে আমার চোখ দুটো সামনে চেয়ে থির হয়ে গেল। একটা হনুমান। মাটির ওপর তিড়িং তিড়িং লাফ মেরে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে নালাটার সামনে এসে মুখ ঠেকিয়ে জল খাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। আমিও নিঃসাড়ে ঝোপের জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে এলুম। এখান থেকে দুটো লাফ মারলেই আমি হনুমানটার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আমি মারলুম লাফ। কিন্তু সব গড়বড় হয়ে গেল। আমি নিশানা ঠিক করতে পারি নি, না, হনুমানটা বুঝতে পেরে একটু সরে গেল, তা আমি জানি না। তাই আমি হনুমানটার ঘাড়ে না পড়ে সিধে ওই নালাটার

যে মুখের আকর্ষণে
AFGHAN SNOW
আপনি চান...একটি
নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল রঙ।
আপনাকে তা দেবে
আফগান স্নো—ভারতের সবচেয়ে
জনপ্রিয় বিউটি ক্রীম।
আফগান স্নো। আপনার
ত্বককে পাপড়ির মত নরম
আর ভোরের শিশিরের
মত তাজা রাখবে।
আপনার রঙের ভার
ছেড়ে দিন আফগান
স্নো'র হাতে।
হাজার
চোখ মুগ্ধ
আফগানস্নো
আপনার রঙ সুন্দর রাখে

জলের ভেতর ঝপাং করে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। ততক্ষণে হনুমানটা এক লাফে গাছের ওপর। গাছের ওপর উঠে, এমন বিচ্ছিরি ক্যাঁচ-ম্যাঁচ করে চিৎকার সুরু করে দিলে যে, আমি বুঝতে পারলুম না, সে আমার এই দুর্দশা দেখে ঠাট্টা করে হাসছে, না ভয় পেয়েছে। আমি হুড়মুড়িয়ে জল থেকে উঠে পড়েছি। উঠে দেখি, হনুমানের হল্লা শুনে ঠাকমাও ছুটে এসেছে! আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ঠাকমা আমায় একটুও বকাবকি করলো না। উল্টে যে-গাছটায় হনুমানটা লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করছিল, সেই গাছের দিকে লাফ মারলে। ধরা শক্ত। কারণ, অত ওপরে লাফ মেরে কী ওঠা যায়! গাছে ওঠবার জন্যেই যে ঠাকমা লাফ দিচ্ছিল, তা নয়। যতদূর মনে হচ্ছে, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে। ঠাকমার মাথার মধ্যে কী ছিল আমি জানি না। কিন্তু ঠাকমাকে লাফাতে দেখে হনুমানটা যে ভীষণ ভয় পেয়েছে, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। ঠাকমা শেষবার যখন গলায় বিকট গর্জন করে লাফ মারলো, আমি তাজ্জব বনে গেলুম দেখে, হনুমানটা গাছ ফস্কে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল! আর দেখতে নেই, আমি ঝড়ের মত লাফিয়ে উঠে হনুমানের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমার জীবনে আমি সব-প্রথম নিজের মুখে শিকার ধরলুম। যদিও হনুমান, শিকার তো!

তারপরও দু-চারবার আমি ঠাকমার সঙ্গেই শিকারে গেছি। ক্রমে একটু একটু করে আমার সাহস বাড়তে লাগল। তারপর আমি একদিন একাই শিকার ধরে আনলুম।

একা-একা শিকার ধরতে এখন আমার কোন ভয়ই হয় না। যতই একা-একা শিকার ধরতে লাগলুম, ততই সাহসে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতো। মনে হতো আমার সামনে এখন কে দাঁড়াবে! এই জঙ্গলটা এখন আমার কথায় উঠবে বসবে। এখন আমি এই জঙ্গলের রাজা। আমার সামনে সব মুড়ি-মুড়কি!

আমার ঠাকমা ধীরে ধীরে বয়েসের ভারে নুয়ে পড়ছে। ঠাকমা এখন আর তেমন খাটতে পারে না। তেমন লাফাতে পারে না। সারাদিন ঘুমের ঘোরে ঢুলুনি দেবে। ভারি কষ্ট লাগে। আমি নিজেও আর চাই না, ঠাকমা আমার জন্যে কষ্ট করুক। এখন তো আমি ছোট্টটি নই যে, সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করবো! কিম্বা ঠাকমার কোলে বসে আদর খাবো! আমি চাই, ঠাকমা এখন চুপচাপ শুয়ে থাকুক। যে ঠাকমা একদিন শিকার ধরে এনে আমায় খাওয়াতো, আজ সেই ঠাকমাকে আমি শিকার ধরে এনে খাওয়াই। আমার যে কী আনন্দ লাগে! আমার বাবা-মা আমার জন্যে কতটুকু করতে পেরেছে! কিছু করার আগেই তো তারা হারিয়ে গেল। যা কিছু করেছে সে তো আমার ঠাকমাই। তাই ঠাকমার জন্যে কিছু করতে পারলে আনন্দ হবে না?

একদিন ঠাকমা আমায় বললে, "এখন তো আমি বুড়ো হয়ে গেলুম। আমি তো এবার মরবো। আমি মরে গেলে তুই একা থাকতে পারবি তো?"

আমি উত্তর দিয়েছিলুম, "তুমি মরবে কী ঠাকমা! আমি তোমায় মরতে দেব না। আমি যতদিন বাঁচবো, তোমায় ততদিন বাঁচিয়ে রাখবো।"

ঠাকমা বলেছিল, "তোর তো এখন উঠতি বয়েস, তাই বয়েস বাড়লে বেঁচে থাকার যে কী জ্বালা, তুই তা বুঝবি না।"

ঠাকমার কথা শুনে আমার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। ঠাকমাকে জিগ্যেস করলুম, "তোমার জ্বালা কিসের ঠাকমা? আমি কি তোমায় কষ্ট দিচ্ছি?"

ঠাকমা উত্তর দিলে, "না রে। এতদিন তোকে নিয়ে আমার বুক ভরে ছিল। তোকে চোখে চোখে রাখতুম, খাওয়াতুম, সাধ-আহ্লাদ করতুম। তাতে যে আমার কী আনন্দ ছিল, সে-কথা তোকে আমি বোঝাতে পারবো না। আজ তুই বড় হয়েছিস। নিজে নিজে সব পারিস। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে। তাই দিন-রাত তোর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি।"

আমি বললুম, "ঠাকমা, একদিন যে আমিও তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতুম?"

ঠাকমা উত্তর দিলে, "দুটোর মধ্যে তফাৎ আছেরে, বাছা।"

"কী তফাৎ ঠাকমা?"

ঠাকমা বললে, "আমি কষ্ট করেছি তোকে বড় করে তোলবার জন্যে। আর তুই কষ্ট করছিস যার জন্যে, সে তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। এখন আর আমার দাম কি বল? আমার জন্যে তোর কষ্ট করে লাভ কী?"

আমি বললুম, "একি কথা বলছ ঠাকমা? তুমি না থাকলে

আমায় এত আদর-যত্নে কে বড় করে তুলতো? তোমার জন্যে কষ্ট করতে আমার ভালো লাগে।"

আমার কথা শুনে ঠাকমার চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠেছিল। আমার মনের ভেতরটাও কেমন দুঃখে ভার হয়ে গেছলো।

আমাদের এখানে একপাল হাতি এসেছে। খবর পেয়েছি, পালে কটা হাতির বাচ্চাও আছে। নিজেদের চেহারাগুলো অমনি বিরাট বিরাট বলে, হাতিগুলো যেন কারোর তোয়াক্কাই করে না। ওদের দাপটে সবাই জুজু। খবরটা কানে আসা অবধি আমার পা থেকে মাথা অবধি রাগে জ্বলছে। আস্পর্ধা তো কম নয়! আমি থাকতে হাতির দল বনে দেমাক দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমাকে তা সহ্য করতে হবে! সুতরাং আমি মনে মনে ঠিক করলুম, হাতিগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে।

কথাটা বলা সহজ, কিন্তু করাটা সহজ নয়। কারণ, গায়ের জোরে হাতিও কম যায় না। তবে হাতির চেহারাটা যেমন গদাইলস্করের মত, বুদ্ধিটাও যদি তেমনি হতো, তাহলে রক্ষে ছিল না। কিন্তু এ কথাও বলি না, ওদের বুদ্ধি একেবারে নেই। এমন বুদ্ধি, দল বেঁধে যখন হাঁটবে, তখন বাচ্চাগুলোকে মাঝখানে আগলে নিয়ে হাঁটবে। মতলবটা হচ্ছে, বাচ্চাকে বাঘে না ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। সত্যি কথা বলতে, একটা পুরুষ্টু হাতিকে পিঠে নিয়ে পালাবার ক্ষমতা বাঘের নেই। তবে চেষ্টা করলে একটা বাচ্চাকে পিঠে ফেলে পালানো যায়।

আমায় অবশ্য ঠাকমা বলেছিল, "কক্ষনো একা হাতির সঙ্গে লাগতে যাস না। ওদের গায়ে ভীষণ জোর। একবার যদি শুঁড় দিয়ে ধরে ফেলে তাহলে নির্ঘাৎ পায়ে টিপে মেরে ফেলবে।"

অতই সোজা! আমাকে শুঁড়ে ধরে টিপে মারবে! আমি বাঘের ব্যাটা! তাই আমি যখন প্রথম ওদের দেখি, ইচ্ছে করেই নিজেকে আড়ালে রেখেছিলুম। একটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ওদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলুম। আমার ধান্ধা ছিল, ওরা একটু অন্যমনস্ক হলেই একটা বাচ্চার পিঠে লাফিয়ে পড়বো! কিন্তু তারপরেই কথাটা ভালো করে ভেবে, নিজেকে এমন ছোট বলে মনে হলো। ছিঃ! ছিঃ! বাঘের মনে এ-রকম কাপুরুষের মতো ভাবনা! আমি না সাহসী, শক্তিমান। না, না, চোরের মতো নয়। লড়তে যদি হয়, মরদের মতো সামনা-সামনি লড়বো। বাচ্চা মেরে হাত গন্ধ করার মধ্যে কোনই বাহাদুরি নেই!

কিন্তু ওদের দেখে তো এই বাহাদুর বাঘের চক্ষু স্থির। লড়াই করবো কী! ওরা এমনভাবে দল বেঁধে আছে, লড়াই তো দূরের কথা, কাছেই ঘেঁসা যাবে না। এক হতে পারে, আচমকা যদি কোন একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। তাতেও এক বিপদ। কারণ, একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, আর দশটা একসঙ্গে তেড়ে আসবে। তখন সাংঘাতিক বিপদ। তাই ভাবলুম, দলটাকে তছনছ করে দিই। এই ভেবে, আমি ঝোপের আড়াল থেকে ভয়ংকর হুংকার ছাড়লুম। কিন্তু বলবো কী, আমার হুংকার শুনে ওই হাতির পাল এতটুকু ভয় পেলো না, ছুটেও পালালো না। উল্টে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর শুঁড় উঁচিয়ে ডাক ছাড়লো। যেন বলতে চাইলো, "আয় একবার দেখি!"

বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এখন হুট করে এখান থেকে বেরিয়ে না পড়া। আমি আবার প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলুম। ওই হাতির পালের যেটা সর্দার ছিল, সে ঘুরে দাঁড়ালো। কুঁৎ কুঁতে চোখ দুটো এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলো। তারপর কঁপা এগিয়ে এল। মজা কী, সর্দার এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু সর্দারের সঙ্গে আর কেউ এলো না। আর সকলে বাচ্চা আর বাচ্চার মায়েদের আগলে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি মনে মনে চাইছি সর্দার আরও একটু এগিয়ে আসুক। ওর চলার বহর আর হাবভাব দেখে বেশ বুঝতে পারছি, আমি কোথায় লুকিয়ে আছি ও তার হদিশই করতে পারছে না। ও যখন আমার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, আমি মেরেছি লাফ। একেবারে সর্দার হাতিটার সামনে। আমায় দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে এতটুকু ভড়কে গেল না হাতিটা। ওই বিরাট দেহটা নিয়ে হাতি আমায় তীরের মত তেড়ে এলো। তার গলা দিয়ে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এলো। আমিও গর্জে উঠলুম। বন কেঁপে উঠলো। আমি লাফিয়ে কঁপা পিছিয়ে এলুম। হাতিটা ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে-পিষে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি হাতির পেছন দিকে লাফ মেরে পালালুম। হাতিটা চক্ষের নিমেষে ছলকে উঠে ওই মস্ত দেহটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লো। ইচ্ছে ছিল আমার, এই পেছন দিক থেকে হাতির পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়বো। কিন্তু হঠাৎ দেখি, হাতির দু নম্বর সর্দারটা কোত্থেকে ছুটে এসে একেবারে আমার সামনে। তখনই আমার মনে হলো, এইরে পেছনে লাফ মেরে তো আমি ভুল করেছি। আমায় যে ঘিরে ফেলছে। এখন যদি আর দুটো হাতি ছুটে এসে ডাইনে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে তো নির্ঘাৎ মরণ! কিন্তু আমি বাঘ। আমার ভয় পেলে তো চলবে না। মুখখানা বিচ্ছিরি রকম খিঁচিয়ে উঠে, এক ধমক মেরেছি আমি দু নম্বর সর্দারকে। দু নম্বর সর্দার তো! তাই বয়েস কম। সেইজন্যে একটু বেশি দুর্দান্ত। আমার ধমকে ও ভয় পাবে কেন? আমার দিকে গোঁৎ গোঁৎ করে তেড়ে এলো। মুখের শুঁড়টা লকলক করে উঠছে-নামছে। দাঁত দুটো সাদা ঝকঝকে ছুঁচালো। একবার পেটে ঘুঁসিয়ে দিলেই শেষ। আমি আগু পিছু কিচ্ছু না-ভেবে দু নম্বর সর্দারের মাথার ওপর মেরেছি এক লাফ। ডান কানটা থাবলে নিয়ে, মাথায় টেনে দিয়েছি থাবার এক ঝটকা। আমি দেখতে পেলুম দু নম্বর সর্দারের মাথাটা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। আমিও বন কাঁপিয়ে হাঁক দিচ্ছি, হাতিও চিল্লাচ্ছে। শুঁড়টা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে আঁক-পাঁক করছে। আমি জানতুম আর একবার যদি ওর মাথার খুলির ওপর আর একটা থাবা মারতে পারি, তবে হাতির কম্ম শেষ। কিন্তু সর্দার হাতিটা আমায় তা করতে দিলো না। নিমেষের মধ্যে ছুটে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকে ওঠার মত আচমকা শুঁড় দিয়ে খপাৎ করে আমায় চেপে ধরেছে। আমি বুঝে নিলুম এবার আমার শেষ। কী প্রচণ্ড শক্তি এই শুঁড়টার। আমায় যখন টিপে ধরলো, মনে হলো, আমার বুকের পাঁজরগুলো বুঝি সব গুঁড়িয়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমারও শক্তি বা কিসে কম! যখন সর্দার হাতিটা শুঁড় দিয়ে চেপে ধরে আমায় নিচে নামাচ্ছে আমায় পা দিয়ে টিপে মারবে বলে, সে তখন জানতো না তার শুঁড়টাকে আমি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করছি। ও যদি আমার গলাটা শুঁড় দিয়ে চেপে ধরতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি দম ফেটে মরতুম। কিন্তু হুড়োমুড়িতে সে আমার বুক আর পিঠটা জড়িয়ে ধরেছে। আমার মুখের নাগালে আমি ওর শুঁড়টা পেয়ে গেছি। আমার দাঁতে যত জোর ছিল, সব জোর দিয়ে কামড়ে দিয়েছি। আমি জানি না, আমার কামড়ের জোরে ওর শুঁড়টা ছিঁড়ে পড়ে গেল কিনা। কিন্তু সর্দারটা প্রচণ্ড চিৎকার করে আমায় ছেড়ে দিলো। আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। বুকের প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে আমি লাফ দিলুম। তারপর আর কিচ্ছু জানি না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে কাতরাতে লাগলুম। ঠাকমার কাছে যখন ফিরলুম, দেখলুম, তখনও ঠাকমা ঘুমোয়নি। আমার জন্যে বসে আছে। আমি কাতরাতে কাতরাতে ঠাকমার কোলের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঠাকমা ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলে, "কী হয়েছে রে?"

আমি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে উত্তর দিলুম, "হাতির সঙ্গে লড়াই।"

ক'দিন পরে শরীরটা যখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো, যখন মনে হলো, নতুন করে হাতির সঙ্গে আমি আবার লড়াই করতে পারি, তখন আমি আবার বনের রাজার মত গর্জন করতে করতে বন কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু হাতির সঙ্গে লড়াই করার পর ব্যাপারটা চারিদিকে যে হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে, এ-কথা আমি জানতেই পারিনি। এমন কী মানুষের কানেও পৌঁছে গেছে। আর সেই নিয়ে মানুষের কাছে এটা একটা মস্ত খবর। বনে-জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে হাতির লড়াই হবে, এ আর এমন কী নতুন কথা! বাঘ, সিংগি, গণ্ডার নানান জন্তুর সঙ্গে খুটখাট হামেশাই লেগে আছে। আর এইটাই তো জঙ্গলের জীবন। তা না হলে তো জন্তুরা জঙ্গল ছেড়ে কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকের মত ঘোড়ার গাড়ি চেপে শহর করতে বেরুতো!

খবরটা মানুষের কানে পৌঁছুবার পর থেকে তারা যে আমার পিছু নিয়েছে, আমায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে এ-কথা আমি আর কেমন করে জানবো? কারণ, আমি তো থাকি জঙ্গলে। ওরা ভেতরে ভেতরে গুজগুজ করে কী শলা-পরামর্শ করছে, আমার কানে তো সেই খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই। আমার অজানতে আমি তাদের কাছে একটা দুর্দান্ত বাঘ। তারা হয়তো ভেবেছিল, এ-বাঘটা হাতির সঙ্গে যখন লড়াই করেছে, তখন হুট করে কোনদিন না কোনদিন মানুষ-পাড়ায় এসে মানুষেরও তো ক্ষতি করতে পারে!

সত্যি বলছি, মানুষের কোন ক্ষতি করবো, এ ভাবনা আমার মাথায় এতদিন পর্যন্ত একদম ঢোকেনি। তবে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা আর বাবার দুর্দশার কথা মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ভীষণ দুঃখে ভরিয়ে তুলতো। তখন মনে হতো, মানুষকে পাই তো ছিঁড়ে খাই। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোন সুযোগ আসেনি। আর আসবে কিনা তাও জানি না।

আজ আমার ভাগ্যটা ভালো বলতে হবে। কেন না, দিন-দুপুরে হঠাৎ একটা শিকার মিলে গেল। বেশ বড়-সড় একটা বুনো-শুয়োর। আপাতত আমার পেটে জায়গা নেই। একদম খিদে নেই। তাই এখন এটাকে মুখে করে তুলে নিয়ে ওই ঝোপটার মধ্যে লুকিয়ে রাখাই ঠিক করলুম। তারপর সন্ধে নাগাদ যখন খিদে পাবে, তখন রসিয়ে খাওয়া যাবে। ঠাকমার জন্যে কাল একটা হরিণ শিকার করে দিয়েছি। সেটা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। আজও চলে যাবে। আমি শুয়োরটাই খাব।

মুশকিল হচ্ছে কী, শিকার মেরে তুমি যদি বনের মধ্যে খোলা-মেলা ফেলে রেখে যাও, ভেবে থাকো পরে এসে খাবে, তাহলেই ভুল করে বসবে। কারণ, তুমি চোখের আড়াল হলেই, পাঁচ-ভূতে তোমার খাবার সাবাড়িয়ে, তোমার জন্যে পেসাদ রেখে যাবে খটখটে হাড় কখানি। তাই আমি এটাকে একটা ঘুপচি-ঝোপে লুকিয়ে রেখে বড় বড় শুকনো-পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গেছলুম।

কিন্তু রাত্তিরে শিকারের কাছে ফিরে যে দৃশ্য দেখলুম, তাতে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া। দেখি কী, একটি হৃষ্টপুষ্ট ভাল্লুক বেশ বহাল তবিয়তে আমার শিকার দিয়ে পেটপুজো করছে। আমি যে এসেছি, সেটি পর্যন্ত বাছাধন টের পাননি। আর যদি টের পেয়েও থাকেন, তাহলে বলবো আমাকে সে গ্রাহ্যই করেনি। আমার মাথা গেল বিগড়ে। রেগেমেগে এমন হুংকার ছেড়েছি যে, বেচারা ভাল্লুকের পিলে বুঝি ফট হয়ে যায়! তবে ভাল্লুকটাও কম যায় না! আমার দাবড়ি খেয়ে পালাবে কোথায়, তা না, ডাক ছেড়ে রুখে দাঁড়ালো। আচ্ছা একগুঁয়ে তো! তবে রে! তোর ভাল্লুকের নিকুচি করেছে! আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম ভাল্লুকের ঘাড়ে। ভাল্লুকটাও ছাড়বার পাত্তর নয়। ঠ্যাং দিয়ে সে-ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর যা লেগে যা ঝটাপটি! প্রচণ্ড লড়াই! ভাল্লুকও চেঁচায়, আমিও গর্জন করি। ধামসা-ধামসি, খামচা-খামচি, মাটির ওপর গড়াগড়ি।

চিৎকার, গর্জন আর ধামসা-ধামসির আওয়াজটা এমন সাংঘাতিক হয়েছিল যে সেই আওয়াজ আমার ঠাকমার কানেও পৌঁছে গেছে। বুড়ি ঠাকমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। সেদিন দেখলুম এই বয়েসেও ঠাকমার কী তেজ! ছুটে এসে, মুখে কোন কথা না বলে ঠাকমাও ভাল্লুকটার ওপর লাফিয়ে পড়েছে। আমি বলবো কী, ঠাকমা যেই লাফিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে

গুড়ুম, গুড়ুম

গাছের ওপর থেকে মানুষ গুলি করেছে। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত দশ হাত দূরে আমার ঠাকমা ছিটকে পড়লো। ঠাকমার বুকে গুলি বিঁধেছে! আমি একদম হতভম্ব! কী করবো, না করবো সেই বুদ্ধিটুকু মাথায় আসতে না আসতে আবার আওয়াজ

গুড়ুম

কী হলো জানি না। শুধু মনে হলো, আমার গায়ের ওপর কে যেন আগুনের গোলা ছুঁড়ে মারলে। আমি ছিটকে গেলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে, লাফ মেরে পালাতে গিয়ে ভীষণ জোরে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলুম। পড়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠেছি। আবার গুলির শব্দ

গুড়ুম

আমাকেই তাক করে মেরেছে। এবার তাক ফস্কে গেল। লাগেনি। লাগলো গিয়ে গাছের গায়ে। সেই তক্কে ওখান থেকে আর একটা লাফ মেরে আমি ছুট দিলুম। অন্ধকার রাত্তির তাই রক্ষে!

ছুটতে ছুটতে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো এখনকার মত আমি বেঁচে আছি। কিন্তু পরে কী হবে, জানি না। কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে আমার পিঠে। বুঝতে পারছি, গুলিটা পিঠেই এসে লেগেছে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে পিঠ দিয়ে। গুলি আমার পিঠে লাগলো বলে, আমি এখনও ছুটতে পারছি। কিন্তু গুলি ঠাকমার বুকে বিঁধলো, তাই ঠাকমা আর উঠতে পারলো না। ছিঃ! ছিঃ! শেষ বয়েসে ঠাকমাকেও মানুষের হাতে মরতে হলো!

আমার এতো ভয় করছে! মনে হলো আর একটু পরে আমিও হয়তো মরে যাব! আমি আর ছুটতে পারছি না। আমার দেহটা কী রকম টলমল করছে। একটু দাঁড়ানো যায় না? দাঁড়ালেই যদি আবার গুলি করে দেয়! না তাই টলতে টলতেও আমি ছুটতে লাগলুম।

মনে হলো অনেকটা পথ বন ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছি। এবার বোধ হয় দাঁড়ানো যায়। সামনে একটা খাবলা-কাটা খাদ। তার ভেতরে ঝটপট লুকিয়ে পড়লুম। জায়গাটা বেশ ঘুপচি। এখানে লুকিয়ে থাকলে আমায় নিশ্চয়ই কেউ খুঁজে পাবে না। যদিও মনে হচ্ছিল অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু কতটা যে পথ এসেছি, সেটা ভেবে বার করার মত বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। কারণ, উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম কোনদিকের পথ ধরে এ কোথায় এলুম, এই অন্ধকার রাতে তা ঠাওর করার অবস্থা আমার তখন নয়। পিঠের অসহ্য যন্ত্রণায় সারা শরীরটা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কী ভীষণ জ্বালা। আমি ওই খাদটার মধ্যে লুটিয়ে পড়লুম। তারপর কখনও চিৎ হয়ে, কখনও উপুড় হয়ে খাদের মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে কাতরাতে লাগলুম।

কতক্ষণ এমনি করেছি আমার মনে নেই। মনে নেই যন্ত্রণাটা আমার বাড়ছিল না কমছিল। কিন্তু আমি হঠাৎ শুনতে পেলুম, একটা যেন কিসের শব্দ, এই নির্জন বনে টুং টুং করতে করতে আমার কানে এসে বাজছে! আমি চমকে উঠলুম। আমি এতদিন বন-জঙ্গলে বাস করছি, এ-রকম অদ্ভুত শব্দ আমি আর কোনদিন শুনিনি। কেমন যেন ভালো লাগছিল। ঠিক এই সময়ে আমি

বুঝতে পারছিলুম না, এই পিঠের যন্ত্রণাটা আমায় বেশি জ্বালা দিচ্ছে, না ওই শব্দটা আমার মনকে বেশি খুশি করে তুলছে।

আমি গড়াগড়ি খেতে খেতে উঠে বসলুম। কান দুটো খাড়া করে শুনতে লাগলুম। সেই অন্ধকার বনের গাছ পাতার ফাঁক দিয়ে, ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সেই টুং টুং শব্দটা ভেসে ভেসে আমার কানে এসে বেজে উঠছে। হঠাৎ যন্ত্রণাটা এত কম বলে মনে হচ্ছে! আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এতক্ষণ যে যন্ত্রণার জ্বালায় আমি ছটফটিয়ে মরছিলুম, সেটা যে হঠাৎ এমন চট করে কমে যাবে, এতো ভাবাই যায় না। পিঠের রক্তটা পেট দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে। আমি চেটে-চুটে পরিষ্কার করে ফেলছি। রক্তটাও এখন অনেকটা কম। একটু আগেও আমার মনে হয়েছিল, আমি বাঁচব না। এখন যেন সে ভয়টাও আমার কেটে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে বন্দুকের গুলি আমার পিঠে ঢোকেনি। শুধু পিঠের ওপর ঠোক্কর মেরেছে। পিঠ ছুঁয়ে বাইরে ফস্কে উড়ে গেছে। তাহলে হয়তো এখন আমি সত্যিই মরছি না।

আমি মরতুম, নিশ্চয়ই মরতুম, যদি ঠাকমা না থাকতো! বুড়ি ঠাকমা আমাকে বাঁচাতে এসে নিজেই নিজের প্রাণ দিলে। সেই গাবদা-গাবুস ভাল্লুকটার যে কী হলো, তা দেখার আর সুযোগ হলো না। সেটাও হয়তো অক্কা পেয়েছে।

একদিন ঠাকমা বলেছিল, "আমি তো বুড়ি হয়েছি। আমার দাম কি বল?" কিন্তু সে-কথাটা যে কতো মিথ্যে, ঠাকমা আমায় বাঁচাতে এসে সেটাই প্রমাণ করে গেল। আজ আমি স্পষ্ট বুঝেছি, ছোট থাকো কিম্বা বুড়ো হও, যতদিন বেঁচে থাকবে, জীবনের দাম ততদিনই সমান থাকবে।

শেষ অবধি যে কী হলো ঠাকমার কে জানে! ওখানেই ছিটকে পড়ে রইলো, না মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে গেল নিজেদের আস্তানায়! ঠাকমার ছালটা গা থেকে খুলে নিয়ে হয়তো নিজেদের ঘর সাজিয়ে রাখবে। কী নিষ্ঠুর! আজই প্রথম, আমার জ্ঞানে আমি ঠাকমার কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলুম। চিরদিনের মত। আর আমি ঠাকমাকে কোনদিনই দেখতে পাবো না।

সত্যিই, এদিকটা আমার একেবারে অচেনা। এদিকে কোনদিন এসেছি বলে আমার মনেই হচ্ছে না। আমি বাঘ। এ-রকম একটা বেপট জায়গায় কতক্ষণ লুকিয়ে থাকা যায়! কেউ না কেউ দেখে ফেলতে পারে। তখন আবার আর এক ঝামেলা। এক বিপদ থেকে আর এক বিপদ! সুতরাং যা হোক করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে হবে। কিন্তু এখনই যদি তুমি আমার মুখখানা দেখতে পেতে, তাহলে তোমার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হতো না, ঘর যে আমার কোনদিকে তা আমি একদম ভুলে গেছি। ভুলে গেছি ঠিক, তবু আমায় খুঁজে বার করতে তো হবে!

ঘরে ফিরলেও ঘরের ছেলেকে ছেলে বলে ডাকবার আর কেউ নেই। এখন আমি একা। সঙ্গীহীন। কী ভাগ্য আমাদের দেখো, একটা বংশের সকলে মানুষের কবলে পড়ে কেমন শেষ হয়ে গেল। এখন মনে হয়, ওই বন্দুক নামে গুলি ভর্তি যন্ত্রটা যে বার করেছিল সে যতই বুদ্ধিমান হোক, তাকে আমি কোনদিন ভালোবাসতে পারবো না। আমার ভাগ্যেই বা কী আছে, কে জানে!

আঃ! ওই শব্দটা ভারি সুন্দর! একটানা এখনও কেমন বেজে চলেছে। কিন্তু শব্দটা কিসের আর কোথা থেকেই বা আসছে, এখান থেকে আমি বুঝতেই পারছি না। কেমন যেন মন চাইছে শব্দটার কাছে চলে যেতে। কিন্তু আবার যদি কোন বিপদ হয়!

আমি উঠে দাঁড়ালুম। গুটি গুটি পা-পা এগিয়েই চললুম। খুব সাবধানে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলুম। তবু রক্ষে, জঙ্গলটা এখানেও এতটুকু হালকা নয়। সুতরাং লুকিয়ে-ছাপিয়ে চলতে ফিরতে খুব অসুবিধে নেই। আমি ওই শব্দটার দিকে কান স্থির রেখে এগিয়ে চললুম। ঝরে পড়া শুকনো শুকনো পাতার ওপর মাঝে মাঝে আমার পা যখন পড়ছে, তখনই কেমন খসখসানি আওয়াজটা আমায় থমকে দিচ্ছে। থামছি, আবার আলতো পায়ের ডিঙি মেরে এগিয়ে চলছি। এখন মনে হচ্ছে ঠিক পথেই হাঁটছি। কেননা, শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে আমার কানে ভেসে আসছে। আরও কাছে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আর ক পা হাঁটলেই নাগাল পেয়ে যাবো।

সত্যিই নাগাল পেয়ে গেলুম। দৃশ্যটা দেখে আমি চমকে গেছি। হতভম্বের মত থমকে দাঁড়িয়ে দেখি, ওই অন্ধকারে, ঘন-জঙ্গলের একটা গাছের গোড়ায় চুপটি করে বসে বসে একটা ছোট্ট ছেলে হাত দিয়ে কী যেন বাজাচ্ছে! আর সেই বাজনাটা দিয়ে ওই মিষ্টি শব্দটা বেরিয়ে আসছে। আমি অবশ্য পরে জেনেছিলুম, ওই বাজনাটার নাম বেহালা। একটা মানুষকে এই সব-প্রথম চাক্ষুষ দেখে, আশ্চর্য, আমার কিন্তু মনে হলো না, ওর টুঁটিটা টিপে ওর কম্ম শেষ করে দি! তার বদলে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম আর থ হয়ে বেহালার সুর শুনতে লাগলুম! কিন্তু কে এই ছেলেটি একা, এই জঙ্গলে? আর একটু এগিয়ে যাই, এ আমার সাহস হলো না। কারণ, আমায় দেখতে পেয়ে ভয়েময়ে ছেলেটি যদি পালায়! তাহলে আমি তো আর ওই বাজনাটা শুনতে পাবো না। তাই এখানেই হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লুম। আর তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম।

তারপরেও অনেকক্ষণ বাজনা বাজলো। অনেকক্ষণ ধরে আমি শুনলুম। ঠিক এই সময়ে কেন জানি আমার হঠাৎ মনে হলো, আমিও যদি বাজাতে পারতুম! কিন্তু এমন চিন্তা আমার মগজে আসাই মিছে। বাঘ কখনও বাজনা বাজাতে পারে?

বাজাতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে বাঘ যে এমন মোহিত হয়ে যেতে পারে, তা জানা ছিল না। সত্যি, আমার তখন মনে হচ্ছিল, দিনের পর দিন যদি ওটা বেজে যায়, তাহলে দিনের পর দিন আমি চুপটি করে বসে বসে ওর সুর কান পেতে শুনে যাব!

মাঝে মাঝে গাছের ডালে এক-একটা পাখি হঠাৎ মিষ্টি সুরে ডেকে ওঠে। কিন্তু সে-ডাক আমায় এমন অবাক করে দেয় না। কারণ, ওরা তো ডাকেই। ডাকবেও। পাখির ডাক আমার কাছে কিছু নতুন বলে মনে হয় না। জন্ম থেকেই ওদের ডাক শুনে আসছি। আমার এতদিন জানা ছিল মানুষ খালি বন্দুক উঁচিয়ে আমাদের মারবার জন্যে গুলি চালায়। কিন্তু তারা যে এমন বাজনা বাজাতে পারে, সে-কথা তো আমায় কেউ বলে দেয়নি। আশ্চর্য, যে-হাত দিয়ে মানুষ ভয়ংকর অস্ত্র চালায় সে-হাত দিয়েই আবার এমন সুর বেরোয়!

হঠাৎ চমকে উঠলুম। যে-শব্দটা এতক্ষণ একটানা বেজে যাচ্ছিল, সেটা আচমকা থেমে গেছে! কী রকম নিশ্চুপ হয়ে গেল চারিদিক। জমাট থমথমে। আমার চোখটাও থতমত খেয়ে সেই ছেলেটির দিকে তাকালো। দেখলুম, উঠে দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। পাছে আমায় দেখতে পায়, আমিও তাই চট করে আরও একটু আড়ালে সরে গেলুম। কান দুটোকে সজাগ রেখে, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম।

হঠাৎ ঠং করে কী যেন বেজে উঠলো। এতো বাজনার শব্দ নয়! দেখলুম ছেলেটি হাঁটছে। আবার বাজলো ঠং। তারপর ঠং ঠং। দেখছি যতবারই পা পড়ছে ততবারই ঠং ঠং করে শব্দ বেজে উঠছে। আমার দৃষ্টি যতটা স্পষ্ট করা যায়, সে-চেষ্টার কসুর করলুম না। আমি দেখতে পেলুম, এতক্ষণ যেটা সে বাজাচ্ছিল, সেটা হাতে নিয়ে পা দুটো টেনে টেনে সে হাঁটছে। তার পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, পা দুটো বাঁধা। হাঁটতে পারছে না। তবু হাঁটছে। আর পায়ের বাঁধার শব্দটা ঠং ঠং করে বাজছে।

অমনি কষ্ট করেই খানিকটা এলো সে। আমিও এক-পা

এক-পা করে এগিয়ে এসেছি। এই জায়গাটায় দাঁড়ালো সে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখানটায় একটা উঁচু মতো ঢিপি। সেই ঢিপিটার সামনে নুয়ে পড়ে মাথা ঠেকালো। তারপর নরম গলায় ফিসফিস করে বললে, "মা, তুমি ঘুমিয়েছ মা? আর যে আমি পারছি না মা। আমার যে হাত ব্যথা করছে!" বলতে বলতে ছেলেটি ডুকরে ডুকরে কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে সেই জায়গাটার গা-ঘেঁসে, বাজনাটা মাথার কাছে রেখে, নিজেও শুয়ে পড়লো।

আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, ওখানে কোথায় ওর মা! আর থাকলেও অন্তত একবারও তো আমি দেখতে পেতুম। আমি উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। ভাবলুম, শুয়ে থাকলে যদি ওর মা আসে! আমার ঠাকমাও তো কতদিন আমার ঘুম পেলে আমায় আদর করতো! আর ওর মা করবে না?

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলুম। কিন্তু ওর মায়ের দেখা পেলুম না। না, ওর মা এলো না। দেখলুম ছেলেটার চোখ দুটি বুজে গেছে। হাত দুটি কেমন নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়লো।

এখন কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, শুধু একটিবারের জন্যে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যদি আমি বাঘ না হয়ে মানুষ হতে পারতুম, তাহলে কী ভালোই না হতো! তাহলে আমি সাহস করে ওর সামনে যেতে পারতুম। ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে পারতুম। চাই কি, ওর মতো আমিও বাজনা বাজিয়ে ওকে খুশি করতুম। তাতো হবার নয়। বাঘ মানুষ হতে পারে না। বাঘ সে বাঘই। কিন্তু বলিহারি যাই মাকে! এতো করে ডাকলো ছেলেটি, কাঁদলো, তবু সাড়া দিলো না।

আমি বুঝতে পারছি না, ওর পা দুটো এমন করে বাঁধা কেন! ও হাঁটছিল আর ঠং ঠং করে বাজছিল, ওটা কী দিয়ে বাঁধা! ঠাকমা বলেছিল, লোহার খাঁচায় শেকল বেঁধে বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে মানুষ। তবে কী লোহার শেকল দিয়েই কেউ ওর পা দুটি বেঁধে দিয়েছে! একটি ছোট্ট ছেলে কী এমন দোষ করেছে যে, তার এই দুর্দশা! আমার মন কেমন-কেমন করছে! মনে হলো, এক্ষুনি গিয়ে আমার থাবা দিয়ে ওই শেকলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি!

কিন্তু এখনই ওর সামনে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ, যতই হোক আমি বাঘ। আমায় দেখলে ভীষণ ভয় পেয়ে যেতে পারে। আর যাই হোক, অমন একটি ছোট্ট ছেলেকে আমি ভয় দেখাতে নারাজ। তাই এখানে চুপটি করে বসেই রইলুম।

এর মধ্যে যে কী একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেছে, তা তোমাদের বলাই হয়নি। ছেলেটিকে দেখে ভুলেই গেছলুম। শুনলে খুশি হবে কিনা জানিনা, বন্দুকের গুলি-লাগা আমার পিঠের জ্বালা এখন একদম থেমে গেছে। আর একটুসও রক্ত গড়াচ্ছে না। কী মজার ভেল্কিবাজি! আনন্দে চার ঠ্যাং ছুড়ে বন-বন করে ঘুরপাক খেতে ইচ্ছে করছে। থাক বাবা! ঘুরপাক খেতে গিয়ে শেষে ঘোর-পাকে পড়লে, তখন আর দেখবার কেউ থাকবে না।

ছেলেটি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, এই সুযোগে ওর কাছে একবার যাই। ওর মুখখানি একটু ভালো করে চোখ মেলে দেখি। অন্তত ওর মায়ের মুখখানাও তো একবার দেখতে পারি! একি মা বাবা, ছেলে ডাকলে সাড়া দেয় না!

আমি চারপাশটা খুব ভালো করে দেখে নিলুম। তারপর সত্যি-সত্যিই পা টিপে টিপে চোরের মতো এগিয়ে গেলুম। হুট করে সামনে হাজির হওয়াটা ঠিক না। ওর মা দেখে ফেলতে পারে! কিম্বা ছেলেটিরও ঘুম ভেঙে যেতে পারে! পেছনদিক দিয়ে গিয়ে, চুপি চুপি ওর মাথার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালুম। ওর মাকে উঁকি মেরে খুঁজতে লাগলুম। আশ্চর্য! কই ওর মা? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! যখন থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছি, সেই তখন থেকে একটিবারের জন্যেও আমি চোখ ফেরাইনি। তাই যদি হয়, তবে ওর মা আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়? আমার চোখকে ঠকানো কী এতই সোজা! তাই খুব সাবধানেই আঁতিপাতি চোখ ফিরিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারলুম। ফোক্কা! তখন একটু সাহস করে ঘুমন্ত ছেলেটির মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একদম কাছে, এত কাছ থেকে একটা মানুষের চেহারা এই সব-প্রথম আমি চোখ মেলে দেখছি। ছেলেটি যেন বড্ড ক্লান্ত। শত ছিন্ন একটা কাপড় পরে আছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো রুক্ষ। আর পায়ের লোহার শেকলটা ওর পায়ের তুলনায় অ-নে-ক—অনেক বড়। ছেলেটির বয়স আমি বলতে পারবো না। আমার নিজেরই বয়েস আমি জানি না। কিন্তু এটা বুঝতে কষ্ট হলো না, ছেলেটির যত বয়েস তার চেয়ে আমি অনেক বড়। ছেলেটির গড়ন দেখে আমার বেশ মনে হলো, এক সময়ে ছেলেটির স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। তুমি হয়তো জিগ্যেস করতে পার, "সুন্দর স্বাস্থ্য বলতে তুমি কী বোঝ হে ছোকরা?" উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি, তা জানি না। জানি শুধু ছেলেটিকে আমার ভালো লাগছে!

হঠাৎ ওর মাথার দিকে ওই বাজনাটার ওপর আমার নজর পড়লো। আমি আর একটু কাছে এগিয়ে গেলুম। ভালো করে এবার বাজনাটাই দেখতে লাগলুম। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, এই অন্ধকার রাত্তিরে হঠাৎ আমার মাথায় একটা আজগুবী চিন্তা গজিয়ে উঠেছে। আমার মন বলছে, আমিও তো বাজনাটা বাজাতে পারি! শুনে তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমার মতো গো-মুখখু এ-জগতে দুটি নেই। বাঘ আবার বাজনা বাজাবে, কী! আমি গো-মুখখু কী অন্য কিছু এ-সব ভাববার তখন আমার সময়ই হয়নি! তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, বাজালে কেমন হয়! হয়তো ভালোই হয়, কিন্তু বাজাবো কেমন করে!

মুশকিল আমার হাজারটা। প্রথমতো ছেলেটির মতো ওই বাজনাটা আমি ধরতেই পারব না। আমার তো থাবা। তারপর যদিও ধরা যায়, বাজাবো কী ঠ্যাং দিয়ে?

যা কপালে আছে! লাগে তাক, না লাগে তুক! আমি মুখ দিয়েই বাজনাটা তুলে নিলুম ঝট করে। ছুটে, একটু দূরে, একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম! এইরে যা! সেই যে লম্বা ছড়িটা, যেটা দিয়ে টেনে টেনে বাজাচ্ছিল, সেটা যে আনতে ভুলে গেলুম! যাকগে, থাবার নোখ দিয়েই বাজাই। দেখা যাক না!

সত্যিই, নোখগুলো বাজনার ওই তারের ওপর বুলিয়ে দিতেই বেজে উঠলো, টুং-টুং-টুং! বুকের ভেতরটা কেমন শিউরে উঠলো। ওঃ! আমি বাজাতে পেরেছি! আর একবার দেখি! আবার বেজেছে, টুং-টুং-টুং! কী মজার কান্ড! তবে তো দেখছি ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়! শক্ত নিশ্চয়ই। কেননা, ওই ছেলেটি যেভাবে বাজাচ্ছিল, আমি তা পারছি কই? ওর হাতে কেমন একটা টানা-টানা সুর বেজে বেজে কেঁপে উঠছিল। আর আমি বাজাচ্ছি, কাটা কাটা টুং-টুং-টুং! বেজেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে না। তবু কিন্তু বাজাতে ভালো লাগছে। আমি বাজাতেই লাগলুম। একফাঁকে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলুম ওদিকটা। না, না, ছেলেটি এখনও ঘুমুচ্ছে। তবে খুবসে বাজাই! ট্যাং-ট্যাং, টুং-টুং!

আমি একটা আস্ত গাধা। দেখো, একটু সাবধান তো হওয়া উচিত। তা নয় একেবারে জ্ঞান হারিয়ে বাজনা বাজাচ্ছি! একবার মনেও হলো না, ছেলেটির ঘুম ভেঙে যেতে পারে!

পারে মানে কী! ঘুম তো ভেঙেই গেছে। ওর পায়ে-বাঁধা শেকলটার ঠং ঠং আওয়াজ হঠাৎ শুনতে পেয়েছি আমি! ঝট করে বাজনা থামিয়ে উঁকি মেরে দেখি, সত্যিই তো ছেলেটি

এদিকেই আসছে। আর থাকে এখানে! বাজনা-টাজনা ফেলে রেখেই, দে চম্পট। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে, আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢ্বকে পড়েছি। জঙ্গল বলে রক্ষে। এদিক ওদিক ঝোপের মধ্যে ল্বকিয়ে পড়া খ্বব সোজা। ল্বকিয়ে ল্বকিয়ে ঝোপের ভেতর থেকে একে ওকে দেখাও খ্বব সোজা। আমিও ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল্বম, আমি যেখানে বাজনাটা ফেলে এসেছি, ছেলেটি ওই পায়ের শেকল টেনে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাজনাটা হাতে তুলে নিলো। তুলে নিয়ে কেমন ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো। আমি নিশ্চিত জানি, ওর পায়ে যদি ওই ভারী শেকলটা বাঁধা না-থাকতো, তবে ও এ-ঝোপ ও-ঝোপ ছ্বটে ছ্বটে ঠিক আমায় খ্বঁজে বার করতো। এখ্বনই আমি যদি ওর নজরে পড়ে যাই, তাহলে কী কান্ডটা হয় বলো? হয় এক্ষ্বনি আমায় ডাক ছেড়ে পালাতে হবে আর তা না হলে ওর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, ওকে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে ফেলতে হবে!

আমার ভাগ্যটা খ্বব ভালো। দ্বটোর কোনটাই করতে হলো না। আমায় দেখতে পেলো না ছেলেটি। দেখতে না-পেয়ে, বাজনাটা হাতে নিয়ে আবার পায়ের শেকল টানতে টানতে হাঁটা দিলে। ওকে ওভাবে হাঁটতে দেখে, সত্যি বলছি, আমার নিজের ওপর এমন রাগ হলো! মনে হলো, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ; আমার জন্যেই তো ওর ঘ্বম ভেঙে গেল। আমার জন্যেই এমন কষ্ট করে মোটা শেকলটা টানতে টানতে এখানে উঠে আসতে হলো!

আবার সেই নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো ছেলেটি। বসে, তেমনিভাবেই অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো এইদিকেই। আমি কিন্তু গ্বড়গ্বটি মেরে ঠাই বসে। না নড়ছি, না ট্ব শব্দ করছি। কোন কিছ্বর সাড়া-শব্দ না-পেয়ে কী আর করে ছেলেটি, আবার শ্বয়ে পড়লো। হয়তো আবার ঘ্বমিয়ে পড়লো।

এক্ষ্বনি এখান থেকে বের্বনো একদম ব্বদ্ধিমানের কাজ নয়! কারণ, ওর চোখে এখনও যদি ঘ্বম না এসে থাকে! তাই আরও কিছ্বক্ষণ চ্বপচাপ ঝোপের মধ্যে অমনি করেই বসে রইল্বম।

এখন মনে হচ্ছে, না, ছেলেটি সত্যিই ঘ্বমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আবার বেরিয়ে এসেছি। আবার থমকে থমকে হেঁটেছি ওর দিকে। এবার ঝোপের আড়াল দিয়ে গা ঘেঁসিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল্বম। এবার আর বাজনাটার দিকে নজর না, ওর পায়ের দিকে নজর গেল। ওই ছোট্ট পা দ্বটিকে কে যে এমন করে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছে! তার কোন দয়া মায়া নেই! দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছে, যে ওর পা দ্বটি বেঁধে দিয়েছে, সে হয়তো চেয়েছে, ওই পা চির-দিনের মতো থেমে যাক। ও যেন আর ছ্বটতে না পারে! এই বন পেরিয়ে হাঁটতে না পারে! থাক বন্দী হয়ে এই গভীর জঙ্গলে!

আমি ভালো করে দেখবো বলে, আর একট্ব এগিয়ে গিয়েছিল্বম। দেখবো, শেকলটা খোলা যায় কিনা! কিন্তু হঠাৎ এমন আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠেছে ছেলেটি, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেছি! এত চালাক, আমায় ধরবে বলে, ঘ্বমের ভান করে চ্বপ মেরে শ্বয়েছিল! উঃ, আমায় ধরা তো অত সহজ নয়! আমিও মেরেছি এক ডিগবাজি। তাই দেখে ছেলেটি আরও জোরে হেসে উঠলো। বললে, "কোন দেশের বাঘ বাবা, আমায় খেতে এসে পালালো!"

আমার ম্বখ দিয়ে আর কথা সরে? ঝোপের আড়ালে জ্বজ্বব্বড়িটির মতো নিঃঝ্বম মেরে বসে রইল্বম। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। বললে, "পালাবে কোথায়! এক্ষ্বনি ধরছি!"

আমি তো জানি, ও ধরতে পারবে না। তাহলেও কিন্তু এবার আমার উঁকি-ঝ্বঁকি মারতে সাহস হলো না। কেননা, একটা জ্যান্ত মান্বষকে সামনে পেয়েও, আমি ভীতুর মতো পালাল্বম! আর কেউ শ্বনলে ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, করবে না!

ছেলেটি কী সাবধানী দেখো! দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেল্বম! এবার যে সে হেঁটে হেঁটে এদিকেই আসছে, তা আমি ব্বঝতেই পারিনি! কারণ, এমন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে হেঁটেছে যে, তার পায়ের ওই শেকলটার ঠং ঠং শব্দটি পর্যন্ত আমার কানে ঢোকেনি। আমার পেছনদিক দিয়েই এসেছিল সে। আর আমি হাঁদার মতো সামনে ম্বখ উঁচিয়ে বসে আছি। ছেলেটি করেছে কী, পেছনদিক দিয়ে এসে আমাকে আচমকা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, "এই ধরেছি!"

আমি যে তখন কী সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছল্বম, তা এখন ম্বখে বলা আমার কম্ম নয়। ভয় পেয়ে ছেলেটিকে এক ঝটকা দিয়ে আমি মারল্বম লাফ। ছেলেটি ম্বখ থ্ববড়ে আছাড় খেলো। আর আমি সিধে লম্বা!

সত্যি বলছি, আমি ভয় পেয়েছি এই কথাটা ভাবতে এতো লজ্জা করছে! বাঘের ম্বখে ভয়ের কথা শোভা পায়? কী বদনাম! না, না, চম্পট দিয়ে ভেগে পড়াটা একদম উচিত না। একটা মান্বষের বাচ্চা-ছেলের কাছে আমি হেরে যাবো! কক্ষনো না। আমি হার মানি না, মানবো না। আমি ছেলেটাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেব। আমাকে কী ঠাউরেছে! ল্যাজ নাড়া কুত্তা!

আমি যেমন তীরের মতো লম্বা দিয়েছিল্বম, ঠিক তেমনি তীরের বেগে ফিরেও এল্বম। কিন্তু বললে হাসবে হয়তো, শিক্ষা দেওয়া দ্বরে থাক ওর তখনকার সেই অবস্থা দেখে আমি সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছি! দেখি, ছেলেটা আমার ঝটকা খেয়ে ম্বখ থ্ববড়ে পড়ে আছে। উঠতে পারছে না। পায়ের শেকলটা একটা আগাছার সঙ্গে প্যাঁচ লেগে জড়িয়ে গেছে। ভীষণ কষ্ট করে টানাটানি করছে। কিন্তু ওর কী সাধ্য ওটা খ্বলতে পারে!

আমি সামনে এসে দাঁড়াতে, অত কষ্টেও ছেলেটি ম্বখখানা হাসি হাসি করে বললে, "আমায় ফেলে দিয়ে পালালি বলে দেখ, আমার কী হলো!"

আমি ভাবল্বম, ও নিজেই আর যদি বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করে, তবে পা কাটবে, রক্ত পড়বে। ওর ওই হাল দেখে আমার পায়ের থাবা চারটে নিশপিশ করে উঠলো। আমার মনে হলো, এখনই এই থাবা দিয়ে ওর পায়ের শেকলটা দ্বমড়ে ম্বচড়ে খান খান করে ফেলি। আমার দাঁতগ্বলো কড়মড় করে উঠলো। চটপট শক্ত শেকলের আংটাটা দাঁতে চেপে ধরেছি। চেপে থাবা দিয়ে যেই চাপ দিয়েছি, "খটাং!" খালি একটি আওয়াজ। তারপর ট্বকরো হয়ে শেকলটা ছিটকে পড়লো। এতো একটা পায়ের আংটা। আর একটা? একটা যখন ভেঙেছে আর একটা কী থাকে? সেটাকেও নিমেষে চ্বরমার করে দিল্বম!

ওঃ! যাক এতক্ষণে ঠিকঠিক কাজে লাগাতে পেরেছি আমার গায়ের জোরটাকে। ছেলেটিও অবাক হয়ে এতক্ষণ আমার দিকেই চেয়েছিল। এবার খ্বশিতে তার ম্বখখানি উছলে উঠলো। আমাকে দ্বহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো সে। চিৎকার করে উঠলো। তারপর ছ্বটে পালালো। ছ্বটতে ছ্বটতে মায়ের কাছে চলে গেল। বললে, "মা, দেখো, দেখো, বাঘ আমার পায়ের শেকল ভেঙে দিয়েছে মা। মা, দেখো, এখন আমি ছ্বটতে পারছি। মা, দেখো, আমি লাফাচ্ছি।"

কিন্তু এবারও আমি ওর মাকে দেখতে পেল্বম না। দেখল্বম, ছেলেটি কেঁদে ফেলেছে। হয়তো আনন্দে কিম্বা খ্বশিতে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "মা, তোমাকে যারা মেরেছে তাদের আমি কিছ্বতেই ক্ষমা করবো না মা, কিছ্বতেই না। মা, এবার আমি বাবাকে ম্বক্ত করে আনবো। বলো না পারবো না?"

আমি তখনও দ্বরে দাঁড়িয়েছিল্বম। দ্বর থেকেই কথাগ্বলো আমার কানে এলো। কী রকম গোলমাল হয়ে গেল আমার মাথাটা। আমি কিছ্ব বোঝবার আগেই, অবাক হয়ে ও নিজের মনেই আবার বলে উঠলো, "আমার গায়ে রক্ত কোথা থেকে লাগলো!"

হঠাৎ আমি নিজের গায়ের দিকে চেয়ে দেখি, আমার গায়েও রক্ত! গুলির আঘাত লেগে যেখানটা আমার কেটে গেছে, সেখান দিয়ে আবার রক্ত পড়ছে। থেমে গেছলো। কিন্তু লাফা-লাফি করতে গিয়ে বোধ হয় আবার লেগে গেছে! মনে হচ্ছে, আমার গায়ের রক্ত ওই ছেলেটির গায়ে লেগেছে! ও আমায় যখন জড়িয়ে ধরেছিল, বোধ হয় তখন।

ছেলেটি ছুটে আমার কাছেই এলো। এবার আমি কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ও আমার পিঠে হাত দিলো। আমার পিঠে গুলির আঘাত দেখে আঁৎকে উঠলো। তারপর নিজের ছোট্ট হাত দিয়ে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলে, "কে তোকে গুলি মেরেছে রে? আহা!"

আমি এখন বলতে পারবো না, তখন আমার কী ভালো লেগেছিল! আমি বাঘ, নইলে আমি হয়তো কেঁদে ফেলতুম! কাঁদবো কী, তখন তো আমি একদম বোবা! বোকার মতো জুলজুল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বলতে লজ্জা কিনা জানি না, তখন আমি নিজেই নিজেকে বাঘ বলে মনে করতে পারছিলুম না। আমার যেন মনে হচ্ছিল, এই ঘুপ-চুপ নির্জন বনে এখন এই ছেলেটি আমার একান্ত বন্ধু। কিম্বা বলা যায়, আমি ওর আপনজন।

ঠিক এখনই আমি মনে করতে পারছি না, ছেলেটি কতক্ষণ আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। মনে করতে পারছি না, কী কথা তখন সে আমায় আদর করে বলেছিল। আমি সত্যিই বেবাক হয়ে গিয়েছিলুম। মনে মনে ভেবেছিলুম এ-ও হয়? মানুষ আমাকে মারবে বলে আমাকে তাক করে বন্দুক মেরেছিল। আবার সেই মানুষ আমার পিঠের রক্ত মুছিয়ে দিতে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছে!

ছেলেটি **বললে** "বোধ হয় ভেবেছিলি, আমি বাঘ দেখে ভয় পাবো? হুঁ! আমার আবার ভয় **কিসের**! আমাকে তো ওরা বাঘের পেটে দেবে বলেই, আমার পায়ে শেকল বেঁধে এই বনে ফেলে দিয়ে গেছে।"

আমি ওর কথা শুনলুম, কিন্তু কিছু বলতে পারলুম না।

ছেলেটি আবার বললে, "আমি কতদিন ধরে বনে বনে ঘুরছি, কেউ তো আমায় খেয়ে ফেললো না। তুই-ও এলি, অথচ আমায় মারলি না। আমার বেহালা নিয়ে বাজাতে সুরু করলি। কোন দেশের বাঘরে তুই? কী রকম বাঘ?"

আমি তো এ এক আচ্ছা লজ্জায় পড়লুম। বলতে পার, ছেলেটি আমায় ওই কথা বলে ভীষণ ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছে। সত্যিই তো! বাঘ কোথায় বনে বনে হাঁক ছেড়ে ঘুরে বেড়াবে,

তা নয় বেহালা নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে! কে শুনেছে বাবা এমন কথা! কিন্তু পালাবো যে, তাওতো পারছি না। লজ্জা নেই, বলতে, এখন আমি ওই ছোট্ট ছেলেটিকে ছেড়ে পালাবার কথা ভাবতেই পারছি না। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভীষণ সাহসী। আমাকে একটুও ভয় পেলো না! যাই বলো, তাই বলো, বীরের মতো মাথা উঁচিয়ে যে সাহস দেখায়, তাকে কার না ভালো লাগে? আমার মতো বাঘের তো লাগবেই। কারণ, বাঘও তো বীর। তবে আমাকে হয়তো বীর বলতে তোমার মন নাও চাইতে পারে। ভাবতে পারো, বাঘ হয়ে একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে ভাব করার জন্যে যে উসখুস করে, তাকে বীর বলবে না আর কিছু। তুমি যাই ভাবো, আমার কিন্তু ছেলেটিকে বড্ড ভালো লেগেছে।

রক্ত থেমে গেছে । ছেলেটি আমায় ছেড়ে আবার ছুটে গেল। ছুটে গেল ওর মায়ের কাছে। বললে, "যাই, মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে! আমি বাজনা না বাজালে মায়ের ঘুম আসবে না।"

ছোট্ট ঢিপিটার কাছে বসে বসে সে আবার বাজনায় সুর বাজালে। মিষ্টি সেই শব্দটা আবার নির্জন বনে ভেসে ভেসে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাবছি, ও আমাকেও যদি ওইটা বাজাতে শিখিয়ে দেয়! ইচ্ছে আমার ষোল আনা! কিন্তু ক্ষমতা তো আর নেই! ক্ষমতা থাকলেই বা কী! আমি তো কথাই বলতে পারি না। ওকে কেমন করে বোঝাবো, আমি বাজনা শিখতে চাই।

কখন অজানতে আবার ছেলেটির কাছেই আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি! আমাকে দেখতে পেয়ে ও থামলো। আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বললে, "চুপ, কথা বলিস না। মা ঘুমুচ্ছে, এইখানে, এই মাটির নিচে।"

আমি চোখ ফিরিয়ে দেখলুম। ভাবলুম, "বাবা! মানুষ মাটির নিচে ঘুমোয় কেমন করে?" সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কী রকম একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছে। সবটার মধ্যে কী যেন গোলমেলে গন্ধ! আমি ওই ঢিবিটার দিকে আবার তাকালুম। কিছুই হদিশ করা গেল না।

ছেলেটিই বললে, "তুই দেখতে পাবি কী করে? আমি ছাড়া মাকে কেউ দেখতে পায় না। রোজ আমার মা এই মাটির নিচ থেকে উঠে এসে, আমার চিবুক ধরে আদর করে। আমার কপালে চুমু খায়। আমি "মা" বলে ডেকে উঠে, মাকে আদর করে যেই জড়িয়ে ধরি, মা হারিয়ে যায়!" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়লো ছেলেটি। আমি অন্ধকারেও লক্ষ্য করলুম, তার চোখ দুটি ছলছল করছে। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তারপর ঠোঁট দুটি ওর কেঁপে উঠলো। আমার চোখের দিকে কী রকম অসহায়ের মতো তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললে, "ওরা আমার মাকে মেরে এইখানে শুইয়ে রেখে গেছে। যে মেরেছে সে একটা দস্যু। একটা শয়তান। তার নাম হুড্ডা-গুড্ডা!"

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম। চারিদিক নিস্তব্ধ! নিস্তব্ধ বনের অন্ধকারে আমি দেখতে পেলুম, ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। হয়তো রাগে। না কি আর কিছু আছে ওর মনে আমি তা বুঝতে পারিনি। আমার শুধু মাথায় তখন একটা কথাই ফিরে ফিরে ঘুরে আসছে। আমি ভাবছি, হুড্ডা-গুড্ডা কী কোন জন্তু, না মানুষ! হুড্ডা-গুড্ডা বলে কোন জন্তুর নাম তো কখনও শুনিনি!

আবার ছেলেটি কথা বললে। বললে, "জানিস, আমার বাবা খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারে! আমার হাতে এই যে বেহালাটা দেখছিস, এটা বাবাই আমায় কিনে দিয়েছে। আমি বাবার কাছেই এটা বাজাতে শিখেছি! আমার বাবা কে জানিস? আর আমি? আমার বাবা রাজা। আমি রাজপুত্র!" এইটুকু বলে ছেলেটি থামলো। একটুখানি ক্লান্ত হাসি ওর ঠোঁট দুটি ছুঁয়ে মিলিয়ে গেল।

তারপর নিজেই জিগ্যেস করলে, "তুই শুনবি আমার কথা?" আমি কী বলব!

"তুই শুনেই বা কী করবি! তুই তো বাঘ! আমার কথা বুঝবি কিছু?"

আমি ঘাড় নেড়েছিলুম কিনা জানি না। কিন্তু আমার ল্যাজটা অজানতে নেড়ে ফেলেছিলুম। হয়তো তাতেই ও বুঝেছিল, আমি ওর কথা শুনতে চাই। ও তাই সুরু করেছিলঃ

"আমার বাবা এই দেশের রাজা। কিন্তু আমার বাবাকে দেখলে রাজা বলে কেউ মনেই করতে পারবে না। রাজার মস্ত প্রাসাদ, সোনার সিংহাসন, মনি-মুক্তা-সাজানো রাজমুকুট, হাতি-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত সব ছিল। কিন্তু আমার বাবার ছিল না রাজার দেমাক। তাই গরীব-বড়লোক সবার বাড়িতে বাবা ছুটে যেতো। রাজপ্রাসাদে তাদের ডেকে আনতো। আদর করে বসিয়ে তাদের নিজের হাতে বাজনা শোনাতো। চাই কি, যে শিখতে চাইতো তাকে শিখিয়ে দিতো। বাবা ছিল খুব সুখী। বাবার রাজত্বে ছিল প্রচুর আনন্দ। কোনদিন যুদ্ধ করতে হয়নি বাবাকে। কেন করতে হবে! কারুর সঙ্গে তো শত্রুতা ছিল না তার। অন্য কোন রাজ্যের একমুঠো মাটিও বাবা কোনদিন নিজের হাতে ছোঁয়নি। কিন্তু উল্টে নিজের দেশের মাটি সোনায়-সোনায় উপচে গেছলো। বেহালা বাজানো এটা তো ছিল বাবার সখ। আর তাই সখ করে বাবা আমাকেও বাজনা শেখাতো। আমি যখন শিখতুম, বাজনার তারে সুর ছড়িয়ে যখন মাথা নাড়তুম, তখন বাবা মাকে ডেকে বলতো, "রাণী, দেখো, দেখো, তোমার ছেলে তার বাপকেও হার মানাবে।" এ কথা শুনে আমার তখন ভীষণ লজ্জা করতো। কিন্তু কী আনন্দ যে লাগতো! আমার বাবা জানতেই পারেনি, আমাদের এই সুখের রাজত্বে এক শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে! কে জানতো, এখানে এক শয়তান বাসা বেঁধেছে!

"দলবল নিয়ে গভীর জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছিল এই শয়তানটা। মানুষ খুন হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে, আমাদের রাজত্বে এই কথা কেউ কোনদিন ভাবতেই পারে না। কিন্তু ঠিক তাই হলো। একদিন দেখা গেল, আমাদের এক সৈনিক বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে। রাস্তায় পড়ে আছে। আর একদিন খবর এলো, এক প্রজার বাড়ি লুঠ হয়ে গেছে। কেমন করে লুঠ হলো, আর কারাই-বা লুঠ করলো, কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, একদিন বাবার নিজের আদরের হাতি-টিকে কারা গুলি করে মেরে ফেলেছে! রাজপ্রাসাদের হাতিশালে ঢুকে, হাতিকে মারা তো সোজা কথা নয়! সবাই বুঝলো, এমন দুঃসাহসের কাজ যে করতে পারে, সে এক ভয়ংকর শয়তান!

"বাবা পড়লো ভীষণ ভাবনায়। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হলো বাবার। হাতের বাজনা থেমে গেলো। হুকুম হলো, যে এ-কাজ করছে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। তখন সুরু হয়ে গেল, সেই শয়তানকে খুঁজে বার করবার জোর তোড়জোড়। বাবা নিজেও বাজনা ছেড়ে বন্দুক ধরলো। অন্ধকার রাতে নিজের সেনাদের নিয়ে সেই শয়তানকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

"কিন্তু কদিন হয়ে গেল, কিছু কিনারাই হলো না। সেই শয়তান ধরা পড়লো না। অবাক কথা, সে যে কখন আসে, কোথা দিয়ে আসে, কেমন করে আসে, কেউ দেখতেও পায় না, বুঝতেও পারে না!

"হঠাৎ একদিন ধরা পড়লো! ধরা পড়লো বটে, কিন্তু সেই শয়তানটা নয়, তার দলের একটা লোক। এই লোকটা ছিল শয়তানটার খুব বিশ্বাসী। তাই তাকে পাঠানো হয়েছিল রাণীকে খুন করে, তার গলায় যে মরকতের মালাটি রয়েছে, সেটি হরণ করে আনতে। আমি বলছি না, শয়তানের এই লোকটা খুব বোকা ছিল। কিন্তু মা ছিল তারচেয়ে অনেক চালাক। শুনলে অবাক লাগে, লোকটা ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে-ছাপিয়ে আসেনি! রাজপ্রাসাদের ভেতর মহলের চাকর সেজে সে সুযোগ খুঁজছিল। ঘরের চাকরকে কে আর সন্দেহ করবে? তাছাড়া রাজবাড়ির

অতো দাস-দাসীর মধ্যে কে কোথায়, কোন মহলে কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, তার হিসেব রাখা তো সোজা কথা নয়! কিন্তু আমার মা রাজরাণী হলেও, ঘর-কন্নার খুঁটিনাটি কাজ সব নিজের হাতে করতো! আর সেইজন্যে মা ঝি-চাকর, দাস-দাসী, সবাইকে চিনতো! ঐ-লোকটা যে একদম অচেনা, সেটা মা তাকে এক নজরেই বুঝতে পেরেছে। তবু কিচ্ছু বলেনি। তার চলা-ফেরা, তার কাজ-কম্ম, হাবভাব সব চুপচাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

"তারপর তক্কে তক্কে এক সময় হঠাৎ মায়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। ঢুকে, পালংকের নিচে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়লো। মা কিন্তু ঠিক দেখে ফেলেছে। যেন কিছু জানে না, মা এমনি ভান করে কখনও ঘরে ঢুকছে, এটা ওটা খুঁটিনাটি নাড়ানাড়ি করছে, বেরিয়ে আসছে! এমনি করতে করতে এক সময় চট করে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দিলো মা! লোকটা ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে গেল! মায়ের সত্যি কী সাহস, কী বুদ্ধি!

"লোকটা ধরা পড়লো। প্রাণের দায়ে সব কথা ফাঁস করে দিলো। সে-ই বললো, তারা দস্যু। তাদের সর্দারের নাম হুড্ডা-গুড্ডা। তাদের আস্তানাটা সে বাংলে দেবে।

"দিলোও তাই। তার কথা মতো, একদিন রাজসেনাদের নিয়ে বাবা ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে গভীর জংগলে সেই হুড্ডা-গুড্ডার আস্তানায় হানা দিলো। একটা পাহাড়ে, অন্ধকার গুহার মধ্যে তাদের আড্ডা। আচমকা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজসেনারা। কিন্তু তখন সেই দস্যু-সর্দার হুড্ডা-গুড্ডা সেখানে কোথায়? শুধু তার সাকরেদরা গুহা পাহারা দিতে সেখানে হাজির রয়েছে। চমক দিয়ে রাজসেনার বন্দুকের গুলি গর্জে উঠলো। তারা তো হকচকিয়ে গেছে। কিছু করবার সুযোগই পেলো না। আগুনের ফুলকি ছুটে ছুটে হুড্ডা-গুড্ডার গুহার আস্তানা তছনছ করে দিলো। সব কটা লোক বন্দী হলো। গুহার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হলো, হাজার হাজার মোহর। দামী দামী হিরে-জহরৎ আরও নানান জিনিষ। সেইসব মাল-পত্তর দশটা হাতির পিঠে চাপিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হলো। তারপর ঢোল-শহরৎ করে সেই সব জিনিষ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো বাবা। লোকে রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেল।

"ধীরে ধীরে দেশের লোক হুড্ডা-গুড্ডার কথা ভুলে গেল। কেন না, তারপর থেকে দেশে আর দস্যুর অত্যাচার রইলো না। বাবা আবার বাজনা ধরলে।

"কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। সেদিনটা ছিল বাবার অভিষেকের দিন। যেদিনে বাবা প্রথম সিংহাসনে বসে প্রত্যেক বছর সেদিনটা খুব ধুমধামে উৎসব করা হয়। সারা শহরটা আলোর মালা, রঙিন পতাকা আর নানান ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সে সময়ে শহরটা দেখতে লাগে যেন রঙিন আলোর দেশ। কতো দূর দূর থেকে, কতো মানুষ এই উৎসব দেখতে আসে। কতো রাজ-রাজড়া, কতো গণ্যমান্য মানুষ, কতো কবি-গায়ক উৎসবে যোগ দেয়। তাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়। দেওয়া হয় প্রচুর উপহার। আর সবশেষে রাজদরবারে আসর বসিয়ে বাবা তাদের শোনায় নিজের হাতে বেহালার বাজনা।

"এবারেও অভিষেকের দিনে এসেছিলেন হাজার হাজার লোক। এবার আর বাবা নিজে বাজনা শোনালো না। বললে, "এবার আপনাদের বাজনা শোনাবে আমার ছেলে।"

"রাজদরবার লোকে লোকারণ্য। অতো লোক দেখে, আমার কিন্তু একটুও ভয় করেনি। আমি বেহালায় সুর ধরলুম। এখন আমি মনে করতে পারছি না, কতক্ষণ আমার বাজনায় সুর বেজেছিল। আর কতো লোক আমার বাজনা শুনছিল, কতো লোক থেকে থেকে আনন্দ আর খুশিতে বাহবা দিচ্ছিল। আমি যেমন একমনে বাজনা বাজাচ্ছি, আর সকলেও তেমনি একমনে শুনছে। কেউ তখন জানতেও পারেনি সেই দস্যু শয়তান হুড্ডা-গুড্ডা আর তার দলবলও রাজদরবারে হাজির রয়েছে। ছদ্মবেশে ওই অগুনতি লোকের মধ্যে মিশে এখুনই যে তারা এক ভীষণ কাণ্ড করবে বলে ওৎ পেতে বসে আছে সে-খেয়াল কার আছে?

"দুম-দুম! কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ রাজদরবারে অসংখ্য লোকের মধ্যে বোমা পড়লো। আগুনের ঝলকা এসে বাবার চোখে-মুখে লাগলো। আবার "দুম-দুম।" আগুনের ঝলকা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি সারা দরবারে ছড়িয়ে পড়লো। প্রথমটা হঠাৎ আচমকা এই শব্দে দরবারের প্রতিটি লোক হকচকিয়ে গেছলো। তারপর প্রচণ্ড চেঁচামেচি আর হুড়োহুড়ি! কে আগে পালাবে, সেই নিয়ে ঠেলাঠেলি আর হট্টগোল। কেউ পড়লো, কেউ মরলো, কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন কে রাজা, কে প্রজা আর কে-ই-বা গণ্যমান্য। প্রাণ বাঁচাতে সবাই কান্নাকাটি জুড়ে দিলে।

"আমার চোখ দুটোও ভীষণ জ্বালা করছে। কিন্তু হাতের বাজনা আমি ছাড়িনি। ওই ধোঁয়ার কুণ্ডুলি আমার চোখের ওপর যখন আছড়ে পড়লো, আমি ভেবেছিলুম, আমি বুঝি অন্ধ হয়ে গেছি। অন্ধ আমি হইনি। আমি আবছা চোখে দেখতে পেলুম, বাবা দু চোখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি ভয়ে চিৎকার করে বাবাকে জড়িয়ে ধরলুম। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে ছুটতে গেল! কিন্তু পালাবে কোথায়? সেই সর্দার হুড্ডা-গুড্ডা ওদিক থেকে ছুটে এসে বাবার পায়ে লাঠির বাড়ি এমন জোরে মারলো, বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। আমিও পড়লুম। সংগে সংগে দস্যুরা ছুটে এলো। আমার দিকে না-তাকিয়ে বাবাকে ওরা বেঁধে ফেললে। বাবাকে বাঁধতে দেখে, আমি লাফিয়ে উঠে সর্দারের বুকে মেরেছি এক ঘুষি। সর্দার চিৎকার করে আমার গলাটা টিপে ধরলে। এমন টিপে ধরেছে মনে হলো, আমি এক্ষুনি দম আটকে মরে যাবো। আমি মরলুম না। সে আমার গলায় ভীষণ জোরে এক ধাক্কা মারলে। আমি চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম। আমার হাতের বাজনাটা আর একটু হলে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। খুব বরাত ভালো, অনেক কষ্টে বাঁচাতে পারলুম। কিন্তু বাবাকে ওদের হাত থেকে ছাড়াতে পারলুম না। ওরা বাবাকে বেঁধে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল জানতে পারিনি। আর আমাকে ওরা চ্যাং-দোলা করে ঘোড়ার পিঠে তুললো। আমি উঠবো না কিছুতেই। আমি কী পারি? সর্দার নিজেই ঘোড়া ছোটালে। ততক্ষণে রাজদরবার তছনছ হয়ে গেছে।

"আমার মা এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না। সর্দার আমায় নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে, ঘোড়ার পিঠে চেপে বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছে মা। এতদিন আমি মাকে দেখেছি রাজরাণী বেশে। আশ্চর্য! আজ দেখলুম মায়ের অন্য মূর্তি। মায়ের বন্দুক গর্জে উঠলো গুড়ুম! সর্দার আমাকে পাকড়াও করে ঘোড়ার পিঠে ছুটছে। মা-ও পেছনে ঘোড়ার পিঠে। হাতে বন্দুক! মা হয়তো ভেবেছিল, ঘোড়াটাকে যদি বন্দুক মেরে কোনরকমে খোঁড়া করে দিতে পারে, তাহলে আমি উদ্ধার পাব, দস্যু-সর্দারেরও দফা শেষ হবে। তাই গুলি চালালো মা ঘোড়ার পায়ের ওপর। ঘোড়া চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠে মাটিতে ছিটকে পড়েছে। আমিও পড়লুম, দস্যুটাও পড়লো ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর। সংগে সংগে সর্দার উঠে দাঁড়ালো ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়লো মায়ের দিকে। আমাকে ওই সর্দার-দস্যুটা এমনভাবে তার সামনে দাঁড় করিয়ে নিজে আমার আড়ালে দাঁড়ালো যে, মা আর গুলি ছুড়তে পারে না। কারণ, ছুড়লেই আমার বুকে লেগে যাবে। তাই মা ছুটে আড়ালে চলে গেল। মা হয়তো ভেবেছিল, নিঃসাড়ে সর্দারটার পেছন চলে যাবে। পেছন থেকে গুলি মেরে সর্দারের পিঠটা ঝাঁঝরা করে দেবে। মা সর্দারের পেছনেই গেছলো। হয়তো বন্দুকও তুলেছিল। কিন্তু তার আগেই শয়তানের দল মায়ের

বুকে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। মা ঘোড়ার পিঠ থেকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। তারপর আর কথা বলতে পারেনি মা।

"রাজপ্রাসাদটা দখল করে নিলে শয়তানের দল। তারা বাবাকে বন্দী করে রাজপ্রাসাদের গারদখানায় আটকে রাখলে। আমি যতদূর জানি, বাবা এখনও সেখানেই আছে। আমাকে আর আমার মায়ের নিস্তেজ দেহটা তারা এই জঙ্গলে নিয়ে এলো। তারা আমাকে মারলো না। আমার পা দুটো শেকল দিয়ে বেঁধে দিলে। আমি যেন পালাতে না পারি। তারা ভেবেছিল, বনের বাঘ এসে আমায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। আর আমার মায়ের দেহটা ওরা এইখানে, এই মাটির নিচে পুঁতে রাখলে আমার চোখের সামনে। কিন্তু তখন মাকে পুঁততে দেখে আমার চোখ দিয়ে একটুও জল পড়েনি। আমি ভেবেছিলুম, তবু ভালো আমি যদি মরি আমার মায়ের কাছেই মরতে পারবো। এখন একটা কথা কিন্তু ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে। আমি যেমন আমার হাত থেকে বাবার দেওয়া বেহালাটা ছাড়িনি, ওরাও যে কেন আমার হাত থেকে এটা কেড়ে নেয়নি, আমি তা আজও জানি না। তাই এটা আমার কাছেই আছে। আমি এই বেহালাটা বাজিয়ে রোজ মাকে জাগাই, ঘুম পাড়াই। আর ভাবি, এখন আমার বাবা কী করছে রাজপ্রাসাদের গারদখানায়?"

কথা তার শেষ হলো। ছেলেটি থামলো। আমার মুখের দিকে চাইলো সে। হয়তো ভেবেছিল, আমি কিছু বলবো তাকে। তারপর যখন দেখলো বাঘ হয়েও হাঁদার মতো আমি চুপ করে আছি, ওর মুখে কেমন একটা দুঃখ-মেশানো হাসি ঝিলিক দিয়ে হারিয়ে গেল। নিজের মনেই বেহালাটা বুকে তুলে নিলে। তারপর আবার বাজাতে সুরু করলে। এখন ওর এই বাজনার সুরটা আমার মাথায় ঢুকছে কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওর কথাগুলো গুনগুন করে আমার সমস্ত মনটাকে নাড়া দিচ্ছে। আমি ভাবছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি মানুষ বন্দুক নিয়ে শুধু বাঘই মারে না। মানুষ বন্দুক দিয়ে মানুষকেও মারে!

আমার চোখে চোখ পড়তে ওর বাজনা থামলো। আমায় বললে, "তুইতো জন্তু। মানুষের মতো কথাতো বলতে পারিস না! মানুষের মতো বাজনা বাজাতে পারবি? আমি শিখিয়ে দেব।"

আমার মনটা যেন "ধ্যাৎ" করে উঠলো।

তারপর বললে, "তুই তো বাজাচ্ছিলি। এই নে, আবার বাজা!" বলে বেহালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

আমি একটুখানি দোনোমনো করেছিলুম। তারপর সামনের একটা থাবা এগিয়ে দিলুম বাজনাটার দিকে। বাজনার তারে ঘা পড়লো, "টুং!"

ছেলেটি বললে, "বারে! বেশ তো পারিস!"

আমি আর একবার আর একটা তার টানলুম, "টাং!"

তারপর আর একটা, "টিং!"

শেষকালে একসঙ্গে, "টুং-টাং-টিং!"

একবার, দুবার, তারপর বারবার, "টুং-টাং-টিং! টুং-টাং-টিং! টুং-টাং-টিং!"

ছেলেটি খুশিতে হেসে উঠলো।

হঠাৎ চমকে উঠেছিলুম আমি। ছেলেটিও বোধ হয় চমকে গেছলো! একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে এলে যেমন শব্দ ওঠে নির্জন বনে, আমি শুনলুম, তেমনি যেন শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে। ছেলেটি চটপট উঠে দাঁড়ালো। আমায় বললে, "দস্যু আসছে! তুই এখান থেকে পালা!"

পালাবো কেন? আমি কাকে ভয় পাই! ওখান থেকে উঠে আমি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। আমি আগে

কখনও দস্যু দেখিনি। আমি ভাবলুম যাক ঝোপের আড়ালে বসে এবার তাহলে দস্যু দেখা যাবে! যে কখনও দস্যু দেখেনি, তার দস্যু জিনিষটা কেমন দেখতে এটা জানার ইচ্ছে তো হবেই।

আমি লুকিয়ে পড়লুম, কিন্তু ছেলেটি যেখানে আগে বসেছিল, আবার সেখানেই বসে পড়লো। আবার বেহালাটা বাজাতে লাগলো।

ততক্ষণে দস্যুরা সেখানে হাজির। ওদের চেহারা আমি দেখতে পেয়েছি। ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে। আগাগোড়া বিচ্ছিরি কালো রঙের পোষাক পরে আছে। চোখগুলো কালো কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে এমনভাবে মোড়া, তুমি শত চেষ্টা করলেও ওদের চোখ দেখতে পাবে না। কিন্তু ওরা তোমায় ঠিক দেখতে পাবে। সক্কলের কাঁধে একটা করে বন্দুক। দলে ক'জন আছে আমি বলতে পারবো না। কিন্তু অনেকজন।

বাজনার শব্দটা শুনেই বোধ হয় ওরা ঘোড়া দাঁড় করালো। তারপর ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে কতক্ষণ লাগবে? ওতো সামনেই বসে আছে। একজন দস্যু ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। সবাইকে ডেকে বললে, "আরে! একে তো এখনও বাঘে খায়নি! এখনও তো বেঁচে আছে!"

ছেলেটি কিন্তু ওদের কথা কানেই নিলো না। সে যেমন বাজাচ্ছিল, তেমনিই বাজাচ্ছে!

একজন দস্যু ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কাছে এগিয়ে গেল। ক্যার-কেরে গলায় জিগ্যেস করলে, "এই, এখানে কী করছিস?"

ছেলেটি তোয়াক্কাই করলে না।

একজন হঠাৎ ওর পা দুটো দেখতে পেয়েছে। চেঁচিয়ে

ঘোড়াগুলোও ভয়ে পিছু হটছে। তা বলে তো আর লোহার শেকল ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকানো যায় না! দস্যুরা ঝটপট বন্দুক তুললে। আমি দেখলুম ওর এবার নির্ঘাৎ মরণ!

ওরা বন্দুক ছোড়ার আগেই ঝোপের ভেতর থেকে আমি হঠাৎ হুংকার ছাড়লুম, "হালুম!"

থমকে গেল ওদের বন্দুক। চমকে উঠলো ওদের বুক। ওরা কিছু বুঝতে না বুঝতেই, আমি দস্যুদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লুম। ওরা ভয়ে মরা-কান্না কেঁদে উঠলো। ঘোড়াগুলো চার পা তুলে লাফাতে লাগলো। আমি এক-একটা থাবা মারি আর এক-একটা দস্যু মাটির ওপর চিৎপাত হয়ে লুটিয়ে পড়ে! আমার গর্জন, ওদের চিৎকার আর ঘোড়াগুলোর চিঁহিঁ-চিঁহিঁ ডাক, সব মিলিয়ে তখন যেন সেখানে কুরুক্ষেত্র! আমি বেশ মনে করতে পারছি, সেদিন সব কটা দস্যুকে আমি খতম করে দিয়েছিলুম। সব কটার বন্দুক হাত থেকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আর ঘোড়াগুলো, কোনটা মরেছে, কোনটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর কোনটা এদিক ওদিক ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। এই সুযোগে একটা কিন্তু কাণ্ড ঘটে গেল। একজন দস্যু আমাকে ফাঁকি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে দে চম্পট। আমার নজর এড়ায়নি। আর এই ব্যাপারটাই যে সাংঘাতিক বিপদ ডেকে আনবে, আমি সেটা তখনই বুঝতে পেরেছিলুম। বুঝলে কী হবে! আমি তো কথা বলতে পারি না। আমি তো ছেলেটিকে বলতে পারিনি, এখানে আর থাকা উচিত নয়। আর যদিও বলি, ও আমার কথা শুনবে কেন? ও কি এখান থেকে মাকে ছেড়ে যাবে?

দস্যুগুলোকে হারিয়ে দিয়ে জেতার গর্বে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। আর এমন একজন সাহসী ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পেরে আমার যে কী আনন্দ, বলতে পারছি না। বীরের সঙ্গে বীরেরই পোষায়! ল্যাদাড়ুস ল্যাংচা-মার্কাদের নিয়ে কাজ হয়!

আমি হাঁপাচ্ছিলুম। হাঁপিয়ে একটু গেছলুম। ছেলেটি ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আমায় আদর করলে। আমিও আমার এই হাঁড়ির মতো মস্ত মুখটা দিয়ে ওর গালটা ঘসে দিলুম।

ছেলেটি খুশিতে ছুটে গিয়ে ওই মরা দস্যুদের বন্দুকগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে। বললে, "কোনদিন আর যদি কেউ আসে, এই বন্দুক দিয়ে তাকে শেষ করবো!"

আমি জানতুম, যদি কেন, নিশ্চয়ই আসবে। কারণ, যে-দস্যুটা পালিয়েছে, সে কী তার দলবলকে এ-কথা বলবে না? দস্যু-সর্দার হুম্ভো-গুম্ভো কী ছেড়ে কথা বলবে? ওই দস্যুটা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে আমার তাই এতো আফশোষ হলো! আমায় বোকা বানিয়ে দিলে! আমিই বা কী করবো! একা সক্কলের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। ব্যাপারটা তো চারডিখানি নয়! তার ওপর সব্বার হাতে বন্দুক। একবার চালিয়ে দিলেই হলো! কিন্তু সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া চলবে না। সুতরাং হাওয়ার মতো ছুটে ছুটে আমায় কাজ করতে হয়েছিল। এখন সেই ফাঁকে কেউ পালালে, আমার বরাত ছাড়া আর কী বলবো!

বন্দুকগুলো যখন সব ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো ছেলেটি, তখন বেহালাটা আবার তুলে নিলো। ভালো করে পরখ করলো। নাঃ, ভাঙেনি। আমায় বললে, "আয়, এবার তোকে বেহালা বাজাতে শিখিয়ে দিই।"

সত্যি বলছি, আমার তখন ওই বেহালা-টেহালা বাজাবার মতো মনের অবস্থা নয়। মন তখন পড়ে আছে অন্যখানে। ভয় হচ্ছে, দস্যুরা এবার না লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসে। কিন্তু ছেলেটির কথা না শুনলে ও যদি দুঃখু পায়! সত্যিই, ওকে দুঃখু দিতে কষ্ট লাগে! আর সেই কথা ভেবেই, ইচ্ছে না

উঠলো, "আরে! পায়ের শেকলটা তো পায়ে বাঁধা নেই! খোলা পড়ে আছে!"

সত্যিই শেকলটা ওর পাশেই পড়ে ছিল।

হঠাৎ দস্যুটা ওর হাত থেকে বাজনাটা কেড়ে নিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভাঙেনি রক্ষে! তারপর ওর ঘাড়টা ধরে টেনে তুললে। জিগ্যেস করলে, "পায়ের শেকল খুলেছিস কেন?"

ছেলেটি এতক্ষণে কথা বললো। বললে, "বেশ করেছি!"

আমি অবাক হয়ে গেলুম ওর কথা শুনে। দারুণ তেজিয়াল ছেলে তো! একটুও ভয় পেলো না!

আমি বুঝতে পারলুম, দস্যুটা ওর কথা শুনে ভীষণ খেপে গেছে। ঘাড়টা ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলে। বললে, "মুখের ওপর কথা! সাহস তো কম নয়! মেরে দাঁতগুলো উপড়ে ফেলবো!"

ছেলেটি উত্তর দিলে, "আমিও দাঁত উপড়ে নিতে পারি!"

ছেলেটির কথা শুনে দস্যুটা কী রকম ঘাবড়ে গেল! থতমত খেয়ে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে আর একটা দস্যু চেঁচিয়ে বললে, "দে না, একদম খতম করে দে!"

"তাই দেব," বলে যেই দস্যুটা ওর ঘাড় ছেড়ে, নিজের কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়েছে, ছেলেটিও মাটির থেকে লোহার শেকলটা তুলে নিয়েছে। হাত ঘুরিয়ে চোখের নিমেষে ধাঁই করে ওর মুখের ওপর মেরে দিয়েছে। লোকটা ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। কী দুর্দান্ত সাহস!

কিন্তু এবার তো ওর নিশ্চয়ই বিপদ! এবার ওকে নিশ্চয়ই মারবে! কিন্তু মজা কী, মারবার আগে ও নিজেই চেঁচিয়ে উঠলো, "আয়, আয়, দেখি তোদের কতো সাহস!" বলে সেই লোহার শেকলটা বন বন করে ঘুরিয়ে এগুতে লাগলো।

থাকলেও, বেহালা শিখতে আমি আপত্তি করলুম না। ওর পাশে গিয়ে বসলুম।

ছেলেটি বললে, "প্রথমে তোকে সা-রে-গা-মা শিখিয়ে দিই।"

তোমাকে তো আগেই বলেছি আমি বাঘ। ওই হাসি-টাসি ব্যাপারগুলো আমার ধাতে সয় না। কিন্তু সা-রে-গা-মা কথাটা শুনে আমার হঠাৎ এমন মজা লাগলো! মনে হলো, কে যেন হাসিয়ে দেবার জন্যে আমার পেটে কাতুকুতু দিয়ে দিলে। যে হাসতে জানে না, তার কাতুকুতু লাগলে যে এমন দুর্দশা হবে, আমি তা মোটেই ভেবে পাইনি। আমার মনে হচ্ছিল, হাসিটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে যতই আঁচড়-পাঁচড় করছে, ততই আমার পেটের ভেতরে সেটাকে কে যেন আঁক-পাকিয়ে টেনে ধরে রাখতে চাইছে। সে এক ভয়ানক হেস্নুড়ে ব্যাপার! হাসি পাচ্ছে অথচ হাসতে পারছি না!

শেষকালে ফট করে পেটের ভেতর থেকে ফস্কে হাসিটা মুখ দিয়ে হা-হা-হা শব্দে বেরিয়ে এলো। আমি হেসে ফেললুম। বাঘের হাসতে সত্যি মানা কিনা জানি না। কিন্তু একবার যখন হেসে ফেলেছি, তখন সেটাকে থামাবার চেষ্টা না করে, হাসতে-হাসতেই বেহালায় সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি শিখতে লাগলুম।

বেশিক্ষণ হাসতে হলো না। সা-রে-গা-মা-ও শিখতে হলো না। যা ভেবেছি তাই! আবার ঘোড়া ছুটে আসছে! শব্দ পাচ্ছি! এইবার নির্ঘাৎ বিপদ! ছেলেটিও শুনতে পেয়েছে। এবার যেন অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ছেলেটি চটপট বেহালাটা অন্ধকারে সরিয়ে রেখে আমায় বললে, "ওরা নিশ্চয়ই আবার আসছে! তুই লুকিয়ে পড়!" বলে নিজে ছুটে চলে গেলো দস্যুদের সেই বন্দুকগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই ঝোপের মধ্যে। আর আমিও লুকিয়ে পড়লুম একটা মস্ত ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে।

দেখতে দেখতে দস্যুর দল সেখানে হাজির। এবার একজন-দুজন নয়। অগুনতি। এবার ওদের সঙ্গে লড়া, আমার একার কম্ম নয়। কারণ, এবার ওরা তৈরি হয়ে এসেছে। বাহাদুরি দেখাতে গেলে, নিস্তার নেই!

দস্যুগুলো সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার রাত্তির বলে ঠাওর করতে ওদের মুশকিল হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝটপট নেমে পড়লো। একটু আগে যে-দস্যুগুলোকে আমি মেরে ফেলে রেখেছি, সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখলে। যদি কেউ বেঁচে থাকে! যখন দেখলো কেউ বেঁচে নেই, তখন বন্দুক উঁচিয়ে সেই জায়গাটা ঘিরে ফেললে। খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো।

"গুড়ুম!" হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠলো। আমি ঠিক দেখতে পেলুম, ছেলেটি যে ঝোপটার ভেতরে বসে আছে, সেখান থেকে গুলি ছুটে এসে একটা দস্যুর বুকে বিঁধেছে। চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো দস্যুটা। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে ঝপা-ঝপ মাটিতে শুয়ে পড়লো। বন্দুক উঁচিয়ে, হামাগুড়ি দিতে দিতে ওই ঝোপের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। আবার ঝোপের ভেতর থেকে শব্দ এলো, "গুড়ুম!"

"গুড়ুম! গুড়ুম!" দস্যুরাও বন্দুক ছুড়লে।

তারপর ঝোপের ভেতর থেকে আর দস্যুদের বন্দুক থেকে শব্দ আর শব্দ, "গুড়ুম! গুড়ুম!" সত্যিকারেরর একটা যুদ্ধ লেগে গেল দস্যুদের সঙ্গে ছেলেটির।

কতক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলেছিল, আমি বলতে পারবো না। জানি না, যুদ্ধে কটা দস্যু মরেছিল। কিন্তু খানিকপরেই ছেলেটির বন্দুক থেমে গেল। তখনই আমার ভয় হয়েছিল, বন্দুকের গুলি বোধহয় ফুরিয়ে গেছে!

আমার কথা মিথ্যে নয়! এবার দস্যুর দল আগের মতোই মাটি কামড়ে গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে চারিদিক থেকে ওই ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঝোপ ছেড়ে ছেলেটি ছুটতে গেল, কিন্তু পারলো না। ছেলেটিকে দস্যুর দল হ্যাঁচড়া-টানে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে, ছুট দিলে। ছেলেটি হাত-পা ছুড়ে ছটফটিয়েও আর ছাড়ান পেলো না। একবার মনে হয়েছিল, আমি লাফিয়ে পড়ি ওদের ওপর। সাহস হলো না। ভেবেছি, হট করে এমন কাজ করাটা ঠিক না। তাহলে আমাকেও মরতে হবে। তুমি হয়তো আমার এ-কথা শুনে ভাবছ, "আমি একের নম্বরের ভীতু। ভীষণ স্বার্থপর।" ভাবতে পার। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখলে ভালো করবে। অনেক সময় খামোকা গা-জোয়ারী করার চেয়েও, বুদ্ধির জোর কাজ হয় অনেক বেশি। তাই ওরা যখন ছেলেটিকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুট দিলে, আমিও তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওই যে বেহালাটা মাটিতে পড়েছিল, ওটা মুখে তুলে নিয়ে নিঃসাড়ে ঘোড়ার পেছনে আমিও ছুট দিয়েছি।

একটা যে বাঘ ওদের পেছনে পেছনে ছুটছে, এটা কিন্তু ওরা খেয়ালই করেনি। ওরা জানতে পারলো না, ওদের পেছনে যম। জানতে পারা সম্ভবও নয়। কারণ, ওরা তখন শিকার ধরে জয়ের আনন্দে দিশেহারা। আর আমি তখন শিকার ধরবার জন্যে সাবধানে তাদের পেছনে লাফিয়ে ছুটছি।

ছুটতে ছুটতে ওরা বন পেরিয়ে গেল। বোধহয় শহরে পড়লো। বিপদ আমার। কেননা, বন-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শহরে তো তা হবার যো নেই। পরিষ্কার ঝরঝরে রাস্তা ঘাট। লুকুবার জায়গা-ই নেই। আমি চেয়ে দেখি, ঠাকমা যেমন আমায় বলেছিল, শহরটা ঠিক তেমনি। এ-পাশে ও-পাশে বড় বড় কোঠা বাড়ি। কিন্তু রক্ষে এই, তখন নিঃঝুম রাত্তির। লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তা-ঘাট ফাঁকা।

আমি দেখলুম, ছেলেটিকে জাপ্টে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দস্যুর দল একটা মস্ত বাড়ির ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বাইরে থেকে বাড়ির চেহারা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইলো না, এইটা রাজপ্রাসাদ। ওরা তো ঢুকে গেল গটগটিয়ে। কিন্তু বাঘ কেমন করে ঢুকবে? চোরের মতো আর সকলের চোখ এড়িয়ে টুপ করে তো আর ঢুকে পড়তে পারবো না! আমার চেহারাটা যদি ছোট-খাটো হতো, তা হলে ভাবনা ছিল না। এই পেল্লাই দেহটা নিয়ে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুখের কথা নয়! তার ওপর আবার ফটকের সামনেও বন্দুক উঁচিয়ে দু-দুজন দস্যু-পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় আমি বাঘ না হয়ে, বাঘের মাসী হলে ভালো হতো!

আমার মাসীকে আমি কখনও দেখিনি। শুনেছি, আমার মাসীর চেহারাটা খুব ছোট্ট-খাট্টো! মাসী আমার রান্না-ঘরে, ভাঁড়ার-ঘরে হুট হুট করে ঢুকে পড়তে পারে। মাছটা, দুধটা উল্টে-পাল্টে খেয়ে ফেললেও কেউ জানতে পারে না। আমার মাসীকে অবশ্য তোমরা সবাই চেনো। অনেকে আদর করে ঘরে পোষ মানাও। ভালোবেসে ডাক দাও, "মিনি-মিনি-মিনি!"

কিন্তু সে তো হলো। এখন তো যাহোক করে আমাকে রাজপ্রাসাদের ভেতরে যেতেই হয়। দেরি হয়ে গেলে, ছেলেটিকে হয়তো আর আস্তই রাখবে না। যেমন করে হোক তাকে বাঁচাতেই হবে। এখন ঝঞ্ঝাট আমার এই বেহালাটা নিয়ে। বাজনাটাকে কোথাও লুকিয়ে না রাখলে বাজনাটাও যাবে আর আমারও অসুবিধে। কিন্তু রাখি কোথা?

এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তে দেখি, রাজপ্রাসাদের প্রায় সামনা-সামনি একটা বেশ উঁচু বাড়ি। ইচ্ছে করলে, এই বাড়িটার ছাতে উঠে পড়া যায়। সেই ভালো!

রাতদুপুরে বাড়ির লোকজনেরাও সবাই ঘুমিয়ে আছে। এই তাল। আমি এগিয়ে গেলুম। সাঁই করে বাড়ির পাঁচিলে লাফ দিলুম। পাঁচিলের ওপর ডিঙি মেরে ছাতের ওপর টপকে উঠে পড়লুম। ছাতের এইখানে, এই কোণে বেহালাটা লুকিয়ে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না। বেশ ঘুপচি। আমার মুখ থেকে নামিয়ে বেহালাটা এইখানেই রেখে দিলুম।

ছাতটা সত্যিই বেশ নির্ঝঞ্ঝাট। আমি এখানে দিনের পর দিন যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকি, তা হলেও কেউ দেখতে পাবে না। অথচ আমার সব কিছু দেখতে অসুবিধে নেই। অন্ধকারেও রাজপ্রাসাদটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে, রাজপ্রাসাদের গা বরাবর একটা মস্ত ঝিল। জল চিকচিক করছে। অবশ্য দেখতে পাচ্ছি রাজপ্রাসাদের বাইরেটা। ভেতরে কী হয় না হয় মা ভগায়-ই জানে। আমার কিন্তু মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। ছেলেটিকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কী করলো কে জানে!

ঝটপট আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। মনে হলো, অন্তত ওই ফটকের পাহারাদার দুটোকে যদি শেষ করে ফেলতে পারি, তাহলে ফটক পেরিয়ে প্রাসাদের ভেতরে তো ঢোকা যায়! কিন্তু আমি জানতুম না, ভেতরেও অগুনতি পাহারাদার। না-জেনেই আমি আবার ছাত থেকে লাফ মেরেছি। গুঁড়িসুঁড়ি মেরে ফটকের সামনে হাজির হয়েছি। ওরা তো আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় দেখতে পাওয়ার সুযোগই দিলুম না। ধাঁই করে একটার ওপর মেরেছি লাফ। একটি থাপ্পড়েই বাছাধন ছিটকে পড়ে অক্কা গেল। আর একজন সেই দেখে পালাতে যাবে কী, আমি তার টুঁটিটা টিপে ধরতেই, তিনি আর মা বলবার সময়ই পেলেন না। দুটোকেই ওখান থেকে চটপট সরিয়ে ফেললুম। পাশের ঝিলটার মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলে দিলুম। জলের ভেতর দুজনেই ডুবে রইলো। দেখলুম, ঝিলের জল ওদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ওদের যেখানে মেরেছিলুম সেই রাস্তাটা, ফটকের সামনেটাও তাদের রক্তে যে লাল হয়েছিল, সেটা অবশ্য আমি দেখবার সময় পাইনি। কেননা, ওদের ঝিলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেই আমি রাজপ্রাসাদের ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

ফটক পেরিয়ে দেখি, সামনে ইয়া লম্বা-চওড়া একটা চত্বর। এমন খোলামেলা যে গা-ঢাকা দেওয়া অসম্ভব। তার ওপর চত্বরেও দেখি, জনা পাঁচেক দস্যু বন্দুক নিয়ে ঘোরা ফেরা করছে। দেখে মনে হলো, আমি যে ওদের দুজন সঙ্গীকে খতম করে ফেলেছি, ওরা সেটা টেরই পায়নি। রাতটা অন্ধকার বলে তাই। তা না-হলে জেনে রাখো, ওরা আমায় নির্ঘাৎ দেখে ফেলতো! তারপর কী হতো, সে তো বুঝতেই পার! এগিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হলো না। অগত্যা আমি চত্বরের একটি কোণে জুজুবুড়ির মতো বসে রইলুম! দেখতে পেলুম রাজবাড়ির ওপর দিকে বারান্দাটা একদম ফাঁকা। ইচ্ছে করলে লাফ মেরে উঠে পড়তে পারি। ওখানে উঠে, লুকিয়ে থাকলে কেউ কিসসু বুঝতেই পারবে না। কিন্তু, আসলে আমি তো লুকিয়ে থাকতে আসিনি। ছেলেটিকে উদ্ধার করতে এসেছি। আশ্চর্য, তার তো কোন পাত্তাই নেই!

এমন সময় হঠাৎ যেন বাইরে একটা কাক ডেকে উঠলো। একটা ডাকলো বলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ডাকলো। তারপর এমনি করে একটি দুটি ডাকতে ডাকতে অনেক কটি কা-কা সুরু করে দিলে। আমি একদম বুঝতে পারিনি, এতো তাড়াতাড়ি রাত কেটে ভোর হয়ে আসছে। এইরে! এইবারেই তো বিপদ! আমি একেবারে বুদ্ধু বনে গেছি। আমার মাথায় একবারও এলো না, রাতের অন্ধকার চিরটা কাল ধরে আকাশের গলা জড়িয়ে বসে থাকবে না। আলো আসবেই। নাঃ, আর বোধহয় ছেলেটিকে বাঁচাতে পারলুম না। দিনের আলো স্পষ্ট ফোটার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায় যে কাটবো, জানি না।

ঠাকমার মুখে শুনেছি, শহরটা গাঁ-ঘরের মতো নয়। গাঁ-ঘরে লোকজন কম। গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় আছে। তবু লুকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু শহরে সেটি হবার যো নেই। এক্ষুনি ঘুম ভাঙলেই সব হৈ হৈ করে বাইরে বেরিয়ে পড়বে। মাঠে, ঘাটে, বাজারে লোকে লোকে ছয়লাপ হয়ে যাবে।

আমি বেরিয়ে পড়লুম রাজপ্রাসাদ থেকে। ভাবলুম, আবার কী ছুট দেব! কিন্তু কোনদিকে ছুটবো, কোথায় ছুটবো? রাস্তা-ঘাট কিছু চিনি না। আমার সব-গুলিয়ে গেছে। আমি এখন ভীষণ প্যাঁচে পড়ে গেছি।

বলতে বলতেই হাত-পা কেঁপে উঠলো। সাংঘাতিক ব্যাপার। দেখি, রাস্তায় একটি দুটি লোক হাঁটাহাঁটি সুরু করে দিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়েই বা থাকি কী করে?

মাথায় যখন কোন বুদ্ধি আসছে না, তখন যে বিপদ আমার ঘাড়ের ওপর এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে, সেটুকু বুঝতে পারছি। তাই আগু-পিছু না ভেবে, যে-ছাতে বেহালাটা লুকিয়ে রেখে এসেছি, সেইখানেই আবার লাফিয়ে উঠে লুকিয়ে রইলুম। অন্তত এখনকার মতো তো থাকা যাক। তারপর দেখা যাবে।

ভাগ্যি ভালো যে, এই বাড়ির এখনও কারো ঘুম ভাঙেনি। তাই আমিও নির্ঝঞ্ঝাটে উঠতে পেরেছি। ছাতের ওপর উপুড় হয়ে বসে রইলুম।

দেখতে দেখতে আকাশ ফর্সা হয়ে গেল। চারিদিকে লোক-জন চলাফেরা সুরু করে দিলে। কথা-কওয়া, চান-খাওয়া, অফিস-যাওয়া চালু হল। ফ্যাসাদ কাকে বলে! আমি মশাই নাস্তানাবুদ! তুমি হয়তো বলবে, "কী দরকার ছিল তোমার অমন বাহাদুরি দেখানোর? ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে লাভটা কী হলো? বাঘের ছেলে, বাঘের মতো, বাঘের বনেই

থাকলে পারতে! এখন কেমন জব্দ!"

তা বলতে পারো জব্দ হয়েছি। তা নইলে বাঘ বলে বাঘ, সে কিনা ছাতের কোণে লুকিয়ে বসে আছে! লোকে শুনলে দুয়ো দেবে না? তাছাড়া এই চৌদিক ফাঁকা ছাতের ওপর, একটা ধুমসো বাঘ কতক্ষণই বা চোরের মতো বসে থাকতে পারে? নিজেরই এখন নিজেকে ছ্যাঃ ছ্যাঃ বলে ভেংচাতে ইচ্ছে করছে। ওদিকে যার জন্যে এতখানি ছুটে আসা, ধড়িবাজ দস্যুর দল এখনও তাকে আস্ত রেখেছে **বলে** মনে হয় না। কারণ এখান থেকে বসে বসে রাজপ্রাসাদের মধ্যে কী হচ্ছে, না হচ্ছে, তা জানার তো কোনই উপায় নেই। তবে এখন এটাকে রাজপ্রাসাদ না বলে সিধেসিধি দস্যু-প্রাসাদ বলা ভালো। কেননা, প্রাসাদটা তো এখন রাজার নয়। রাজাকে বন্দী করে, রাজপ্রাসাদটা কেড়ে নিয়ে, গোটা রাজত্বটাই এখন হুন্ডা-গুন্ডা দখল করে বসে আছে। তাই বলতে পারো, এখন হুন্ডা-গুন্ডাই এখানকার রাজা। তাই-ই হয়! তুমি ভালো হও, চাই নাই হও, তোমার বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, তোমার কাছে বন্দুক, গোলা, কামান থাকলেই হচ্ছে। দুম-দাম, গুড়ুম-গুড়ুম ছুড়বে, দেখবে জবরদস্ত রাজা-উজিরও ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তোমায় খাতির করবে। তোমাকে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করবে।

এ-সব মানুষের বেলায়। তবে আমাদের ওটি পাবে না। ওই তো আমার বুড়ি ঠাকমা। ইচ্ছে করলে তো গায়ে পড়ে মানুষের সঙ্গে ভাব করতে পারতো। করলে তা? উল্টে মানুষের গুলিতে বীরের মতো প্রাণ দিলে। আর আমি? আমার কথা ধরো। এইতো আমার পিঠে গুলির দাগটা এখনও দগদগে হয়ে আছে। ঠিক কথা রক্ত পড়া থেমেছে। কিন্তু এখনও তো একটু একটু জ্বালা আছে। তাই বলে কী আমি পা জড়িয়ে মানুষের খোসামোদ করতে গেছি। বয়ে গেছে! আমি বাঘের ছা। ও ধাতুতে আমরা গড়া নই।

একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। তার মানে আমার ভয় কেটে গেছে। তুমি দেখো, ভয় যখন পায়, তখন ঘুম পায় না। আর ঘুম যখন পায়, তখন ভয় পায় না। ঘুমের আর দোষ দেব কী! কাল রাত থেকে যা ধকল যাচ্ছে। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, শেষে ছেলেটার পাল্লায় পড়ে এমন জড়িয়ে গেছি! জড়ানো উচিত ছিল না। কিন্তু বাঘ হলেও আমার তো একটু-আধটু দয়া-মায়া থাকতে পারে! মোদ্দা কথাটা ভুলো না কেউ, আমার জন্ম একটা খাঁটি আর সত্যিকারের রাজবংশে! তার মানে, আমাকে তুমি জানোয়ার বলতে পারো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হবে, আমি বনের রাজা!

"দুম!" কী সাংঘাতিক শব্দ! ভাবা যায় না, এই সকাল-বেলা এমন একটা শব্দ আচমকা অমন করে ফেটে পড়বে। সত্যি বলছি, আমি চমকে উঠেছি। আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল ভয়ংকর। ছাতের আলসের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ঘোড়ার পিঠে দস্যু। একটা বোমা ফেটেছে ঠিক রাজবাড়ির ফটকের সামনে। ধোঁয়ার কুন্ডুলি পাক খেতে খেতে আকাশে উঠছে। সারাটা জায়গা অন্ধকার। দেখো, রাস্তার লোকগুলো চিল-চেঁচাতে চেঁচাতে কী রকম পাঁই পাঁই করে ছোটা দিয়েছে। আবার বোমা ফাটলো, "দুম! দুম!" দস্যুর দল ঘোড়া ছুটিয়ে হল্লা সুরু করে দিলে, "হাট যাও, হাটো, হাটো।" রাস্তার লোকেরা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পগারপার! কী ব্যাপারটা কী? তাহলে কি কাল রাতে যে দুটো পাহারাদারকে মেরেছি, তার খবর পেয়ে দস্যুর দল খেপেছে!

চক্ষের নিমেষে রাস্তা-ঘাট সব খাঁ খাঁ। যে যেদিকে পারলো ভেগে পড়লো। ঘর-দোর সব বন্ধ হলো। ঘোড়সওয়ার দস্যু-গুলো ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে লাফিয়ে তান্ডব নাচ সুরু করে দিলে। ওদের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, যে এদিকে আসবে কিম্বা যে জানলা-দরজা খুলবে, তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। এতো আচ্ছা রাজার রাজত্ব! বটেই তো! রাজত্বটা এখন কার দেখতে হবে তো! রাজার নাম, দস্যু-সর্দার হুন্ডা-গুন্ডা!

আমি তো এতক্ষণ ধরে ছাতের ওপর চুপটি করে বসে ঘোড়ার পিঠে দস্যুগুলোর ছোটাছুটি দেখছিলুম আর ওই বোমা-ফাটানো ধোঁয়ার হাত থেকে নিজের চোখ দুটোকে সামলা-চ্ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ দেখি কী, ওই ফাঁকা রাস্তার ওপর কটা দস্যু বন্দুক-টন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। কী রে বাবা! আমায় দেখতে পেলো নাকি! তারপর আরও দেখি কী, দুজন দস্যু, সেই ছেলেটিকে বেশ করে বেঁধে, টানতে টানতে রাজ-প্রাসাদের ফটকের বাইরে নিয়ে আসছে। এতক্ষণ যে এতো বোমা ফাটাফাটি হলো, কিম্বা ঘোড়া ছোটাছুটি করলো, তাতে আমি একটুও ঘাবড়াইনি। কিন্তু হঠাৎ ছেলেটিকে অমনি করে ফটকের বাইরে আনতে দেখে, আমার পা থেকে মাথা অবধি ঠকঠক করে কেঁপে উঠলো। আমি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমার একটিবারের জন্যেও খেয়াল হলো না, কেউ আমায় দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ভাগ্য বলতে হবে, তখনও পর্যন্ত আমায় কেউ দেখতে পায়নি। ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ওরা খোলা রাস্তায় দাঁড় করালো। আমি দেখলুম একজন বেশ লম্বা-চওড়া দস্যু ভীষণ হম্বি-তম্বি করে ছেলেটার সামনে এগিয়ে আসছে। সবাই তাকে দেখে তটস্থ হয়ে সরে যাচ্ছে, সেলাম ঠুকছে। আমার মনে হলো, ইনিই বোধহয় হুন্ডা-গুন্ডা। ইনিই এখন রাজা।

রাজাই তো। তবে দস্যু-রাজা। রাজার ইসারা মতো ছেলেটির সামনা-সামনি, একটু তফাতে, একজন বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ালো। এবার আমার কাছে সব ব্যাপারটা জলবৎ তরলং। এখন ওরা ছেলেটিকে এই খোলা রাজপথে গুলি করে মারবে।

লোকটা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াতেই হুন্ডা-গুন্ডা চেঁচিয়ে উঠলো, মানে হুকুম চালালে, এক, দো—

আমি তিন বলতে দিলুম না। আমি জানি তিন বললেই বন্দুক ছুটবে, গুড়ুম! আমার মাথায় নিমেষের মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। তিন বলার আগেই পড়ি-মরি বেহালাটা তুলে নিয়ে বাজিয়ে দিয়েছি, টুং-টাং-টিং! বেশ জোরেই তারে টান পড়েছে! হুন্ডা-গুন্ডা থমকে গেছে। মুখে কোন কথা না বলে মিট মিট করে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু দেখবেই বা কাকে আর বুঝবেই বা কী! তাই আবার হাঁক দিলে, এক, দো—

টুং-টিং-টাং।

হুন্ডা-গুন্ডার গলায় এবার মেঘ ডাকলো, "কোন হ্যায়! বাজনা বাজায় কে?"

সেই ডাক শুনে তো ওর সাঙ্গপাঙ্গদের মুখ শুকিয়ে আমচুর। সবাই ভয়ে ভয়ে এ ওর চোখ চাওয়া-চায়ি করছে। কিন্তু কিছুর হদিশই পাওয়া গেল না। হুন্ডা-গুন্ডা ভাবলো, তার বোধহয় নিজেরই শুনতে ভুল হয়েছে। তাই সে আবার হাঁক পাড়লো, এক, দো—

"হুজুর, বাঘ!" হঠাৎ একজন দস্যু ছাতের দিকে চেয়ে চিৎকার করলো।

এইরে! আমায় দেখতে পেয়েছে!

আর দেখতে আছে! ওর মুখের কথা শেষ হতে দিলুম না। ছাতের ওপর বেহালাটা ফেলে রেখেই নিমেষের মধ্যে মেরেছি লাফ, একেবারে সিধে হুন্ডা-গুন্ডার ঘাড়ের ওপর। ওর টুঁটিটা কামড়ে ধরে ঘাড়টা মটকে দিয়েছি। হুন্ডা-গুন্ডা মাটির ওপর চিৎপটাং। তাই না দেখে আর সব দস্যুগুলো, "মারে," "বাপরে" বলে যে যেদিকে পারলো ছুট দিলো। আমার সঙ্গে পারবে কেন? টপাস টপাস করে একটি একটি ধরছি, আর শেষ করছি। একেবারে লন্ডভন্ড। এমন হুংকার ছাড়ছি, যে বাছাদের সেই ভয়েই হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। আমি সব তছনছ

করে দিয়েছি। কিন্তু সব কটাকে একসঙ্গে শেষ করি কী করে? এতো আর আমার একার দ্বারা সম্ভবও নয়। তখন দেখি কী, ছেলেটি নিজের বাঁধনটা কষ্টে-সৃষ্টে খুলে ফেলেছে। একটা দস্যুর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে, দুম-দাম সে-ও লেগে পড়লো। তাই না দেখে যে পারলো, পালালো। যে সামনে পড়লো, সে মরলো। আমার কী লম্ফঝম্ফ তখন যদি দেখতে। সে যেন একটা সত্যি-সত্যি যুদ্ধক্ষেত্র। অন্তত হাজারটা দস্যুর দেহ মাটিতে পড়ে রক্ত-গঙ্গায় হাবুডুবু খাচ্ছে। আমিও ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি। হাঁপাতে হাঁপাতেই তেড়ে-মেড়ে ছোটাছুটি করে খোঁজাখুঁজি করছি।

না, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আর কাউকে দেখছি না। তবু আর একবার হুম্ভা-গুম্ভার দেহটার কাছে এগিয়ে গেলুম। বিশ্বাস নেই, বেঁচেও তো থাকতে পারে! পা দিয়ে ওর গলাটা চেপে ধরতেই, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। লোকটা একদম খতম।

কতক্ষণেরই বা ব্যাপার! এইটুকু সময়ের মধ্যে এখানে যে এমন সাংঘাতিক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে, এটা আগে কে ভেবেছিল? দস্যুগুলো তো জানতোই না। আমি-যে-আমি, ভাবতে পেরেছিলুম? এ যেন সেই বিনা মেঘে বাজ পড়ার মতন।

হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, ছেলেটি তো নেই! বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। তা হলে কী, ছেলেটিকে ওরা ছিনতাই করে নিয়ে পালালো! রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। থাকলে দেখতেই পেতুম। এদিক ওদিক ব্যস্ত হয়ে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। একবার রাজবাড়ির ভেতরটা তো দেখা দরকার! ভেবে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

কিন্তু তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, দিনের আলোয় রাজবাড়ির ভেতরটা দেখে আমি এক্কেবারে ট্যারা হয়ে গেছি। কী বিরাট আর কী চমৎকার! এক-একটা চত্বর পেরিয়ে এক-একটা মহল। এক-একটা মহলে অগুনতি ঘর। কী সুন্দর সাজানো-গোছানো! ওরই মধ্যে হনহনিয়ে হেঁটে হেঁটে আমি ছেলেটিকে খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজে পেলুম না। খুঁজে পাওয়া সম্ভবও না। তবু খুঁজতে খুঁজতে যে-জায়গায় গিয়ে পড়লুম, দেখলুম সেখানে কয়েদখানা। সারি সারি গারদে দেখি, রাজার সেনারা বন্দী হয়ে আছে। আমি দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। সামনে গেলে বাঘ দেখে যদি ওরা ভয় পায়!

হঠাৎ আবার বন্দুকের আওয়াজ—"গুড়ুম!"

আমি হকচকিয়ে গেছি! কী হলো আবার! আবার বন্দুক ছোটে কেন? তখনই আমি হঠাৎ ছেলেটিকে দেখতে পেলুম। দেখলুম তার হাতে বন্দুক। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ও কয়েদখানার দস্যু পাহারাদারের বুকে গুলি মেরে দিয়েছে। পাহারাদার মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছে। ছেলেটি পাহারাদারের ট্যাঁক থেকে ঝটপট চাবির গোছাটা টেনে বার করে নিলে। গারদের ফটকটা খুলে ফেলে "বাবা" বলে চিৎকার করে উঠলো। ওই গারদে দস্যুর দল ওর বাবাকে বন্দী করে রেখেছিল! ওর বাবার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ছেলেটি। আমি দূরেই, ওদের চোখের আড়ালে রইলুম। আমি দেখতে পেলুম ওর বাবা ওকে বুকে তুলে নিয়ে গারদ থেকে বেরিয়ে আসছে। ছেলেটি বাবার গলা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। আমি এতটা দূর থেকে ঠিক দেখতে পাইনি, ছেলের কান্না দেখে ওর বাবার চোখেও জল এসেছিল কিনা। তবে দেখলুম, ওর বাবা ছেলের হাত থেকে সেই চাবির গোছাটা নিয়ে একটি একটি করে কয়েদখানার সব কটি ফটক খুলে ফেললে। অমনি সেই বন্দী সেনারা আনন্দে চিৎকার করে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এলো দলে দলে। রাজপুত্তুরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে খুশিতে নাচতে

লাগলো।

ওরা যখন আনন্দে দিশেহারা, আমি তখন মনে মনে ভাবলুম, আর তো এখানে থাকা ঠিক নয়! মানে মানে কেটে পড়তে হয়!

আমি কেটেই পড়লুম। আমি আবার পাশের বাড়ির ছাতে উঠে প'ড়েছি। বেহালাটা নিলুম। নিয়ে ভাবছি এখন কী করা যায়! ঝট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল আমার মাথায়। আচ্ছা, এখন এ-বাড়ির ছাতে লুকিয়ে না থেকে রাজবাড়ির ছাতে উঠে পড়লে তো হয়! আমি তো জানি, এক্ষুনি ছেলেটি আমায় খুঁজবে!

বাঘ দেখে, দস্যু দেখে আর বোমা-গুলির দুম-দাম আওয়াজ শুনে শহরের লোকেরা সেই যে ঘরে খিল এ'টেছে, আর বেরুবার নামটি নেই। রাস্তা-ঘাট খাঁ খাঁ করছে। যেন মরুভূমি! আমিও তাই এই তালে এই ছাত থেকে লাফ দিয়ে রাজবাড়ির পেছনদিকে ছুটে গেছি। রাজবাড়ির পেছনদিকের পাঁচিল বেয়ে, এক তোলা, দো তোলা টপকে টপকে যখন ছাতে পেশছুলুম, ভাগ্যি ভালো, আমায় কেউ দেখতে পায়নি! দেখবেই বা কেমন করে! তখন কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার সেনারা, রাজবাড়ির দাস-দাসীরা আনন্দে এমন মশগুল যে, বাঘ নামে এই মস্ত জন্তুটার চেহারা তখন ওদের নজরেই পড়লো না। তাছাড়া আমিও কী অতো বোকা, যে চট করে ওদের দেখা দিয়ে বসে থাকি! আমি জানি কেমন করে খুব সাবধানে সবার নজর এড়িয়ে কাজ করতে হয়।

ছাতে উঠে কান পেতে শুনি রাজবাড়ির ভেতরে তখনও ভীষণ হৈ-হল্লা চলছে। আমার তখন মনে হলো, এখন একটু মজা করলে তো হয়! এই কথাটা ভেবেই আমি আবার বেহালা বাজাতে সুরু করে দিলুম। এবার টুং-টাং-টিং নয়। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমি রীতিমতো সা-রে-গা-মা বাজাতে সুরু করে দিয়েছি। আর সেই সা-রে-গা-মা-র সুরটা যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, রাজবাড়ির হৈ-হল্লাটা ততই থমকে থমকে থিতিয়ে এলো। তারপর একেবারে চুপ! আমি তখন ঠিক শুনতে পেলুম, বাজনদারকে খুঁজে না পেয়ে ছেলেটি চিৎকার করছে, "আমার বাঘ বাজনা বাজাচ্ছে। আমার বাঘ কোথা গেল?"

আমি তো পাকা ওস্তাদের মতো একমনে বাজনায় মশগুল। এদিকে কখন যে বাবার হাত ধরে শহরের রাজপুত্তুর বনের রাজপুত্তুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমি তা দেখতে পাইনি। ও ছুটে এসে, আনন্দে আমার পিঠের ওপর লাফিয়ে বসলো। আমার পিঠের সেই গুলি-বে'ধা জায়গাটা যদিও হঠাৎ একটু ব্যাথিয়ে উঠেছিল, তবু আমি তাকে নিয়ে নাচতে সুরু করে দিলুম। তার হাতে বেহালাটা তুলে দিলুম। সে আমার পিঠে বসেই বাজনার সুর ধরলে। আমি তাকে পিঠে নিয়ে তরতর করে সি'ড়ি বেয়ে ছাত থেকে নেমে এলুম। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। ছেলেটি আমার পিঠে বসে বাজনা বাজায় আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকি।

এতো চেনা বাজনার জানা সুর। এ শহরের সবাই তো আগে রাজপুত্তুরের বাজনা শুনেছে। তাই চেনা-চেনা বাজনা শুনে, চেনা মুখটি দেখার জন্যে সবাই একটু একটু দরজা ফাঁক করলো। সবার চোখে বেবাক চাউনি! বাঘের পিঠে বসে রাজপুত্তুর! নিজেদের চোখকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছে না! এতদিন তারা হুন্ডা-গুন্ডার কবলে পড়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিল। তাই আজ বাঘের পিঠে রাজপুত্তুরকে দেখে তারা বিশ্বাস করে কী করে?

তবু তাদের বিশ্বাস করতে হলো। সব-প্রথম একটি ছোট্ট ছেলে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। আমার পিঠে রাজপুত্তুরকে দেখে হাততালি দিয়ে চে'চিয়ে উঠেছিল, "মা, বাঘের পিঠে রাজপুত্তুর!" চে'চাতে চে'চাতে সে ছুটে এসেছিল রাজপুত্তুরের কাছে। অবাক কথা, বাঘ দেখে সে একটুও ভয় পায়নি! রাজপুত্তুর তাকে আমার পিঠে তুলে নিয়ে আবার বাজনা বাজাতে সুরু করলে। সেই ছোট্ট ছেলেটি আমার পিঠে বসে বাজনার তালে তালে হাততালি দিতে লাগলো।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এলো। কাতারে কাতারে মানুষ সেই বাজনার তালে তালে নাচতে সুরু করে দিলে। নাচতে নাচতে আমার পিছু পিছু হাঁটা দিলে। আমি দেখতে পেলুম, গোটা শহরটাই যেন আনন্দে উপচে পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আর আমার সঙ্গে নেচে নেচে হে'টে চলেছে।

তারা আমার সঙ্গে রাজবাড়িতেই ফিরে এলো। আবার তারা দেখতে পেয়েছে তাদের রাজাকে। আবার তারা রাজার গলায় মালা পরিয়ে দিলো। রাজাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো।

রাজা সিংহাসনে বসলেন। দরবার ডাকলেন। দরবার ডেকে রাজা নিজের গলার মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এ মালা আমার গলায় মানায় না। এ-মালা কেউ যদি পাবার যোগ্য হয়, তো সে শহরের এই রাজা নয়, বনের এই রাজপুত্তুর। এই বাঘই আমাদের শত্রু হুন্ডা-গুন্ডাকে খতম করে, আমাদের সম্মান ফিরিয়ে এনেছে। সুতরাং মালা দিন এই বাঘকে।"

রাজার মুখের কথা শেষ হলো না। বলবো কী, অমন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ফুলের মালা নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য ছুটে এলো। অতো মালা আমার গলায় ধরবে কোথায়? একজন সিপাই ছুটে এলো আমার কাছে। আমার গলায় একটি-একটি মালা পরিয়ে দিচ্ছে দেশের মানুষ, ও তখন একটি-একটি মালা খুলে নিয়ে পাশে রাখছে। আর কী হাততালি!

শেষে আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেছি। যখন মালা দেওয়া শেষ হলো, দেখলুম, দরবার ঘরটা উপচে গেছে ফুলে-ফুলে। আমার বেশ মনে আছে, সব-প্রথম আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল রাজা আর সব শেষে আমায় মালা দিয়েছিল রাজ-পুত্তুর। শ্বেত গোলাপের গুচ্ছ। ভারি মিষ্টি গন্ধ!

শুনলে অবাক হয়ে যাবে, রাত্রে আমার সম্মানে বসলো, এক বিরাট সভা। কতো মানুষ সেখানে জমায়েৎ হলো। কতো জ্ঞানী-গুণী, কতো গণ্যমান্য। সকলে আমার গুণ-গানে পঞ্চমুখ। আমার এতো তারিফ করতে লাগলো তারা, মনে হলো আমি কী ঠিক অতটা পাবার যোগ্য!

সভার শেষে, আমাকে শোনাবে বলে রাজা নিজেই সেদিন বাজনা ধরলে। সকলে গদগদ হয়ে বাজনা শুনছে আর থেকে থেকে "আহা, উহু, ওহো" করে সভাকে মাতিয়ে রাখছে। আমিও বোকার মতো চেয়ে চেয়ে, তাদের সঙ্গে মনে মনে "উহু উহু" করতে লাগলুম।

কী সুন্দর করে সাজিয়েছে এই সভাটা। কতো ফুল, কতো রঙিন পতাকা। কতো ফানুস উড়ছে আকাশে, কতো আলোর তারা! কেমন সব রঙ-বেরঙের পোষাক পরে সকলে এসেছে! কী রঙের বাহার! কী সুন্দর সুন্দর পোষাক! চোখ ধাঁধিয়ে যায়!

ধাঁধিয়ে গেল সত্যিই। আমার চোখ না, আমার মন। সকলের গায়ে ওই অমন সুন্দর সুন্দর পোষাক দেখে আমার এমন লজ্জা করে উঠলো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার তো গায়ে পোষাক নেই! রঙ চঙে নাই বা হলো, সাদা-মাটাও তো একটা থাকবে! এতো সব রঙ-ঝলমল পোষাক-পরা গণ্যমান্য মানুষের মধ্যিখানে আমি নির্লজ্জের মতো বসে আছি! আমি ন্যাং—

ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ছুটির বাঁশি…
পূজো এলো। এলো আনন্দের দিন।
নতুন জামা, নতুন জুতো।…
পড়া কম-কম,
মজা হরেক রকম।…
ঠাকুর-দেখা, ভোজ খাওয়া,
সবাই মিলে বাইরে-যাওয়া।…
কোনও প্রোগ্রাম নিয়েই
ভাবনা নেই যদি হাতের কাছে থাকে
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক
ক্রীম
বোরোলীন
হৈ হুল্লোড়ে হঠাৎ কোথাও কেটে
গেলে বা ছড়ে গেলে, কিংবা ঝলসে
গেলে চটপট বোরোলীন লাগিয়ে
নাও, নিমেষে আরাম। তাছাড়া
জীবাণুনাশক বোরোলীন
ত্বকের খাদ্যও বটে। সুস্থ সতেজ
স্বাভাবিক ত্বকের জন্য এমনিতেও
নিয়মিত ব্যবহার করা ভাল।
BOROLINE
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস
প্রাঃ লিমিটেড
বোরোলীন হাউস,
১ সিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

শজারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব

চণ্ডী লাহিড়ী
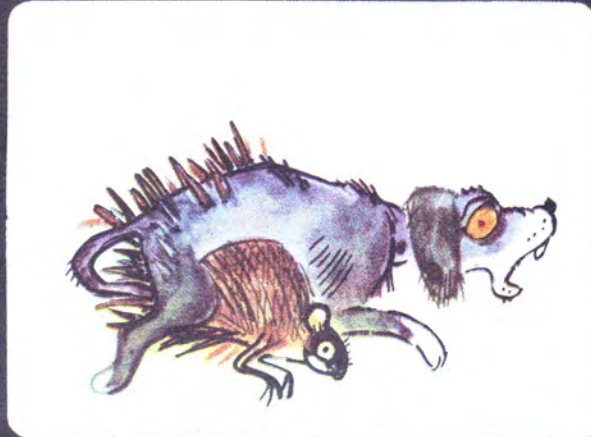
বনফুলের

১

জ্যোৎস্না পাড়ায় চাঁদ উঠেছে
রোদের পাড়ায় সূর্য্যি
মোদের পাড়ায় কি হয়েছে
সেইটে শুধু খুঁজছি
হঠাৎ দেখি বাগান পাড়ায়
ফুটেছে খুব ফুল
আর গরবিনীর কান দুটিতে
দুলছে হীরের দুল।

২

মুচকি ভালো? কিম্বা ভালো মুচকা?
সবার চেয়ে ভালো কিন্তু টাটকা-ভাজা ফুচকা।
সাগরে চাঁদ ওঠা কিন্তু তার চেয়েও ভালো
সবচেয়ে ভালো কিন্তু 'লোড শেডিং'-এর পরে
যখন আসে আলো।
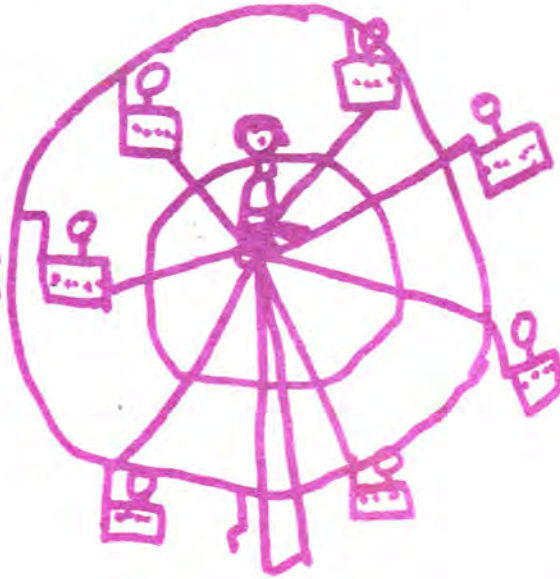
৩

সবাই বলে জল পেলেই
ফসল ফলে সুখে
গোঁফ দাড়ি কবে হবে?
জল ছেটাব মুখে?

ছড়া
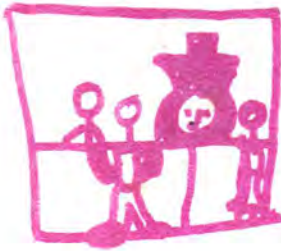
৪

মনের রাগ মনেই ছিল
জ্বলছিল ধিকধিকই
কিন্তু যখন মাথার টিকি
হইল টিক্‌টিকি
ক্ষেপে উঠল লোকটা।
ঠিকরে পড়ল চোখটা।

৫

শামুক শামুক করছ কেন
আমার নাম শম্বুক
শেয়াল শেয়াল করছ কেন
আমার নাম জম্বুক
শালিখ শালিখ করছ কেন
আমার নাম শারী
তিনজনেতে গোলমাল
লাগিয়েছে ভারী।

৬

ধনেশবাবুর সঙ্গে আছে
চিংড়ি মাছের মিল
একটু অমিল ছাড়া,
ধনেশবাবুর দাড়ি আছে
চিংড়ি মাছের দাড়া।
ধনেশবাবু গল্প বলেন
অতি চমৎকার
চিংড়ি মাছের মালাইকারি
তুলনা নেই তার।

ছবি এঁকেছে **শুভেন্দু দেব** ৬ বছর

আশাপূর্ণা দেবী
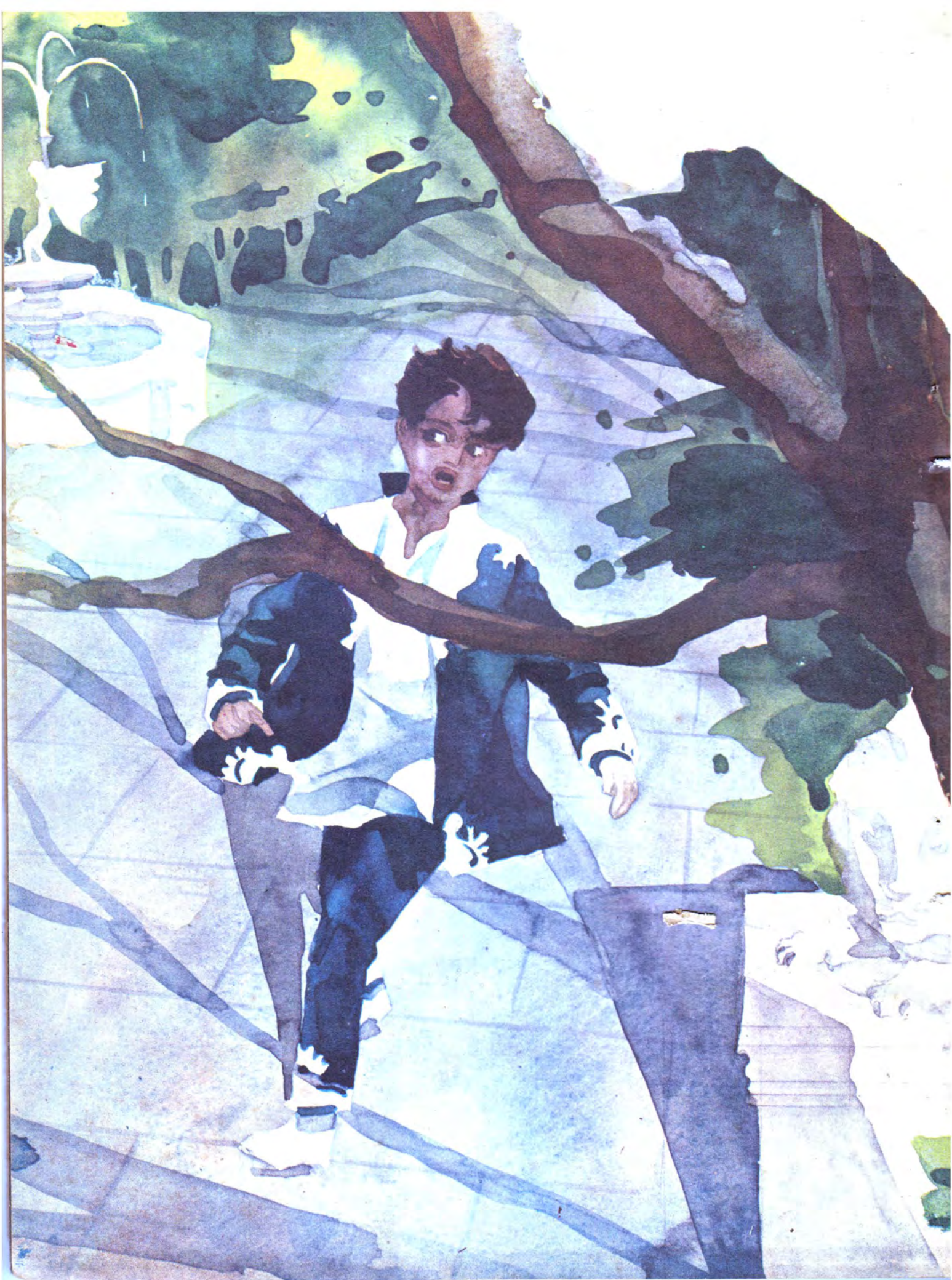
রাজকুমারের পোশাকে

'বিশ্বাসের টী স্টল। বিশ্বাসের টী-স্টল! আসুন দাদা আসুন। বিশ্বাসকে বিশ্বাস করুন, আসল দার্জিলিং টী! টেস্ট্ করে দেখুন একবার। এক কাপ খেলে দু' কাপ খেতে চাইবেন, সেকেন্ড কাপের দাম হাফ্!...বুঝে দেখুন দাদা জলের দরে চা পেয়ে যাচ্ছেন!'

লাল রঙা একটা টিনের চোঙায় মুখ রেখে চেঁচিয়েই চলেছে লোকটা! কে জানে বিশ্বাস নিজেই, না তার কোনো বিশ্বাসী খিদ্‌মদগার। যেই হোক গলা বটে একখানা! শুনে মনে হচ্ছে যেন ওই টিনের চোঙাটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটিয়ে পড়লো বলে। যতক্ষণ ফেটে না যাচ্ছে, শব্দটা তেড়ে তেড়ে প্রায় আকাশে উঠে যাচ্ছে।

আর তারপর আকাশ থেকে ঝরে পড়ে মেলার কলকল্লোল ছাপিয়ে সকলের কানের পর্দায় গিয়ে আছড়াচ্ছে 'জলের দরে চা! জলের দরে চা!'

গলাও যেমন জোরালো, বলার ভঙ্গীও তেমনি ঘোরালো, দু' চারবার শুনতে শুনতেই যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, চা তেষ্টা পেয়ে যায়।

অন্তত টিকলু আর বাপুর পেয়ে গেল। অবশ্য ঠিক চা তেষ্টা পেয়ে যাবার বয়েস ওদের নয়, কিন্তু পরিবেশে কী না করে?

একেতো ওই চোঙা ফাটানো আওয়াজের আকর্ষণীয় ডাক' 'জলের দামে চা'। তার ওপর মেলা তলায় ঘুরছে কি কম ক্ষণ? খিদে তেষ্টা সবই পেয়ে গেছে।

ঘুরছে সেই কখন থেকে অথচ এক পয়সারও কিছু কিনে খায়নি। যদিও রামরাজাতলার এই মেলাতলার দশদিক আচ্ছন্ন করে শুধু খাবারেরই সমারোহ। সুখাদ্য অখাদ্য, শুধু খাদ্য, গুরুপাক খাদ্য, লঘুপাক খাদ্য, দামী সস্তা নানা ধরনের খাদ্য।

কিন্তু খাবে কী? বাড়ি থেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছে শুধু দুই বন্ধুতে একা একা মেলা দেখতে যেতে সাধ হয়েছে তা যাও। কিন্তু খবরদার কিছু কিনে খাবেনা। এক পয়সারও না। 'কলেরা বাধালে দেখবে কে?'

বাপুর ছোড়দি আবার বাপুর ঠিক বেরোবার সময় বেচারার পকেট সার্চ করে যা কিছু ছিল কেড়ে নিয়ে তুলে রাখল। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না বাপু! আবার শুধু নিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না, ভেঁপু বাঁশির সুরে বাড়ির বড়দের কানে তুলল, 'মা, দুর্মতি দেখ তোমার ছেলের!

বাবু পয়সা পকেটে নিয়ে মেলা-তলায় যাচ্ছেন। কম নয়, তিন টাকা কুড়ি।

বেচারা বাপ্পু, কত কষ্টেই না ওই পয়সা কটা জমিয়েছিল। নিয়ে নিল। চিলের মতো ছোঁ মেরে নিল, অথচ যেন দাবির সঙ্গে। ছোড়দিটা সব সময় ওই রকম করে। বাপ্পু কোথা থেকে না কোথা থেকে একটি গল্পের বই জোগাড় করে এনে একটু পড়ছে, ছোড়দির দৃষ্টিতে পড়ল কি গেল। বই হাতছাড়া।

বাপ্পুর ছোড়দি অবশ্য খুবই নিষ্ঠুরতা করেছে বাপ্পুর সঙ্গে, টিকলুর কিন্তু অতটা নয়। তা ছাড়া—টিকলুর ছোড়দিও নেই। টিকলুর হাফ্ প্যান্টের পকেটে পয়সা আছে। তবে নিষেধ-বাক্যটাও আছে তার সঙ্গে। থাকবেই তো। টিকলুর সেজকাকার যে বদ্ধমূল ধারণা মেলাতলা মানেই কলেরার জার্মের ডিপো।

তবু এখন হঠাৎ টিকলু ঘোষণার মতো ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'চল্ বাপ্পু, বিশ্বাসের চাটা একটু টেস্ট করে দেখা যাক।'

সত্যি বলতে টিকলুর এই সাড়ে বারো বছরের জীবনে একদিনের জন্যেও টিকলু স্বাধীনভাবে একা কোনো চায়ের দোকানে বা রেস্টুরেন্টে ঢুকে চেয়ার টেনে বসেনি, নিজে মুখে অর্ডার দেবার সুখে বিগলিত হয়ে বড়দের মতো করে বলবার সুযোগ পায়নি, 'কই দেখি একটা চা—'

অথচ টিকলুর ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে অনেকেই এ সুখ পেয়েছে।

কারণটি ওই সেজকাকা।

সেজকাকার কড়া হুকুম, বাইরে যেখানে সেখানে কিছু খাবে না। অবশ্য তিনি নিজে দয়া পরবশ হয়ে কখনো কখনো ভাইপোকে উচ্চাঙ্গের কোনো রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছেন 'ভালমন্দ' অনেক কিছু। কিন্তু তাতে তো আর পূর্ণ সুখ নেই! সে তো সেই বোকা বোকা খোকা খোকা মুখে চুপ করে বসে থাকা, আর সেজকাকা যখন দরাজ গলায় প্রশ্ন করেন, কী রে কী খাবি? তখন ঘাড় গুঁজে বলা, 'তোমার যা ইচ্ছে।'

না বলে করবে কি? টিকলু নিজে যেটা পছন্দ করবে, সেটাই তো সেজ-কাকার মতে 'ওটা সুবিধের নয়' হবে।

আজ টিকলু নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করবে। করবে বলে সংকল্প করেই বড়দের ভঙ্গীতে বলল, 'চল বাপ্পু, বিশ্বাসের দোকানের চাটা একটু টেস্ট করে আসা যাক।'

বাপ্পুর মনও আন্দোলিত হচ্ছিল ওই 'জলের দাম'টা শুনে, আর অনেকক্ষণ থেকেই বাপ্পু তার হাফ্-প্যান্টের পকেট দুটোয় হাত ঢুকিয়ে খানা তল্লাসি চালাচ্ছিল, যদিই কোনো খানাখন্দের মধ্যে ওই 'জলের দাম'টা পড়ে থেকে থাকে। থাকতেও তো পারে সেলাই টেলাইয়ের খাঁজে। যেমন চিনেবাদামের খোলার মধ্যে থেকে টিপতে টিপতে হঠাৎ এক আধটা আস্ত বাদাম পেয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু নাঃ! ছোড়দির করাল হাত কোনো খানাখন্দকেই বাদ দেয়নি।

বাপ্পু তাই ছিটকে উঠে বলে, 'চা খেয়ে আসা যাক মানে? আসবার সময় কী কথা হয়েছিল?'

টিকলু গম্ভীরভাবে বলে, 'জানি, কী কথা হয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র কলেরার জার্ম, কোথাও কিছু খাওয়া চলবেনা। কিন্তু এটাও তো ভেবে দেখা দরকার নিজেদের বাড়িগুলো কি পৃথিবী ছাড়া?'

বাপ্পু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

উদাস উদাস দার্শনিক গলায় বলে, 'তোর ইচ্ছে হয় খেগে যা! আমার অত পয়সা নেই।'

টিকলুও নিজের পকেটটা সার্চ করছিল এতক্ষণ, এখন আশ্বস্থভাবে বলল, 'আমার কাছে যা আছে দুজনের হয়ে যাবে।'

'নাঃ তুই একাই খা।'

টিকলুর গলা কড়া হয়ে ওঠে, 'বাপ্পু, চিরদিনের জন্যে বন্ধুবিচ্ছেদ চাস? আমার পয়সায় খেলে তোর মান যাবে?'

'আমি কি তাই বলছি?' বাপ্পু তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নেয়, 'বলছি তোরটাতো সবই ফুরিয়ে যাবে তাহলে!'

'যায় যাবে। তুই আয়তো।'

বন্ধুকে প্রায় টেনে নিয়ে আসে টিকলু, 'বিশ্বাসের স্টলে'র সামনে।

যেমন হয়, দুটো খুঁটির সঙ্গে টানটান করে বাঁধা চওড়া লাল শালুর টুকরোর ওপর শাদা রঙ্ দিয়ে লেখা 'আদত দার্জিলিং চা। বিশ্বাসের টী স্টল।'

আর পাশে সরু লম্বা পীজবোর্ডের গায়ে মোটা কলমে লাল কালিতে ধরে ধরে লেখা—

চা	——	চিনির	৩০ পঃ
ওই	——	গুড়ের	২৫ পঃ
টোস্ট	——	মাঃ সঃ	২৫ পঃ
ওই	——	মাঃ বাঃ	২০ পঃ
ডিঃ অঃ	——	সিঙ্গল	৬০ পঃ
ওই	——	ডবল	১১০ পঃ
ডিঃ হাঃ বঃ	——		৪৫ পঃ
লঃ মঃ	——	ফ্রী	....

বাপ্পু টিকলু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকবার লেখাগুলো পড়ে, তারপর মুখ চাওয়াচায়ি করে। ব্যাপারটা কি!

লোকটাতো দিব্যি শাদা বাংলায় কথা বলছে, খাদ্যবস্তুর তালিকাটা কোন ভাষায় লেখা? জিগ্যেস করতেও লজ্জা। গাঁইয়া টাঁইয়া ভেবে বসবে হয়তো।

টিকলুর পকেটে পয়সা, কাজেই টিকলু আত্মস্থ। তাই গম্ভীরভাবে বলে, চায়ের সঙ্গে এর কোনটা অর্ডার দেওয়া যায় বলতো বাপ্পু?

বাপ্পু আরো একবার পড়ে নিয়ে বলে, 'কোনোটারই তো মাথা মুণ্ডু বোঝা যাচ্ছে না ছাই। টোস্টটা যদি বা বুঝলাম, মাঃ সঃ মানে?'

'সেই তো—' টিকলু চিন্তাকুল, 'আবার—ওই মাঃ বাঃ?' ওটাই বা কী?

'চাইনিজ কিছু হবে। ওদেরই তো ভাষার মধ্যে খণ্ডৎ আর বিসর্গর ছড়াছড়ি।'

'সেরেছে। তাহলেই তো বিপদ। না জেনে শুনে একটা কিছু অর্ডার দিয়ে বসা হবে, যদি আরশোলা হয়?'

'হতে পারে! সোনা ব্যাঙের ব্যাপার হওয়াও আশ্চয্যি নয়।'

'তা হলে?'

'শুধুই চা বলা যাক তাহলে।'

বলল টিকলু।

বাপ্পুর অবশ্য কথাটা মনঃপুত হল না। নিয়ম ভেঙে যদি খেতেই হয় তো ভাল মতোই হোক।

বাপ্পু বললে, 'ডিঃ অঃ টা বলে দেখ না। আরশোলা টোলা হবে না বোধ হয়।' আর তার সঙ্গে চিনির চা। এটাই যা বাংলায় লেখা।

টিকলু ততক্ষণে মনে মনে হিসেব করে ফেলেছে, চিনির চা দুটো ষাট পয়সা, ডিঃ অঃ সিঙ্গল ষাট পয়সা. (ডবল হলে তো আরোই বেড়ে গেল) তাহলে সত্যিই তো ফুরিয়ে যায় সব। নাগরদোলাটা আর হয় না। যদিও সেটাও বারণ আছে, কিন্তু অত বারণ শুনলে চলে না। ভীড়ের জ্বালায় তো নাগরদোলার ধারে কাছেই যাওয়া যাচ্ছে না, সবাই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে।

অত বারণ শোনা যায় না বাবা।

নাগরদোলার কথাটা ভেবে টিকলু বেশ বিজ্ঞভাবে বলে, 'তার থেকে এই লঃ মঃ টা অর্ডার দেওয়া যাক বুঝলি?

এটা যখন ফ্রী দিচ্ছে।'

বাপ্‌ন ঈষৎ চিন্তিতভাবে বলে 'আচ্ছা ফ্রী কেন দিচ্ছে বল তো?'

টিকল্‌ন আরও বিজ্ঞ অভিজ্ঞ হয়, 'কেন আর। দোকানের বিজ্ঞাপন। একটা খাবার যদি ফ্রী দেয়, লোকে ছ্‌নটে আসবে।'

'তবে ঢ্‌নকে পড়া যাক।'

ঢ্‌নকে পড়ল। নিয়তির অমোঘ আকর্ষণে। দ্‌নজনেই একসঙ্গে। তার পর ঠিক বড়দের মতো ভঙ্গীতে দ্‌নখানা টিনের চেয়ারে বেশ শব্দ করে বসে পড়ে বলে উঠল, 'কই দ্‌নটো চা দেখি। তার সঙ্গে দ্‌নটো লঃ মঃ।'

যে চোঙায় ম্‌নখ দিয়ে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছিল, সে এখন 'বিরতি' দিয়েছে একট্‌নক্ষণের জন্যে। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তার সঙ্গে দ্‌নটো কী?'

'বললামতো লঃ মঃ! কানে কম শোনেন না কি?'

'লঃ মঃ! ও বিশ্বাসদা, এ ছেলেরা বলে কী! লঃ মঃ মানে?'

বিশ্বাসদা, অর্থাৎ দোকানের মালিকও ভুর্‌ন কুঁচকে বলেন, 'লহ্‌ মহ্‌?' সেটা আবার কী হে ছোকরা?

ছোকরা!

টিকল্‌নর পকেটে পয়সা, তাই তার ম্‌নখটা বেশী লাল হয়ে ওঠে। তাছাড়া টিকল্‌ন খ্‌নব ফর্সাও। সেই লাল লাল ম্‌নখে বলে ওঠে টিকল্‌ন, 'ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না? ছোকরা মানে?'

'আরে বাস! ঘাট হয়েছে বাব্‌ন'। কিন্তু কথাটা যে ব্‌নঝতে পারছি না। লহ্‌ মহ্‌ কি?

টিকল্‌ন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, 'কী তা' আমরা বলব? নিজেরাই লিখে রাখেননি ব্‌নঝি? এই তো দেখ্‌নন না কী এটা? লঃ মঃ ফ্রী। ফ্রী দেবার নাম করে লোককে ডেকে তারপর এই রকম করা। বাঃ বেশ।'

বিশ্বাস আর তার লোক, দ্‌ন'জনে একবার সাইন (পীজ) বোর্ডটা দেখে নেয়, তারপরই হো হো করে হেসে ওঠে। থামতেই চায় না।

এত হাসির মানে?

রেগে চেয়ার ছেড়ে চলে আসে টিকল্‌ন, বলে উঠে, আয় বাপ্‌ন। এ দোকানে আর নয়। এটা পাগলের দোকান। তা' নইলে শ্‌নধ্‌ন শ্‌নধ্‌ন কেউ হাসে?'

বিশ্বাস কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, 'শ্‌নধ্‌ন শ্‌নধ্‌ন কী দাদা, আপনারা যে না হাসিয়ে ছাড়ছেন না। লঃ মঃ মানে হচ্ছে লঙ্কা মরিচ। রাখতে হয় না একট্‌ন লঙ্কা মরিচের গ্‌নঁড়ো? তা' কথাগ্‌নলোকে একট্‌ন সংক্ষেপ করে না নিলে একফ্‌নট বোর্ডে ধরবে কেন বল্‌নন? তাছাড়া আর্টিস্ট দিয়ে লেখাতে হয়েছে নগদ করকরে পয়সা খরচা করে। এক একটা অক্ষর লেখাতে পাঁচ নয়া। দরাজ হাতে যদি লেখাতে দিই 'টোস্ট, মাখন সহ, টোস্ট মাখন বাদ, ডিম হাফ্‌ বয়েল, ডিমের অমলেট্‌ ডাবল সিঙ্গল', তাহলে তো ফতুর হয়ে যাব।...যাক এখন বল্‌নন কী দেব। একটা কিছ্‌ন নিলে তবে না লঙ্কা মরিচ ফ্রী? শ্‌নধ্‌ন ফ্রীটা চাইলে যে সেই ফাউয়ের গল্প হয়ে যাবে।'

'ফাউয়ের গল্প মানে?'

গল্পের গন্ধে বাপ্‌ন উসখ্‌নস করে ওঠে।

তা শ্‌নধ্‌ন বাপ্‌নও নয়, স্টলের কোনের দিকে নতুন প্যাকিং কাঠের টেবিল জোড়া করে যে কজন চা টোস্ট ডিমের অমলেট নিয়ে বসে কসে খাওয়া চালাচ্ছিল তারাও যেন চঞ্চল হয়ে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে।

বিশ্বাস উৎসাহ পেয়ে খোনাগলায় বলে, 'আহা জানো, ইয়ে জানেন না, একজন লোক খাবারের দোকানে গিয়ে চারটে হিঙের কচ্‌নরি চাইল, দোকানী শালপাতার ঠোঙায় করে চারটে হিঙের কচ্‌নরি দিয়ে তার সঙ্গে আর চারটে আল্‌নর দম দিল। দেখে তো লোকটা মহা খাপ্‌পা, 'আবার এগ্‌নলো চাপাচ্ছো কেন? বাড়তি খরচার মধ্যে আমি নেই।'...দোকানী হেসে বলল, আল্‌নর-দমের জন্যে আলাদা পয়সা দিতে হবে না বাব্‌ন, ওটা ফাউ।'

'তাই নাকি?' লোকটা একগাল হেসে বলল, 'তবে এই ফাউটাই নিয়ে যাচ্ছি, কচ্‌নরিটা থাক। এতেই এবেলাটা চলে যাবে।'

সেই কথাই বলছি। তবে লঙ্কা মরিচের গ্‌নঁড়ো তো আর আল্‌নর দমের মত শ্‌নধ্‌ন খাওয়া যায় না?

'আপনি' করেই বলছে, 'বাব্‌ন'ও বলছে, কিন্তু সবটাই যেন তামাসার ছলে। যেন মজা করছে। ছোটদের নিয়ে বড়রা যেমন করে।

টিকল্‌ন এটা ব্‌নঝতে পারে, টিকল্‌ন মনে মনে চটে। চটার আরো কারণ, এদের কাছে টিকল্‌নদের বোকামি ধরা পড়ে গেছে।

নেহাৎ চায়ের দোকানে টোকানে আসার অভ্যাস নেই বলেই এমনটা হল, নইলে টিকল্‌ন কখনো বোকা বনে? যে টিকল্‌নর ঠাকুমা বলেন, 'এ ছেলেকে নদীর এপারে প্‌নঁতলে, ওপারে গাছ গজায়।'

এ ছাড়াও অনেক ভাল ভাল বিশেষণ আছে টিকল্‌নর, যেমন 'কীর্তিচন্দ্র' 'মহাপ্রভু', 'শাহানসা', 'বোম্বেটে' 'বিচ্ছ্‌ন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই টিকল্‌ন কিনা কথার সর্টকাট ব্‌নঝতে পারল না! ফট্‌ করে লঃ মঃ চেয়ে বসল!

লোকটা বেজায় অভদ্র!,

'বাব্‌ন' বলছিস, 'আপনি' বলছিস, ঠিক আছে, তার সঙ্গে অমন একটা ব্যঙ্গের স্‌নর মিশিয়ে দেওয়া কেন? আর ওই কোনের মধ্যে যারা বসেছিল, তারাই বা এখানে এত উকিঝ্‌নঁকি মারছে কেন? খাচ্ছিলি খা না বাবা। এই ব্‌নড়ো হয়ে যাওয়া লোকগ্‌নলোর যদি কোনো ভব্যতা থাকে। টিকল্‌নর দিকে এমন করে তাকাচ্ছে চোখ ড্যাবা করে। কেন, টিকল্‌নর কপালে কি দ্‌নটো শিঙ্‌ আছে? না সিন্ধ্‌নঘটকের মতো দ্‌নটো দাঁত আছে?

ওর তাকানো দেখে মাথা জ্‌নলে যাচ্ছে, দোকান থেকে বেরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু হঠাৎ চলে গেলেও মান থাকে না। অতএব টিকল্‌ন আবার গ্‌নছিয়ে বসে গম্ভীর গলায় বলে, ঠিক আছে। দিন দ্‌নটো টোস্ট আর দ্‌নটো হাফ্‌ বয়েল, আর দ্‌নটো চা। চিনির চা দেবেন। কীরে বাপ্‌ন হাফ্‌ বয়েল খাবি না অম্‌লেট? অমলেট্‌? আচ্ছা একটা হাফ্‌ বয়েল, একটা অমলেট্‌।

চোঙাওলা মিটিমিটি হেসে বলে, 'পয়সা কড়ি সঙ্গে আছে তো ভাই?'

বটে! এই কথা! আর নয় এখানে।

টিকল্‌ন এবার চেয়ারটা ঠেলে ফেলে কড়া গলায় বলে, 'বাপ্‌ন, চলে আয়। এটা ভদ্দর লোকের জায়গা নয়।'

'আহাহা চটছেন কেন ভাই, ছেলে-মান্‌নষ, সঙ্গে গার্জেন নেই, ভুল ভাল তো হতেও পারে; তাই শ্‌নধোচ্ছিলাম। যাক গে বস্‌নন বস্‌নন।'

'না না, অন্য দোকানে যাব।'

'যেতে চান যাবেন, তবে মিছিমিছি রাগ করছেন ভাই। আমি মন্দ কিছ্‌ন বলিনি। দেখলাম কিনা রেস্ট্‌নরেন্টে ফেস্ট্‌নরেন্টে আসার অভ্যেস তেমন নেই, তাই ভাবছিলাম—'

'ভাব্‌নন বসে বসে! নয় তো চোঙায় ম্‌নখ দিয়ে চেঁচান। লোককে কেমন জলের দরে চা খাওয়াতে পারেন, বল্‌নন ডেকেডেকে।

বলে স্টল থেকে নেমে পড়ে টিকল্‌ন।

মানে নেমে পড়তে যায়, কিন্তু পড়া হয়না, হঠাৎ এপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে ওর শার্টের কলারটা চেপে ধরে হ্‌নঙ্কার দিয়ে ওঠে সেই

ড্যাবড়া চোখে তাকানো আধাবুড়ো লোকটা।

লোকটার সাজসজ্জা সমেত চেহারা-খানা যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর! তৎ-কালীন ঘটক নায়েব অথবা সওদাগরি অফিসের বড়বাবু মার্কা। বেঁটে খাটো গড়ন, হলদে হলদে গায়ের রং, মাথায় পাকা কাঁচা চুল কুচিয়ে ছাঁটা, পরণে খাটো ধরনের ধুতির ওপর গলাবন্ধ জিনের কোট, গলায় পাক দিয়ে কোঁচানো উড়ুনি, বগলে ছাতা, পায়ে ক্যাম্বিসের সু।

হুঙ্কারটাও সেকালেরই মত বাজখাই।

'কী যাদু, এই একটা ছুতো তুলে কেটে পড়ছিলে, কেমন? আর পালাতে হচ্ছে না—।

হঠাৎ সবাই থমকে যায়।

এ আবার কী?

তারপরই টিকলু ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'এর মানে?'

'মানে বুঝছোনা? তা' বুঝবে কেন চাঁদ? ওদিকে দুটো বুড়ো বুড়ি কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ করে ফেলল, আর তুমি এখনো বোকা সেজে উড়ে পালাবার তাল করছ। বলি খোকা রাজাবাবু, প্রাণে কি তোমার মায়া মমতার বালাই নেই? বুড়ো ঠাকুমা ঠাকুর্দার কথাটা একবার ভাবছ না ভাই?'

হুঙ্কার থেকে একেবারে সুর ঝঙ্কার!

টিকলু এখনও ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'পাগলের মত কী সব যা তা বলতে শুরু করেছেন? ছেড়ে দিন বলছি। নইলে চেঁচিয়ে লোক জড় করব।'

ছাঁটাচুল জিনের কোট পরা আধ-বুড়ো ভদ্রলোক তাঁর পাশের লপেটা মার্কা সিকিবুড়ো লোকটার দিকে একবার দৃষ্টি পাত করেন, তারপর দৃষ্টি পাত করেন পিছনের 'না বুড়ো' মস্তান মার্কা ছোকরা দুটির দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা টিকলুকে এমন-ভাবে ঘিরে ধরে যে, হঠাৎ লাফ দিয়ে পালাবার পথ আর থাকেনা টিকলুর।

যাকে বলে 'ঘেরাও।'

হঠাৎ এই হঠাতের ধাক্কায় বাপু বেচারী থতমত খেয়ে গিয়েছিল, এখন সে কিঞ্চিত ধাতস্থ হয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'ব্যাপারটা কী? হঠাৎ একে ধরছেন যে? পাগল না কি আপনারা?'

'এটি আবার কে? ফোঁস কেউটে ফোঁ! বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এই রকম সব গুণনিধি বন্ধু জোটানো হয়েছে কেমন? ছি ছি। আচ্ছা খোকা-রাজাবাবু হঠাৎ তোমার মাথায় কী ভূত চাপলো বলতো, তাই পালিয়ে এলে? পালিয়ে এসে এইভাবে হত-ভাগার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছ, যেখানে সেখানে খাওয়া দাওয়া করছ, একবার ভাবছনা কী বংশের ছেলে তুমি, কী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েসের মধ্যে প্রতিপালিত তুমি—'

'টিকলু,' বাপু চেঁচিয়ে ওঠে, এই পাগলের পাল্লা থেকে চলে আয়। খুব চা খেতে ঢোকা হয়েছিল।'

কিন্তু চলে আসবে কি, টিকলু তো তখন ঘেরাও। শুধুই যে ওই গলায় উড়ুনি গায়ে জিনের কোট ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক, তা'তো নয়। বিশ্বাস তার চায়ের দোকানের ভবিষ্যৎ ভুলে, এবং বিশ্বাসের সহকারী তার চোঙা ফেলে, একেবারে ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, কাজেই টিকলুর অবস্থা ষষ্ঠরথী বেষ্ঠিত।

বাপু বলে ওঠে, 'টিকলু আমি মেলার অন্য সব লোকেদের ডেকে আনব?'

টিকলু ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, এখুনি লোক ডেকে আনতে হবে না। এদের পাগলামীর বহরটা দেখে নিই আগে তারপর দেখছি কে আমায় ধরে রাখতে পারে।

কিন্তু যতই হোক ছেলেমানুষের গলা, তাকে ছাপিয়ে বাজখাঁই গলা হেঁকে ওঠে, খোকা রাজাবাবু তুমিই এবার পাগলামীটা ছাড়ো, বুড়ো বুড়িকে আর কাঁদিও না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।'

বিশ্বাস কোম্পানী বোধহয় এতক্ষণে রহস্যের সূত্র পায়, চোখ গোল গোল-করে বলে, 'ব্যাপার কী মশাই, পালিয়ে আসা ছেলে না কি? কাদের ছেলে?'

ঊনবিংশ শতাব্দী হঠাৎ যেন-আত্মস্থ হয়ে যান, মুখে ফুটে ওঠে একটি অলৌকিক হাসি। শান্ত গম্ভীর গলায় বলেন, 'কাদের ছেলে? ছেলে হচ্ছে পাট্টাদার বাহাদুরের পুত্র কুমার রাজীবনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুরের একমাত্র সন্তান শ্রীল শ্রীমান দীপেন্দ্র নারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর। হিঙুল-গঞ্জের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজীব-নারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুরের পুত্র যুবরাজ শ্রীল শ্রীযুত অনন্ত-নারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুরের একমাত্র সন্তান শ্রীল শ্রীমান দীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর।'

ওরেব্‌ বাস! তারমানে আপনি বলতে চান ছেলেটি হচ্ছে কোনো এক রাজপুত্তুর?'

চোঙাওলা বলে ওঠে কথাটা।

'জিনের কোট খাটো ধুতি' এই বলে ওঠার দিকে তাকান, একটুক্ষণ তাকিয়েই থাকেন, তারপর বলেন, 'বলতে চান কথাটার মানে? শুধু শুধু চাই? আর বলতে চাইলেই সব হয়ে যাবে, না চাইলে নয়? চাওয়া-চায়ির কথাই নয়। যা সত্যি তাই বলছি, হ্যাঁ তাই।'

'আপনি তো তাজ্জব করলেন, এ যুগে এখনো রাজারানী রাজপুত্তুর রাজকন্যা এসব আছে?'

'আছে মশাই আছে। পৃথিবীতে সবই আছে সবই থাকে। একদা কি মহাকবি কৃত্তিবাস ভগবানকে ডেকে বলে যান নি প্রভু—তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায়নাকো কভু।' জানেন শ্রীবৃন্দাবনে এখনো শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজে, রাধিকার নূপুর ধ্বনি শোনা যায়, নদীয়ার পথে গৌরাঙ্গর কীর্তনের রোল ওঠে, আর নিজের নিজের কানে হাত চাপা দিলেই বুকের মধ্যে রাবণের চিতা হু হু করে জ্বলে ওঠে।'

বাপু অলক্ষিতে টিকলুকে টিপে আস্তে বলে, 'রাবণের চিতার কথাই তো জানি, বুড়ো এতসব কী বলছে রে?'

'যা প্রাণ চাইছে বলছে। শুনে যা একমনে দেখ আরো কত কী বলে।'

'এই তো তোকে রাজপুত্তুর বলছে—' বাপু বলে ওঠে, আমায় আবার মন্ত্রীপুত্তুর বলে বসবে না তো? তা' 'কোথাকার রাজা?' বাপু জোরে হি হি করে হেসে ওঠে, 'লাঙুলগঞ্জের? কী রে টিকলু, তুই তাহলে লাঙুলগঞ্জের রাজপুত্তুর?'

'আঃ! এ তো আচ্ছা ফাজিল ছোকরা! ক্যাম্বিসসু ভদ্রলোক অবজ্ঞার গলায় বলেন, 'এই সব ছেলের সঙ্গে মিশে তোমার কতটা অবনতি হয়েছে, তা' অনুমান করতে পারছি খোকারাজাবাবু।'

বিশ্বাস কোম্পানী ব্যগ্রহয়ে বলে, 'ও মশাই ওই লাঙুল না হিঙুলগঞ্জ সেটা আবার কোনখানে? জীবনে তো নাম শুনিনি।'

ছাঁটাচুল খোঁচা গোফ্‌ ধিক্কারের গলায় বলেন, 'হিঙুলগঞ্জের নাম শোনেন নি? মশাই তো দেখছি ভূগোলে খুব কাঁচা।'

বিশ্বাস একগাল হেসে বলে, 'সে যা বলেছেন। ওই ভূগোলের গোল-মালেই মাথা গোলমাল হয়ে গিয়ে লেখা পড়াটা আর হল না। তাই এই অবস্থা। তা' বলুন না মশাই।'

খাটো ধুতি এবার উদার হন, করুণাঘন গলায় বলেন, 'তা' যদি বললেন, 'অনেকেরই আপনার মতন অবস্থা। শুনলেই চোখ কপালে তুলে বলে সেটা আবার কোনখানে মশাই?'

আমি বলে দিই, 'ওহে সেটা হচ্ছে বকখালি পার হয়ে সাড়ে সাতক্রোশ দক্ষিণে। থানা কুমীরখালি, মৌজা ভাসানখালি পত্তন হিঙুলগঞ্জ।...এই যে ছেলেটিকে দেখছেন? এর প্রপিতা-মহ রাজা বিজয়নারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুরের দাপটে মহারাণী ভিক্টোরিয়া চিন্তাযুক্ত হতেন। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? তা' এর পিতামহ রাজা রাজীবনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুরের নামেও একদা বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। তবে বৃদ্ধ হলে যা হয় প্রজারা আর মানতে চায় না, তা ছাড়া বর্তমান যুবরাজ, মানে এর পিতা-ঠাকুর অনন্তনারায়ণ রাজ্যে উপস্থিত না থাকার জন্যও বটে। দিনকাল সব পাল্টে যাচ্ছে মশাই। আমি এই বক্রে-শ্বর বাক্যবিনোদ তিন পুরুষ ধরে এই রাজ বংশের অনুগত হয়ে আছি। অথচ আমার ছেলে, ব্যাটা বলে কিনা রাজবাড়ির কাজ আর করবে না! বিশ্বাস করতে পারছেন?'

বিশ্বাস মশাই মাথা নেড়ে বলে, 'কথাটা অবিশ্বাস্য বটে, তবে এ যুগের ছেলে পুলের পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে, রাজা টাজা কি সত্যি আর এযুগে আছে মশাই?

'রাজা' নামটা তো উপে গেছে পৃথিবী থেকে। এখন তো শুধুই মন্ত্রী।...... মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে ধুল পরিমাণ। কিন্তু রাজা? কই শুনি না তো?'

'তা শুনবেন কোথা থেকে?'

বক্রেশ্বর বাক্য বিনোদ রেগে উঠে বলেন, 'এ যুগের যে সবই সৃষ্টি ছাড়া! মাথা নেই পাগড়ী, হাত নেই হাতিয়ার, রাজা নেই মন্ত্রী।...কিন্তু আমাদের হিঙুলগঞ্জে এখনো রাজা আছে। আর এই অবোধ বালকটিই হচ্ছেন সেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ মালিক।'

ইস!

বিশ্বাস মনে মনে জিভ কাটে।

এই ছেলেকে কিনা সে ঠাট্টা তামাসা করেছে, পকেটে পয়সা আছে কি না বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ছি ছি।

বিশ্বাস তাই নিজের ত্রুটি সামলাতে চেষ্টা করে।

এখন আর ব্যঙ্গের সুরে নয়. ভক্তির সুরে বলে, 'ইস! এত বড় ঐতিহ্য আপনার আর আপনি কিনা এইভাবে পালিয়ে এসে—না ভাই খুব অন্যায় হয়েছে আপনার। যান যান দেওয়ান মশায়ের সঙ্গে চলে যান। 'আহা' ছেলেটির বুঝি বাপ মা নেই বাক্যেশ্বর বক্রবাগীশ মশাই?'

'কী? কী বললেন,' বক্রেশ্বর বাক্য-বাগীশ প্রায় ছিটকে ওঠেন, 'নাম বদলাচ্ছেন কেন? এই যে আপনি বিশ্বাসের টী স্টলের বিশ্বাস, হঠাৎ যদি আমি আপনাকে নিশ্বাস মশাই বলে ডাকতে শুরু করি, আপনি পছন্দ করবেন? বলুন, করবেন পছন্দ?'

বিশ্বাস বিনয়ের অবতার হয়ে বলে, 'ভুল হয়ে গেছে বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশ মশাই। মাপ করবেন। জানেনই তো মূর্খের অশেষ দোষ। তা নিজ গুণে ক্ষমা করে নিয়ে বলুন ঘটনাটা সব বিস্তার করে। মা বাপ আছেন?'

'এই যে বললাম এর পিতাঠাকুর দেশে না থাকাতেই যত বিপত্তি। হরপার্বতীর মত মা বাপ আছেন, তবে এখানে নেই এক বছরের জন্যে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন।'

'পৃথিবী পরিক্রমা?' সেটা আবার কী জিনিস মশাই?'

'উঃ! আপনাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না, মনে কিছু করবেন না নিশ্বাস মশাই কী আর বলব। শহর বাজারে চায়ের দোকান দেন, আর বিশ্ব পরিক্রমা মানে জানেন না?

মানে হচ্ছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছেন। এ কথাটার মানে জানেন? না কি তাও জানেন না? তবে বলি—জগতের সব দেশ রাজ্য দেখতে বেরিয়েছেন।'

বিশ্বাস চোখ কপালে তুলে বলে, 'বলেন কি? তা আপনাদের হিঙুল-গঞ্জেও এত প্রগতি টগতি হয়েছে? রাজা রানী পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন?'

এতে এত আশ্চর্য হবার কী আছে মশাই? ভ্রমণের জন্যে আবার প্রগতি লাগে না কি? যা লাগে সে হচ্ছে টাকা। একটা বেড়ালের গলায় আপনি টাকার থলি বেঁধে ছেড়ে দিন, সেও বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসতে পারবে। আর এতো জলজ্যান্ত দুটো মানুষ। তা' ছাড়া এঁরা কি আর সেই জঙ্গল রাজ্যে পড়ে থাকেন মশাই? সারা বছরই ছেলেকে নিয়ে হিল্লী দিল্লী করে বেড়ান। রাজ্যে থাকতে আছেন শুধু বৃদ্ধ রাজা ও রানীমা। তবে যুবরাজ যুবরানীমা নিজেরা পৃথিবী ভ্রমণের প্রাক্‌কালে এই বালককে পিতামহ পিতামহীর কাছে রেখে যান।......কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস তাঁরা যাবার ক'দিন পরেই হঠাৎ ছেলে হাওয়া। দেখুন ভেবে বৃদ্ধ বৃদ্ধার মানসিক অবস্থাটি কেমন! সে আজ ছয় মাস হয়ে গেল। তদবধি আমি এই তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ভারত চষে বেড়াচ্ছি। ছেলে খোঁজার দৌলতে কত দেশভ্রমণ কত তীর্থদর্শন হয়ে গেল, ইয়ে মানে বাধ্য হয়েই ঘুরতে হয়েছে আর কি। এর মা বাপ ফিরে আসার আগে ছেলেকে খুঁজে বার করে রাখাই চাই। বুঝতেই পারছেন রাখতে না পারলে মুখটা কোথায় থাকবে?

'তাই তো—'

বিশ্বাস বিজ্ঞের মত বলে, কথাটা সত্যি। কিন্তু ছবি ছাপিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই তো হত।'

'চমৎকার বলেছেন! সে কাগজ যদি 'ইনকেস্' যুবরাজ যুবরানীর হাতে পড়ে যায়? তখন? কী কেলেঙ্কারটা হবে ভাবুন। তাঁরা ছেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াতে বেরোলেন, আর—যাই হোক মশাই ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন চল ভাই—'

ভাল করে হাত ধরেন টিকলুর।

বাপী হাত পা ছুঁড়ে প্রায় ভেঙিয়ে বলে ওঠে, 'আহা! এখন চল ভাই!' আবদার! শুনছিস টিকলু। বুড়োর চালাকি? বুঝেছি—আপনি বুড়ো হচ্ছেন একটি ছেলেধরা। দল নিয়ে বেরিয়েছেন মেলাতলায় ছেলে ধরতে। বুঝিনা কিছু? টিকলু, দাঁড়া তুই আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছি—'

কিন্তু এ কী? টিকলু হঠাৎ এমন ঠান্ডা মেরে যায় কেন? টিকলুর সেই রাগারাগি দাপাদাপি কোন ফাঁকে অন্তর্হিত? 'টিকলুর মুখে যেন একটি অলৌকিক লাবণ্যময় হাসির আলো।

সেই হাসির আলো মাখা মুখেই টিকলু অলক্ষ্যে বাপীর গায়ে একটা ক্ষুদে চিমটি কেটে মোলায়েম গলায় বলে, 'এই বাপী, ছিঃ! ওভাবে কথা বলতে হয় না। যতই হোক উনি আমাদের গুরুজনের মত।'

উনি আমাদের গুরুজনের মত!

বাপীর মুখটা হাঁ হয়ে যায়।

'উনি আমাদের গুরুজনের মতো?'

'তা তো নিশ্চয়ই। শুনলি তো তিন পুরুষ ধরে উনি—'

বাপী চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'পাগলদের পাল্লায় পড়ে তুইও পাগল হয়ে গেলি না কি রে টিকলু? কী বকতে শুরু করলি?'

টিকলু আবার অলক্ষ্যে হাত বাড়িয়ে বাপীর গায়ে একটি শ্যাম চিমটি কেটে ধ্যানী বুদ্ধ ধ্যানী বুদ্ধ মুখে বলে, 'থাক বাপী! ধরাই যখন পড়ে গেছি, তখন আর লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমায় যেতে দে—'

বক্রেশ্বর বাক্যবিনোদ আকর্ণ হেসে ফেলে বলেন, 'এই তো সোনা ছেলের মত কথা! ওরে গজগোবিন্দ একখানা ট্যাক্সী ডাক। বলবি সোজা ডায়মণ্ড হারবার। যত টাকা লাগে।'

সেই সিকিবুড়ো গোছের লোকটা সাঁ করে বেরিয়ে যায়।

আর বাপী হতাশ মুখে ফেলে আসা টিনের চেয়ারটাতেই আবার বসে পড়ে বলে 'টিকলু আমার মাথা ঘুরছে।'

'আহা হা, বোধহয় খিদেয়।'

বিশ্বাস মশাই তৎপর হয়ে বলেন, ঈস্ দেখ তো কী কাণ্ড! ছেলেরা চা খেতে এসেছিল!...সাধন চটপট দুটো অমলেট, দু' পেয়ালা চিনির চা, আর দু পীস্ করে মাখনদার টোস্ট। খবরদার বিল কাটবি না।'

বক্রেশ্বর গর্জে ওঠেন, 'বিল কাটবে না মানে? আমার সামনে আপনি হিঙুলগঞ্জের রাজকুমারকে দাতব্যে খাওয়াবেন?'

'আ ছি ছি, এ কী বলছেন!'

বিশ্বাস অবিশ্বাস্য রকমের লম্বা জিভ কেটে বলে, 'আমার এমন আসপর্দা হবে? আপনি খুশী হয়ে যা দেবেন মাথা পেতে নেব। আমার দোকান থেকে আপনি হারানো মাণিক খুঁজে পেলেন, আমায় তো আপনার সোনার মেডেল দেবার কথা।'

'দেবার কথা, দেব। হিঙুলগঞ্জে গিয়ে পাঠিয়ে দেব। এখন ছেলেকে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।'

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে টিকলুর দিকে তাকিয়ে থাকেন বক্রেশ্বর পাছে পালায়।

বিশ্বাস তার টেবিলে পরিপাটি করে দুজনের মত খাবার গুছিয়ে দেয়।

টিকলু চেয়ারটা টেনে নিয়ে আবার গুছিয়ে বসে বলে, 'আয় বাপী শেষবারের মতো দু'জনে একসঙ্গে খেয়ে নিই।'

বাপী আর সহ্য করতে পারে না, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলে, 'সত্যি সত্যি তুই ওই বুড়োর সঙ্গে চলে যাবি?'

টিকলু করুণাঘন কণ্ঠে বলে, 'যেতেই যে হবে ভাই। এখন বুঝতে পারছি চলে এসে কাজটা বড়ই খারাপ করেছিলাম। আহা ঠাকুরমা ঠাকুর্দা বুড়ো মানুষ! তাঁদের খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছে।'

তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে আস্তে আস্তে বলে, 'এই বাপী, মন খারাপ করিস না, মজাটা একটু দেখাই যাক না। দেখ্ গল্পের বইতে ছাড়া 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'যে কী জিনিস তা' তো কখনো জানলাম না, ভাগ্যে যখন জুটে যাচ্ছে দেখেই আসি না একবার।'

বাপী ধরা গলায় বলে, 'আর ফিরবি তুই?'

'ফিরবো না? পাগল না কি?'

'ওরা তোকে ছাড়বে?'

'ধরে রাখবে এত সাধ্যি আছে?'

'আর মাসিমা যখন বলবেন টিকলু কই?'

'তুই বলে দিবি মেলার ভীড়ে কোথায় হারিয়ে গেলো দেখতে পেলাম না।'

'আচ্ছা বুড়ো যা বলছে সত্যি বলে মনে হচ্ছে তোর? তুই কি ঠিক ওদের ছেলের মতন দেখতে?'

'খুব সম্ভব। না' হলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল কেন?'

'ছেলেধরা হতে পারে না?'

'পৃথিবীতে এত ছেলে থাকতে আমাকেই বা ধরতে আসবে কেন?'

'তা বটে!' বাপী চুপ করে যায়।

বক্রেশ্বর বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আতঙ্কের গলায় বলেন, 'আবার দু'-

জনে কী ফুস্ ফুস্ গুজ গুজ হচ্ছে?'

টিকলু খেয়ে প্যান্টে হাত মুছতে মুছতে টান টান হয়ে জোর গলায় বলে, 'কী আবার? এতদিন একসঙ্গে থাকলাম, বন্ধুত্ব হ'ল, চলে যাবার সময় গল্প করে যাব না?'

বক্রেশ্বর বোধহয় ভয়খান, ভাবেন খাঁচায় ভরে ফেলতে না পারা পর্যন্ত বেশী চাপ দিয়ে কাজ নেই। তাই ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'তা তো সত্যি, তাতো সত্যি, কও ভাই কও। আমার ভাবনা, পাছে আবার শিকলি কাটো।'

টিকলু বুকটান করে বলে, 'দেখুন হিঙুলগঞ্জের রাজবাড়ির ছেলে কখনো মিথ্যে কথা বলে না। একবার যখন বলেছি ফিরে যাব, তখন যাবই। বেশী ইয়ে করলে বিগড়ে যাব কিন্তু।'

না না সে কী। চল ভাই, তাই চল।'

বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশ ত্রস্তে ব্যস্তে বলেন, 'তোমার মা বাপ ফিরে আসা পর্যন্ত অন্তত থেকো ভাই, যাতে এই বুড়োটার মুখ থাকে মাথা থাকে।'

বক্রেশ্বর যেন বিনয়ে গলে পড়েন।

আর বক্রেশ্বর কেবল তাকাতে থাকেন ট্যাক্সী আসছে কিনা দেখতে।

অবশেষে গজগোবিন্দ এসে খবর দেয়, ট্যাক্সী এসেছে, মেলার প্যাণ্ডেলের বাইরে আছে।

টিকলু বাপীর শার্টের কাঁধটা খামচে ধরে বলে, 'বেশী মন খারাপ করবি না তো?'

'আমি চলে গেলে তুই কী করতিস?'

'আহা সে তো বুঝছিই। তবু।'

'আমিও বাড়ি ফিরছি না, মেলা-তলায় হারিয়ে যাব।'

'এই বাপী খবরদার! একজন গিয়ে খবর না দিলে বাড়ির লোকেরা থানা পুলিশ করবে।'

'তোর মন কেমন করছে না?'

'করছে না, তা বলছি না। কিন্তু মন কেমন করলে কোনো মহৎ কর্ম হয় না বাপী!'

'তুই যে ওদের ছেলে নয় এটা বুঝতে পেরে তোকে যদি ওরা মেরে ফেলে?'

টিকলু আত্মস্থ গলায় বলে, 'দূর বোকা, তাই কখনো করে? যতদিন না সেই যুবরাজ যুবরানী পৃথিবী ঘুরে বাড়ি ফিরছেন, ততদিন পর্যন্ত আমায় না রাখলে ওদের চলবে?'

গজগোবিন্দ তাড়া দেয়, বক্রেশ্বর টিকলুকে প্রায় বেস্টন করে নিয়ে স্টল থেকে নামেন। পিছু পিছু মস্তান মার্কা ছেলে দুটো।

বিশ্বাস হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তৎক্ষণাৎ সোনার মেডেল অবশ্যই দেওয়া হয়না তাকে, তবে এ আশ্বাস দেওয়া হয় হিঙুলগঞ্জে গিয়েই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কী চায় বিশ্বাস?

সত্যিই মেডেল? না কি ঘড়ি. আংটি, কলম, সোনার বোতাম? যা চায় বলে রাখুক। বক্রেশ্বর দায়ীক। আর চায়ের দামটা? সে এই খান দুই দশটাকার নোট রইল টেবিলের ওপর। 'তোকে দেখে নিলাম!'

বলে গট গট করে চলে গেল বাপী। আর সেই মুহূর্তে টের পেল টিকলু, খেলাচ্ছলে নিজেই নিজেকে কী জালে ফেলেছে সে। এখন আর উপায় নেই। কারণ এখন সে ট্যাক্সীতে চড়ে বসেছে, তার সঙ্গে অপর পক্ষের চার চারজন লোক।

অতএব প্রাণের বন্ধু বাপী, চির-কালের এই রামরাজাতলা, মা বাবা ঠাকুমা সেজকাকা ছোটকাকু চারিদিকের যত আপন লোক সব কিছু ছেড়ে এক অজানা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে টিকলুকে।

পিছনে মেলাতলার কলরোল ছাপিয়ে শব্দ উঠছে, 'বিশ্বাসের টী স্টল। বিশ্বাসের টী স্টল। আসল দার্জিলিং টী! একবার খেলে দু'বার খেতে চাইবেন...সেকেণ্ড কাপ হাফ্ প্রাইস্... জলের দরে চা।'

টিকলু তার ঠাকুমার ভাষায় মনে মনে বলে ফেলল, 'কী কুক্ষণেই ওই বিশ্বাসের চায়ের দোকানে ঢুকেছিলাম।

রামরাজাতলা থেকে বেরিয়ে এসে হাওড়া পার হয়ে কলকাতায় পড়ল টিকলুরা।

কলকাতার রাস্তা! কী রোমাঞ্চ তাকে ঘিরে।

মানিকতলায় বড়মাসির বাড়ি, কখনো সখনো আসা হয়, কী উত্তেজনা কী আনন্দ হতে থাকে আসবার আগে। তাও কি আর এমন আরামসে ট্যাক্সী চেপে আসা? ভীড়ে গাদাগাদি হয়ে দু'বার বাস বদলে বদলে তবে তো। কিন্তু তা'তে কী? ঘাড় বাঁকিয়ে জানলায় চোখ মেলে রাস্তাটাকে যেন চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। অথচ এখন?

চোখ বুজে সিটে পিঠ ঠেসিয়ে বসে আছে টিকলু।

টিকলু সেই বোজা চোখের মধ্যে থেকেই ওদের বাড়ির উঠোনটা দেখতে পাচ্ছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। (কারণ বাপী নিশ্চয় অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে তারপরে বাড়ি ফিরেছে) বাপী দাঁড়িয়ে আছে মলিন মুখে, আর টিকলুদের বাড়ি সুদ্ধ সবাই বাপীকে জেরা করছে, কখন তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল টিকলুর, তার আগে কী কী ঘটেছিল।

সেজকাকা তো বোধহয় ছিঁড়েই খাচ্ছেন ওকে উকিলি জেরার প্যাঁচ চালিয়ে চালিয়ে।

বেচারা বাপী!

এখন মনে হচ্ছে টিকলুর, বাপীকেও সঙ্গে নিয়ে এলে হত। যদি বলতাম, 'আমার এই বন্ধুকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না হলে যাব না,' তাহলে বড় ভাল হত।

তখন যে কেন বুদ্ধিটা মাথায় এল না।

তখন এই বক্রেশ্বর বুড়োর রাজাই-চালের কথা বার্তা শুনে হঠাৎ কেমন মজা লেগে গেল, প্রাণে অ্যাড্ভেঞ্চারের সাধ জেগে উঠল।

হঠাৎ নিজেকে চাঙ্গা করে নিল টিকলু।

গল্পের বইতে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের কত দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী পড়েছে টিকলু, আর সে তো একটা বুড়ো ধাড়ি ছেলে।

যদি ওখানে কেউ বুঝতে পারে টিকলু স্রেফ্ জাল রাজকুমার!!

টিকলু বুকটান করে নিশ্বাস নিল।

আমার কী?

আমি বলব, আমি বন্ধুর সঙ্গে মেলা দেখছিলাম, এই বক্রেশ্বর কোম্পানী আমায় জোর করে ধরে এনেছে। আমি চেঁচাইনি কেন?

কেন আবার? আমার নাকে মুখে ওষুধ মাখা রুমাল চেপে ধরা হয়নি বুঝি? আমাকে কখন কীভাবে কোথা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে টেরই পাইনি।

কিছুদিন আগেই পড়া একখানা ডিটেকটিভ্ বইয়ের গল্পের কাহিনী থেকে ভেবে নিতে থাকে টিকলু।

তবে খানিকটা ঠিকই, কোথা দিয়ে যে নিয়ে চলল টিকলুকে, তার কিছুই বুঝল না সে।

ওর শুধু মনে হতে থাকে যেন অনন্তকাল ধরে ট্যাক্সী চেপে চলেছে তো চলেইছে। যেন এই যাত্রা পথের শেষ নেই।

টিকলু কি তবে গল্পের সেই ভুতুড়ে রেল গাড়ির মত কোনো ভুতুড়ে মটর গাড়িতে চড়েছে? এ আর কোনোদিন থামবে না? টিকলুকে নিয়ে এক অশেষ অনন্ত পথে নিয়ে যেতে যেতে,

হঠাৎ কোনখানে আছড়ে ফেলে দেবে? আসল কথা একটানা এতখানি মটরগাড়ি চাপা টিকলুর জীবনে কখনো ঘটেনি।

চোখ বোজা, তবু অনুভব করছিল যেন অন্ধকার অন্ধকার পথ দিয়ে চলছিল, হঠাৎ টের পেল খুব একটা আলো ঝলমলে জায়গায় এসে পৌঁছে গেছে তারা।

চোখ খুলল টিকলু।

ওরা সব নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে।

শুনতে পেল বক্রেশ্বর গজগোবিন্দকে নির্দেশ দিচ্ছে এইখানেই আজ রাতটার মত খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে। কাল ভোরের আগে স্টীমার বা লঞ্চ কিছুই ছাড়বে না।

খাওয়া শোওয়ার কথা শুনে মনটা একটু উৎফুল্ল হল টিকলুর।

তা হলে গাড়ি থেকে নামা হবে।

বাঁচা গেল বাবা!

এই হচ্ছে মানুষের মনের মজা!

যে টিকলু দৈবাৎ একটু মটরগাড়ি চড়বার সুযোগ পেলেই মনে করে হায় হায় এক্ষুনি কেন নামতে হচ্ছে, অনেক অনেকক্ষণ কেন চলল না, রেলগাড়িতে চাপলে মনে করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস রেলগাড়িতেই কেন থাকা হয় না? সেই টিকলুই ভাবল নামা হবে! বাঁচা গেল বাবা।

এই জায়গাটার নামই নাকি ডায়মণ্ড হারবার। ওই আলো ঝলমলে বাড়িটা হচ্ছে গভর্মেন্টের রেস্ট হাউস। নাম 'সাগরিকা'। চমৎকার জায়গা।

বক্রেশ্বর আর গজগোবিন্দর মতো গাঁইয়া লোককে এখানে মোটেই মানাচ্ছে না। কিন্তু তাতে তো ওদের বয়েই গেল। নিজেই তো বলেছেন বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশ মশাই, টাকা জিনিসটা এমন যে একটা বেড়ালের গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেও বেড়ালটা বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসতে পারে।

এরা যেমনই হোক, টাকা আছে দেদার।

খাওয়াটা ভাল, বিছানাটা সুন্দর, আর এই চার চারটে লোকের তোয়াজ, মন্দ লাগল না। কবে আবার ডানলোপিলোর গদিতে শুয়েছে টিকলু? আর কবেই বা তার কাছে কেউ এমন জোড় হস্ত থেকেছে?

বাড়িতে তো ভোর হতে না হতেই তো ছোটকাকুর হুমকি শোনা যায়, 'কী, শাহানসা বাদশা, এখনো নিদ্রামগ্ন? তা এবার গা তুলুন!'

ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম করা ছোটকাকুর এক বাতিক। তা' শুধু নিজের বাতিক মিটিয়ে ক্ষান্ত হও না বাপু? তা' নয় বেচারী টিকলুকেও সেই দলে টানা চাই।

অতএব টিকলুকেও ভোরবেলা উঠে পড়ে ডনবৈঠক করতে হয়, আদা ছোলা খেতে হয়।

তারপরই সেজকাকার ডাক, 'কই মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? বই খাতাগুলো নিয়ে একটু বসলে হত না? পড়তে হবে না বাপ, তুমি একবার ওগুলো নিয়ে পড়ার টেবিলে বোসো. দেখে চক্ষু সার্থক করি।'

পড়তে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের ডাকাডাকি, 'দুধ ডিম না খেয়েই পড়তে বসা হল? রোজই বলতে হবে এটুকু খেয়ে তবে পড়তে বস।...এস খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।'

খাবার সময় আর এক সোরগোল।

কোথা থেকে যে আঁখিপাত করে বসে থাকেন ঠাকুমা, হঠাৎ হৈ চৈ শোনা যায়', 'ওরে মারে, আমি কোথায় যাইরে—মুরগীর ডিম খেয়ে জামায় হাত মুছল! কেন, জগৎ সংসারে জল নেই? হাতটা একটু ধুতে পার না পাজী ছেলে?'

ঝাড়িয়ে কাটিয়ে যদি বা পড়তে বসল, পিসি এসে হানা দিল, 'এই টিকলু চট্‌ করে চার আনার পাঁচ ফোড়ন এনে দেতো, এই টিকলু ছুট্টে একটু হলুদগুঁড়ো নিয়ে আয় তো, টিকলু অমুক বেড়াতে এসেছে, দুটো রাজভোগ আনতো—'

টিকলু যদি বিদ্রোহ করে, পিসি হাত মুখ নেড়ে বলবে, 'গেরস্তর ছেলে, সংসারের এটুকু করতে পারবে না? খেলায় মত্ত থাকবার সময় তো পড়ার চাড় দেখি না। আরে বাবা, সারা দিনরাত পড়লেও তুমি ফার্স্ট সেকেণ্ড হবে না, এই আমি স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিলাম।'

টিকলুর ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। টিকলু যদি গণেশকে এক আধবার ডাকে ঘুড়ির ধরাই দিতে, কি বল খেলার সঙ্গী হতে, অমনি তক্ষুনি বাড়িতে যেন 'গণেশ গণেশ' রব পড়ে যাবে।

'গণেশ তোমার সঙ্গে খেলছে? কাজ নেই ওর? খেলার নেশা ঢুকিয়ে দিয়ে ওর পরকালটি ঝরঝরে করে দিতে চাও?'

অনেক চেষ্টা করে করে এইগুলো মনে আনে টিকলু মন কেমন বসাবার জন্যে, কিন্তু আশ্চর্য এতে বসা ছেড়ে বেড়েই যায়। মনে হয় ঠাকুমা যখন অত হৈ চৈ করে, হাতটা একটু ধুলেই হয়। পিসির সঙ্গে তর্কাতর্কি করে সময় খরচ না করে এক কথায় এনে দিলেই হয়। বাড়ির সামনেই তো দোকান।

হঠাৎ খেয়াল হল, এখন আর বর্তমান নয়, অতীত। 'করলে হয়' নয়, 'করলে হতো।'

তবু ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েও পড়ল। বেশ শান্তির ঘুম।

ক্লান্ত ছিল তো?

সক্কাল বেলাই লঞ্চ ছাড়বে।

সঙ্গের মস্তান মার্কা দু' জনের একজন প্রায় করজোড়ে এসে ডাকল 'খোকা রাজাবাবু এবার তো উঠে পড়তে হয়। ইস্টিম লঞ্চ ছাড়বার সময় হয়ে এল।'

চোখ খোলবার আগেই মনে পড়ে গেল টিকলুর, এখন সে রাজপুত্তুর।

টিকলুর সেই পুজো প্যাণ্ডেলে দেখা পাড়ার শখের যাত্রাদলের সাজা নবাব সিরাজউদ্দোলাকে মনে পড়ে গেল। অবনীদা সেজেছিল, কিন্তু কে বলবে সেই অবনীদা। সাজ সজ্জায় তো বটে, হাবে ভাবে কোথাও কোনোখানে 'অবনীদার' চিহ্ন মাত্র নেই, যেন সত্যিই নবাব।

টিকলুকেও তেমনি হতে হবে এখন থেকে।

টিকলু একটু হাই তুলে বলল, 'ঠিক আছে।'

হাত মুখ ধোওয়ার পর টিকলুকে এক প্রস্ত মিহি আর্দ্দির চুড়িদার চোস্ত্ আর কল্কাদার পাঞ্জাবী দেওয়া হল পরতে। দেখেই রাগ ধরে গেল টিকলুর। টিকলু খোকা না কি?

এসব যে কোথা থেকে সংগ্রহ করল বুড়ো কে জানে বাবা। নেহাৎ আনকোরাও তো নয় যে ভাববে কিনে আনা হয়েছে।

না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'এটা কোথা থেকে এল?'

ওই ছোকরার নাম নিধিরাম, সে বলে ওঠে 'খোকারাজাবাবু কি এই ক' মাসেই নিধিরামের নাম ভুলে গেছেন?'

নিধিরাম। নিজেই বলে ফেলেছে।

টিকলু গম্ভীরভাবে বলে, 'বাজে কথা রাখ নিধি, যা জিগ্যেস করছি তার জবাব দাও।'

নিধিরাম মাথা চুলকে বলে, 'দেওয়ান বাবু ঠিকই বলেছে, মেজাজেই মালুম। এগুলো তো দেওয়ানবাবু সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ফিরছে। জানেই তো এতকাল কোথায় না কোথায় কী না কি পরে ঘুরছে, হঠাৎ রাস্তায় ঘাটে দেখতে

পেলেই তো ক্যাঁক করে ধরে ফেলতে হবে, কোন সাজে রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ঢোকানো হবে।'

'থাম বেশী কথা বলতে হবে না।' বলে পোশাকটা পরে ফেলে টিকলু। দেখেই যে রেগে জ্বলে গিয়ে মনে হয়েছিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলবে, 'এসব আমার কস্মিনকালেও পরা অভ্যাস নেই' ভাগ্যিস বলেনি সেটা। তাহলেই তো ধরা পড়ে যেত।

সকালবেলা আর কালকের মতো খুব খারাপ লাগছে না। নতুন দৃশ্য নতুন অবস্থা, নতুন একটা জীবনের পথে যাত্রা! মন্দ কী? এই তো অ্যাড্ভেঞ্চার।

স্টীম লঞ্চে চড়া টিকলুর জীবনে এই প্রথম। পাশে পাশে কাটিয়ে চলেছে কত ঝোপ জঙ্গল চালা ঘর ছোট ছোট গ্রাম। জিগ্যেস করবার জন্যে মন উসখুস করছে, কিন্তু জিগ্যেসের উপায় নেই, এ পথ তো আর রাজকুমার দীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদারের অজানা হবার কথা নয়। কে জানে কতবার এ পথে যাওয়া আসা করতে হয়েছে তাকে।

বকখালি, কুমীরখালি ভাসানখালি। অবশেষে হিঙ্লগঞ্জ।

স্টীম লঞ্চ, গরুর গাড়ি, পালকী! অবশেষে রাজবাড়ির জুড়ি গাড়ি।

জীর্ণ বিবর্ণ হলেও বেশ বিরাট দেউড়ি, দেউড়ির দু ধারের থামের মাথায় থাবা উঁচোনো সিংহ মূর্তি বসানো, লোহার গেট, মরচে ধরা তবু জগদ্দল পাথরের মত ভারী, সহজে ঠেলে খোলা সম্ভব নয় দু' তিনটে লোকের দরকার, তাই ওই গেটের মাঝখানে একটা ছোট কাটা দরজা, সর্বদার যাওয়া আসা সেই দরজা দিয়েই।

তাতেও অবশ্য ভিতর থেকে তালা চাবি লাগানো।

বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশ চড়া গলায় হাঁক দিলেন, 'কৌন হ্যায়!'

সঙ্গে সঙ্গেই কড়াং করে একটা শব্দ হল। তার মানে তালা খোলা হল। তার মানে সেখানে লোক মোতায়েন ছিল।

চৌকো গড়নের কাঁচের লণ্ঠন হাতে একটা লোককে সেই কাটা দরজার মধ্যে দেখা গেল। লোকটা আপাদ-মস্তক বাঙালী!

বক্রেশ্বরও বাঙালী।

তবু রাজবাড়ির কায়দা, তাই ডাকতে হলে 'কৌন হ্যায়।'

লোকটা কয়েক সেকেন্ড হাতের আলোটা উঁচু করে ধরে দৃশ্যটাকে যাকে বলে অবলোকন করে নিয়ে বিচলিত গলায় বলে, 'দেওয়ানবাবু!' আপনি! সঙ্গে কে?'

দেওয়ানবাবু, অর্থাৎ বক্রেশ্বর বাক্য-বিনোদ প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বলেন, 'সঙ্গে কে দেখতে পাচ্ছ না?'

'আঁ—আঁগ্যে পাচ্ছি বৈ কি! নি—নিধিরাম ভজ—ভজহরি, গ গ গ গজ গোবিন্দবাবু, আর—'

'আর কী? থেমে গেলি কেন?'

লোকটা ছাড়াছাড়াভাবে বলে, 'খোকা—রাজা—বা—বু!'

'যাক। বুঝতে পারলে তা'হলে? এখন সর দরজা ছাড়! তুমি ফোকর আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা কি মাছি হয়ে ঢুকব?'

লোকটা তটস্থ হয়ে সরে দাঁড়িয়ে বলে, 'খোকা রাজাবাবুকে তা'হলে খুঁজে পেলেন?'

'খুঁজে পাবনা তো কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে বেরিয়েছিলাম?'

'আজ্ঞে তা' বলছিনা। মা হিঙ্গুল-রানী কালীর কী কৃপা তাই বলছি।'

বক্রেশ্বর খিঁচিয়ে ওঠেন, 'হ্যাঁ অশেষ কৃপা! কৃপা না হলে লোহার দুর্গের ভেতর থেকে হঠাৎ ছেলেটাকে 'হাওয়া' করে দেন। তারপর এই ছমাস ধরে বেপাত্তা করে রেখে হতভাগা বুড়োকে দিয়ে গরু খোঁজা খোঁজালেন।...নাও সর। মেলা বকবক কোরোনা। কর্ত্তারাজা আর কর্ত্তা-রানীমা আছেন কেমন তাই বল।'

'আজ্ঞে তেনাদের আর থাকা থাকি। রাম বনে চলে যাওয়ার পর রাজা দশরথ আর মা কৌশল্যের যেমন অবস্থা হয়েছিল, সেই অবস্থায় আছেন।'

বক্রেশ্বরের আগেই গজগোবিন্দ ধমক দিয়ে ওঠে, 'বৈকুণ্ঠ তুমি বুঝি সেই রাজা দশরথ আর মা কৌশল্যের অবস্থা দেখে এসেছিলে? এই লোকটা যদি কখনো কোন সময় একটা শাদা বাংলায় কথা বলবে! সব সময় কথায় গহনার ছটা। বাবুর যেন বেদ পুরাণ সব মুখস্থ। বলি শরীর গতিক কেমন আছে তাঁদের? খাওয়া দাওয়া করছেন ঠিক মত?'

বৈকুণ্ঠ মাথা নেড়ে বলে, 'সেটি বলতে পারবো না ছোট নায়েববাবু। ওসব হচ্ছে রান্নাশালার ডিপার্ট্মেন্টো।'

টিকলু হঠাৎ জোর গলায় বলে ওঠে, 'গেটে দাঁড়িয়ে এত কথা বলার কী আছে? প্রাসাদে ঢুকলেই তো জানা যাবে।'

রাজ্যের ভাবী মালিকের মতই জোর

শোনায় টিকলুর গলা। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলে।

বক্রেশ্বরের কপালটা কুঁচকে যায়, ভুরুটা খাড়া হয়ে ওঠে, ঠোঁটটা ঝুলে পড়ে।

বক্রেশ্বর কিন্তু কথা বলে মধু ঢেলে, 'এই তো। ঠিক তো। এমন মেজাজ না হলে মানায়। এস ভাই এস। ভিতরে বসবে এস। হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করবে চল। ততক্ষণে রাজাবাবুকে খবর দিয়ে রাখি। আচমকা সামনে নিয়ে গেলে অতি আহ্লাদে হার্টফেল করে বসতে পারেন। অবশ্য দুটি চক্ষে ছানি, দেখতে পাবেন না।'

টিকলু মনে মনে বলে, হুঁ! সেটাই সুবিধে হয়েছে। মুখে বলে ওঠে, 'রাজা রানী, দুজনের চোখেই ছানি?'

বৈকুণ্ঠ কাতর কাতর গলায় বলে, 'আহা তা' অবিশ্যি নয়। কিন্তুক কেঁদে কেঁদেই তো দু'চক্ষু অন্ধ করে ফেলেছেন রানীমা। একবার করে দেওয়ানবাবুর চিঠি আসে এখনো সন্ধান নেই, আরো টাকা পাঠান.' আর কর্তারানীমা বিছানা নেন। বললে বিশ্বাস করবেন না দেওয়ানবাবু, মন খারাপের চোটে উনি একদিন ওনার মেয়েদের ঘুম পাড়াতে ভুলে গেছলেন।'

'বটে না কি? বলিস কি? অ্যাঁ! তা যাক, এতদিনে দুঃখ ঘুচল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল। চল হে গজ-গোবিন্দ। নিধিরাম ভজহরি, তোমরা এখন তোমাদের 'স্ব স্ব' গৃহে ফিরতে পার! তোমাদের পাওনা গণ্ডার হিসেব পরে হবে।'

নিধিরাম বেজার গলায় বলে, সমানে তো জপাতে জপাতে আসছিলেন দেওয়ান মশাই 'ওখেনে পোঁছেই তোদের এই এতদিনের ঘুরুনির মজুরি দিয়ে দেব,' এখন আবার 'পরে' দেখাচ্ছেন?'

'এ তো আচ্ছা ইয়ে দেখছি। সাধে কি আর বলে 'এ যুগের ছেলে!' পেন্টুল পরতে শিখলেই বাছাদের সব মেজাজ গরম হয়ে যায়। বলি দৈনিক ক' পয়সা রোজগার করতিস তোরা? বাপের ক্ষেত খামারেও তো খাটতে দেখিনি কখনো। কোথা থেকে না কোথা থেকে পেন্টুল পরতে শিখলি, আর গলায় রুমাল বাঁধতে শিখলি, ব্যস মস্ত তালেবর হয়ে গেলি, কেমন? বেকার বসে বাপের অন্ন ধ্বংসাচ্ছিলি, আমি এই ছমাস ধরে তোদের লালন পালন করিনি?

ভজহরি ঘাড় গোঁজ করে বলে, 'তা' আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাও তো একটা চাকরী, তার বদলে লালন পালন করেছেন এ আর আশ্চায্যি কী? বলেছিলেন না এত টাকা দেব যে তোদের দু'জনার একটা করে ছাইকেল আর একটা করে 'ট্যানজিস্টো' হয়ে যাবে। কাজ গুছিয়ে এখন বুঝি কলা ঠেকাবেন?'

বক্রেশ্বর কি বলতেন কে জানে, কিন্তু টিকলুর মধ্যেকার 'রাজকুমার' জেগে উঠল, এবং রেগে উঠল।

টিকলু কড়া গলায় বলে উঠল, 'নিধিরাম, ভজহরি, তোমাদের কথা-টথা খুব খারাপ শুনতে লাগছে। এভাবে কথা বলবে না। রাজবাড়ি থেকে কখনো কারো পাওনা টাকা মারা গেছে দেখছ?'

ভজহরি আর নিধিরাম দু'জনে একযোগে আধ ফুট লম্বা জিভ বার করে কান মুলে বলে 'অপরাধ হয়েছে খোকাবাবু। আচ্ছা এখন যাচ্ছি।'

টিকলু নিজের ভূমিকায় সচেতন হয়।

টিকলু বেশ দরাজ গলায় বলে, 'এখন যাবে কেন? এত খেটে টেটে এলে, খাওয়া টাওয়া সেরে যাবে তো? বাড়িতে তো তোমাদের জন্যে রান্না করা নেই?'

বক্রেশ্বর হঠাৎ রাগ প্রকাশ করে বসেন,

'এখানেই বুঝি প্রভুদের জন্যে পোলাও কালিয়া রান্না করা আছে?'

টিকলু গম্ভীরভাবে বলে, 'পোলাও কালিয়া না হোক্ কিছুতো আছেই? এরা এখান থেকেই খেয়ে যাবে।' গলাটা জোরালো।

নিজের মহিমায় নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছে টিকলু। সত্যি, নিজেকে যেন মালিক মালিকই মনে হচ্ছে।

ওদিকে বক্রেশ্বর বাক্যবিনোদ আর গজগোবিন্দর মুখের চেহারা যেন পেঁচার মত হয়ে ওঠে।

বেজার মুখে বলেন বক্রেশ্বর, 'দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাত কাবার করতে হবে না কি? গজ-গোবিন্দ, যাও অন্দরে খবর দাও গে।'

দেউড়ী পার হয়ে টানা লম্বা একটা দালানে পড়ল টিকলু। অন্ধকার অন্ধকার ছায়া ছায়া। দু' পাশের টানা দেওয়ালে মাঝে মাঝেই একটা করে তালা বন্ধ দরজা, আর সেই দরজার মাথায় উঁচুতে দেওয়ালে আঁটা একটা করে কাঁচঘেরা কেরোসিনের আলো। কিন্তু সেই লালচে আলোয় আলোর থেকে অন্ধকারের ভয়াবহতাটাই যেন বেশী প্রকাশ পাচ্ছে।

টিকলুর বুকটা ছাঁৎ ছাঁৎ করছে, টিকলুর মনে হচ্ছে কোথায় যেন ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ থাবা তুলে বসে আছে।

কিন্তু কী আর করা?

নিজেই তো নিজের বিপদ ডেকে এনেছে টিকলু। টিকলু আবার মনকে জোরালো করে নেয়। সেই কথাটাই ভাবে, বিপদ কী জন্যে হবে? ওই বক্রেশ্বর বুড়ো তো টিকলুকে তোয়াজ করতেই ব্যস্ত। তা ছাড়া এত কষ্ট করে ধরে এনে তো আর মেরে ফেলবে না?

আচ্ছা, সত্যিই কি বুড়ো আমায় এই রাজবাড়ির রাজপুত্তুর বলে ভুল করেছে? না কি কোনো অভিসন্ধির বশে আমায় রাজপুত্তুর বলে চালাতে চেষ্টা করছে? ডিটেকটিভ্ গল্পে তো লেখে এরকম সব।

যা শুনেছি, তাতে তো জানলাম ছেলেটা এখানে বেশী থাকত না, মাঝে মাঝে আসত; নেহাৎ বাপ মা বিলেত আমেরিকা চলে যাবার সময় রেখে গিয়েছিল বলেই—'তা' তাওতো কিছুদিন থেকেই পালিয়েছে। এখানের লোকজন বোধহয় খুব বেশী চেনে না। রাজপুত্তুররা তো আর বাইরে বেরিয়ে মাঠে বাগানে খেলে বেড়ায় না, বাড়ির মধ্যেই থাকে। বাইরের লোকেরা বোধহয় বুঝতে পারবে না।

ছেলেটা যে অনেকটা টিকলুর মতই দেখতে তা'তে সন্দেহ নেই। আবার গালেও নাকি টিকলুর মতই একটা তিল আছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই ছবি টবি আছে, কাল দেখা যাবে। এখন সেই চোখে ছানি রাজারানীর সঙ্গে যে প্রথম দেখাটা রাত্রের অন্ধকারে হচ্ছে সেটা ভাল।

কে জানে তারা কি রকম দেখতে।

টিকলু যখনই মনকে জোরালো করে বুক টান্ টান করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তখনই বেশ আমোদ লাগছে, আর কীভাবে সাহসে ভর করে চটপট কথা বলবে, তার রিহার্শাল দিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু মাঝে মাঝেই নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। বুদ্ধুও মনে হচ্ছে।

তখন নিজের মনের হাত দিয়ে মনের গালে ঠাশঠাশ করে চড় কসিয়ে দিয়ে বলছে, 'কী দরকার ছিল রে তোর বুদ্ধু, অ্যাড্ভেঞ্চার করতে আসার? কী লাভ হবে তোর এতে?' তোর মার কথা ভাবলি না, বন্ধুর মুখের দিকে তাকালি না, বাড়ির লোকের কথা চিন্তা করলি না?

কিন্তু এতো ভাবলে চলবে কেন?

যে সব ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে হাজার কান্ড করে বেড়ায়, তাদের বুঝি মা বাপ থাকে না?

টিকলু যখন এসব কথা ভাবছে, তখন টিকলুর সামনে এক থালা খাবার।

তবে ওই খাদ্যবস্তুগুলোর মধ্যে কোনোটাই টিকলুর পছন্দের নয়। একতাল ছানা, এতগুলো ফল, পাঁচ ছটা মিস্টি, খানিকটা হালুয়া, এই হচ্ছে থালার তালিকা।

ফলের মধ্যে শশাটাই যা টিকলুর প্রিয়, তাই তুলে নিয়ে খায় আস্তে আস্তে।

খাওয়ার সামনে বক্রেশ্বর বসে আছেন, আর আছে একটা মোটা সোটা ঝি। ঝিয়ের হাতে আবার সোনার বালা, গলায় সোনার হার।

ওকে গজগোবিন্দ 'বামুন দি' 'বামুন দি' বলে ডাকছিল।

টিকলু কী বলে ডাকবে সেটাই ভাবনা। কাকে যে কী বলে ডাকত সেই দীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর তা' কে জানে। ওইখানেই ধরা পড়ার ভয়।'

বামুন দি বলল, 'খোকা রাজাবাবু এত দিন নিরুদ্দেশ হয়ে পিথিমি ঘুরে এলে, কিন্তুক খাওয়া দাওয়ার ভাব তো বদলাল না। সেই তো খাবারের পাত্তর সমুখে রেখে বসে বসে টুকছ।'

টিকলু মনে মনে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এটা তা হলে মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু আর একটা কথা ভাবনার। বামুনদি বলে চলেছে চেহারার কী ছিরিছাঁদ হয়েছে। দেখে আর চেনা যায় না। রং কালীবর্ণ গড়ন ঠকঠকে। আগে কেমনটি ছিলে ভাব?'

টিকলু রেগে বলে, 'কেমনটি আবার! যত সব ইয়ে—।'

বামুনদি আবার বলল, আমরা হলাম বাইরের নোক, বললে শোভা পায় না, কিন্তুক বাড়ি থেকে চলে যাওয়া কি ভাল কাজ হয়েছেল তোমার খোকাবাবু? পেরাণে একটু মায়া মমতা নেই?'

'আঃ তুমি আবার কী বকবক করতে এলে?'

বক্রেশ্বর ক্রোধেশ্বরের মূর্তিতে বলেন 'অন্দরে' কর্তারানীমাকে খবর দেওয়া হয়েছে কি না সে খোঁজটা তো দিচ্ছ না।'

বামুনদি গালে হাত দিয়ে বলে 'ওমা সি কি! এই যে বলনু, ছোট নায়েব মশাই খবর দেছল, কর্তা রানীমা ত্যাখন তেনার মেয়েদের খাওয়াচ্ছেলো। বলল, 'এদের খাইয়ে শুইয়ে একেবারে নিশ্চিন্দ হয়ে যাচ্ছি।'...আসল কথা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে, এই খবর জেনে বুকটা ঠান্ডা হয়েছে 'এই আর কি।'

বক্রেশ্বর বলেন, 'আর কর্তারাজা?

বামুনদি আর একবার গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা! আপনি যে আকাশ থেকে পড়া কথা বলছ দেওয়ান মশাই। কর্তারাজা আবার কবে কোন দিন এই সন্দে রাত্তিরে সজ্ঞানে থাকে? দু' পহর রাত পার হবে, তবে তো আপিঙের ঝিমুনি কাটবে। ত্যাখন উঠে মিছরির শরবৎ খাবে, ক্ষীর লুচি, কলা সন্দেশ খাবে, গুড়ুর গুড়ুর তামাক খাবে, আর পেরাণ খুলে কথা বলবে। খোকা রাজাবাবু কি আর অত রাত অবদি জেগে থাকতে পারবে? ওনার সঙ্গে দেখা হতে সেই কাল ভোর সকাল।'

টিকলু মনে মনে বেশ আমোদ পায়। ছেলে হারিয়ে এত কষ্ট হচ্ছিল ওনাদের অথচ ছেলেকে পাওয়া গেছে শুনে অস্থিরতা টস্থিরতা নেই। আপিং খাওয়া আবার কী? আপিং খেলে তো মানুষ মরে যায় বাবা!

আর ওই কর্তা রানীমার ব্যাপারটা? ওটা কী?

মেয়েদের খাওয়াচ্ছেন, মেয়েদের শোওয়াচ্ছেন। কত ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে? খুব বুড়িটুড়িদের কী ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়ে থাকে? কই ঠাকুমার তো নেই। দিদিমারও নেই, বাপীর ঠাকুমারও নেই। তা'হলে?

জলখাবার খাওয়ার পর টিকলুকে এরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় আর একটা দালান পার হয়ে খুব বড় একখানা ঘরে নিয়ে এল। সিঁড়িটা খুব অদ্ভুত লাগল টিকলুর। রেলিং টেলিঙের বালাই নেই, দু' দিকেই ভারী চাপা দেওয়াল, সে দেওয়ালে জানলা টানলা কিছু নেই। একটু যেন বাদুড় বাদুড় চামচিকে চামচিকে গন্ধ।

দোতলার এই দালানটা ভাল। বড় বড় জানলা, জানলা দিয়ে বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে, জ্যোৎস্না রয়েছে বলেই এত সুন্দর দেখাচ্ছে।

টিকলুকে যে ঘরটায় এনে ঢোকানো হল, সে ঘরের কড়িকাঠ থেকে মাঝারি গোছের একটা ঝাড় লন্ঠন ঝুলছে, ঝাড়ের সব আলোগুলো জ্বলছে না বটে তবে যে কটা জ্বলছে, তা'তেই ঘরটার সব কিছু বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ঘরের মাঝখানে উঁচু এক পালঙ্ক, তার বাজু আর ছত্রিতে নানা কারুকার্য, একহাত পুরু গদি, ফর্সা ধবধবে বিছানা, ঝালর দেওয়া বালিশের ঝালরগুলো খোলা জানলা থেকে বাতাস এসে উড়ছে, বিছানার চাদরের কোণগুলোও উড়ছে। জানলা দরজায় পর্দা বলে কিছু নেই, তাই বাতাসটা জোরে আসছে।

ঘরের কোনে কোনে অর্ধচন্দ্র গড়নের তিন চার থাক উঁচু সেলফ বসানো, তার তাকে তাকে কত রকমের যে খেলনা পুতুল সাজানো। টিকলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মাটির রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, দু বাহু তোলা গৌরনিতাই, পাথরের মহাদেব, জগন্নাথ, গণেশ, পেতলের লক্ষ্মী সরস্বতী নাড়ুগোপাল, কাঠের সেপাই, কাঁচের সাহেব মেম, ঝিনুকের হাঁস, শোলার ময়ূর, পুঁতির ফুলগাছ, টিনের রেলগাড়ি, মোমের ফল, আরো কত সব কী টিকলু বুঝতে পারল না কী দিয়ে তৈরী ওইসব ছোট্ট ছোট্ট হাঁড়িকুড়ি চায়ের সেট্ গেলাস রেকাবি। সবই পুরু ধুলোয় ঢাকা, রং জ্বলা।

দেয়ালের ধারে একটা পালিশ জ্বলে যাওয়া প্রকান্ড টেবিল, তার উপর কিছু বই খাতা দোয়াতদানি কলম পেন্সিল! বাতিদানে বসানো বাতি, আর ঠিক টেবিলের মাঝখানে স্ট্যান্ডে বসানো দুখানা ফটো। একটা গ্রুপ ফটো, আর একটা শুধু একটা ছোট ছেলের।

ছবিটা দেখে টিকলুর বুকটা ধুকধুক করে উঠল। এ নির্ঘাৎ এদের খোকা রাজাবাবুর। টিকলু বক্রেশ্বরের সামনে ছবিটার দিকে ভাল করে তাকাতে সাহস করল না। নিজের ছবি আবার নিজেকে দেখে নিরীক্ষণ করে?

বক্রেশ্বর বিনয়ে গলে পড়া গলায় বলেন, 'তা'হলে তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর ভাই, একটু পরেই কর্তা রানীমার ঘরে ডাক পড়বে। ওনার সঙ্গে একটু সাবধানে কথা বলবে বুঝলে তো?'

টিকলু শক্ত গলায় বলল, 'সাবধানে মানে?'

বক্রেশ্বর ব্যস্ত গলায় বলে, 'আহা মানে জানোই তো ওনাকে? একটুতেই দুঃখ অভিমান। এই যে তুমি এতদিন ধরে পালিয়ে বেড়িয়ে ওঁদের কষ্ট দিলে তার জন্যে তো অভিমান আরো বেশী। সেই আর কি। তবে ওঁর মেয়েদের খবর কী জানতে চাইলেই অবশ্য আহ্লাদে সব ভুলে যাবেন। মেয়েগুলি তো ওঁনার প্রাণতুল্য তা' দেখেই গেছ। ওদের নিয়েই সব ভুলে মেতে থাকেন। যুঁই মল্লিকা শেফালী

মালতী কমল গোলাপ সবাই তো ওঁনার সমান আদরের?'

টিকলু গম্ভীরভাবে বলে, 'সে তো জানিই।'

বক্রেশ্বরের গোঁফ দুটো ঝুলে পড়ে. বক্রেশ্বরের জোড়া ভুরুটাও যেন ঝুলে পড়ে। বক্রেশ্বর একটুক্ষণ টিকলুর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, 'আচ্ছা' বলে চলে যান।

টিকলু শুনতে পায় বাইরে কাকে যেন বলছেন, 'হ্যাঁ এই দরজার পাশে বসে থাকবে নড়বে না। খোকাবাবুর কখন কী দরকার হয়।'

টিকলু মনে মনে বলল, 'তার মানে, পাহারা বসানো হল। তার মানে আমি এখন বন্দী। 'অচিনদেশে অভীক' বইটার সঙ্গে একেবারে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। হঠাৎ বেজায় আহ্লাদ হল টিকলুর, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে।

অভীকের দরজায় একটা দৈত্যের মত গুর্খা প্রহরী বসানো হয়েছিল, আর টিকলুর দরজায় একটা মোষের মত বাঙালী প্রহরী। শুধু এইটুকু তফাৎ।

যাক একটু শুয়ে তো পড়া যাক।

ঘরে কাগজ কলম দোয়াত কালি সবই তো মজুত রয়েছে দেখা যাচ্ছে, সময় বুঝে বাপীকে একটা চিঠি লিখে ফেলা যাবে। ওকে ছেড়ে চলে আসা থেকে যা কিছু ঘটেছে সব লিখে পাঠাবে। বেচারী বাপু।

টিকলুর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল এত ফর্সা বিছানাটায় চট করে শুয়ে পড়তে। কিন্তু টিকলু এখন রাজপুত্র, ওর এ রকম তুচ্ছ জিনিসে মায়া করা শোভা পায় না।

খাটের ধারে যে ছোট্ট জল চৌকীটা পাতা ছিল, তার উপর চড়ে খাটের উপর উঠে পড়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল টিকলু।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা?

রাজা রাজীবনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর আপিঙের ঘোরের মধ্যে একবার শুনলেন, 'খোকা রাজাবাবুকে পাওয়া গেছে।'

শুনে রাজীবনারায়ণ চমকে ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'কই, কই, কোথায়?'

কিন্তু হঠাৎ উঠে বসার জন্যে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে এল আবার গড়িয়ে পড়ে তাকিয়ার উপর মাথা ফেললেন। ঝিম্‌ঝিম্‌ করা মাথার মধ্যে ভেঙে যাওয়া ঘুমটা রিমঝিম করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আবার জুড়ে গেল. সেই জুড়ে যাওয়া ঘুমের গাঁট্টা খেয়ে পাট্টাদার বাহাদুর আবার এক অতল তলে ডুবে গেলেন।

গেলে হবে কী, ওই খবরটা যেন অনবরত ওই অতল তলের তলে গিয়েই মাথার মধ্যে ইলেকট্রিকের শক্‌-এর মত চিড়িক্‌ পাড়তে লাগল। পাট্টাদার আর একবার তাকিয়া থেকে মাথা তুলে উঠে বসলেন।

উঁচু খাটের তলায় একটা লোক শুয়ে ছিল সে বলে উঠল, 'রাজামশাই কিছু চাই?'

পাট্টাদার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বললেন, 'চাই! তোর মাথাটা চাই।' বলেই ফের ঘুমিয়ে পড়লেন। এই রকম বার আষ্টেক শুয়ে আর উঠে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই উঠে বসলেন তিনি।

তারপরই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, মাথার মধ্যে কী চিড়িক পাড়ছিল!

তারপরই হঠাৎ খেঁচিয়ে উঠলেন, 'কৌন হ্যায়।'

খাটের তলায় শুয়ে থাকা লোকটা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে বলল, 'কী হুকুম?'

পাট্টাদার বললেন, 'আমার হারানো নাতিকে খুঁজে পাওয়া গেছে আর আমাকেই দেখানো হচ্ছে না? কে কোথায় আছিস নিয়ে আয় তাকে এখানে।'

লোকটা হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে আপনি ঘুমোচ্ছিলেন—'

'আমি ঘুমোচ্ছিলাম? আমি? আমি বলে সারারাত অনিদ্রার ব্যায়রামে ভুগি, আর আমাকে ঘুমের বদনাম? রোসো মজা দেখাচ্ছি। ডাক তো গজ-গোবিন্দকে।

'গজগোবিন্দবাবু বাড়ি চলে গেছে।'

'বাড়ি চলে গেছে? ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে না না, ছেলেকে নিয়ে যাবেন কেন? ছেলে এখানেই আছেন।

'তা আছেই যদি তো আমার এখানে আনা হচ্ছে না কেন? আন বলছি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল লোকটা, হাঁফাতে হাঁফাতে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বক্রেশ্বরকে জানাল কর্তা উঠেছেন।

বক্রেশ্বর চটপট চলে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল টিকলুকে।

দালান পার হতে হতে বক্রেশ্বর নীচু গলায় বললেন, 'খোকা রাজা-বাবু মনে রাখবেন উনি আপিঙের রুগী।'

টিকলু বুকটান করে বলল, 'উনি যে আপিঙের রুগী সে কথা আপনি আমায় বলবেন তবে জানব? আমি জানি না?'

বক্রেশ্বরের নাকের ডগা ঝুলে গেল।

বক্রেশ্বর বললেন, 'হুঁ।'

টিকলুর ইচ্ছে হচ্ছিল গট গট করে আগেই এগিয়ে যায়, কিন্তু উপায় তো নেই। ঘর বাড়িটা তো অচেনা, কোনখানে যেতে কোনখানে গিয়ে পড়বে।

বক্রেশ্বরের সঙ্গেই যেতে হ'ল।

রাজা রাজীবনারায়ণের দু' চোখেই ছানি, তায় আবার পাছে আলো লেগে যন্ত্রণা হয় তাই মোটা কালো চশমা পরা।

তবু বক্রেশ্বর কুর্নিশের ভঙ্গীতে নমস্কার করেন এবং ইশারায় টিকলুকে বলেন 'কই প্রণাম কর?'

টিকলু কিন্তু মিটিমিটি হেসে বুড়ো আঙুলটি নেড়ে বুঝিয়ে দেয়. 'করে লাভ? দেখতে তো পাবেন না।'

বক্রেশ্বর বেজার মুখে কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে নিয়ে নরম গলায় বলেন, 'হুজুর অবশেষে আমার সাধনা সফল হয়েছে। হারানিধিকে খুঁজে নিয়ে এসেছি।'

পাট্টাদার রেগে উঠে বললেন, 'এসেছো সে কথা তো সাতদিন ধরে শুনছি, কই কোথায় সে, আমার দীপু? আমার দীপেন্দ্রনারায়ণ!'

হাতটা বাড়িয়ে হাতড়াতে থাকেন।

অগত্যাই টিকলুকে এগিয়ে গিয়ে ওনার বিছানার ধারে বসতে হয়।

রাজীবনারায়ণ ওর মাথাটা হাতে পান। অতএব মাথায় হাত বুলিয়েই আশীর্বাদ করতে যান, কিন্তু হাত দিয়েই যেন চমকে সরিয়ে নেন!

বলে ওঠেন, 'এ কী চুল এমন শক্ত শক্ত খোঁচা খোঁচা কেন? সেই রেশমের মতন চুলগুলো কুচিয়ে বুরুশ ছাঁট করেছিস? ছি ছি।'

এ কথা শুনেই টিকলুর সেজকাকার মুখটা মনে পড়ে যায়। নিজে সঙ্গে করে সেলুনে নিয়ে যান সেজকাকা টিকলুকে, আর টিকলুর দুঃখ অসন্তোষ মর্মবেদনা আক্ষেপ সব কিছু নস্যাৎ করে দিয়ে সেলুনের নাপিতকে জোর গলায় আদেশ দেন 'বেশ ছোট করে ছেঁটে দাও। এই বয়সেই লম্বা লম্বা চুল রেখে মস্তান হবার দরকার নেই।'

তার প্রতিফল এই!

ছি ছি।

টিকলু কিছু বলার আগেই বক্রেশ্বর বলে ওঠেন, 'এই ছ মাস কাল রণে বনে অরণ্যে কোথায় না কোথায় ছিল হুজুর, মাথায় হয়তো তেলই জোটেনি—'

রাজীবনারায়ণ বকে ওঠেন, 'তুমি
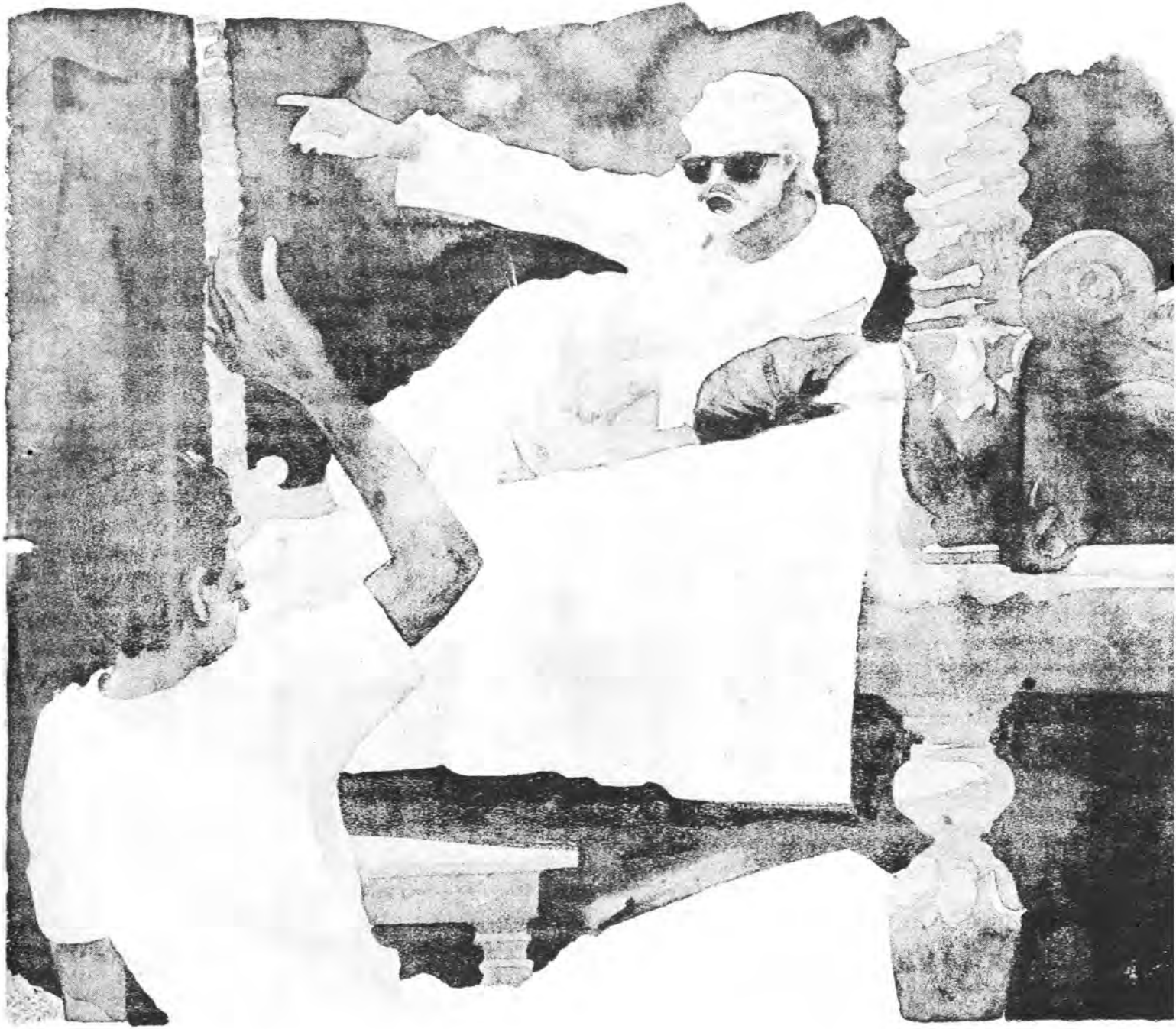
থামোতো বাক্যবাগীশ. ওকে বলতে দাও।...বলি হঠাৎ বাড়ি থেকে পালাতে ইচ্ছে হল কেন?'

টিকল্ গলা ঝেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এমনি।'

'এমনি! এমনি তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে?'

'হ্‌ঁ।'

'উঁহু! নির্ঘাৎ তোমার ওই কর্তা রানীমার আহ্লাদী মেয়েদের উৎপাতে। নিশ্চয়! হবেই তো ওদের উৎপাতে ছেলে ছেলের বৌ দেশ ছাড়া, আমিই মহল ত্যাগ করে এ মহলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি। বাক্যবাগীশ, আমি এই বলে দিচ্ছি দীপেন্দ্রর মহল আলাদা করে দেবে।'

'আজ্ঞে সে আর বলতে।'

'দীপেন্দ্র, অতএব তোমার আর ভয় নেই। কই তোমার হাতটা দেখি—'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিকল্ একটা হাত বাড়িয়ে দেয়।

রাজীবনারায়ণ নিজের ফুলো ফুলো তুলো তুলো হাতের মধ্যে ওর হাতটা চেপে ধরে বলেন, 'ইস! এটা কী হয়েছে? এটা? হাতটা এমন কাঠ কাঠ করেছিস কী করে? মোট বয়ে পেট চালিয়েছিস বুঝি? তা তো হবেই। পৃথিবী তো আর তোমার জন্যে রুপোর থালায় অন্ন বেড়ে নিয়ে বসে নেই। ছি ছি হাতের চামড়াটা পর্যন্ত খশখশে হয়ে গেছে। শাটিনের মতন মোলায়েম আর পালিশ করা চামড়া ছিল তোমার। ছি ছি।'

কেবল ছি আর ছি।

টিকল্ রেগে উঠে বলে বসে, 'পুরুষ মানুষের ওরকম হবার দরকার কী?'

'পুরুষ মানুষ!'

রাজীবনারায়ণ হা হা করে হেসে ওঠেন, 'ও বাক্যবাগীশ, এ ছেলেটা বলে কি? এই তো সেদিন বোতলে মুখ দিয়ে দুধ খেতিসরে, সর্বক্ষণ

চুষি মুখে দিয়ে বেড়াতিস। হঠাৎ তিন লাফে পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি কখন?'

টিকলু হাতটা টেনে নেয়।

রাজীবনারায়ণ এবার প্রশ্ন করেন, 'এতদিন কোথায় ছিলে? কী খেয়ে-ছিলে? কাদের বাড়িতে ছিলে?'

বক্রেশ্বর আগ বাড়িয়ে বলে ওঠে, 'সে কী আর বলে বোঝাতে পারবে হুজুর? সেই যে বলে না 'ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে' সেই রকমই আর কী। আমি তো একটা মেলাতলা থেকে—'

টিকলুর অসহ্য লাগে ওই বক্রেশ্বরের বকবকানি। ক্রমশঃই আর সন্দেহ থাকে না টিকলুর, ওই বুড়ো ভুল করে 'খোকা রাজাবাবু' বলে টিকলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি, জেনে বুঝে ইচ্ছে করেই পড়েছিল। সাদৃশ্য অবশ্য আছেই কিছু, তাই সাহস করেছে।

টিকলু আর ওকে কেয়ার করবে না।

টিকলু তাই কড়া গলায় বলে ওঠে 'আপনি বুঝি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দেখেছিলেন?'

'রাজীবনারায়ণ আবার চমকে ওঠেন, 'দীপু! এই ক' দিনে তোমার গলার স্বরই বা এমন বদলে গেল কী করে?'

'কী করে আর' বক্রেশ্বর বলে ওঠেন, 'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, গরীব গেরস্ত ঘরের ছেলেদের সঙ্গে মিশে—'

'বাক্যবাগীশ তোমার জিভকে থামাবে? যাকে জিগ্যেস করছি তাকে বলতে দাও।'

রাজীবনারায়ণের গলায় একটা রাজকীয় স্বর ফুটে ওঠে।

এখন টিকলুর একটু সমীহ আসে।

টিকলু গলাটাকে যতটা সম্ভব নরম করে বলে, 'এই রকমই তো ছিল। অনেকদিন পরে শুনছেন, তাই।'

'তা হবে।'

রাজীবনারায়ণ একটু চুপ করে থেকে বলেন,

'তা' পালালে কী করে?'

টিকলু শক্ত হয়ে বসে।

টিকলু 'অচেনা দেশে অভীক' বইটার কাহিনীটা মনে করে নেয়। নড়ে চড়ে বসে বলে, 'জানি না! রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মনে হল কে যেন আমায় ডাকছে। চলে গেলাম।'

চোখে দেখতে না পেলে মানুষ যে শুধু' অসহায়ই হয় তা' নয়, একটু যেন অসহিষ্ণুও হয়ে যায়। রাজা রাজীবনারায়ণ সেই অসহিষ্ণু গলায় বলেন, 'মনে হল আর চলে গেলে?... দেখলে না কে ডাকছে?'

'আমি তো তখন স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম।'

'তা' বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে কী করে? সিঁড়ির দরজা বন্ধ ছিল না? দেউড়িতে তালাচাবি ছিল না?'

'জানি না তো। হঠাৎ যখন জ্ঞান হল, দেখলাম সকাল হয়ে গেছে আমি একটা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় শুয়ে আছি।'

'হুঁ! নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ভগবান রক্ষে করেছেন। তারপর তুমি কী করলে?'

'উঠে বসলাম। তখন দেখলাম কোথা থেকে একজন কাপালিক মত লোক এসে আমায় এক গেলাস দুধ খেতে দিল—'

'সর্বনাশ! তুমি খাওনি তো?'

টিকলু অবলীলায় বলে, 'খেলাম তো—'

'আহা হা! ছি ছি! সেই কাপালিকের হাতের দুধ তুমি খেলে? তোমার একবারও মনে হল না, ওটা মন্ত্রপূত দুধ হতে পারে।'

টিকলু অম্লান গলায় বলে, 'বাঃ কী করে মনে হবে? তখন তো আমি অলরেডি মন্ত্রপূত হয়েই গেছি।'

'হুঁ! ঠিক! তারপর?'

'তারপর? তারপর সেই কাপালিকের সঙ্গে কোথায় না কোথায় বেড়ালাম! বনে জঙ্গলে—ও কী দেওয়ান মশাই আপনি হঠাৎ মেজেয় শুয়ে পড়ে 'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত' না কি, সেই করছেন যে?'

বক্রেশ্বর হিংস্র গলায় বলেন, 'হ্যাঁ করছি!'

রাজীবনারায়ণ চমকে বলেন, 'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত? কেন? কাকে?'

বক্রেশ্বর আরো হিংস্র গলায় বলেন, 'করছি আমার গুরুকে।'

'গুরু! তুমি যে তাজ্জব করলে বাক্যবাগীশ! এখানে আবার তোমার গুরু পেলে কোথায়?'

'পেলাম।'

'তা'হলে ভাল করে বসাও টসাও গে। তোমার তো কখনো গুরু টুরু ছিল না!'

'ছিল না। হঠাৎ লাভ হয়েছে।'

বলে নিজের গায়ে 'চটাস চটাস' শব্দ করে মশা মারেন বক্রেশ্বর।

রাজীব আর একবার হাত বাড়িয়ে বলেন, 'কই দীপু? কোথায়? হাতটা দেখি আর একবার।'

টিকলু অনিচ্ছা সত্ত্বে অগত্যাই সেটা করে।

রাজীবনারায়ণ একটুক্ষণ টিপে টিপে দেখে বলেন, হুঁ বুঝেছি। গাঁজা টাঁজা সাজিয়েছিল তোমায় দিয়ে, তাই হাতের গড়ন বদলে গেছে। ওই একই কারণে সবই গেছে।...তোর মা বাপ এলে যে কী বলবো!'

টিকলু মনে মনে বলে, 'ততদিনে আমায় আবার কাপালিকে ধরে নিয়ে যাবে।

মুখে বলে, 'কী আবার বলবেন। মানুষ কি চিরকাল এক রকম দেখতে থাকে?'

রাজীবনারায়ণ মৃদুস্বরে বলেন, 'কী জানি! কতটা বদলে গেছ বুঝতে তো পারছি না। মনে হচ্ছে যেন আর কার সঙ্গে কথা বলছি।'

বক্রেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'কী যে বলেন। খোকারাজা ঠিকই বলেছেন, অনেকদিন পরে তো।'

'তা'হবে। ওর কর্তামার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো?'

টিকলু বলে ওঠে, 'নাঃ।'

'তার মানে?' রাজীবনারায়ণ হঠাৎ চড়ে ওঠেন, 'বাক্যবাগীশ, এটা কী হয়েছে?'

'আজ্ঞে, আসা মাত্রই খবর দেওয়া হয়েছিল।'

'ওঃ খবর দেওয়া হয়েছিল? তা' ওই একটা সিঁড়ি উঠেই থেমে যাওয়া হল কেন? দেখাটা করানো হল না কেন?'

টিকলু ফট্ করে বলে ওঠে, 'উনি এখন ওঁর মেয়েদের খাওয়াচ্ছেন। খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে আসবেন।'

'ওহো হো!'

রাজীবনারায়ণ হাসতে থাকেন হা হা করে। তারপর বলেন, 'সাধে কি আর বাড়ির লোক বাড়ি ছেড়ে পালায়! কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে খুবই কষ্টে থেকেছিলে মনে হচ্ছে। গলাটা তোমার একেবারে বদলে গেছে। অমন বাঁশির মত সুরেলা গলা—'

হঠাৎ টিকলুর সেই না দেখা খোকা রাজাবাহাদুর দীপেন্দ্রনারায়ণের উপর ভারী রাগ হয়। তাঁর না কি রেশমের মত চুল, শাটিনের মত গায়ের চামড়া, আবার বাঁশির মত সুরেলা গলা।

তবে?

বুড়ো বক্রেশ্বর, কী দরকার ছিল তোর বেচারা টিকলুকে তার বদলে ধরে আনার?

এ কথা ভাবার পর টিকলু মনে মনে হাসে, ধরে কি আর এনেছিল? ধরে আনবার সাধ্য ছিল? টিকলু আর বাপী যদি দু'জনে মিলে পরিত্রাহি চেঁচাত, মেলাতলার সমস্ত লোক ছুটে এসে বুড়োকে গুঁড়ো করে ফেলত না?

রানী তুলসীমঞ্জরী পাট্টাদার বাহাদুরা আজ দারুণ মুস্কিলে পড়েছেন। কোথায় ভাবছেন মেয়েগুলোকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে গিয়ে ফিরে পাওয়া হারানো মানিককে নিয়ে গুছিয়ে বসবেন, তা' নয় কিছুতেই ঘুমোতে চাইছেনা তারা। যতবার শুইয়ে মশারি ফেলে দিতে চাইছেন, ওরা মশারি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তুলসীমঞ্জরী অনেক আদর করলেন তাদের, অনেক খোশামোদ করলেন, যাদু সোনা লক্ষ্মী মানিক গোপালী বাবুরানী ইত্যাদি বলে, কিন্তু কী যে হল ওদের, ঘুমের নাম নেই।

'বুঝেছি, ভাইপোকে না দেখে ঘুম আসছে না তোদের চোখে—'

তুলসীমঞ্জরী হতাশ হয়ে বলেন, 'ভেবেছিলাম আজ রাত হয়ে গেছে, আজ আর হৈ চৈ-তে কাজ নেই, কাল সকালেই পিসি ভাইপোতে দেখা সাক্ষাৎ হবে। তা তোরা তো দেখছি ছাড়বি না, এখনই দেখতে চাস। তবে চল। 'কই রে কোথায় আমার দীপু সোনা? আমার আঁধার ঘরের মানিক, আমার হারানো ধন, আমার শিবরাত্তিরের সলতে, আমার দীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর!...মোক্ষদা? ভবতারিণী? জাহ্নবী? বামুনদি? কোথায় তোরা? কোন ঘরে রেখেছে তাকে?'

টিকলু তখন সবে রাজীবনারায়ণের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফের তার সেই ঘরটাতেই এসে বসেছে, হঠাৎ মোক্ষদা এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল, 'খোকা রাজাবাবু কর্তারানীমা আসছেন।'

টিকলু তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে। আর তারপরই দরজার কাছে কর্তা রানীমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে খাট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেয়ার উল্টে ফেলে টেবিল ঠেলে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকে।

রানীমার পরণের গরদ শাড়ির বেদম চওড়া লাল পাড়, আর পিছনে তাঁর মেয়েদের মাথায় বাঁধা লাল সিল্কের চওড়া ফিতের ফাঁস যেন একটা রক্তের ইসারা নিয়ে টিকলুর গলায় ফাঁস পরাতে আসছে।

টিকলু ছুটে যে ঘরে হোক ঢুকে পড়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দেবে।

শুধুই যে লাল ফাঁসে রক্তের ইসারা, তা তো নয়, ওই লালের পিছনে অন্ধকার ভবিষ্যতের গভীর কালো ছায়াও।

রানী বাহাদুরার পিছন পিছন লাইন দিয়ে এগিয়ে আসা তাঁর ছোট বড় মেজ সেজ নানা মাপের মেয়েগুলির সকলের পরণে ঘন কালো শাটিনের লম্বা ঝুল রাত জামা। কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য।

টিকলু ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে শিউরোচ্ছে, শিউরোতে শিউরোতে ছুটছে আর বারান্দার ধারে ধারে যত দরজা পাচ্ছে দুহাতে ধাক্কা মারছে। কিন্তু খুলছে কই? সব দরজাই যে ভিতর থেকে বন্ধ।

আর বারান্দাটাও কি এত বড়।

না কি মন্দির প্রদক্ষিণের মত পাক খেয়ে আবার একই জায়গায় ঘুরে আসছে, সে? এই বাইরের দিকের বারান্দায় আলোর বালাই নেই। এ ধারে ঘরের দেয়াল, আর রেলিঙের ওধারে অন্ধকারে জমাট গাছপালার সারি। হয়তো আম কাঁঠাল জাম জামরুল তাল নারকেলের বাগান। কিন্তু সে দিকে কে তাকাচ্ছে? ওই ঝাঁকড়া মাথা জমাট কালো গাছগুলোকে তো স্রেফ্ দৈত্য বলে মনে হচ্ছে।

ধাক্কা দিতে দিতে হঠাৎ একটা ঘরের দরজা দু হাট করে খুলে গেল, আর টিকলু ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কিন্তু মাটিতে পড়ল কি?

'কে! কে বাবা তুমি?

আকস্মিকতায় চমকে ওঠা স্বর নয়, দিব্যি গা গড়ানো দীর্ঘ বিলম্বিত-লয়ে উচ্চারিত শব্দ, 'হুমড়ে এসে পড়লে কে?'

ঘরের এককোণে একটা কেরোসিনের আলো খুব কমিয়ে সরিয়ে রাখা ছিল, সেটা কেউ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিল, ঘরটা আলো হয়ে গেল।

টিকলুর ভাগ্য, ও যে ঘরে হুমড়ে এসে পড়ল, সে ঘরের সারা মেজেটায় পুরু গদি পাতা। অর্থাৎ ঘরের মেজেটা বিছানায় মোড়া।

টিকলুদের নিজেদের বাড়িতে না থাকলেও অন্য অনেক বাড়িতে মেজেটা কার্পেট মোড়া দেখেছে টিকলু কিন্তু পুরু গদিদার বিছানায় মোড়া?

না, এমন কখনও দেখেনি।

যাক ভাগ্যিস এমন অভিনব ব্যাপারটা রয়েছে, তাই না টিকলুর নাক মুখটা বাঁচল। নইলে এই মার্বেল পাথরের মেজেয় ঠিকরে এসে পড়লে নাক মুখ কি আর থাকত?

তবু উঠে বসে নাকে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাঁপাতে থাকে টিকলু।

যে লোকটি আলো বাড়িয়েছিল সে সেটা ধরে এনে টিকলুর মুখের কাছে

দুলিয়ে তেমনি বিলম্বিত গলায় বলে, 'কে হে ছোকরা! মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ভূতে তাড়া খাওয়ার মত আছড়ে এসে পড়লে! এলে কোথা থেকে? বাগান দিয়ে? রেলিং টপকে?'

টিকলু দেখে লোকটার সাজসজ্জা যারপরনাই শৌখিন। মিহি আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, পাট পাট করে কোঁচানো ফাইন শান্তিপুরী ধুতি, দুহাতে মিলিয়ে গোটা পাঁচ ছয় আংটি মধ্যযুগের মত সরু টেরির দুপাশে থাক দেওয়া চুল, পায়ে রঙিন মোজা। ঘরে আর কেউ নেই।

এই সাজ করে যে কেউ রাত্রে ঘুমুতে পারে, টিকলুর ধারণার বাইরে। টিকলু নাক থেকে হাত খুলে তাকিয়ে দেখে।

এও সেই 'ছোকরা' বলছে।

'ছোকরা' শুনলেই টিকলুর মেজাজ চড়ে ওঠে, এখনও উঠল। টিকলু সেই চড়া গলায় বলে উঠল, 'আপনি কে তাই শুনি?'

'আমি? আমি আবার কে? এ বাড়ির সবাই জানে আমি কেউ না, কিছু না। তবে আছি এ বাড়িতে বছর চল্লিশ ধরে, আর একটা কিছু নামে ডাকতে তো হয় মানুষকে, তাই সবাই আমায় 'জামাইবাবু' বলে। কর্তা কর্তামাও বলেন, যুবরাজা যুবরানীও বলেন, দাস দাসী আমলা শামলা নায়েব দেওয়ান লেঠেল পাইক সবাই বলে। আমার জ্ঞান উন্মেষের আগে থেকে আমার এই নাম। কিন্তু এযাবৎ-কালের মধ্যে কই তোমায় তো কখনো দেখিনি।'

'দেখেন নি? বাঃ চমৎকার!'

টিকলু ঠিক করে ফেলে বেপরোয়া চালিয়ে যাবে। আর যাই হোক ভয় খাবেনা কিছুতেই। অবশ্য কর্তা-রানীমার মেয়েদের বাদে।

টিকলু জোর গলায় বলে 'দেখেননি? আগে কক্ষনো দেখেননি?'

'কস্মিন কালেও না।'

টিকলু বুক ফুলিয়ে বলে, 'আমি হচ্ছি রাজকুমার শ্রীদীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর।'

'কী? কী হল? তুমি দীপেন্দ্র-নারায়ণ? হা হা হা! হো হো হো! পাট্টাদার বাহাদুর! হা হা হা! নাঃ বাবা গড়াগড়ি দিতে হল।'

জামাইবাবু হঠাৎ মেজেয় পাতা গদি বিছানার ওপর প্রথমে বসে পেট চেপে, তারপর শুয়ে, গড়াগড়ি দিতে দিতে হাসতেই থাকেন, হা হা হা।'

অমন পাটভাঙা জামাকাপড়গুলো গেল। অসহ্য লাগে টিকলুর।

স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে ওঠে, 'হচ্ছেটা কী? জামাকাপড়গুলো যে গেল।'

'যাক বাবা! যাক! এ বাড়িতে মাইনে করা ধোপা আছে, রোজ ধোপদস্ত করে দেয়। তা' হঠাৎ রাজপুত্তুর হবার শখ হল কেন যাদু?'

'শখ আবার কী? আমিই তো ছিলাম, তারপর হারিয়ে গিয়েছিলাম—অনেকদিন না দেখে আপনি'

'ওহো হো! ওরে বাবারে! তুমি দেখছি আমার পেটটা ফাটিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না। বাবাঃ।

'কী পাগলের মত হাসছেন?'

'তা হাসবো না? পাগল যে করলে বাপ।...না বাপু আমায় একটু পেট-ভরে হাসতে দাও।'

বলে আবার গড়াগড়ি দিয়ে হাসতে থাকেন জামাইবাবু।

হাসি আর থামতে চায় না, হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে যান, তাহলে তুমিই সেই নিরুদ্দেশ রাজপুত্র? হ্যাঁ হে ওস্তাদ, নিজেই এই কারবারটি ফেঁদেছ, না কি বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশের নতুন কোনো কারসাজি।

'তার মানে?'

'মানে আর তোমায় কি বোঝাব যাদু? কস্মিনকালেও যে তুমি এই পাট্টাদার বংশের কেউ নও, তা নিজেই খুব ভালো জানো। কিন্তু এলে কোথা থেকে? কোথা থেকে জোগাড় করে আনল তোমায় বক্রেশ্বর? তবে হ্যাঁ লোকটার ক্যাপাসিটি আছে। জোগাড় একখানা করেছে মন্দ নয়। কিন্তু গালের ওই কালো তিলটা অবশ্যই মেক্‌আপ?'

'মেকআপ?'

টিকলু রেগে জোরে জোরে গালে হাত ঘসে বলে, 'এটা মেকআপ? উঠে যাচ্ছে?'

'উঠছে না? তাই তো। তা হলে বলতেই হবে বিধাতা পুরুষও মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গে খানিকটা ঠাট্টা-তামাসা করে ফেলেন।...এই যে তুমি, কে তা জানি না, কী নাম কোথায় ধাম, কিছুই জানি না, কিন্তু মানতেই হবে এ বাড়ির ঘরপালানে ছেলেটার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য আছে তোমার। আবার বলছ ওই তিলটাও মেকআপ নয়। ঠিক আছে। জিতা রও। দেখি নব যাত্রা পার্টিতে নতুন কী পালা শুরু হয় এবার।'

যদিও প্রথমে ছোকরা বলেছিল, তবু, ভদ্রলোকের কথাটথাগুলো নেহাৎ মন্দ লাগছে না টিকলুর। গড়িয়ে গড়িয়ে বললেও কথার মধ্যে প্রাণ আছে।

টিকলু বলে, 'আমি এ ঘরেই শোবো।'

'এ ঘরেই শোবে? বাঃ বাঃ! বেশ মামার বাড়ির আবদার তো। এ ঘরে আমি মাঝরাত্তির থেকে শেষরাত্তির অবধি গানের সুর ভাজি না?'

'ভাজবেন, তা'তে কী? আমি তো এক কোণে শুয়ে থাকবো। গান আমার ভালই লাগে!

'বাঃ ছেলে! খুব চালাক। বক্রেশ্বর বুঝি তোমায় এই হতভাগা লোকটার ঘরে ভর্তি করবার জন্যে ধরে নিয়ে এসেছে?'

'ধরে?!

টিকলু বীরবিক্রমে বলে, 'আমায় কেউ ধরে-টরে নিয়ে আসেনি। ধরে আনা অত সস্তা নয়। আমি নিজেই এসেছি।'

'নিজেই এসেছ?'

আদ্দির পাঞ্জাবী ছড়িয়ে ভদ্রলোক গদির উপর গদিয়ান হয়ে বসে বলেন, 'ভ্যালা রে মোর যাদুমণি! কিন্তু কেন এসেছ বাপ?'

'এমনি।'

'এমনি! তা কবে কখন কোন সময় এই আবির্ভাবটি ঘটল?'

'এই তো আজ। কিন্তু এখন আমি শুচ্ছি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'তা তুমি তো বাপু রাজকুমার, এ ঘরে এসে লুকিয়ে থাকলে বাড়িতে হুলিয়া পড়ে যাবে না?

টিকলু গম্ভীর গলায় বলে, 'মোটেই আমি লুকোতে আসিনি। ঘুম পাচ্ছে বলেই আর অন্য ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে। ঘুমোও। কিন্তু খবর-দার সুরভাঁজার সময় বকবক করবে না।'

টিকলু অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'একটা কথাও বলব না। আমার যা ঘুম পাচ্ছে, শুনতেই পাব না।'

টিকলু শুয়ে পড়ে হাত পা ছড়িয়ে। জামাইবাবু কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে দেখেন ওকে।

তারপরই আবার কথা বলে ওঠেন, 'সবই তো একরকম বুঝলাম! কী সূত্রে, কী পরিস্থিতিতে আর কোন্ কৌশলে তুমি এই বুনো রাজবাড়ির দেউড়ি ডিঙোলে তাও জানতে চাই না, কিন্তু এখন হঠাৎ অমন বাঘে তাড়া খাওয়ার মত ছুটে এসে পড়লে কেন তাই শুনি?'

টিকলু ধড়মড়িয়ে বলে ওঠে, 'ওরে বাবা সে কথা মনে করিয়ে দেবেন না! ভাবলেই আমার মাথা ঘুরে উঠবে।'

আবার ধপাস করে শুয়ে পড়ে।

আর বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ে।

সকাল থেকে মনে সুখ নেই রাণী তুলসী মঞ্জরীর। গতকাল রাত্তিরে হঠাৎ ওরকম ঘটনা ঘটল কেন! এতদিন পরে যদি বা ছেলেটা বাড়ি ফিরে এল, সে কি মাথার গোলমাল ঘটিয়ে এল? পিসীদের এত ভালবাসত সে, বিশেষ করে গোলাপ পিসি আর মালতি পিসিকে, অথচ কাল ওদের দেখেই হুড়মুড়িয়ে পাগলের মতন ছুটে পালিয়ে গেল। সেই অবধি না কি আর দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। ভগবান কি দিয়ে আবার কেড়ে নিলেন? কূলে এসে তরী ডোবালেন?

শুনতে পেয়েছেন, দীপুকে নাকি নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, দীপুর নাকি হাবভাব, ধরন ধারণ, মাথার চুল, গলার স্বর সব বদলে গেছে। রঙেরও না কি সে জেল্লা নেই। মন ভেঙে যাচ্ছে তুলসীমঞ্জরীর।

আর মাত্র মাসখানেক বাকি আছে, ছেলে ছেলেবৌয়ের ফিরে আসার, তারা এলে কী দেখাবেন? এখনও যদি ছেলেটাকে ঠিকমতো হাতে পাওয়া যেত, তাহলে আচ্ছা করে দুধ ঘী ছানা মাখন ক্ষীর সর আর মাছের মুড়ো খাইয়ে এবং কবিরাজী তেল মাখিয়ে মাখিয়ে, আগের চেহারায় এনে ফেলা যেত। কিন্তু তার যদি মাথাটাই বেঠিক হয়ে গিয়ে থাকে? তাহলে তো কোন আশাই নেই। হয়তো মাথায় মাখবার ফুলেল তেলকে সরবৎ ভেবে খেয়ে ফেলবে, ডাবের জল মাথায় মেখে বসবে, হয়তো বা ভাত নিয়ে ছড়াবে, ধরতে গেলে পালাবে, হাত পা ছুঁড়বে।

রানী তুলসী মঞ্জরীর এক পিসে-মশাইকে একবার ভূতে পেয়েছিল, তখন তিনি এইসব করেছিলেন। তখন তাঁর চেহারাও কী পাল্টে গিয়েছিল, উঃ। চোখ লাল, তার ওপর আবার সে চোখ সর্বদা ঘুরছে। মাথার চুল খাড়া খাড়া, মুখের রং বেগুনী। কত-দিন ধরে, মাথায় কত হুঁকোর জল থাবড়ে, কত কবরেজী তেল ঘষে, গায়ে কত পানাপুকুরের পানা মাখিয়ে, আর কত পান্তাভাতের বাসি আমানি আর তেঁতুল গোলা খাইয়ে খাইয়ে তবে ধাতে আনা হয়েছিল পিসেমশাইকে।

'খোকাকে আমার তাই করতে হবে নাকি গো—'

বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন তুলসীমঞ্জরী।

আজ কোথায় মা হিঙ্গুলরানী কালীর মন্দিরে পুজো দিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরবেন, তা নয় এই।

'ছেলেটাকে এখনো পর্যন্ত ভাল করে চোখেও দেখলাম না—' আর একবার ভেউ ভেউ।

ছুটে এল মোক্ষদা, বামুনদি, তারিণী-সুধা দুঃখীর মা।

কেউ পাখা এনে বাতাস করতে থাকে, কেউ মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দেয়, কেউ বা নিজেরাও গলা মিলিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লেগে যায়। ওদের দেখাদেখি তুলসীমঞ্জরীর যুঁই মল্লিকা শেফালী মালতী কমল গোলাপ সবাই মিলে একযোগে তারস্বরে সুরে সুর মেলায়, 'ভেউ ভেউ ভেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

এদিকে রামরাজাতলায়—

বাপুর এখন কাজ হয়েছে, প্রতিক্ষণ প্রতি সময় মাথার মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে হাতুড়ি ঠোকা। আর দৈনিক আধঘণ্টা করে আনুষ্ঠানিকভাবে ধাঁই ধাঁই করে ঠোকা। মানে নিজেরই মাথায় এই আনুষ্ঠানিকটি হচ্ছে যে কথাটা মনে পড়ছে না, সেটা মনে পড়াবার জন্যে তার মতন কিছু লেখা। ধর একজন চেনা লোকের নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না, অথবা কোনো একটা মুখস্থ গানের কোনো লাইন মনে আসছে না, তখন, 'ভুলে গেছি' বলে থেমে না থেকে; খাতার পাতায় কেবল সেই ধরনের কিছু লিখে চল।

সামান্য একটু সুর, কি একটা শব্দ-ঝঙ্কার, একটু ধ্বনি, এ তো থাকবেই মনে?

ওইটা ধরেই চালিয়ে যাওয়া।

'শুধু মনে পড়াতে চেষ্টাটা হচ্ছে স্যাকরার হাতুড়ির মত 'ঠুক ঠুক' আর পাতার পর পাতা লেখাটা হচ্ছে কামারের হাতুড়ির মত ধাঁই ধাঁই—' এটা বলেছেন বাপুর বাবা।

তাঁর মতে, মানুষের পক্ষে কোনো কিছুই একেবারে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। সে একবার যা চোখে দেখেছে, একবার যা কানে শুনেছে, অথবা এক-বার যা জিভে খেয়েছে কিছুতেই তার ছাপ হারিয়ে যায় না।...মানুষের ব্রেনের মধ্যে মৌচাকের মত অসংখ্য খুপরিওলা একটা ঘর আছে, তার কোনো না কোনো খুপরিতে গিয়ে আটকে পড়ে থাকে ওই দেখা, শোনা, জানা জিনিসগুলো। হয়তো কোনো কারণে ওই আটকা পড়া খুপরিটায় ঢাকনি চাপা পড়ে যায়, এক ডাকে বেরিয়ে আসতে পারে না, তখন-কার কর্তব্য হচ্ছে অনবরত ঠোকার, অর্থাৎ ভাবার। ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ একসময় ওই চাপা পড়ে যাওয়া ঢাকনিটা খুলে যাবে।'

অতএব বাপুকে এখন সবসময় ভাবা ছাড়াও দৈনিক আধঘণ্টা করে খাতার খালি পাতা ভর্তি করে খালি খালি লিখে চলতে হয়, 'ময়নাখালি, শালিখ-খালি, কাকখালি, নেকড়ে খালি, হাঙর খালি, মোজা খালি, জুতো খালি, লাঙুল খালি, আঙুল খালি, গঞ্জ খালি, থানা খালি—'

আরো কত খালি।

কারণ, বাপুর এইটুকু মনে আছে টিকলুকে ওরা যে রাজ্যে নিয়ে গেল, তার ঠিকানার মধ্যে বেশ কতকগুলো 'খালি' আছে। কিন্তু ঠিক যে কী আছে, তা ভাবতে ভাবতে মাথা খালি হয়ে যাচ্ছে বেচারার। একটির পর একটি 'এক্সারসাইজ বুক্' শেষ হয়ে গেল, এখন ওর ছোড়দি বলছে, এবার থেকে ফুলস্ক্যাপ কাগজে লেখ, খাতার দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে।

টিকলু হারানোর দিন থেকে বাপু বেচারা চোরের অধম হয়ে আছে।

বাপু এতখানি বয়সে সারাজীবনে যতটা না বকুনি খেয়েছে, তার থেকে একশো গুণ বকুনি, সেই একদিনে খেয়েছে।

তার ওপর লাঞ্ছনা গঞ্জনার ঝড় বয়ে গেছে, ধিক্কারের শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, ধমকের বজ্রপতন হয়েছে, আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মুষলধার বর্ষণ হয়ে গেছে। এখনও হচ্ছে।

সেই ভয়ংকর সময়ে বাপু সব সময় সামনে ছিল, সমস্ত কথার সাক্ষী আর সমস্ত দৃশ্যের দর্শক ছিল, অথচ বাপু লোকটার নাম ভুলে গেল, ভুলে গেল তার বলা ঠিকানাটা। তাছাড়া বাপু বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে থেকে বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

সবাইয়ের এক কথা, 'তুই মেলাতলার লোকেদের ডেকে বলে দিতে পারলি না? তারা সবাই এসে একযোগে ওই ছেলেধরা জোচ্চোরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে 'বৃন্দাবন' দেখিয়ে ছাড়ত! কাউকে 'বৃন্দাবন দেখাবার' সুযোগ পেলে মানুষ আমার তোমার বোঝে না, আসল ঘটনাটা কী জানতেও চায় না বুঝলি? স্রেফ ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিত।'

আর কতবার যে বাপুকে আদ্যো-পান্ত বলতে হয়েছে। সেই বাড়ি থেকে বেরোনো থেকে টিকলুকে হারিয়ে মেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত।

তারপর কী হল?

তারপর কী করলি?

তারপর সে কী বলল?

কাহিল হয়ে গেল বাপু একই প্রশ্নের উত্তর একশোবার দিতে দিতে।

টিকলুর সেজকাকাতো একেই চায়ের দোকান শুনে চমকে উঠেছিলেন, তার ওপর ডিমের অমলেট শুনে অজ্ঞান হয়ে যাবার জোগাড়।

' তা হলে আর আক্ষেপ করার কিছু নেই, বাড়ি ফিরলেও তো সেই কলেরা হয়ে মরত।

বাপু রেগে বলে, 'আমি বুঝি মরে গেছি?'

সেজকাকা অনায়াসে বলেন, 'তোমার কথা বাদ দাও।'

কেন যে বাদ দেওয়া হবে তা কিছু বলেন না।

আচ্ছা লোকগুলো কী রকম দেখতে?

একশোবার এ কথার উত্তর দিতে হয়েছে বাপুকে।

বাপু যতই বলে কী রকম দেখতে, সে কি কখনো বলে বোঝানো যায়?

ওরা ততই চাপ দিতে থাকেন, তা কিছুও তো দেখবি? কালো না ফর্সা, মোটা না রোগা, গায়ে কোট না শার্ট, পরনে ধুতি না পায়জামা এইসব।

কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার সেই একই কথায় এসে পৌঁছায়।

কী বলে তুই ওকে ছেড়ে দিয়ে হাঁ করে ফিরে এলি?

তোর না চিরকালের বন্ধু?

তুই না ওর চিরকালের বন্ধু?

ওর সঙ্গে না তোর অজ্ঞান বয়েস থেকে ভালবাসা?

'আশ্চর্য এ তোর মাথায় এল না, যে লোকটা জোচ্চোর?'

'বাঃ আমি কি করে জানব? আমি কখনও জোচ্চোর দেখেছি?'

'আহা! টিকলু যে কী রকম বিশ্বাসঘাতকতা করল!'

—বলেছে বাপু কেঁদে ফেলে, 'ও দিব্যি বলে দিল, ও সেই ওই কী খালি'র যেন রাজবাড়িরই ছেলে। তার বেলায় দোষ হল না?

'তাকে তো যাদু করে ফেলেছিল—' সেজকাকা বলেছিলেন, 'স্রেফ্ মেসমেরাইজম। মানে ইন্দ্রজালের প্রভাবে আয়ত্ত করে ফেলা। ওর দোষ কী?'

তার মানে বাপুই সকল দোষে দোষী।

তাই বাপুকে এখন রোজ গভীর চিন্তায় ডুবে তলিয়ে গিয়ে লিখতে হচ্ছে 'চড়াই খালি, মাছরাঙা খালি, পানকৌড়ি খালি—লিখতে হচ্ছে, বক্রেশ্বর চক্রেশ্বর লক্ষ্যেশ্বর যজ্ঞেশ্বর মাথাশ্বর মুণ্ডুশ্বর।'

কত কতদিন হয়ে গেল, হাতুড়ি মেরে মেরে বাপুর ব্রেনটাই বোধহয় জখম হয়ে গেল, কিন্তু সেই আসল খুপরির ঢাকনিটা আর খুলছে না।

গ্রীষ্মের ছুটি, একদিন সকালের দিকে খাতাকলম রেখে বাপু বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে একমনে ভাবতে চেষ্টা করছে, আচ্ছা তারপর বুড়ো কী বলল, তার পর টিকলু কি বলল। হঠাৎ পিয়ন এল চিঠি নিয়ে।

উদাসভাবে চিঠিগুলো নিচ্ছিল বাপু, হঠাৎ তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল, মাথার চুল, দু'বাহু তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর চোখ!

সে তো স্রেফ্ বাপুর ছোট ভাইয়ের খেলার রবারের বল!

বাপুর নামে চিঠি, হাতের লেখা টিকলুর।

বাপুর সর্বশরীর অবশ হয়ে এল, বাপুর হাত পা কাঁপতে লাগল, বাপু সাহস করে ওই ভারী ভারী খামখানা খুলতে পারল না। বাপু নিজের নামের চিঠিটা নিয়েই ছুটে ভিতরে চলে এসে বলল, 'বাবা! দেখ কাণ্ড!'

তা কাণ্ডই বটে।

দু' বাড়ির লোক একসঙ্গে কথকতা শোনার মত এক মনে এক ধ্যানে জড় হয়ে টিকলুর চিঠি শুনতে বসল।

বাপুর গলা কাঁপছিল, তাই পাঠের ভার নিল বাপুর ছোড়দি।

ওর মায়ামমতা কম, গলা টনটনে, পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলবে না, গলা বুজে যাবে না। টিকলু যে এত বড় চিঠি লিখতে পারে একথা কে ভেবেছে? আসলে মানুষ কী পারে আর কী না পারে, তা সে নিজেই জানে না। অবস্থাই মানুষকে দিয়ে অভাবিত অসম্ভব সব কাজ করিয়ে নিতে পারে। না হলে টিকলুর হাত থেকে ছ পৃষ্ঠা চিঠি বেরোয়?

টিকলু লিখেছে—

'বাপু তুই বোধহয় আমার ওপর রেগে টং হয়ে আছিস। হতেই পারিস। পরে বুঝেছি আমার জন্যে তোকে অনেক বকুনি খেতে হয়েছে। আমি তো 'তলি হাত ফসকে গেলি'র মত ফসকে চলে এলাম, হাঁড়িকাঠে গলা দিতে হল একা তোকে। কিন্তু পরে যখন গিয়ে সব গল্প করবো, তখন তোর সব রাগ জল হয়ে যাবে। তার আগে চিঠি পাঠাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম রে।

আমায় যে ঘরে থাকতে দিয়েছে সে ঘরের টেবিলে লেখবার সব জিনিস মজুত আছে। কাগজ কলম কালির দোয়াত, পেনসিল রবার, আলপিন খাম পোস্টকার্ড ডাকের টিকিট। তার মানে রাজকুমারের কখন কি লাগে তার ব্যবস্থা।

আমি এখন রাজকুমার!

আমার যখন যা দরকার পেয়ে যাব, শুধু বাইরে বেরোনো বন্ধ। অর্থাৎ বন্দী রাজপুত্র। কিন্তু বাড়ি এত বড়, সঙ্গে এত বড় বাগান যে বন্দী বলে সব সময় মনে পড়ে না।

সে যাক, এখানে এসে কেমন সব মানুষ দেখলাম, সেই কথাই বলি।

১। বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশ। যে মহাপুরুষ ব্যক্তিটি আমায় হঠাৎ 'খোকারাজাবাবু' বলে চিনে ফেলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিলেন। একের নম্বরের ভণ্ড আর চালাক লোক। মোটেও ও আমায় ওদের রাজকুমার বলে বিশ্বাস করেনি, শুধু অনেকটা সাদৃশ্য দেখে আর সেই রাজকুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের মত আমার গালে তিল দেখে, চালাকিটা খেলল। ওর ওপর হুকুম হয়েছিল আর এক মাসের মধ্যে ছেলে খুঁজে বার করতে না পারলে গর্দান যাবে। কী আর করে বেচারা? গর্দানের মায়ার কাছে তো আর কিছু নয়?...আসলে ও ভেবেছিল আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ভয়টয় দেখিয়ে কিম্বা ভুলিয়ে ভালিয়ে দীপেন্দ্র সাজিয়ে, তালিম দিয়ে দিয়ে বুড়ো রাজারানীর চোখে ধুলো দেবে। দেওয়া খুব শক্তও নয়, বুড়ো ভদ্দরলোকের দু' চোখে ছানি, তার ওপর কালো চশমা। আর রানীমার? তাঁর কথা পরে বলছি।

তা বক্রেশ্বর মশাই আমার ব্যাপার দেখে হাঁ। আমি নিজেই এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন আমি সত্যিই দীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর। দেখে শুনে থ হয়ে আমায় 'গুরু' বলে পেন্নাম করেছে।

২। শ্রীগজগোবিন্দ, অর্থাৎ ছোটনায়েব। লোকটা ভীষণ ভীতু। দেওয়ান মশাইয়ের ভয়ে কাঁটা। আমার সঙ্গে আড়ালে একটা কথা বলবার সাহস নেই। ওর ধারণা আমি দেওয়ান মশাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসব করছি। কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে না। তবে বেজায় লোভী, কেবল আমার কাছে টাকাপয়সা চায়। তা আমাকে অবশ্য হাতখরচ বলে অনেক টাকাপয়সা দেওয়া হয়, সেসব দিয়েই দিই। বাইরেই বেরোতে পাই না টাকাপয়সা নিয়ে করব কী বল? এক একসময় যদিও খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ওখানে একটা দুটো টাকা পেলেই মনে হত যেন রাজ্য পেলাম, অথচ তাও পেতাম না। কত কী-ই কিনতে ইচ্ছে করত। একদিন আস্ত একটাকার বাদামচাকতি কেনবার এত ইচ্ছে হত, বেশ তোতে আমাতে খেতে খেতে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যেতাম।...কিন্তু সে আর হয়নি।

আর এখন সব সময় পকেটে কুড়ি পঁচিশ তিরিশ টাকা! অথচ দোকানে খাবার উপায় নেই। এই বোধহয় পৃথিবীর মজা। তবে টাকাগুলো থাকায় এই সুবিধে হয়েছে, বাড়িতে যারা কাজ টাজ করে, তাদের দিয়ে দিই। তারা দারুণ খুশী। বলে, 'খোকা-রাজাবাবু সাধু সন্নিসীর সংগে ঘুরে এসে দয়ালু হয়ে গেছে, আগে এমন মন ছিল না।'...হ্যাঁ আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি, আমি দিব্যি বলে দিয়েছি আমি যে চলে গিয়েছিলাম, সে হচ্ছে নিশির ডাকে। আর আমি ওই ছ'মাস কাপালিকের সংগে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবং আমার যে অনেক কিছুই মনে নেই (মনে আর থাকবে কোথা থেকে বল?) তার কারণ আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল... গল্পে-টল্পে সিনেমার ছবিতে এরকম দেখা যায় না?

এরা কবিরাজ ডেকে এনেছিল, তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, ওঁদের শাস্ত্রে নাকি এ-রকম রোগ আছে, তাকে 'স্মৃতিলুপ্তি' না কি যেন বলে।...' আর চেহারা? সে তো, বনে জংগলে ঘুরলে, খেতে না পেলে খুব কষ্ট থাকলে বদলে যাবেই।...তাই সবাই বেশ মেনে নিয়েছে. সন্দেহ-টন্দেহ করে না।

আর সবাই মানে তো ঝি চাকর দারোয়ান মালী সহিস কোচম্যান? তাদের আর কতই বা বুদ্ধি? দীপেন্দ্র-নারায়ণ তো থাকতোও না বেশী।

৩। বামুনদি।

তার একমাত্র কাজ আমার মত একটা ছোট ছেলের পেটের মধ্যে দশটা বড় মানুষের মত খাবার চালান করার চেষ্টা। এতো জ্বালাতন লাগে। তবে এমনিতে বেশ ভাল। আমার কাছে তার যত গল্প। না কি আমার (অর্থাৎ দীপেন্দ্রর) বাবা হচ্ছেন দারুণ 'সাহেব', অতএব তাঁর বৌও 'মেম।' এই জংগলের রাজাগিরি ওঁদের অসহ্য।... বুড়ো রাজার সংগে তাই বনে না। তাঁরা বেশী সময় তাই পালিয়ে, মানে বেড়িয়ে বেড়ান। তবে মাঝে মাঝে আসেন। এই বাড়িতে নাকি কোনো একটা দেয়ালের মধ্যে রাশি রাশি সোনার চাঁই পোঁতা আছে। কবে কোন কালে ডাকাতের ভয়ে তখনকার রাজামশাইরা এই কান্ড করে রেখে দিয়েছেন।

মজা হয়েছে কি, আসলে 'আমার' দাদু ওই কর্তারাজাও জানেন না সেই মোক্ষম দেওয়ালখানা কোন ঘরের মধ্যে আছে। ওঁর বাবাও জানতেন না, তাঁর বাবাও না। অথচ চিরকাল ধরে এই ধারণাটা চালু হয়ে আছে। ঠিক গল্পেরই মত না রে?...বামুনদি আরো বলে, 'আমি' যখন জন্মেছিলাম, ঠিক তক্ষুনি নাকি খুব ভূমিকম্প হয়েছিল, আর ছাতের সিঁড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল।

ওঁরা ভেবেছিলেন, নির্ঘাৎ ওই দেওয়ালেই সেই সোনার বাসা, নাতি হয়েছে বলে পূর্বপুরুষরা আশীর্বাদ করে সেগুলো বার করে দিলেন। কাজেই ছেলে রইল পড়ে, সিঁড়ি দেখতেই সবাই ব্যস্ত। বামুনদিই সেই ছোট্ট ছেলেটাকে আর তার মাকে আগলে বসে থেকেছে।

রাত্তিরে দোতলার বারান্দার ধারের ঘরে ভেলভেটের আসন পেতে আমায় খেতে দেওয়া হয়, রাশি রাশি সব খাবার, বামুনদির চেষ্টা গল্প বলে বলে সব চালান করবে।

বারান্দার ওধারে রাজবাড়ির বিরাট ফলের বাগান, অন্ধকারে ঝাঁকড়া মাথা দৈত্যের মত মাথা নাড়ে, শন্ শন্ করে শব্দ ওঠে, এলোমেলো হাওয়া বয়, কোথা থেকে না কোথা থেকে নাম না জানা সব ফুলের গন্ধ আসে, মনটা যেন কোথায় ভেসে যায়।...মনে হয় চির-কালই বুঝি আমি এই হাওয়া খেয়েছি, এই দৃশ্য দেখেছি, এইরকম বসেছি, খেয়েছি।

আমি যে রামরাজাতলার বিশ্বনাথ-বাবুর ছেলে সোমনাথ, সবাই যাকে টিকলু বলে ডাকে, তা যেন মনেই পড়ে না। মনে পড়ালে বিশ্বাস হয় না যেন। কে জানে আগের জন্মে আমি এই রাজবাড়িরই ছেলে-টেলে ছিলাম কিনা। হয়তো ছিলাম, তা নইলে এদের বাড়ির মতন চেহারাই বা হল কেন?...

তা বলে দিনের বেলায় এসব কথা মনে হয় না। ওই রাত্তিরটায় যে কী আছে। দিনের বেলায় তোর কথা কেবলই মনে পড়ে। আহা তুইও যদি আসতিস। এখন ভারী দুঃখ হয়—তখন কেন বলিনি 'আমার বন্ধুও আমার সঙ্গে যাবে।' তা যদি হত কী মজাই হত ভাব? ঝড়ের সময় আম-বাগানের যে কী দৃশ্য আমরা তো জন্মেও দেখিনি। এখন স্কুলে গরমের ছুটি, এলে কোনো অসুবিধে হত না।

কিন্তু এখন আর বলে কি হবে?

যদির কথা নদীতে যাবে।

এ-বাড়িতে আর একজন লোকের সঙ্গে আমার দারুণ ভাব হয়ে গেছে, যাকে বলতে পারি চার নম্বরের মেম্বার। তাঁর নাম হচ্ছে 'জামাইবাবু।'

তিন চার বছর বয়েস থেকে না কি তাঁর এই নাম। কেন কে জানে। আসলে যে তিনি এ-বাড়ির কে তাও জানলাম না। ভদ্দরলোক মোটে বিয়েই করেননি, অথচ 'জামাইবাবু' নামেই পরিচিত। বাড়ির কর্তা থেকে জমাদার পর্যন্ত সবাই বলে 'জামাইবাবু।' তা সাজেন খুব, ঠিক জামাইবাবুরই মতন। বেশ মজার লোক। ওঁর ঘরটাও ওঁর মতই মজার।

সারা ঘরে এক হাত পুরু গদিপাতা, সেই গদির ওপর সর্বদা ফর্সা ধবধবে চাদর বিছানো। তাতে মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট তাকিয়া ছড়ানো। ওঁর নাকি যখন ইচ্ছে শুয়ে পড়া একটা শখ, আর হাসি পেলে গড়াগড়ি দিয়ে হাসেন, তাই এই ব্যবস্থা। তা হাসেনও বটে।

আমি যখন বক্রেশ্বরের ওপর হম্বি-তম্বি চালাই, আর বক্রেশ্বর মুখ চুণ করে বিড়বিড় করে, তখন এ্যাইসা হাসি হাসেন। আমাকে পিঠ ঠুকে বলেন, 'জিতা রহো বেটা!' বলেন, 'আসলে তোমার রাজপুত্তুর হওয়াই উচিত ছিল।'

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—ওই জামাই-বাবুটি আমায় দেখেই বুঝে ফেলেছিলেন আমি জাল রাজকুমার। বক্রেশ্বর আমায় ধরে আনেনি, আমি নিজেই 'অ্যাড-ভেঞ্চারে'র আশায় চলে এসেছি শুনে বেজায় আমোদ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমাদের। ধরে ফেললেও উনি অন্য কারুর কাছে ফাঁস করেননি। বেশ মজায় আছি আমরা।

ওনার কাজ হচ্ছে কী জানিস?... মাঝ রাত্রে উঠে গানের সুর ভাঁজা।... কী একটা বাজনা নামটাম জানি না বাবা, সেই নিয়ে এমন মিহি গলায় গলা সাধেন, ঘুমের ঘোরে মনে হয় যেন অলৌকিক কিছু হচ্ছে।

এই সময় ওঁর পরণে থাকে কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, গায়ে আতরের গন্ধ। খুব পরিপাটি টেরি। ভোর পর্যন্ত চলে এই সুর ভাজা। তারপর উঠে পড়েন, হাত মুখ ধুয়ে ছাতে চলে যান। হাতে করে নিয়ে যান বড় একবাটি ছোলা ভিজে আর আদার কুচি। ছাতে বসে বসে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে, ফট্ করে জামাটামা সব ছেড়ে টেড়ে কুস্তিগীরদের মতো একটা জাঙিয়া পরে নেন, আর গায়ে আষ্টেপিষ্টে মাটি মাখেন। ছাতেরই একটা ছোট্ট ঘরে ওঁর মাটি ভিজনো থাকে গামলায়। আর থাকে একজোড়া লোহার মুগুর। মাটি মেখে জামাইবাবু সেই মুগুর দুটো নিয়ে ভাঁজতে শুরু করেন।

ওরে বাবা সে যে কী ভারী, আমি তো এক ইঞ্চিও নড়াতে পারি না। আর উনি সে দুটোকে ঘোরান যেন দু' হাতে দুটো পেন্সিল ঘোরাচ্ছেন। না দেখলে বিশ্বাসই হয় না।

একই লোক সুর ভাঁজে, আবার মুগুর ভাঁজে। খুব আশ্চর্য্য না? সত্যি বলতে জামাইবাবু না থাকলে আমি হয়তো এখানে টিকতে পারতাম না।

বলতে পারিস টিকবার দরকারটা কী? পালিয়ে গেলেই তো হয়। সত্যি বাড়ির কথা, তোদের কথা এসব মনে পড়লে ছুটে চলে যেতেই ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমি এখন সেই দীপেন্দ্র-নারায়ণের মা বাবা আসার অপেক্ষায় আছি। ওঁরা এলে তখন তো একটা বেজায় মজা হবে। সেইটার অপেক্ষায় আছি। আর একমাসও নেই, এসে যাবেন।'

আচ্ছা এইবার আসল লোক দুটির কথা বলি—প্রথম—

রাজা রাজীবলোচন।

তাঁর কাজের মধ্যে সারাক্ষণ আপিঙের নেশায় ঝিমোনো, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ 'কোই হ্যায়' বলে চেঁচিয়ে ওঠা। চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে আসে, 'কী চাই, কী চাই' বলে, উনি তখন বলেন, 'কিচ্ছু চাই না বেটারা। তোরা মরে গেছিস, না আমি মরে গেছি, তাই দেখে নিচ্ছি।'

আমাকে রোজ সকালে একবার করে ওঁর কাছে গিয়ে বসতে হয়। আর রোজই উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'তোমার সেই রেশমের মত চুল-গুলো যে কোথায় গেল! তার জায়গায় এই নারকেল ছোবড়ার মত চুল!'

আচ্ছা তুই বল তো, আমার চুল নারকেল ছোবড়ার মত? শুনে এইসা রাগ হয়। বুড়োর যদি চোখটা একেবারে পর্দাঢাকা না হত, নির্ঘাৎ আমায় মেরে তাড়াতো, নয় তো পুলিশে দিত।

জামাইবাবু আমায় কী একটা কবরেজি তেল মাখতে দিয়েছেন, তাতে না কি চুল রেশমি প্যাটার্নের হয়ে যায়। রাজা-রাজড়ারা মাখেন। কিন্তু চুল রেশমি হয়ে আমার কী হবে শুনি? আর একমাসের মধ্যেই তো খেল খতম।... সেইদিনের কথা ভেবে আমার প্রাণ কাঁপে। এই, ভাবিসনা ভয়ে কাঁপে, আসলে আহ্লাদে কাঁপে। সেটাই তো হবে আসল মজা, যখন দীপেন্দ্র নারায়ণের মা বাবা নিজেব মা বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এ ছেলেটা কে?'...আর দেওয়ান বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশকে প্রশ্ন করবেন, একে কোথা থেকে নিয়ে এসেছ, আর কেন নিয়ে এসেছ?... আরও একটা গোপন কথা আছে, সেটা এখন বলছি না, পরে বলব। ইতিমধ্যে চেষ্টা করছি সেই সোনার দেওয়ালটা খুঁজে বার করবার। জামাইবাবু সহায়।

আচ্ছা এবার ওই কর্তামহারানীর কথা বলে চিঠি শেষ করি।

ওনার দেহটি প্রায় আমরা চিড়িয়া-খানায় যে শ্বেত হস্তী দেখে এসে-ছিলাম তার মতন। হাতে ইয়া মোট্কা মোট্কা সোনার বালা না কি, হাতের উঁচুদিকেও তাই। ওখানে যে আবার বালা পরে জীবনে জানি না। তাছাড়া—গলা থেকে মাথা থেকে, সমস্ত শরীরটাই যেন সোনা চাপড়ে চাপড়ে ঢেকে রাখা। এত গহনা যে কখনো বুড়িরা পরে দেখিইনি। তুই দেখেছিস?

চুলটুল তো সব পাকা ধবধবে, তাতেও খোঁপা বেঁধে খোঁপাতেও সোনা দিয়ে তৈরি ফুলের মালা জড়ানো। সোনার ফুলের মালা! সবই অদ্ভুত না?

আর শাড়ি?

তার পাড়টা এত চওড়া যে দেখলে হাসি পায়। খাওয়ার কাজও তেমনি।

সে অবশ্য রাজারানী দু'জনেরই সমান। থালার পাশে কত যে বাটি গুণে শেষ করা যায় না। রোজ পুকুর থেকে প্রকাণ্ড একটা করে মাছ ধরা হয়, তার মুড়োটা খান রাজামশাই, বাকিটা খান রানীমা। আলাদা এক রুপোর থালায়

করে শুধু মাছই থাকে ভাতের পাশে। তাছাড়া দই দুধ আম টাম, সে তুই ধারণা করতে পারবি না।

খাওয়ার শেষে নিজে নিজে আসন থেকে উঠতে পারেন না, দুজন ঝি দু দিক থেকে তুলে ধরে তবে দাঁড়ান। সে এক দৃশ্য। আহা এনার একটা হাত থেকে অর্ধেকটা মাংস নিয়েও যদি আমার ঠাকুমার হাড়ের ওপর লাগিয়ে দেওয়া যেত!

সে যাক, আসল মজা হচ্ছে এ'র মেয়েগুলি। ছ'টি মেয়ে এ'র! যুঁই মল্লিকা শেফালী মালতি গোলাপ কমল মেয়েদের নিয়ে ইনি বিভোর, মেয়েদের পরিচর্যা করতেই অত মোটা হয়েও রাতদিন খাটছেন, আর মেয়েদের খাওয়া শোওয়া ঘুম বেড়ানো এইসব নিয়ে সারাক্ষণই দুর্ভাবনা করছেন।

ওদের ইনি নিজে হাতে দুধ খাওয়ান, ভাত খাওয়ার সময় তদারক করেন, ঘুমের সময় ঘুম পাড়ান। মেয়েরা সকালবেলা শাদা লেশের ঘাগরা পরে, বিকেল বেলা লাল নীল হলদে সবুজ সিল্কের ঘাগরা পরে, আর রাত্তিরে কুচকুচে কালো শাটিনের পা-ঢাকা লম্বা ঝুল নাইট গাউন না কি যেন পরে।

প্রত্যেকটি মেয়ের আলাদা আলাদা খাট বিছানা মশারি, ঝালর দেওয়া বালিশ, শীতকালে সিল্কের লেপ। রাত্তিরে উনি সবাইকে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে তবে নিজে খেতে ঘুমতে যান।

বুঝতে পারছিস এ'রা কে? পারবিই না।

যুঁই হচ্ছেন একটি বাঘা-মার্কা প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান! ওর আদরের নাম 'যুঁইরানী।' মল্লিকা একটি ভোদা-মুখী শাদা বুলডগ, এ'র আদুরে নাম 'মল্লিকামালা। শেফালি নাকি 'গ্রে হাউন্ড' না কি জাতের। জামাইবাবুই বলেছেন এসব। ওকে ডাকা হয়, 'শেফালীবালা বলে, মালতি, মালতি, মালতি হচ্ছে কী জানিস 'ফক্স টেরিয়ার', উনি হচ্ছেন 'মালতি কুসুম', আর গোলাপ, কমল? ওরা নাকি স্রেফ্ দিশী কুকুর, কিন্তু খোকারাজা নাকি ওদের কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল, তাই ওরা 'কমলকলি', আর 'গোলাপ ফুল'।

ওদের জন্যে আলাদা রান্নাঘর, আলাদা রান্নার লোক। রাজকন্যের থেকে অবস্থা কিছু খারাপ নয়।

একসময় নাকি দেশে চোরের উপদ্রব হওয়ায় একটি কুকুর পোষার দরকার হয়, মেয়ে কুকুর, তাকে মহারানী আদর করে নাম রাখেন যুঁই। তারপর ওনার কুকুর পোষার নেশা লেগে যায়, একে একে মল্লিকা মালতিরা এসে এসে জুটে গিয়ে ভর্তি হয়। ব্যস তারা এখন রাজ-কন্যার আদরে পালিত হচ্ছে। চোর-ডাকাত এলে পাছে ওদের মারে ধরে, তাই কর্তামা ওদের ঘুম পাড়িয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে সেই চাবি নিজের আঁচলে বেঁধে শুতে যান।

একবার নাকি ঝাড়িতে ডাকাত পড়ে-ছিল, কর্তারাজা রেগে বলেছিলেন, 'বাড়িতে ছ ছ'টা কুকুর থাকতে, ডাকাতে সব লুঠ করে নিয়ে যাবে? ওদের ছেড়ে দাও।'

কিন্তু ছেড়ে দিলে আর কী হবে? ওদের মশারিটা এমন শক্ত করে গদীর ধারে গোঁজা ছিল যে, ওরা মশারি খুলে বেরোতেই পারল না। ঝালর দেওয়া বালিশের ওপর পা তুলে দিয়ে মশারির মধ্যে থেকেই ঘেউ ঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল শুধু।

আর ডাকাতরা বাড়ির লোককে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে যত পারল লুঠপাট করে নিয়ে গেল।

তবু—কর্তারাজা কুকুরদের ঘর খুলে দিয়েছিলেন বলে রানীমা রাগ করে সাতদিন কথা বলেননি, সাতদিন ভাত খাননি। শুধু মাত্র দুধ ক্ষীর সর দই সন্দেশ রসগোল্লা মিহিদানা মোতিচুর খেয়ে থেকেছিলেন। সাতদিন পরে বলেছেন, 'তোমার টাকাকড়িই এত বড় হল যে বাছাদের আমার শত্রুর মুখে লেলিয়ে দিচ্ছিলে? যদি ওরা মশারি খুলে বেরিয়ে পড়ত পারত, তাহলে কী সর্বনাশ হত ভাবো।'

তা তারপর থেকে রানীমার মেয়েদের আদর নাকি আরো বেড়ে গেল। উনি বলেছেন, 'এ সবই ওদের শত্রু! যা করে ওদের সামলে রাখি, তা আমিই জানি আর ভগবানই জানেন।'

এখন দুপুর বেলা আমি চিঠি লিখছি আর ওদিকের ঘর থেকে গান আসছে—

ঘুমপাড়ানী মাসিপিসী
ঘুম দিয়ে যাও,
বাটা ভরে পান দেব
গাল ভরে খাও।
কোথায় পাব এমন নিদ্রা,
আমি কাঙালিনী।
দয়া করে দেবেন নিদ্রা,
জীব গড়েছেন যিনি।

উঃ কী হাসি যে পায়, যখন উনি ওদের সারি সারি শুইয়ে একটির পর একটির মাথা চাপড়ে যান। ওদের নাকি একটু এদিক ওদিক হলে অভিমান হয়, ওরা নাকি আবার রান্না পছন্দ না হলে থালা ঠেলে ফেলে দেয়। এদের

নিয়েই মনের আনন্দে আছেন রানীমা।
নাতি নাতি করে যে কান্নাকাটি করেছেন সে শুধু ছেলেবৌ ফিরলে তাদের কী বলবেন ভেবে। আমার দিকে তো ভাল করে তাকিয়েও দেখেন না। আমার পক্ষে অবশ্য ভালই হয়েছে, ওঁর আর বিশেষ কিছু নজরে পড়ছে না, আর ভাবতে বসছেন না নাতির চুল খোঁচা হল কেন, রং ময়লা হল কেন, গায়ের চামড়া খসখসে আর হাতের আঙুল শক্ত হয়ে গেল কেন?
আজ এই পর্যন্ত।
তোরা কেমন আছিস? মা বাবা, সেজকাকা, ছোটকাকু, ঠাকুমা, ছোড়দি, মেসোমশাই?
আমার জন্যে কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি তো এখন তোফা আরামে রাজপুত্তুর হয়ে কাল কাটাচ্ছি। একমাস পরে দেখা হবে।
চিঠিটা লিখছি, কিন্তু বক্রেশ্বর কোম্পানী জানতে পারলে চিঠি ডাকে ফেলতে দেবে না। জামাইবাবু বলেছেন, চুপি চুপি দিয়ে দেবেন।'
ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি—
'টিকলু'
চিঠি শেষ করে ছোড়দি নিশ্বাস ফেলে এক গেলাস জল খেল।
বলল, 'বাব্বা, একটা মহাভারত লিখেছে।'
চিঠি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক মন্তব্য হচ্ছিল, 'ওরে বাবা। কী কান্ড! কী সর্বনাশ! অ্যাঁ! যাঃ তাই আবার হয় নাকি। ওরে বাবা—' ইত্যাদি ইত্যাদি।
এখন ব্যস্ততা দেখা দিল ঠিকানা দেখার। 'ঠিকানা কী!'
চিঠি যখন এসেছে, তখন ছেলেকেও টেনে আনা যাবে।
কিন্তু এ কী! হরে কৃষ্ণ, হরে রাম! কোথায় ঠিকানা?
না আছে ঠিকানা, না আছে তারিখ।
তবে দেখ দেখ ডাকঘরের ছাপ দেখ।
হায় কপাল।
তাই বা কই। ডাকঘরের ছাপটাপ কিছু নেই। তা আর কোন্ চিঠিতেই বা থাকে? যেখানে আসে, সেখানের ছাপ যদিও বা পড়ে, যেখান থেকে ছাড়া হয়েছে, সেখানের থাকবেই না।
খুঁজে পেতে আধখানা ছাপ থেকে 'রাম রা' এইটুকু খুঁজে পাওয়া গেল, আর কিছু না। অর্থাৎ রামরাজাতলা।
ব্যস। তাতে কী লাভ?
হরিষে বিষাদ, আশায় নৈরাশ।
এমন বুদ্ধু ছেলে যে ঠিকানা দেয় না? সব আশাই তো খতম হল।
সবাই বলছে, 'কী বোকা। কী বোকা।'
শুধু টিকলুর ঠাকুমা যিনি চিঠি শুনতে শুনতে হরিনামের মালা হাতে নিয়ে জপ করছিলেন, তিনি মালাটা ঠুকে নামিয়ে রেখে বলেন, 'বোকা না হাতী! চালাকের ধাড়ি। ও ছেলেকে নদীর এপারে পুঁতে দিলে, ওপারে গাছ গজায়। বাপ-কাকাকে এক হাটে বেচে সাত হাটে কিনতে পারে ও। ঠিকানা দেয়নি ইচ্ছে করে। পাছে তোরা ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে নিয়ে আসিস। ওকে চিনতে তোদের অনেক বাকি আছে, শুধু আমিই চিনেছি।'
তা ঠাকুমার কথা সত্যি হোক আর ভুলই হোক, ঠিকানা তো নেইই সত্যি, আর না থাকলে কী ভাবে আনা যাবে তাকে?
একটা নামই শুধু পাওয়া গেছে 'বক্রেশ্বর'। যে লোকটা নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু শুধু একটা নাম নিয়ে আর লাভ কী? সে তো বাপুটা খাতা ভরে লিখছেই কত। বক্রেশ্বর লক্রেশ্বর ফক্রেশ্বর পক্রেশ্বর টক্রেশ্বর ঈশ্বরের ছড়াছড়ি করছে একেবারে।

টিকলুর ঠাকুমা যে বলেন, 'তোরা কেউ ওকে চিনিসনি এখনো, চিনতে আমিই চিনেছি।' সেটা রাগ করেই বলেন অবশ্য, কিন্তু এখানে, মানে হিঙুলগঞ্জে অন্য ব্যাপার।
টিকলুর ধারণা, জামাইবাবু ছাড়া আর কেউ আমায় চিনতে পারেনি, আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি, সেটা ভুল। ধরতে পারছে অনেকেই, বক্রেশ্বর তো বটেই, গজগোবিন্দও অবশ্যই, ভজহরি নিধিরাম বৈকুণ্ঠ, মোক্ষদা সুধা দুঃখীর মা, ফুলির পিসী, সবাই সন্দেহে সন্দেহে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে না। তাদের মধ্যে দুটো ধারণা পাক খাচ্ছে, এক ইচ্ছে দেওয়ান বুড়ো জানমান বাঁচাতে কোথা থেকে একটা ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে ধরে এনেছে, ছেলেটা তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পার্ট প্লে করে যাচ্ছে। আর একটা ধারণা খোকারাজাবাবু 'ভূতাশ্রিত' হয়ে ফিরে এসেছে। অথবা পুরোপুরি ভূত হয়েই। কে বলতে পারে ছেলেটাকে হঠাৎ ভূতেই উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিনা, এবং তার পরিণতি এই কিনা।
শুধু বামুনদির বিশ্বাস স্থির।
বামুনদির মতে নিশিতে পেলে মানুষ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায়।
রাজাবাবু রানীমারও ওই একই মত। ছেলেটাই ভেজাল একথা ভাবেন না ওঁরা, অন্যরকম হয়ে গেছে সেটাই ভাবেন। তাই রানীমা সাধ্যপক্ষে ওর মুখের দিকে তাকান না।
অতএব টিকলু রাজপুত্তুরের ভূমিকায় দিব্যি রাজার হালেই কাটাচ্ছে।
অবিরত ক্ষীর সর ছানা মাখন খেয়ে খেয়ে টিকলুর গায়ের চামড়া ক্রমশ বেশ শাটিন শাটিন হয়ে আসছে, বাইরে রোদে গরমে না বেরোনোর জন্যে গায়ের রং মাখনের মতো হয়ে আসছে, আর কবিরাজী 'তিল আমলা নারিকেল সংযুক্ত' তেল মেখে মেখে মাথার চুলও রেশমি হয়ে আসছে। দীপেন্দ্রর সঙ্গে সাদৃশ্য ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।
বিকেলবেলা রোদ পড়লে জামাইবাবুর সঙ্গে বেড়াতে যায় টিকলু। হেঁটে হেঁটে অনেকদূর চলে যায়, জামাইবাবু ওকে সব বুঝিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন। কবে কোন কালে এঁদের দুর্গ না কি ছিল, ছিল কামান, দ্বাদশ শিবমন্দির ছিল একদা, এখন জঙ্গলে বুজে গেছে প্রায়, সেই সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ান জামাইবাবু। বোঝান তার ইতিহাস, আর বলেন, 'তা বলে ভেবোনা আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসব দেখাচ্ছি তোমায়। শুধু তোমার দেখতে ভাল লাগবে বলেই নিয়ে আসছি।'
তা ভাল লাগবার মতই সত্যি।
বাগানে গাছে গাছে কতরকম ফল, কত রকমের ফুল, নানান পাখি পক্ষী, টিকলু মোহিত হয়ে দেখে আর ভাবে কবে বাপীকে গিয়ে বলতে পারবে! মার কাছে গল্প করবে।
জামাইবাবু মাঝে মাঝে বলেন, 'কী হে রাজকুমার, অমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ কেন, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?'
'মন কেমন!'
টিকলুদের বয়সে সেটা ভারী লজ্জার ব্যাপার, তাই টিকলু সতেজে বলে, 'মোটেই না। আমার শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, এসব তো আমি এই প্রথম দেখছি, অথচ কেনই যে মনে হয়, আগে অনেক অনেকবার দেখেছি।'
জামাইবাবু হেসে বলেন, 'তাহলে হয়তো দেখেছ। আমি অবশ্য পূর্বজন্ম টন্ম মানি না, তবে যারা মানে তারা হয়তো বলতে পারে তুমি আগে এই বংশেই ছিলে কেউ। হয়তো এদের সেই প্রথম পুরুষ, যিনি দুর্গটুর্গ গড়েছিলেন, কামান নিয়ে পোর্টুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, আর তাদের লুঠের সোনা নিজে ফের লুঠ করে নিয়ে, প্রাসাদের দেয়ালে গেঁথে রেখেছিলেন।'
হেসে হেসেই বলেন।
কিন্তু টিকলু কেমন অন্যমনা হয়ে যায়। টিকলুর মনে হয়, কে জানে ওই ঠাট্টার কথাটা সত্যিই কিনা।

'এই ছোঁড়া তুই ভেবেছিস কী'?

টিকলু জামাইবাবুর সঙ্গে ডন-বৈঠক করবে বলে ছাতে উঠেছিল, হঠাৎ বক্রেশ্বর ক্যাঁক্ করে ওর কাঁধটা চেপে ধরে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'সাপের পাঁচটা পা দেখেছিস তুই? আমিই তোকে নিয়ে এলাম, আর তুই কিনা আমার ওপর টেক্কা দিচ্ছিস? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছিস? পাঁচ জনের সামনে আমায় ধমক দিস তুই, এত তোর আসপদ্দা।'

টিকলু তাকিয়ে দেখে বক্রেশ্বরের পিছনে গজগোবিন্দ, তাঁর পিছনে নিধিরাম। তার মানে পরিকল্পিত কাজ।

কিন্তু টিকলু কি তা বলে ভয় খাবে?

টিকলুর এখনকার ভূমিকাটা কী?

রাজপুত্রের না?

টিকলু রাজপুত্রের মতই চালের ওপর বলে, 'সেটা তো আপনারও কম নয় দেওয়ান মশাই। আপনিই বা কোন্ সাহসে রাজা রাজীবনারায়ণের নাতিকে এভাবে কথা বলছেন?'

'কী? তুই...তুই তুই রা-রাজা রাজীবের নাতি?'

'তা' সেই পরিচয়েই তো আছি—'

'হ্যাঁ আছিস, আছিস—'

বক্রেশ্বর বাক্যবাগীশ রাগে আরো তোতলা হয়ে গিয়ে বলেন, 'কে তোকে নিয়ে এসেছিল রে শয়তান? অ্যাঁ! এত বড় বিচ্ছু তুমি তা জানলে কোন্ ব্যাটা নিয়ে আসত! তুমি কর্তারাজার সামনে আমায় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর, লোক-জনের সামনে আমায় অপদস্থ কর। আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা তোমায়। নিধিরাম—'

সঙ্গে সঙ্গে নিধিরাম টিকলুর মুখটা চেপে ধরে পাঁজাকোলা করে নিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গজ-গোবিন্দ ও বক্রেশ্বর।

কোথা দিয়ে না কোথা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আস্তাবলের পিছন দিকের একটা ঘরে ঠেলে পুরে দিয়ে বক্রেশ্বর বলেন, থাক তুই এখানে, না খেয়ে পচে পচে মর। ত্রিভুবনের কেউ তোকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে না বুঝলি?'

দরজা বন্ধ করে তাতে একটা ভারী তালা লাগিয়ে দিয়ে চাবি নিজের ফতুয়ার পকেটে পুরে গটগট করে চলে যান বক্রেশ্বর। আর বলে যান গজ-গোবিন্দ, নিধিরাম একথা যদি প্রকাশ পায়, তা হলে তোদের জ্যান্ত পুঁতব তা বলে রাখছি।'

নিধিরাম দুহাতে নিজের দু' কান মলে, আর গজগোবিন্দ আধফুট জিভ বার করে জিভ কাটে।

জামাইবাবু অনেকক্ষণ ছাতে অপেক্ষা করে, একটু অবাক হয়েই নেমে আসেন। এক্ষুনি যাচ্ছি বলে ছেলেটা গেল কোথায়?

নীচে নেমে এসেও তো কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। এঘর ওঘর, এ দালান ও দালান, এ সিঁড়ি ও সিঁড়ি, এ মহল ও মহল, কোথাও না।

বামুনদি অবাক হয়ে বলে, 'ও মা সে কি? এই তো খানিক আগে দুধ খেলো সন্দেশ খেলো, পেস্তা বাদাম খেলো, খেজুর—'

'থাক থাক, কী খেলো তা আমি জানতে চাই না, কোথায় গেল তাই জানতে চাইছি।'

কিন্তু বলবে কে?

দাসদাসী কেউই তো জানে না।

কর্তারাজা?

তিনি মাথায় হাত চাপড়ে বললেন, 'সেই তো কাল সক্কালে আমার কাছে এসেছিল, আজ এখনো আসেনি। নিশ্চয় আবার চলে গেছে। আমি জানতাম! থাকবে না, তা জানতাম। ওর ভাবভঙ্গী সব সময় পালাই পালাই ছিল। উঃ আর ক দিন পরেই অনন্ত নারায়ণ আসবে, আর আজ সে আবার হারিয়ে গেল? বাগানে দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'চাকরদের মহলে?

'হুঁ!'

'মন্দিরে'—

'দেখেছি নেই।'

'ঠাকুরবাড়িতে?'

'দেখেছি নেই।'

'তার মানে নেই-ই ই! জামাইবাবু শীগগির কাউকে বল, দুটো ডাব কেটে আমার মাথায় ঢালুক! এক্ষুনি! এক্ষুনি! বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথা।'

মহারানী তুলসীমঞ্জরী যেই শুনলেন দীপুকে আবার পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট দেহভার আছড়ে মাটিতে ফেলে গড়াগড়ি দিয়ে মড়া-কান্না শুরু করে দিলেন।

'ওরে যখনই দেখেছি তুই আমার যূঁই মল্লিকা গোলাপ কমলকে আদর করছিস না, ওরা আহ্লাদ করে তোর গালটা একটু চেটে দিতে গেলে ছুট মারছিস, তখনই বুঝেছি তোকে কিছুতে পেয়েছে, তুই আর সে দীপু নেই। তুই থাকবি না, তুই আবার পালাবি—'

ডাবের জল মাথায় ঢেলে রাজীব নারায়ণ একটু সুস্থ বোধ করছিলেন, কানে এল এই কান্নার শব্দ।

'কাঁদে কে? কাঁদে কে? মহারানী বুঝি?'

রাজীব নারায়ণ তেড়ে ওঠেন, রুপোর লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ঠক্‌ঠকিয়ে এগিয়ে যান। চোখে দেখতে না পেলে কী হবে, চেনা জায়গা, চেনা মহল, এসে পড়েন, হুংকার দিয়ে দিয়ে লাঠি ঠুকতে থাকেন, 'আবার এখন কান্না হচ্ছে! এই তোমার জন্যেই এটি হল। তোমার ওই আদুরী আহ্লাদী কুকুরগুলোর ভয়েই বেচারা—'

'কুকুর? তুমি আমার মল্লিকা মালতী-দের কুকুর বলছ?' ফোঁস করে ওঠেন মহারানী।

রাজীব নারায়ণ তাতে কেয়ার করেন না। তিনি সমান তালে চালিয়ে যান, 'তা কুকুরকে কুকুর বলব না তো কি ঠাকুর বলব? একশোবার বলব, কুকুর কুকুর কুকুর। ওই কুকুরদের কুক্‌রোমির জন্যেই দীপু আবার সটকান দিয়েছে।'

বসে পড়েন। বলে ওঠেন, 'ওরে আর দুটো ডাব কাট।'

ক্রমশঃ হৈ চৈ স্তব্ধ হয়ে যায়, বাড়িতে শোকের ছায়া নামে।...

টিকলু এসবের কিছুই টের পায় না। টিকলু মশার কামড়ে ছটফটিয়ে আস্তাবলের বিশ্রী গন্ধওলা সেই ছোট্ট ঘরটায় বসে আছে চারটি খড়ের ওপর।

এমন ঘর, জগতের কোথাও কোনখান থেকে সাড়া আসে না।

খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে, আর মনে পড়ছে ক্ষীর ছানা সন্দেশ রস-গোল্লা গজা বোঁদে কত কি থালায় ফেলে দিয়ে দিয়ে চলে আসে টিকলু! উঃ, একদিন না খেলেই এরকম হয়?

ঘরটার মধ্যে ওই দরজাটা ছাড়া যে আর কিছু আছে টের পায়নি টিকলু, হঠাৎ দেখতে পেল দেয়ালের কাছে যে খড়ের গাদা রয়েছে তার পাশ থেকে যেন চাঁদের আলো আসছে। তাহলে নিশ্চয় ওখানে জানলা আছে।

টিকলু আস্তে উঠে গিয়ে খড় সরাতে গিয়ে দেখে জানলার বাইরে একটা লোক। লোক না ভূত?

টিকলু চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে?'

লোকটা তাড়াতাড়ি বলে, 'চুপ খোকা-বাবু চুপ! আমি নিধিরাম, আপনাকে বের করে আনব বলে জানলার শিক খসাচ্ছি।'

টিকলু তীক্ষ্ম গলায় বলে, 'ওঃ তাই না কি? নিজেই তো ধরে এনে বন্ধ করে যাওয়া হয়েছিল।'

'কী করবো বাবু, মনিবের হুকুম। না আনলে দেওয়ান বাবু আমায় জুতো পেটা করত। কিন্তু সেই অবধি, প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।'

'কর্তারাজাকে বলে দিতে পার না?'

'সাহস হয় না খোকাবাবু। দেওয়ান

বাবুটিকে তো জান না। সাংঘাতিক লোক।'

'আচ্ছা, তুই আমায় বের করে দে, দেখছি কেমন সাংঘাতিক লোক।'

'আমার নাম বলে ফেলবে না তো খোকারাজাবাবু?'

টিকলু বলে, 'পাগল হয়েছিস? তাই কখন বলি?'

এখন টিকলুর হঠাৎ বেশ আহ্লাদ হয়। এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন করছে। এই তো ঠিক ডিটেকটিভ গল্পের বইয়ের মতন সব ঘটছে।

টিকলু সে গল্পের নায়ক।

জানলার শিক বাঁকিয়ে টিকলুকে বার করে নিয়ে বাগানের পিছন দিক থেকে বাঁশের মই দিয়ে ওকে স্রেফ্ ছাতে তুলে দিয়ে, নিধিরাম আবার বাঁকানো শিক সোজা করে, খড়ের বোঝা ঠিক করে রেখে নিজের বাড়ি চলে গিয়ে বাকি ঘুমটা ঘুমুতে থাকে।

আর টিকলু?

সেও মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে খোলা ছাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায়।

জামাইবাবুর আজ ভোরে ছাতে ওঠার সময় হাতে ছোলা ভিজের বাটি নেই। মন খারাপ, ছোলা ভিজতে ভুলেই গেছেন জামাইবাবু। জীবনে এই প্রথম।

কিন্তু এ কী?

ছাতের মাঝখানে শুয়ে কে?

জামাইবাবু দু বাহু তুলে একবার নেচে নিয়ে ওকে নাড়া দেন, 'এই বোম্বেটে শয়তান, গোপাল আমার যাদু আমার, গুণ্ডা গাঁঠকাটা চাঁদুরে, মানিক রে, ভূত প্রেত দৈত্যি দানো, শিব শম্ভু নারায়ণ, বলি, কোথায় ছিলি বাপ দুদিন? পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল? না কি তোর সেই কাপালিক আবার এসে মন্ত্রবলে অদৃশ্য করে দিয়েছিল?'

টিকলু উঠে বসে।

চারদিক অবলোকন করে, তারপর গম্ভীরমুখে বলে, 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার।'

কর্তারাজার ঘরে মলিন মুখে বসে আছেন বক্রেশ্বর, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কেঁদেও উঠছেন।

'আবার যে এমনটা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি কর্তামশাই! এখন যুবরাজবাবুকে কী জবাব দেব?'

রাজীবনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলেন, পরকালে কী জবাব দেবে তাই ভাব বক্রেশ্বর!'

'আজ্ঞে একথা বলছেন কেন?'

'কেন বলছি? জানন না ন্যাকা?' তুমি খোকাকে নিজের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওনি আহ্লাদ করে?'

'আমি নিজের বাড়িতে?'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খোকারাজা দীপেন্দ্রনারায়ণ! অবাক গলায় বলে, 'কী অদ্ভুত! এত ভুলোমন আপনার দেওয়ানবাবু? সেদিন বললেন না, 'এতদিন এসেছ, একবার আমার বাড়ি বেড়াতে যাওনি, চল নিয়ে যাই।' ভুলে যাচ্ছেন? ছোট নায়েববাবু আপনি, নিধিরাম সবাই মিলে নিয়ে গেলেন না? ও কী অমন চমকাচ্ছেন কেন? কী ভুল আপনার উঃ! বললেন না, 'এখন থাক দুদিন।' কত যত্ন আদর করলেন, কত খাওয়ালেন, আর এঁরা এখানে—ও কি আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কেন?'

'কেন? কেন?'

রাজীবনারায়ণ চেঁচিয়ে ওঠেন, প্রণিপাত কেন?'

'কিছু না রাজামশাই, হঠাৎ বামন অবতারকে প্রত্যক্ষ করলাম কিনা, তাই।'

'আঃ কী যে সব বল ছাই। নিয়ে গিয়েছিলে বেশ করেছিলে, কিন্তু বলনি কেন?'

'আজ্ঞে ভুল ভুল! সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আর যেন এমন ভুল না হয়।'

'পাগল! এই নাক মুলছি, কান মুলছি, মাথার চুল ছিঁড়ছি।'

বাড়ি থেকে শোকের ছায়া গেছে, আনন্দের ঢেউ বইছে।

আজ যুবরাজ যুবরানী আসছেন। চারিদিকে আলপনা আঁকা হয়েছে। দরজায় দরজায় মঙ্গল কলস বসানো হয়েছে, বিরাট যজ্ঞির আয়োজন হয়েছে, গ্রামসুদ্ধ লোক খাবে।

কর্তারাজা আজ নিয়ম ছাড়া ভোরে উঠেছেন আর চেঁচাচ্ছেন, 'ওরে দীপুকে আজ একটা ভেলভেটের সুট পরিয়ে সাজিয়ে রাখ।'

ওদিকে কর্তারানী তাঁর মেয়েদের সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে নাইলনের ঘাগরা পরিয়ে সাজাচ্ছেন।

টিকলু হঠাৎ জামাইবাবুর ঘরে এসে বলে, 'জামাইবাবু আমার কিন্তু ভীষণ ইয়ে হচ্ছে, আমি বরং গোলমালের মধ্যে পালাই।'

জামাইবাবু ওর পিঠ ঠুকে দিয়ে বলেন, 'পালাবি কী বল? এতদিন এত কষ্ট করলি, আর আসল মজার সময় পালাবি? যা বলেছি ঠিক ঠিক মনে আছে তো?'

তারপর যা ঘটল টিকলুর নিজের মুখেই শোনা যাক—

রামরাজাতলার বিশ্বনাথবাবুর দালানে জমিয়ে বসে সেই কাহিনী বর্ণনা করছে টিকলু, দুবাড়ির লোক এক ঠাঁই। ওখানেই এক ঠাঁই বসে পড়লেই হল।

এরা বলছে, 'তারপর?'

ও বলছে 'তারপর? তারপর হঠাৎ দেউড়িতে হৈ চৈ, 'এসে গেছেন' 'এসে গেছেন।'

ছুটে গেলেন কর্তারাজা কর্তারানী, মোক্ষদা সুধা যূঁই মল্লিকা মালতীরা। কর্তামা সকাল থেকে ওদের সাজিয়েছেন, সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে, নাইলনের ঘাগরা পরিয়ে মাথায় সিল্কের ফিতে বেঁধে।

বামুনদি আমায় বলল, 'যাও ভাই, মা বাপ এসেছে প্রণাম করগে—'

আমি বললাম, 'থাক, আমি ঘরেই থাকি।'

বামুনদি হেসে বলল, 'ও বুঝেছি, অভিমান হয়েছে, আচ্ছা থাকো, ওনারা নিজেই আসবে। ছেলে বলে কথা। আজ একবছর দেখেনি।'

বসে রইলাম খাটে।

পরনে ভেলভেটের সুট, পায়ে জরির জুতো, মাথায় পাগড়ি, ঠিক যেমন সাজে ফটো তোলা আছে দীপেন্দ্রর।

বসে আছি, হঠাৎ যেন নীচের তলার সেই কলরোলটা ঠাণ্ডা মেরে গেল। শুধু আমার সেই পিসিদের সমবেত সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি ঘেউ ঘেউ ঘোঁ ঘোঁ ঘুঃ ঘুঃ!'

একটু পরে ঠিক আমার বয়সের একটা ছেলে এসে ঘরে ঢুকল। শাটিনের মতন গায়ের চামড়া, গোলাপ ফুলের মত রং, রেশমের মত চুল। সুরেলা গলায় বলে উঠল, 'এ কী? আমার ঘরে তুই কে?'

আমি বুক টান করে বললাম, 'শ্রীল শ্রীমান দীপেন্দ্রনারায়ণ পাট্টাদার বাহাদুর।'

ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুই যদি দীপেন্দ্রনারায়ণ, আমি তবে কে?'

আমি আমার নিজস্ব হেঁড়ে গলায় বললাম, 'সে কথা তুমিই জানো, আমি কী করে বলব। তবে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় বুঝলে?'

ও খিঁচিয়ে বলল, 'ভদ্রভাবে কথা বলব? ওরে আমার কে রে? তুই আমার জামা জুতো পরে, আমার ঘর দখল করে বসে বলছিস, আমিই দীপেন্দ্রনারায়ণ, আর আমি ভদ্রভাবে কথা বলব? আমি জানতে চাই, তুই কোথা থেকে এলি? পাজী বদমাস।'

গলা সুরেলা কিন্তু কথা যেন রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া বুরুশ। রাগে মাথা জ্বলে যায়।

আমি কিন্তু রাগছি না, তেমনি

সতেজে বলি, 'কোথা থেকে আবার আসব? বাবা মা বিলেত যাবার সময় আমাকে ঠাকুমা ঠাকুরদার কাছে রেখে গিয়েছিলেন, তাই আছি।'

ও রেগে হাত পা ছুঁড়ে বলে, 'তাই আছো? চালাকির আর জায়গা পাওনি? রেখে গিয়েছিলেন তোকে? মিথ্যুক। রেখে গিয়েছিলেন তো আমাকে—।'

আমি না খুব হেসে উঠলাম।

বললাম, 'তোমায় রেখে গিয়েছিলেন? তা রেখেই যদি গিয়েছিলেন তো ছিলে কোথায়?'

ও প্রথমে বলে 'সেকথা তোকে বলতে যাব কেন রে?' তারপরে কী ভেবে বলে, 'ছিলাম বিলেতে আমেরিকায়, হোল্ ইয়োরোপ আমেরিকা টুরে—বুঝলি?'

আমি বললাম, 'অথচ তুমি বলছ, তোমায় এখানে রেখে যাওয়া হয়েছিল।'

ও পা ঠুকে বলে, 'হ্যাঁ বলছি! হয়েছিল, আমি থাকিনি। শুনেছিলাম বাবা মা বিলেত যাবার আগে দিন পনেরো বম্বেয় থাকবে। আমি জামাইবাবুকে পাগল করে চুপি চুপি ওঁর সঙ্গে বম্বে চলে গিয়েছিলাম।'

শুনে তো আমি নেই।

জামাইবাবু এত রহস্যের কর্তা। এতদিনের মধ্যে একদিনও তো বলেননি।

আমি এইসব ভাবছি, ও আবার বলে উঠল, 'তুই আমার ঘর থেকে চলে যা বলছি।'

আমি বললাম, 'বরং তুমিই চলে যাও। আমি যে দীপেন্দ্রনারায়ণ, একথা সবাই জানে—'

'ইস্! জানলেই হল। আমি! এই আমিই হচ্ছি—শ্রীল শ্রীমান দীপেন্দ্রনারায়ণ—'

আমি শান্ত গলায় বলি, 'ভুলভাল কথা বোলো না ভাই, আমি।'

'ইস, আবার ভাই বলতে এসেছে। ভাগ্। আমি 'আমি'।

'না আমি।'

'না আমি।'

হঠাৎ না ছেলেটা সেই মিহি সুরের গলাকে আকাশে তুলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল! ও 'মা রানী', ও 'বাবা রাজা' দেখ আমার ঘরের মধ্যে বসে একটা পাজী ছেলে কী বলছে।'

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে সে এক হুলস্থুল কান্ড! নীচে থেকে দুদ্দাড়িয়ে সবাই উঠে এল। আর এসে যেন পাথর হয়ে গেল।

দুই দীপেন্দ্রনারায়ণ মুখোমুখি।

আমার না সেদিন ওই পোষাকটা পরে চেহারা দারুণ বদলে গিয়েছিল। নিজেই নিজেকে চিনতে পারছিলাম না আর্শিতে দেখে।

অনন্তনারায়ণ অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কে?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'এই এক বছরেই ভুলে গেলেন? আমাকে এখানে রেখে আপনারা বিলেত যাননি?'

অনন্তনারায়ণের রানী বলে উঠলেন, 'রেখে আর গেলাম কই? ছেলে তো কেঁদেকেটে পালিয়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গেই ঘুরেছে।'

কখন যে কর্তারাজা লাঠি ঠুকে ঠুকে এসে হাজির হয়েছিলেন কে জানে? তিনি রেগে বলে ওঠেন, 'তা সেকথা তুমি আমাদের জানিয়েছিলে?'...ইনি বললেন, 'আপনারাও জানাননি।'

'আমরা কী জানাব?' কর্তারাজা রেগে বলেন, 'আমরা ছেলে হারিয়ে ফেলে খুঁজে খুঁজে পাগল হচ্ছি।'

অনন্তনারায়ণ তখন খুব হেসে উঠে বললেন, 'তারপর এই ভেজাল মালটিকে খুঁজে পেলেন? আনল কে?'

বক্রেশ্বরও তো চলে এসেছে সেখানে, সে বলে ওঠে, 'তা আমি কী করবো বলুন? হন্যে হয়ে খুঁজছি, হঠাৎ একটা মেলাতলা থেকে বেরিয়ে এসে এই ছেলেটা বলল, কি না, 'দেওয়ানবাবু আপনি এখানে?' তা হলেই বুঝুন? আমি হাতে চাঁদ পেয়ে যাব না? অবিকল খোকারাজার চেহারা।'

দীপেন্দ্রনারায়ণ পা ঠুকে বলল, 'তা তো হাতে চাঁদ পাবেনই। আমার বদলে একটা রাস্তার ছোঁড়াকে নিয়ে এসে—'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'রাজবাড়ির ছেলে, রাজবাড়ির মত কথা বলতে শিখতে হয়।'

অনন্তনারায়ণ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দীপু দেখছ?' সেই সময় জামাইবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'দেওয়ানজী, আর কত পুকুর চুরি করবেন? ও নিজে থেকে বলেছিল?'

তখন না বক্রেশ্বর কেঁদে ফেলে বলে, 'আর কর্তারাজা যে বলেছিলেন, ছেলে খুঁজে না পেলে গর্দান নেবেন, তার কী!...সত্যি বলতে, অত খারাপ লোক বক্রেশ্বর, তবু কাঁদতে দেখে খুব মায়া হল। বললাম, 'চিনে টিনে নয়, তবে

দেওয়ানবাবু যখন বলতে শুরু করলেন, তখন ইচ্ছে করেই এসেছিলাম বলতে পারেন।'

উনি বললেন, 'আশ্চর্য তো! কেন বল দেখি?'

আমি বুক টান করে বললাম, 'জীবনে একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সুযোগের আশায়।' ওরে বাবা, তখন আবার সে কী হাসির ধুম পড়ে গেল।

অনন্তনারায়ণ ওঁর মাকে বললেন, কিন্তু মা, বাবার না হয় চোখ খারাপ, আপনি কি বলে নাতি চিনতে ভুল করলেন?' শুনে না কর্তারানীমা কী বললেন জানো? বলে উঠলেন, 'ভুল আবার করতে যাব কেন? যখনই দেখেছি ও আমার মালতি মল্লিকা গোলাপ কমলকে দেখে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে, তখনই বুঝেছি, ও ছেলে জাল ছেলে। কিন্তু কী করব বল? তোমরা আমার কাছে ছেলে রেখে গেছ, এসে সে ছেলে চাইবে তো? জোড়াতালি দিয়ে একটা মজুত না রাখলে কী দিতাম তোমাদের হাতে? কেমন করে জানব যে তোমরা ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছ। জানি জন্মের শোধ পালিয়েছে।'

জামাইবাবু বললেন, 'সত্য, রাজাবাবু খুব অন্যায় কাজ করেছেন আপনারা।'

উনি বললেন, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন দুই দীপেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে করা যাবে কী বলুন? যমজ ভাই বলে চালিয়ে চলব? যা দেখছি চালানো যায়।'

আমি তখন বলে উঠলাম, 'আহা রে আমি কেন থাকতে যাব? আমার বুঝি নিজের বাড়ি নেই? বাবা মা নেই?'

অনন্তনারাণ বললেন, 'দীপু দেখতে পাচ্ছ? তুমি বুড়ো ছেলে মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে কেঁদে-কেটে লুকিয়ে পালিয়ে গেলে, আর এই ছেলে তোমারই বয়েস, শুধু একটু অ্যাড্‌ভেঞ্চারের আশায় কোন দূর জায়গা থেকে সবাইকে ছেড়ে—বাহাদুর ছেলে বলতে হবে।'

দীপেন্দ্রনারায়ণ রেগে বলল, 'থাক থাক আর বলতে হবে না। জানি তো পৃথিবীর সবাই আমার থেকে ভাল, আমিই খারাপ। তারপর না হঠাৎ মুখে একটা আঙুল দিয়ে বাঁশির মত কেমন যেন একটা শব্দ করে ডেকে উঠল, যূঁই কমল গোলাপ মল্লিকা।'...ব্যস সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর কান্ড ঘটে গেল। কোথা থেকে যেন হুড়মুড়িয়ে ছুটে চলে এল সেই তারা। আর ওই একটা ছেলের ঘাড়ে ওই ছ'টা পিসি ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ছ' ছটা জিভ দিয়ে ওর গাল চাটতে শুরু করল। সেই দৃশ্য দেখে না আমি চেয়ার ঠেলে টেবিল উল্টে যাকে সামনে পেলাম তাকে ডিঙিয়ে একেবারে আমবাগানে।'

টিকলুর বাবা বলে উঠলেন, তারপর?

'তারপর আর কী? টিকলু বলে, 'তারপর খেল্ খতম। দেখতেই তো পাচ্ছ এই এতসব জামা জুতো খেলনা খাবার জিনিসপত্তরের বোঝা চাপিয়ে পেঁৗছে দিয়ে গেল। যারা এসেছিল ওরাই হচ্ছে ভজহরি আর নিধিরাম। ...আসবার সময় কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছিল। এমন কি কর্তামাকে খুশী করতে পিসিদের গায়েও একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে এলাম চোখ কান বুজে। ...জামাইবাবুর দিকে তো তাকাতেই পারছিলাম না আসার সময়।...দীপেন্দ্রর বাবাও এত সুন্দর লোক। আমায় বললেন, কী সুখীই হতে পারতাম, যদি সত্যি সত্যিই তুমি আমার ছেলে হতে। তোমার বাবার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। আর বললেন, যখন ইচ্ছে হবে একটা চিঠি লিখে জানিও, নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ বাপুর মা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, 'আমার ছেলের গালে যদি একটা তিল থাকত।'

আর বাপু বলল, 'টিকলুটা করল বটে একখানা। কী মজাই হল ওর।'

টিকলু একটু গৌরবের হাসি হাসল। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়ে টিকলুর আর মনে হয় না যে খুব একটা মজা ক'রে এসেছে সে। বরং মনটা যেন বিষণ্ণ বিষণ্ণ হয়ে যায়। সে মন ঘুরে বেড়ায় সেই পুরনো প্রাসাদের ঘরে, দালানে, ছাতে সিঁড়িতে, বেড়িয়ে বেড়ায় ভাঙা দুর্গের ধারে কাছে, ছড়িয়ে পড়ে থাকা কামানের ভাঙা টুকরোর আশে পাশে, উঁচু দেয়ালে টাঙানো পাট্টাদার বংশের পূর্বপুরুষদের ভারী ভারী অয়েল পেন্টিঙের তলায় তলায়।

পাট্টাদার বংশের সেই আদিপুরুষ, কী যেন নাম তাঁর, যিনি পর্টুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের লুঠ করা সোনা লুঠে আনতে পেরে-ছিলেন, সেই লোকটির কোনো ছবি নেই এইটাই বড় দুঃখ রয়ে গেছে টিকলুর। থাকলে টিকলু আর্শির পাশে বসে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখত।

টিকলু ভাবল, কাল বাপুকে বলবো, 'বাপু কক্ষনো তুই কোনো পুরনো রাজাটাজাদের বাড়িতে থাকতে যাসনি। গেলেই তোর মনটা একদম অন্যরকম হয়ে যাবে। যেন হারিয়ে হারিয়ে যাবে। মনে হবে এ সব জায়গা যেন তুই আগে কত দেখেছিস, যেন কতবার ওখানে হেঁটেছিস চলেছিস, কত কত-বার সেই ঘরে ঘুমিয়েছিস। আর চলে আসার পর মনে হবে কে যেন তোকে সব সময় পিছন থেকে টানছে। স্রেফ জালে আটকা পড়ে যাবি।'
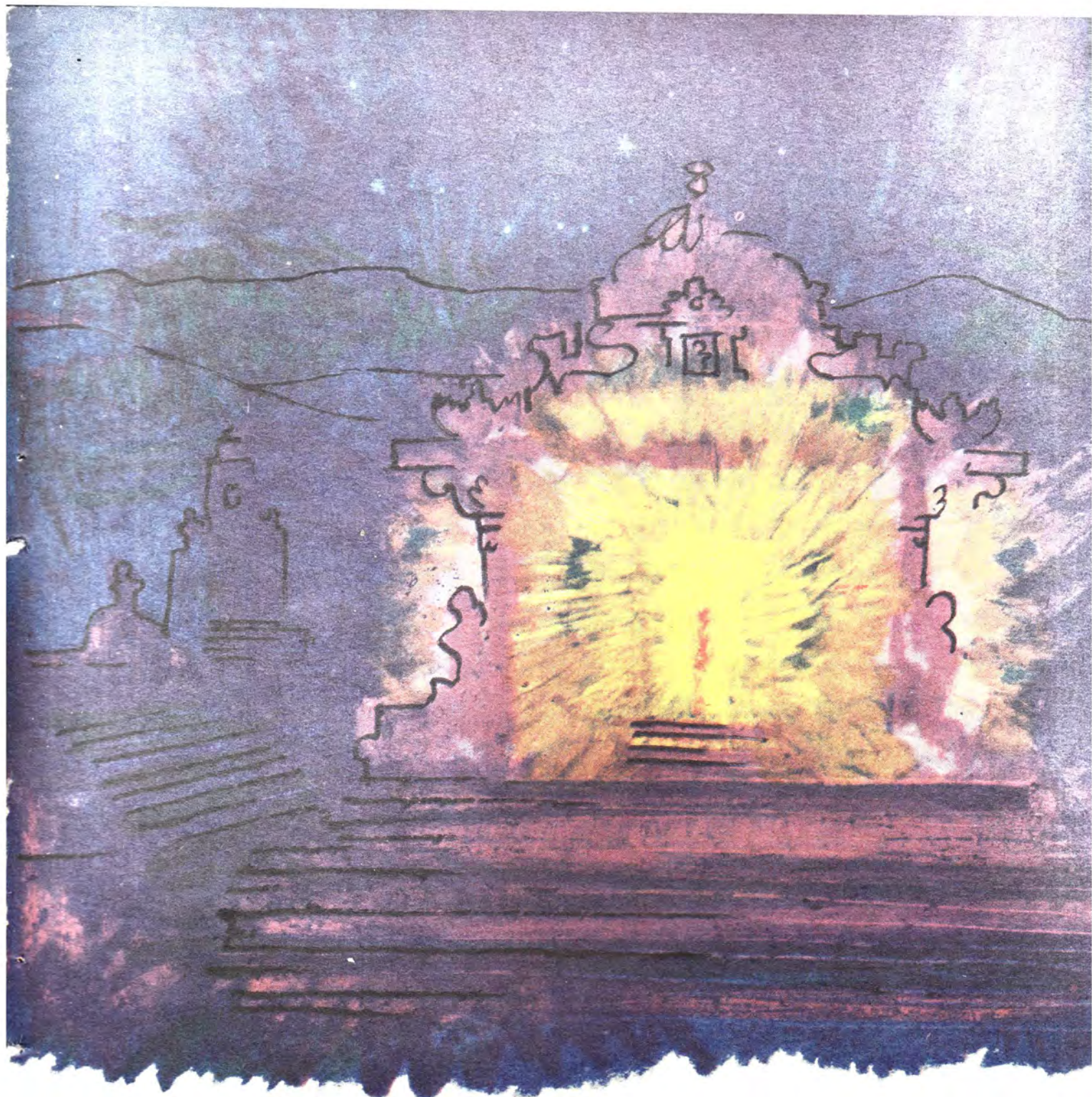
সতীকান্ত গুহ

বড় হবার মন্ত্র

নীলগিরি নামটা কানে যেতেই নীল অরণ্য, নীল পাহাড়, ঢেউ খেলানো নীল জমি, নীল মেঘ, নীল জল ও নীল রোদের একটা আশ্চর্য ছবি চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে। নীল রোদ কথাটা শুনে অবিশ্বাসে হেসো না। রোদ কত কড়া, কত উজ্জ্বল ও কেমন নীল হতে পারে যদি স্বচক্ষে দেখতে চাও একবার তামিলনাদের নীলগিরি মুলুকে যাও। বছরের যে-কোনো সময়ে, বিশেষ করে অঘ্রাণের সোনালী দিনে। তাহলে সোনা থেকে নীল আভা বার হলে দেখতে কেমন হয় দেখবে, বুঝবে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগবে যখন মনে হবে নীল মেঘ কোনো লুকোনো আগুনে জ্বলে উঠে নীল রোদের স্রোতে অঝোরে ঝরছে।

আজ শরতের রুপোলী-রোদে-ভেসে-যাওয়া সকালে লিখতে বসে আমি কিন্তু নীলগিরির ঐ নীল ছবির কথা ভাবছি না। ঐ ভাবনা আমার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ঐ ভাবনা ছাপিয়ে উঠছে কয়েকবছর আগে শোনা অনেকদিন আগের, চোখের-ঘুম-কেড়ে-নেওয়া একটা গল্প। নিছক গল্প নয়। কাহিনী কিম্বা কিংবদন্তী শুধু নয়। ইতিহাস। রাজনীতির চাল ও অস্ত্রের ঝঞ্চনা থেকে তফাতে সরে থাকা এক ফর্দ নরম ইতিহাস।

সূর্যের আলো যখন একটু আলাদা ছিল, অর্থাৎ পৃথিবীর বয়েস এখন থেকে বেশ কিছু কম ছিল, নীলগিরি মুলুকে এক রাজা ছিলেন। নীলগিরির এধারে ওধারে আরো কয়েকটি রাজ্য ছিল। প্রতিটি রাজ্যেই এক একটি নামকরা রাজা ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধে যেতেন, শিকার করতেন, প্রজাদের কাছ থেকে কড়া হাতে খাজনা আদায় করতেন, আবার বছরে একদিন ঢ্যাঁড়া দিয়ে মেলা জমিয়ে রাজকোষ উজাড় করে ধনরত্ন ঝিলিয়ে দিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করতেন। কিন্তু এই রাজাদের কীর্তি ও খ্যাতি ম্লান করে দিয়েছিলেন নীলগিরি মুলুকের রাজা লোকনাথ। তিনি যে-রাতে জন্মেছিলেন নীলগিরি রাজ্য চাঁদের আলোয় ভেসে গিয়েছিল। চাঁদনী রাতে এরকম আলোর জোয়ার কেউ কখনো দ্যাখেনি। কোথা থেকে রাতের আকাশে ঝলক দিয়ে একটি পাখি মস্ত দুটি ডানা মেলে রাজ্যের খাসমন্দিরের চুড়োয় এসে বসেছিল। অদূরে নির্জন নীল অরণ্যে কারা গান গেয়ে উঠেছিল। মন্দিরের কপাট নিজে থেকে খুলে গিয়েছিল। দেবতার বিশাল মূর্তির দুটি চোখের মণি খুসিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। প্রসন্ন মুখে রক্তপ্রবালের দুটি ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল। মন্দিরের পুজারী স্পষ্ট আদেশ শুনেছিলেন, দেবতা রাজার সঙ্গে কথা বলতে চান। রাজা বিশ্বনাথ তখনও সন্তানকে কোলে নেননি। যে-কক্ষে রানী পালঙ্কে ক্লান্তদেহে শুয়ে ছিলেন তারই খোলা কপাটের বার থেকে শিশুকে মুগ্ধ চোখে দেখছিলেন। দেবতার আদেশ পেয়ে রাজা একা গভীর রাতে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। দেবতার ঠোঁট কাঁপলো, দুটি চোখ ঊষার আলোর মতো নরম হলো। দেবতা বললেন, রাজা! আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আর আমার প্রতিনিধি তুমি। আজ এ রাজ্যের আনন্দের দিন। যে-শিশু রানীর কোল আলো করে এল, তাঁর কীর্তির দ্যুতিতে নীলগিরি রাজ্যের নাম ইতিহাসে জ্বলজ্বল করবে। ত্রিকালের বিচারে এর চেয়ে বড় হওয়া দূরের কথা, এর তুল্য কেউ থাকবে না। রাজা! তুমি দেশের পবিত্র মাটির তিলক শিশুর ললাটে এঁকে দাও। শিশুকে বুকে নিয়ে কানে কানে বলো, বড় হও। সবচেয়ে বড়, সত্যিকারের বড় হও।

রাজা দেবতাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। যথারীতি দেবতার নির্দেশ পালন করলেন। প্রাসাদে, ক্রমে ক্রমে সারা রাজ্যে সে রাতেই দৈববাণী রাষ্ট্র হল। রাজ্যে আনন্দের বান ডাকলো।

রাজা পরদিনই রাজ্যের নামী পণ্ডিত ও জ্যোতিষীদেব সভায় ডেকে পাঠালেন। রাজা স্বমুখে তাঁদের দেবতার ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বলুন, শিশুকে কী কী বিশেষ বিদ্যা শেখাই। কী উপায়ে মানুষ করি। আমার কোনো ত্রুটিতে দৈববাণী ব্যর্থ না হয়।

সবিস্ময়ে পণ্ডিত ও জ্যোতিষীরা রাজার কথা শুনলেন। তাঁরা মাথা হেঁট করে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। মনে হল তাঁরা কেউ রক্তমাংসের মানুষ নন। একএকটি পাথরের মূর্তি। শেষে, তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, হাত জোড় করে বললেন, মহারাজ! আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না। এ শিশুর উপর দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি। তিনিই শিশুকে প্রতিপদে বুদ্ধি পরামর্শ দেবেন। পথ দেখাবেন।

শিশুর অর্থাৎ রাজপুত্রের বয়েস যতদিন সাতবছর পূর্ণ না হল, তাকে চোখে চোখে রাখা হল। কিন্তু তারপর তাকে আর চোখের শাসনে ধরে রাখা গেল না। মায়ের কোল থেকে ছাড়া পাবার পরই সে বিশাল প্রাসাদের এখানে ওখানে সকলের চোখের আড়ালে চলে যেতো। সে তন্ময় হয়ে কী ভাবতো। দিনের আলোয় কী স্বপ্ন দেখতো, কার সঙ্গে কী কথা বলত, লক্ষ্য করে সকলেই বিস্মিত হত। কিন্তু রাজা ও রানী আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। বিশেষ করে রাজা। স্বকর্ণে তিনিই তো দেবতার মুখে রাজপুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনেছিলেন। কিন্তু সাতবছর পূর্ণ হবার পর রাজপুত্র সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে সুরু করলেন। বেঁচে থাকতে গেলে স্নানাহারের প্রয়োজন। রাজসিংহাসনে বসতে গেলে নানা বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন। রাজপুত্রের কাছে কোনো প্রয়োজনই যেন প্রয়োজন নয়। একদিন রাজা রাজপুত্রকে আড়ালে পেয়ে নির্জন কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে বিচিত্র কারুকার্যকরা তিনটি পাত্র পাশাপাশি সাজানো ছিল। একটিতে নানা রকমের অস্ত্র, একটিতে নানা দেশের দুর্লভ পুঁথি, আর একটিতে মণিমাণিক্যের সম্ভার। রাজা বললেন, কুমার! তুমি কী চাও বেছে নাও।

রাজপুত্রের দৃষ্টি তাঁর সম্মুখে সাজানো তিনটি পাত্র এড়িয়ে অনেকদূরে চলে গেল। তারপর তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, সময় হয়নি।

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কীসের সময় হয়নি?

রাজপুত্র বললেন, বেছে নেবার।

বিশ্বনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর আরো তিনবছর কেটে গেল। এই তিনবছরে রাজপুত্র সম্বন্ধে রাজ্যের সকলেরই মনে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রশ্ন জাগলো। প্রতিবেশী হেমগিরি রাজ্যের রাজপুত্র শস্ত্রপাণি বয়সে রাজপুত্র লোকনাথের চেয়ে তিনবছরের ছোট। ইতিমধ্যেই তিনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে একদিন অস্ত্রবলে দিগ্বিজয় করবেন, এ নিয়ে হেমগিরি রাজ্যের অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। শ্যামগিরি রাজ্যের রাজপুত্র শ্রীশঙ্কর ন বছরে পা দেবার আগেই বেদবেদান্ত থেকে অনর্গল শ্লোক বলে যেতেন। তিনি যে কালে বিদ্যায় মেধায় রাজাদের শীর্ষস্থানীয় হবেন এ বিষয়ে শ্যামগিরি রাজ্যের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। হেমগিরি ও শ্যামগিরি—প্রতিবেশী এই দুটি রাজ্যের আস্ফালনে নীলরাজ্যের আঁতে ঘা লাগলো। তাদের পরমপ্রিয় রাজপুত্র লোকনাথ, স্বয়ং দেবতা যাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তিনি কোথায়? সকলের চোখের আড়ালে তিনি কী বিষয় নিয়ে সাধনা করছেন? দশ বছরে একটি দিনও তাঁকে প্রাসাদের বাইরে কেউ বার হতে দেখেনি। এর অর্থ কী?

একদিন প্রজারা দলবেঁধে প্রাসাদের তোরণে এল। খবর পেয়ে রাজা বিশ্বনাথ অন্তঃপুর থেকে সভাগৃহে এসে প্রজাদের নায়কদের ডেকে পাঠালেন।

নায়কদের যিনি নেতা মাথা হেঁট করে রাজাকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ! দশ বছরে আমরা রাজপুত্রকে একটি দিনও দেখিনি। তাঁকে একবার তোরণে আসতে বলুন। আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি।

রাজা বললেন, রাজপুত্র সাধনায় মগ্ন। আপনারা ধৈর্য ধরুন। যথাসময়ে দেখা দেবেন।

নায়কদের নেতা বললেন, মহারাজ! হেমগিরি ও শ্যামগিরি রাজ্য তাঁদের রাজপুত্রদের নিয়ে বড়াই করতে সুরু করেছে।

আমাদের রাজপুত্র কী বিষয়ে সাধনা করছেন জানতে পেলে আমাদেরও একেবারে চুপ করে থাকতে হয় না।

রাজা প্রমাদ গণলেন। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি জানলে তো দেবেন! মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাজা বললেন, রাজপুত্র জীবনের সবচেয়ে কঠিন বিষয় বেছে নিয়েছেন। যতদিন তাঁর সাধনা শেষ না হচ্ছে আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। যথাসময়ে তিনিই বলবেন।

নায়করা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রাজা বললেন, দেবতার ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হবার নয়। আপনারা বুক বাঁধুন। একদিন রাজপুত্রের নামে আপনাদের সকলের মুখে যে-জয়ধ্বনি উঠবে তা হেমগিরি শ্যামগিরির আস্ফালন চূর্ণ করে দেবে।

নায়করা রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে প্রস্থান করলেন। রাজাকে অবিশ্বাস করা তাঁদের স্বভাব নয়। তবু, রাজার আশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের বুকে কোথায় একটা কাঁটা বিঁধে রইল।

রাজার সেদিন আহারে রুচি ছিল না। রানীর মিনতি সত্ত্বেও রাজা প্রায় অভুক্ত অবস্থায় শয়নকক্ষে এলেন। রানী চন্দনকাঠের পাখা নিয়ে রাজাকে হাওয়া করতে করতে বললেন, মহারাজ। ধৈর্য ধরুন। দেবতার আশ্বাসে আস্থা হারাবেন না।

রাজা বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, মহারানী! দেবতাকে বিশ্বাসই করতে চাই। কিন্তু রাজপুত্রকে নিয়ে কী করি? প্রজাদের প্রশ্নের কী উত্তর দিই রাজপুত্রের নিজেকে নিয়ে এই লুকোচুরি খেলা আর কতকাল চলবে? প্রজাদের দোষ দিতে পারি না। আমারই চোখে রাজপুত্র এক কূট রহস্য হয়ে পড়েছে। দেবতাকে অবিশ্বাস করার কথা ওঠে না। কিন্তু মহারানী! ভয় হয়, আমিই কি দেবতার কথা ভুল শুনলাম?

রানীর অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। মুখে বললেন, ছিঃ মহারাজ। নিজেকে বৃথা দোষী করবেন না। ভুলবেন না, যে-পাখি পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি রাজপুত্রের জন্মের রাতে রাজমন্দিরের চুড়োয় এসে বসেছিল, মন্দিরের কপাট আপনা থেকে খুলে গিয়েছিল।

সে রাতে রাজার চোখে ঘুম এল না। তিনি আকাশ পাতাল চিন্তা করলেন। রানী যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, রাজা সন্তর্পণে শয্যা ছাড়লেন। নিঃশব্দে শয়নকক্ষ থেকে বার হয়ে রাজপুত্রের ঘরে গেলেন। দেখলেন রাজপুত্রের শয্যা শূন্য। জানালার দিকে তাকাতে দেখলেন রাজপুত্র জানালার সম্মুখে চন্দনকাঠের চৌকিতে বসে রয়েছেন। রাজা রাজপুত্রের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন রাজপুত্রের শরীরে স্পন্দন নেই। তিনি রাতের আকাশের দিকে চোখ মেলে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন।

রাজা বললেন, রাজপুত্র!

রাজপুত্র যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন।

রাজা বললেন। একদিন তোমার সম্মুখে তিনটি পাত্রে তিনটি জিনিস রেখেছিলাম—অস্ত্র, পুঁথি ও রত্নসম্ভার। অস্ত্র বলতে মানুষ বোঝে শৌর্য, পুঁথি বলতে জ্ঞান, রত্নসম্ভার বলতে ঐশ্বর্য। এর যে-কোনো একটির জোরে মানুষ বড় হতে পারে। যার জীবনে তিনের সমন্বয় ঘটে, সে ইতিহাসে চিরকালের জন্য বড় হয়। তোমাকে এই তিনটির একটি বেছে নিতে বলেছিলাম। তুমি বলেছিলে সময় হয়নি।

রাজপুত্র নীরবে রাজার কথা শুনলেন।

রাজা বললেন, তুমি সময় হয়নি বলেছিলে কেন? তুমি কি তোমার জীবনে তিনটিই সমান রকমে চাও?

রাজপুত্র বললেন, না মহারাজ।

রাজা বললেন, তাহলে আজ কি তুমি বেছে নিতে পারো?

রাজপুত্র বললেন, না।

রাজা বললেন, রাজপুত্র! আর কতকাল তুমি আমাকে অপেক্ষায় রাখবে? হেমগিরির রাজপুত্র অস্ত্রবিদ্যায়, শ্যামগিরির রাজপুত্র বেদবেদান্তে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। ওদের রাজ্যের প্রজারা তাদের নিয়ে আস্ফালন করছে। তোমার উপর দেবতার দুর্লভ আশীর্বাদ। তাঁর আদেশে তুমি জন্ম নেবার পরই আমি তোমার কানে বড় হবার মন্ত্র দিয়েছিলাম। তোমার ললাটে দেশের পবিত্র মাটির তিলক এঁকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি নিজেকে বছরের পর বছর আড়াল করে রাখছো। রাজ্যের প্রজারা তোমাকে দেখতে চায়, তোমাকে নিয়ে বড় রকমের অহংকার করে হেমগিরি শ্যামগিরির মুখ বন্ধ করতে চায়। বারবার সময় হয়নি বোলো না রাজপুত্র। দেবতাকে স্মরণ করো। সময়ের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে তাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসো। রাজপুত্র! সময়ের অপেক্ষায় না থেকে তাকে হুকুম করো।

রাজপুত্র বললেন, মহারাজ! সময় একদিন হবেই। যেদিন হবে আমি সভায় উপস্থিত হয়ে আমার সাধনার রহস্য খুলে বলব।

রাজপুত্র আবার ধ্যানমগ্ন হলেন। রাজা বুকে বিরাট পাষাণভার নিয়ে শয়নকক্ষে ফিরে এলেন।

সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু রাজাপ্রজা সকলের উপর যিনি, সেই অদৃষ্ট এমন চাল চাললেন রাজপুত্রকে প্রাসাদ ছেড়ে পৃথিবীর পথে বার হতে হল।

রত্নগিরি রাজ্য থেকে নীলরাজ্যের রাজসভায় দূত এল। বিধিমতো রাজাকে অভিবাদন করে দূত বলল, মহারাজ! রত্নগিরির রাজকন্যা রত্নমালার রূপ ও গুণের তুলনা দক্ষিণ ভারতে নেই। রাজকন্যা লক্ষ্মীপূর্ণিমায় স্বয়ম্বরা হবেন। হেমগিরি শ্যামগিরির রাজপুত্ররা আসছেন। এ অঞ্চলে খ্যাতিতে মানে নীলরাজ্য সকলের উপরে। রত্নগিরির রাজার একান্ত ইচ্ছা নীলরাজ্যের রাজপুত্র স্বয়ম্বর সভায় আসেন।

রাজা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, রাজপুত্র কঠোর সাধনায় রত। স্বয়ম্বর সভার আমন্ত্রণ কানে গেলেও তাঁর প্রাণে সাড়া জাগবে কিনা সন্দেহ।

দূত হাত জোড় করে বলল, মহারাজ! রাজপুত্রের সাধনার কথা রত্নগিরির রাজকন্যার অবিদিত নেই। তবু, তাঁরই অনুরোধে আমাদের মহারাজ রাজপুত্রকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

রাজা রাজপুত্রের মহলে খবর পাঠালেন। রাজপুত্র কী জবাব দেবেন সে সম্বন্ধে রাজার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিছুক্ষণ পর রাজপুত্রকে সভায় প্রবেশ করতে দেখে রাজা, তাঁর সঙ্গে সারা সভা চমকে উঠল। রাজপুত্রকে দেখে মনে হল আকাশের ধ্যানী চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে সস্নেহে হাত ধরে রাজপুত্রকে পাশে বসালেন। কোমলকণ্ঠে বললেন, রাজপুত্র। রত্নগিরির রাজা রাজকন্যা রত্নমালার স্বয়ম্বর সভায় তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বলো কী জবাব দিই।

রাজপুত্র শান্তকণ্ঠে বললেন, দূতকে বলুন, আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি স্বয়ম্বর সভায় যেতে প্রস্তুত? রাজকন্যা রত্নমালার জন্য তুমি হেমগিরি শ্যামগিরি রাজ্যের রাজপুত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে কুণ্ঠিত নও?

রাজপুত্র বললেন, আমার সাধনা কতদূর যেতে পারে তার প্রমাণ দেবার, বড় হবার পথ বেছে নেবার সময় এসেছে। মহারাজ! রত্নগিরির স্বয়ম্বর সভায় প্রমাণ দেবার প্রথম পর্ব শুরু হবে। কোথায় শেষ হবে জানিনা মহারাজ।

রাজা দূতকে বললেন, রাজপুত্র আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

রাজপুত্র রাজাকে প্রণাম করে সভাগৃহ ছেড়ে তাঁর নিজমহলে ফিরে গেলেন। সভা কৌতূহলে বিস্ময়ে থমথম করতে লাগল। রাজা রাজপুত্রের কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টায় স্তব্ধ হয়ে সিংহাসনে বসে রইলেন।

রত্নগিরির রাজা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে তফাতে থাকতেন। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়েছিলেন রত্নমালাকে কন্যা হিসেবে

পেয়ে। রত্নমালাকে দেখে মনে হত মানুষের বেশে একটি অপরূপ কবিতা।

হেমগিরি ও শ্যামগিরির রাজপুত্র শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর মহাসমারোহে স্বয়ম্বর সভায় এলেন। তাঁদের রথের ঘর্ঘর ঝড়ের আকাশের বাজকে লজ্জা দিল। তাঁরা স্বয়ম্বর সভাকে চমকে দিয়ে লাফ দিয়ে যে যাঁর রথ থেকে নামলেন। সভার সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। হ্যাঁ, এ'দেরই রাজপুত্র নাম সার্থক। শুধু রত্নমালার ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

নীলরাজ্যের রাজপুত্র অনেকদূরে রথ থামিয়ে পায়ে হেঁটে সভায় এলেন। রাজপুত্রদের জন্য সোনার কাজকরা হাতির দাঁতের আসন সাজানো ছিল। মহা আড়ম্বরে দুটি ক্ষুদে ইন্দ্র মতো শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর এক একটি আসনে বসেছিলেন। রাজপুত্র লোকনাথ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনের সম্মুখে সভার মেঝেয় বসলেন। সভার সকলে হা হা করে উঠলেন।

রত্নগিরির রাজা বললেন, রাজপুত্র! আসন কি আপনার যোগ্য হয়নি? কোনো ত্রুটি থাকলে বলুন। সংশোধন করে নিই।

রাজপুত্র বললেন, মহারাজ! আসনে কোনো ত্রুটি নেই।

রাজা বললেন, তাহলে আপনি আসনে না বসে মাটিতে বসলেন কেন জানতে কৌতূহল হচ্ছে।

রাজপুত্র বললেন, মহারাজা! মাটির চেয়ে দৃঢ় আসন পৃথিবীতে নেই। পড়ে যাবার আশঙ্কা নেই। উচ্চাসন সেদিক থেকে নিরাপদ নয়। তবে অদৃষ্ট যদি হাতে ধরে উচ্চাসনে বসান বলার কিছু থাকে না।

রাজা হেসে বললেন, তবে দেখছি আমাকেই অদৃষ্টের ভূমিকা নিতে হচ্ছে।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজপুত্র লোকনাথের হাত ধরে তুলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসালেন। সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর, দুজনেরই মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য ম্লান হল।

রাজকন্যা রত্নমালা রাজার পাশে একটি হালকা আসনে এসে বসেছিলেন। রাজার কানে কানে তিনি কী বললেন। রাজা শুনে ঈষৎ হেসে রাজপুত্র লোকনাথকে সম্বোধন করে বললেন, রাজ-কন্যা জিজ্ঞাসা করছেন রথ থাকতে আপনি পায়ে হেঁটে স্বয়ম্বর সভায় এলেন কেন?

রাজপুত্র বললেন, সকলেরই জননী মাটি। কোন দেশের মাটির স্পর্শেই সে দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন মা-র ভিতর সন্তানের। মহারাজ! হেঁটে আসতে আসতে মন আনন্দে ভরে উঠছিল। আনন্দের ভিতর দিয়ে আপনার রাজ্যের সঙ্গে, স্বয়ম্বর সভার সঙ্গে পরিচয় হল।

রত্নগিরির রাজা রাজপুত্র লোকনাথের কথায় চমৎকৃত হলেন। সভার সকলে সাধুবাদ দিলেন। রাজকন্যা রত্নমালার মুখ উজ্জ্বল হল। শস্ত্রপাণির ও শ্রীশঙ্করের মুখে অন্ধকার নেমে এল।

শস্ত্রপাণি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মহারাজ! আমরা স্বয়ম্বর সভায় এসেছি। পণ্ডিতদের তর্কসভায় নয়। আমাদের কার ভিতর রাজোচিত কী গুণ কতটা আছে প্রমাণ করতে এসেছি। এই প্রমাণের উপর আমাদের যোগ্যতার বিচার হোক। বিচারের সময় স্মরণ রাখতে হবে রাজার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে শৌর্য।

শস্ত্রপাণি আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীশঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মহারাজ! আমার বিদ্যা বেদবেদান্তে থেমে নেই। ইতিহাস, কাব্য, নাটক ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি। স্বয়ম্বর সভায় সচরাচর শৌর্যেরই শুধু বিচার হয়। কিন্তু জ্ঞানেরও বিচার

হওয়া দরকার। আজ যিনি রাজপুত্র কাল অর্থাৎ ভাবীকালে তিনিই রাজা। রাজা শুধু সেনাপতি নন। সেনাপতির এক হাতে ইস্পাতের তলোয়ার থাকলেই চলে। রাজার এক হাতে ইস্পাতের তলোয়ার, আর এক হাতে জ্ঞানের। না হলে তাঁকে মানায় না। তিনি অসম্পূর্ণ থেকে যান।

শস্ত্রপাণির দু'চোখ জ্বলে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আসনের একপাশ থেকে ধনুক তুলে নিয়ে শরসংযোজন করলেন। চক্ষের নিমেষে তাঁর শর রাজকন্যা রত্নমালার একটি কেশ তুলে নিয়ে রাজকন্যার পিছনে কপাটের উপর গিয়ে বিঁধলো। রুদ্ধ-শ্বাসে সকলে শস্ত্রপাণির কান্ড দেখলেন। রত্নমালার মুখ আরক্ত হল। রাজা ক্রুদ্ধ হবেন কি না স্থির করতে না পেরে হেসে দিলেন।

শ্রীশঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, রাজপুত্র শস্ত্রপাণির শর-চালনার কৌশলের তারিফ না করে পারি না। তবু, একটা কথা না বলে পারছি না। যদিও আজ রাজকন্যা রত্নমালা আমাদের এক-মাত্র লক্ষ্য, তাঁর কেশবিদ্ধ করে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা না করে তাঁর মর্মভেদ করার দিকে নজর দিলে ভাল হত।

শ্রীশঙ্কর তারপর গম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠে নানা কাব্য থেকে আহরণ করে লক্ষ্যভেদের উপর একটির পর একটি শ্লোক আবৃত্তি করে চললেন। সভা স্তব্ধ হয়ে শ্রীশঙ্করের আশ্চর্য আবৃত্তি শুনলো। রাজা মুগ্ধ হলেন। রত্নমালার মুখ কোমল হয়ে এল।

শ্রীশঙ্কর আবৃত্তি শেষ করে বসলেন। তখন সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাজপুত্র লোকনাথের উপর। লোকনাথ স্বয়ম্বর সভায় এত কান্ড এত কথার ভিতর ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। তিনি সভায় থেকেও যেন নেই। শরীরটা সভায় রেখে তিনি যেন অনেক দূরে অন্য একটা জগতে চলে গিয়েছেন।

রাজা ও রাজকন্যার ভিতর নীচু গলায় খানিকক্ষণ কী কথা হল। রাজা লোকনাথকে সম্বোধন করে বললেন, রাজপুত্র! রাজ-কন্যা রত্নমালা আপনার পিতৃপরিচয় জানেন। আপনি সকলের চোখের আড়ালে কী এক সাধনায় রত, তা'ও জানেন। আপনি স্বয়ম্বর সভায় এসেছেন এজন্য রাজকন্যা কৃতজ্ঞ। আপনি কি যোগ্যতার প্রমাণ দিতে এসেছেন? আপনি কি রাজকন্যাকে বধূ-রূপে পেতে চান?

লোকনাথ ধীরে ধীরে দু'চোখ মেললেন। তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। চিন্তার শেষে লোকনাথ কী বলেন সেজন্য স্বয়ম্বর সভার সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। লোকনাথ আবার চোখ মেললেন। এখন তাঁর চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট, উজ্জ্বল। তাঁর কণ্ঠে দ্বিধা নেই। কোনো জড়তা নেই।

লোকনাথ বললেন, মহারাজ! পৃথিবীর যে-গ্রন্থের তুলনা নেই সেই মহাভারত যে মহাকাব্য তার প্রমাণের জন্য আঠারো পর্বের প্রয়োজন হয়েছে। ঈশ্বর তো যুগযুগ ধরে সৃষ্টির ভিতর জলে স্থলে আকাশে নিজেকে এখনও প্রমাণ করে চলেছেন। যে যত বড় তার প্রমাণও তত বিপুল। মহারাজ! আমার জন্মলগ্নে গভীর রাতে রাজ্যের দেবতা আমার পিতাকে ডেকে আদেশ দিয়ে-ছিলেন আমার কানে বড় হবার মন্ত্র দিতে। সেইসঙ্গে আমার ললাটে মাটির তিলক এঁকে দিতে বলেছিলেন। এই ঘটনার ভিতর আমি বড় হবার অর্থ, যোগ্যতার প্রমাণের অর্থ খুঁজে ফিরছি। শয়নে স্বপ্নে জাগরণে গভীর চিন্তায় বারবার ডুব দিয়েছি। শেষে একটা ধারণায় পৌঁছেছি।

রাজা বললেন, কী ধারণা রাজপুত্র?

লোকনাথ বললেন, বড় হবার সঙ্গে মাটির তিলকের একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে, এই ধারণা। মাটি কিছু চায় না, কিন্তু লক্ষ কোটি হাত ভরে দেয়। ফল, ফুল, ফসল, সব ঐশ্বর্যের আধার মাটি। যে পাহাড় আকাশে হাত বাড়ায়, যে সমুদ্র ফেণার মুকুট পরে যুগ যুগ ধরে ঢেউয়ের হাততালিতে নিজের কীর্তি ফলাও করে বলে তাদেরও আশ্রয় মাটি। তাদের বুকের লুকোনো ঐশ্বর্য হীরা চুনি পান্না মণি মুক্তা মাটির আর একরকম ফুল, আর এক রকম ফসল। কিন্তু মাটি কী করে এত দেয়? কেন সে এত বড়?

রাজা বললেন, রাজপুত্র! এ রহস্যের ব্যাখ্যা শুনতে আমরা সকলেই উৎসুক।

লোকনাথ গভীর স্বরে বললেন, মহারাজ! মাটি সকলের পায়ের তলায়। একটা পোকাকে মাড়ালে সে-ও গা নাড়া দিয়ে আপত্তি জানায়। মাটি কোটি কোটি বছর পায়ের তলায় পড়ে আছে। তার কোনো আপত্তি নেই। ছোট হবার আশ্চর্য শক্তি তার। সৃষ্টি তাই তার কাছে ধরা দিয়েছে। সব ঐশ্বর্য, সব ফুল, সব ফসল সে মাটির ভাঁড়ারে জমা দেয়। ছোট বলেই সে এত বড়। হয়তো বড় বলেই সে ছোট হয়েও প্রতি মুহূর্তে নানা সম্পদে বাড়ে, বড় হয়। মহারাজ! মাটি মূক। সে চায়না। তাই সে এত পায়। নিজেকে অকাতরে সে বিলিয়ে দেয় বলে সে সৃষ্টির কাছ থেকে এত পায়।

রাজা বললেন, রাজপুত্র! আপনার কথা কতটা বুঝেছি, আদৌ বুঝেছি কিনা, জানি না, তবু জানতে ইচ্ছে হয় আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী, আপনি কোন পথে বড় হতে চান।

লোকনাথ বললেন, আমি সব অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে মাটির মত ছোট হতে চাই। মাটির মতো নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আমি জীবনের ভাঁড়ারে কিছু দিতে চাই। মহারাজ! আমি দিয়ে বড় হতে চাই। নিয়ে বড় হতে চাই না। যে হাত বাড়িয়েই থাকে, যার চাওয়ার শেষ নেই, যে আকাঙ্ক্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে পাগল হয়ে পাওয়ার নেশায় পৃথিবী হাতড়ে বেড়ায় সে ভিক্ষুক। রথ হাঁকিয়ে, ঢাক পিটিয়ে সে তার আসল পরিচয়, রাজবেশের আড়ালে ভিক্ষুকের জীর্ণবেশ ঢাকতে পারে না।

শ্যামগিরির পন্ডিত রাজপুত্র শ্রীশঙ্কর কঠোর স্বরে বললেন, রাজপুত্র লোকনাথ! এই স্বয়ম্বর সভায় আপনি রাজকন্যা রত্ন-মালাকে পেতে এসেছেন। যদি না চান কেন এসেছেন?

লোকনাথ শান্তকণ্ঠে বললেন, বলতে এসেছি আমি দিতে চাই। বুঝতে এসেছি রাজকন্যা আমার এ কথার কী অর্থ ধরেন। আমার যোগ্যতার বিচার কী দিয়ে করেন।

শস্ত্রপাণি বললেন, দেবতা মাটিতে থাকেন না। আকাশে থাকেন। মানুষও মাটি আঁকড়ে থাকে না। সে মাটির উপর প্রাসাদ মন্দির ইত্যাদি গেঁথে তোলে। অবশ্য কীট শ্রেণীর জীবরা মাটি নিয়ে সন্তুষ্ট। আমার মনে হয় না রাজপুত্র রত্নগিরির রাজকন্যা রত্নমালা আপনার সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে রাজী হবেন।

শ্রীশঙ্কর শস্ত্রপাণির রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠে বললেন, হেমগিরির রাজপুত্র দেখছি শুধু ধনুকেই নয়, জিভেও বাণ ছুড়তে পারেন। শেষটা দেখছি আপনার ও আমার ভিতর একজনকেই রাজকন্যার বেছে নিতে হবে।

রাজা বাধা দিতে না দিতে রাজকন্যা রত্নমালা ঘোমটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, স্বয়ম্বর সভা ডাকার অর্থ এই নয় যে যোগ্য প্রার্থী না থাকলেও স্বয়ম্বরা হতেই হবে।

শস্ত্রপাণি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আসন ছেড়ে উঠে বললেন, যোগ্যদের ভিতর প্রতিযোগিতায় হারতে পারি, কিন্তু অযোগ্য অপবাদ সহ্য করতে প্রস্তুত নই রাজকন্যা। স্মরণে রাখবেন আমি হেমগিরি রাজ্যের যুবরাজ।

শ্রীশঙ্কর সায় দিয়ে বললেন, আমিও এই কথাই বলি রাজকন্যা।

রাজকন্যা হাত জোড় করে বললেন, আমার ভাষার ত্রুটি ধরবেন না। আপনাদের কেউ অযোগ্য নন। কিন্তু রাজপুত্র লোক-নাথ যোগ্যতার প্রমাণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আমার মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছেন। আমি কিছুকাল ভাবতে চাই। লোকনাথ বড় হবার সাধনায় কোন্ পথে এগোন, সে পথ রাজ-পুত্রের পক্ষে বড় হবার পথ কিনা দেখতে চাই। আপনারাও কে কীর্তির কটা ধাপ বেয়ে কত উঁচুতে ওঠেন দেখব। যা অদৃষ্টে লেখা আছে কে খন্ডাবে! হতে পারে আপনাদের একজনকেই বেছে নেব।

শস্ত্রপাণি বললেন, বেছে নেবার সময় ভুলবেন না আপনি রাজকন্যা। রাজা হবার সত্যিকারের যোগ্যতা যাঁর আছে, যিনি রাজোচিত নানা গুণের অধিকারী, তিনিই আপনার যোগ্য প্রার্থী।

রাজকন্যা রত্নমালা লোকনাথের দুটি শান্ত চোখে চোখ রেখে বললেন, আপনার বলার কিছু নেই রাজপুত্র?

লোকনাথ রত্নমালাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে অভিভূত স্বরে বললেন, চাওয়ার নেশা থাকলে কোনো কথা না বলে আপনাকে চাইতাম। আকাশের চাঁদ কে না চায়! কিন্তু আমার মন্ত্র যে চাওয়ার মন্ত্র নয়। দেওয়ার মন্ত্র। মাটির চিরকালের মন্ত্র। আমি দিয়ে বড় হতে চাই। সবচেয়ে ছোট হয়ে কী করে সবচেয়ে বড় হওয়া যায় সেই রহস্যের গিঁঠ খুলতে চাই। রাজকন্যা! আপনি আকাশের চাঁদ। আমি এক ডেলা মাটি। কিন্তু যেখানেই থাকুন আপনার আলো আমার উপর পড়বে এই আশ্বাস নিয়ে আজ বিদায় নি-ই।

রাজকন্যার চোখে জল এল। বুক ভরে উঠল। লোকনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখ নামিয়ে নিলেন। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হল। মনে মনে বললেন, যাও রাজপুত্র! মাটির রহস্য উদ্ধার করো। দিয়ে বড় হও। সেদিন আকাশ তার সব ঐশ্বর্য নিয়ে তোমার মাটির বুকে ধরা দেবে।

স্বয়ম্বর সভার খবর নীলরাজ্যে পৌঁছলো। কোনো কারণে রাজকন্যা রত্নমালা স্বয়ম্বরা হননি। কিন্তু রাজপুত্র লোকনাথের কথা, সবচেয়ে ছোট হয়ে সবচেয়ে বড় হবার, মাটি হয়ে আকাশ ছাড়িয়ে যাবার কথা স্বয়ম্বর সভা স্তব্ধ হয়ে শুনেছে। গভীর কথা সহজ ভাষায় বলে তিনি শস্ত্রপাণির শৌর্যের অহঙ্কার এবং শ্রীশঙ্করের জ্ঞানের দম্ভ চূর্ণ করেছেন এ কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হল। হেমগিরি ও শ্যামগিরি এই দু রাজ্যের আঁতে ঘা লাগল। যে রাজপুত্র পায়ে ধুলো মেখে স্বয়ম্বর সভায় হাজির হয় তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া উচিত। তা না করে রত্নগিরির রাজা ও রাজকন্যা নীলরাজ্যের রাজপুত্রের কথা, যা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়, মন দিয়ে শুনেছেন। এককথায় পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সভায় বসিয়েছেন এজন্যে দুটি রাজ্যের আক্রোশ রত্নগিরির উপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু রত্নগিরি সুরক্ষিত রাজ্য। তাছাড়া বহু রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে রত্নগিরি রাজ্যের মিত্র। না হলে হেমগিরি শ্যামগিরি একযোগে রত্নগিরি রাজ্য আক্রমণ করে বসলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তবে একটা কারণে আক্রমণ করা সম্ভব হত না। তখনও হেমগিরির শস্ত্রপাণি ও শ্যামগিরির শ্রীশঙ্কর রত্নমালার আশা ছাড়েননি।

নীলরাজ্য খুশি হল। কিন্তু এতে নীলরাজ্যের মন ভরল না। রাজপুত্র লোকনাথ রত্নগিরির স্বয়ম্বর সভায় বিশেষ সম্মান পেয়েছেন, ভালো কথা। আরো ভালো হত, আনন্দে মেতে উঠবার কারণ খুঁজে পাওয়া যেত যদি লোকনাথ শৌর্যের প্রতিযোগিতায় হেমগিরির শস্ত্রপাণিকে হটিয়ে দিতে পারতেন। জ্ঞানের ধারে ও ভারে শ্যামগিরির শ্রীশঙ্করকে পরাস্ত করতে পারতেন।

রাজা ও রাজপুত্রদের জীবনে পৃথিবীর মানুষ করুণা, সততা, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ দেখতে পেলে দূর থেকে নমস্কার জানায়। কিন্তু যে রাজা পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করে রাজ্যর পর রাজ্য জয় করেন, শৌর্যের শিকলে যিনি আধখানা পৃথিবী বাঁধেন, তাঁর রথ মানুষের সুখশান্তি মাড়িয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটে চললেও মানুষ তাঁকে নিয়ে মাতামাতি না করে পারে না। তাঁর পায়ে লুটোতে পারলে কৃতার্থ হয়। নীলরাজ্য রাজপুত্র লোকনাথ সম্বন্ধে এরকম একটি স্বপ্ন দেখছিল। তিনি দিগ্বিজয় করবেন। রাজচক্রবর্তী হবেন, তাঁর প্রচণ্ড প্রতাপে দক্ষিণ ভারত থরথর করে কাঁপবে, মাথা মুড়িয়ে নানা রাজ্যের রাজারা এসে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে, এই ছিল নীলরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা। নীলরাজ্য মানুষের বেশে দেবতা চায়নি, চেয়েছিল একটি অসাধারণ দুর্ধর্ষ রাজা।

তবু তিনি কয়েকটি কথায় নীলরাজ্যের মান বাড়িয়েছেন। সারা নীলরাজ্য মিছিল করে প্রাসাদের তোরণে রাজপুত্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে গেল।

রাত তখন দ্বিপ্রহর। রাজা সোজা প্রাসাদের তোরণে এসে দাঁড়ালেন। রাজপুত্র লোকনাথের নামে বার বার জয়ধ্বনি উঠছে। কিন্তু রাজা নীরব কেন? তাঁর মুখ বিষণ্ণ কেন? তাঁর অঙ্গে এত রাতে সভার বেশ কেন? তিনি এত রাতে রাজসভায় কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিলেন?

সকলে আর একবার জয়ধ্বনি দিয়ে বলল, মহারাজ! রাজপুত্র আমাদের সকলের মান বাড়িয়েছেন। আমরা তাঁকে দেখতে চাই।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, রাজপুত্র নেই। তিনি স্বয়ম্বর সভা থেকে বার হয়ে রথ ফিরিয়ে দিয়েছেন। পায়ে হেঁটে একা চলে গিয়েছেন।

সকলে চেঁচিয়ে উঠে বলল, মহারাজ! অনুমতি দিন। আমরা রাজপুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। একা রাজপুত্র নিরাপদ নন। তাঁর উপর হেমগিরি ও শ্যামগিরির রাজপুত্র দুটির বিষদৃষ্টি।

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, তা হবার নয়। রাজপুত্র কাউকে পথের নিশানা না দিয়ে একা গিয়েছেন। স্বেচ্ছায়। রত্নগিরির দূত খবর এনেছেন, স্বয়ং রাজকন্যা রত্নমালা গোপনে রথ পাঠিয়েছিলেন। স্বরাজ্যে ফিরে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কঠিন সংকল্পে রাজপুত্র বুক বেঁধেছেন। বলেছেন, বড় হবার মন্ত্র যতদিন প্রমাণ করতে না পারছেন, সত্যিকারের বড় হয়ে দেবতার বাণী যতদিন সফল করতে না পারছেন, ফিরবেন না।

রত্নগিরির দূত সভাগৃহ থেকে রাজার পিছন পিছন এসেছিলেন। তাঁরই পাশে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণে সকলের চোখ তাঁর উপর পড়ল। সকলে বুঝল মাঝ রাতে রাজার গায়ে সভার বেশ কেন। যে-রাজপুত্রের উপর তাদের অভিমানের অন্ত ছিল না, আজ তিনি একা কোথায় কোন্ দুর্গম পথে চলেছেন ভেবে তারা আশঙ্কায় কাতর হল। সমস্বরে বলল, মহারাজ! অনুমতি দিন আমরা দলে দলে নানা দিকে যাই। রাজপুত্রকে ফিরিয়ে আনি।

রাজা কয়েক মুহূর্ত তন্ময় হয়ে চিন্তা করলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, রাজ্যের দেবতা বলেছেন রাজপুত্র বড় হবেন। তিনিই তাঁকে রক্ষা করবেন। তোমরা নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরে যাও। রাজপুত্র তাঁর সাধনার শেষে ফিরে আসবেনই। দেবতাকে অবিশ্বাস কোরো না।

রাজাদেশে বাধ্য হয়ে, কিন্তু দেবতাকে অনুযোগ দিতে দিতে সকলে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

রাজপুত্রের অন্তর্ধানের পর কয়েকটা বছর কেটে গেল। তাঁর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কোন্ পথে কোথায় গেলেন, যেন হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। নীলরাজ্যে তাঁর ফিরে আসার প্রত্যাশা প্রতিদিনই সকালের রঙীন রোদে হাতছানি দিয়ে রাতের অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

হেমগিরি শ্যামগিরি রাজ্যেও নীলরাজ্যের রাজপুত্রের ব্যাপারটা নিয়ে নানা জল্পনা সুরু হল। হেমগিরির শস্ত্রপাণি ও শ্যামগিরির শ্রীশঙ্কর, দুজনেরই টনক নড়ল। রাজপুত্র লোকনাথ নিরুদ্দেশ হয়ে যে হৈচৈ ফেলে দিলেন তার জোরেই না তিনি ইতিহাসের খানিকটা জায়গা জুড়ে বসেন। শস্ত্রপাণি সৈন্য সাজিয়ে নানা দিকে হানা দিয়ে ফিরতে লাগলেন। শ্রীশঙ্করও চুপ করে থাকার পাত্র নন। তিনি নানা রাজ্যে তর বিদ্যার দাপটে পণ্ডিতদের চমকে দিতে লাগলেন। শেষে একদিন দুজনে পরামর্শ করে রত্নগিরির রাজসভায় উপস্থিত হলেন।

শস্ত্রপাণি রত্নগিরির রাজাকে বললেন, মহারাজ! স্বয়ম্বর সভায় যেদিন এসেছিলাম, মনে অহঙ্কার ছিল, কিন্তু ষোলো আনা ভরসা ছিল না। আজ আমার মনে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশঙ্কর বললেন, আমারও ঐ একই কথা। তবে আমাদের দুজনের ভিতর কে যোগ্যতর সে বিচারের ভার রাজকন্যার উপর।

আমাদের তুল্য রাজপুত্র দক্ষিণ ভারতে নেই। রত্নমালা আমাদের একজনকে বেছে নিন। না হলে পরে আফসোসের অন্ত থাকবে না।

রাজা বিরক্ত হলেন। কিন্তু মনের ভাব মনে চেপে হেসে বললেন, আপনারা বসুন। আমি রাজকন্যাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

রাজসভা আলো করে রত্নমালা এলেন। রাজপুত্র দুজনের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর ঊষার আকাশের মতো তাঁর দুটি চোখ মেলে বললেন, যোগ্যতর নয়, যোগ্যতম প্রার্থীর প্রতীক্ষায় আছি। তিনি এলেই স্বয়ম্বরা হব।

সন্দেহে ভয়ে দুখান হয়ে শস্ত্রপাণি বললেন, তিনি কে?

শ্রীশঙ্কর বললেন, আর কে? নীলরাজ্যের উন্মাদ রাজপুত্র লোকনাথ!

রত্নমালা শান্তকণ্ঠে বললেন, ঐ উন্মাদের দুচারটি কথা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমার মনে বিস্ময়ের কপাট মেলে ধরেছে। ও'র শেষ কথা শোনার অপেক্ষায় আছি। যেদিন শুনবো, উনি কত বড় বিচার করে দেখব। যদি ও'র কথা শোনার মতো না হয়, আপনা দের একজনকেই বেছে নেব।

শস্ত্রপাণি জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন অপেক্ষা করবেন?

রাজকন্যা বললেন, অদৃষ্ট জানেন।

রাজকন্যা রত্নমালা বালিকা বয়েস থেকেই একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতেন গন্ধর্বের মতো সুন্দর ইন্দ্রের মতো পরাক্রান্ত এক দিগ্বিজয়ী রাজার গলায় মালা দিচ্ছেন। নীলরাজ্যের উদাসী রাজপুত্রের কয়েকটি কথায় তাঁর সেই স্বপ্ন আকাশের রামধনুর মতো মিলিয়ে গেল। কী আশ্চর্য সব কথাই না রাজপুত্র লোকনাথ শোনালেন! সবচেয়ে বড় হতে গেলে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে উঁচু হতে গেলে সবচেয়ে নীচু হতে হয়, এ কথা আগে কারো মুখে শোনেননি। সৃষ্টির জননী মাটি। সব অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে মাটির মতো হতে পারলে আকাশের নমস্কার পাওয়া যায়। যে চায় সে ভিক্ষুকের মতো এককণা পায়। যে চায় না, শুধু দেয়, তার জীবন ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে। এসব কথা বুকে আঁকড়ে ধরে যুগ যুগ বেঁচে থাকা চলে। স্বয়ম্বর সভা ছেলেখেলা বলে মনে হয়।

শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর যেদিন রত্নগিরির রাজসভায় এলেন, সেদিন সন্ধ্যারাতে রাজমন্দিরে দেবতার আরতি শেষ হলে রত্নমালা রাজার বিরামকক্ষে ঢুকে রাজাকে প্রণাম করলেন। রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন, রাজকন্যা! কোনো প্রার্থনা আছে?

রত্নমালা বললেন, মহারাজ! জীবন সলতের আগুনের মতো। এই আছে এই নেই। ভয় হয়, রাজপুত্র লোকনাথের শেষকথা শোনার আগে নিভে না যাই।

রাজা রাজকন্যার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ওকথা বোলো না মা। কী চাও বলো।

রত্নমালা বললেন, পিতা অনুমতি দিন আমি রাজপুত্র লোক-নাথের সন্ধানে বার হই।

রাজার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটলো। পরে বললেন, বেশ। রথ সাজাতে আদেশ দিচ্ছি। একশত রক্ষীকে তৈরী হতে হুকুম দিচ্ছি। তারা তোমাকে অনুসরণ করবে। রত্নমালা বললেন, রাজ-পুত্র একা গিয়েছেন। আমিও একা যেতে চাই। এ বিষয়ে তাঁর কাছে হার মানতে রাজী নই।

রাজা বললেন, তা হয় না মা। তুমি রত্নগিরির বুকসেঁচা ধন রাজকন্যা! তোমার উপর অনেকের লোভ। তা ছাড়া শস্ত্রপাণিকে আমি বিশ্বাস করি না।

রাজকন্যার ম্লান মুখ দেখে রাজা বললেন, বেশ। তুমি একাই যাবে। রক্ষীরা তফাতে থেকে তোমাকে অনুসরণ করবে।

রত্নমালা রাজপুত্রের খোঁজে বার হবার পর ছ মাস কেটে গেল। রাজপুত্রের নিশানা কেউ দিতে পারলো না। সহর, গ্রাম, অরণ্য, রাজধানী যেখানেই যান লোকনাথের বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ তাঁকে দেখেছে কি না। কেউ বলে হ্যাঁ, কেউ বলে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদয়াস্ত পথ চলেও নিশানা মেলে না। পথ-চলা পণ্ডশ্রম হয়। রাজপুত্রের দেখা মেলে না।

শেষে একদিন একটা শহর পার হয়ে রাজকন্যা এক বিশাল প্রান্তরে এলেন। দূরে মেঘের মত ঘন নীল অরণ্য। তার ছায়ায় কয়েকটি কুটিরের একটি গ্রাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয় হয়। গ্রামে উৎসবের ধুমধাম। বাঁশীর সুরে তাল দিয়ে মাদল বাজছে। কারা নাচছে গাইছে। মশালের আলোয় আকাশ লাল হয়ে অন্ধকার রাতের মাথায় আগুনের ছাতা ধরেছে।

রাজকন্যা গ্রামের কাছে এসে দেখলেন একদল লোক কী এক বিষয় নিয়ে জটলা করছে। রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, এ গ্রামে এত ধুমধাম! কী ব্যাপার?

মাতব্বর গোছের একটি লোক বলল, শুনলে বিশ্বাস হবে. না। এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

রাজকন্যার চোখেমুখে কৌতূহল লক্ষ্য করে লোকটি বলল, কলিযুগে যা অসম্ভব তাই হয়েছে। এক সাধু একটি খোঁড়া ছেলেকে সারাতে গিয়ে নিজের একটি পা কেটে দান করেছেন। কারো নিষেধ শুনলেন না। বললেন, আমি দিতে চাই। বাধা দিও না। আমার পায়ের হাড় বার করে নিয়ে ওর পায়ে জুড়ে দাও। ও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে, হাঁটবে, ছুটবে, জীবনের আনন্দ প্রাণভরে পান করবে।

রাজকন্যার বুক ধুক করে উঠল। দিতে চাই এ কথা পৃথিবীতে কে আর বলতে পারে! রাজকন্যা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, সাধুকে তুমি স্বচক্ষে দেখেছো?

লোকটি বলল, দেখিনি? সাধু বলে মনে হবে না। সাধু না হয়ে রাজপুত্র হলে মানাতো ভালো।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রাজকন্যা একটা বড় পাথরের উপর বসে পড়লেন। তাঁর দুচোখে অশ্রুর বান ছুটলো। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সাধু কোথায়?

ঐ পাহাড়ের চুড়োয়, বলে লোকটি রাতের আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মতো একটি পাহাড় দেখিয়ে দিল।

রাজকন্যাকে দুহাতে মাথা চেপে কাঁপতে কাঁপতে পাথরের উপর বসতে দেখে রক্ষীরা ছুটে এল। প্রধানরক্ষী বলল, রাজকন্যা! আপনি অসুস্থ। রথে উঠুন। রাজ্যে ফিরে চলুন।

না, না, বলে রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন। অদূরে পাহাড়চুড়ো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে ওখানে নিয়ে চলো।

প্রধানরক্ষী বলল, এই রাতে ঐ পাহাড়চুড়োয়?

রাজকন্যা বললেন, হ্যাঁ। এখনই। একমুহূর্ত বিলম্ব নয়।

প্রধানরক্ষী হাতজোড় করে বলল, দুর্গম পথ। অজানা দেশ। সাহস হয় না রাজকন্যা।

রাজকন্যা বললেন, পথ যত দুর্গম হোক, যেতেই হবে। তোমরা যেতে সাহস না পাও আমি একাই যাবো।

সম্মুখে রক্ষী, পিছনে রক্ষী, ডাইনে বাঁয়ে দু পাশে রক্ষী, রাজকন্যা অন্ধকার রাতে বিপদসঙ্কুল পথে পাহাড়চুড়ো লক্ষ্য করে এগোলেন।

দীর্ঘকাল রাজকন্যা রত্নমালার কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে রত্নগিরির রাজা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হলেন। কোথায় যান, কার কাছ থেকে পথের নিশানা নেন, সাত পাঁচ ভেবে রত্ন-গিরির রাজা লোকলস্কর নিয়ে নীলরাজ্যে উপস্থিত হলেন। সকলকে রাজ্যের প্রান্তে অপেক্ষা করতে বলে রাজা একা রথ হাঁকিয়ে রাজধানীতে ঢুকলেন।

রাজধানীতে ঢুকে রাজার মনে হল রাজ্যে বড় রকমের একটা ঘটনা ঘটছে, কিম্বা ঘটতে যাচ্ছে। ঘর খালি করে রাজ্যের লোক রাজপথে বার হয়ে এখানে সেখানে জটলা করছে।

রাজা কাউকে কোনো প্রশ্ন না করে প্রাসাদে গেলেন। প্রাসাদ শূন্য। শুনলেন রাজা ও রানী রাজমন্দিরে গিয়েছেন। রত্নগিরিরাজ রাজমন্দিরের দিকে রথের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চললেন। মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন মাথার পর মাথা। চারিদিকে জনসমুদ্র।

রাজা রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চললেন। তাঁর রাজসুলভ চেহারা ও চালচলন দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। রাজা মন্দিরের সোপান বেয়ে উঠে নীলরাজ্যের রাজা বিশ্বনাথ ও রানী পার্বতীকে নিজ পরিচয় দিয়ে অভিবাদন করলেন। বললেন, রাজপুত্র লোকনাথের খোঁজে ছমাস হল রত্নমালা বেরিয়েছে। কোনো খবর নেই। অপেক্ষা করতে না পেরে বার হয়ে পড়েছি। কোন্ দিকে যাবো স্থির করতে না পেরে ভাবলাম নীলরাজ্য হয়ে যাই। যদি কোনো নিশানা পাই।

রাজা বিশ্বনাথ ও রানী পার্বতী মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। পরে রাজা বিশ্বনাথ বললেন, মহারাজ! রাজপুত্রের জন্মের রাতে দেবতা স্বমুখে আমাকে বলেছিলেন তাঁর কানে বড় হবার মন্ত্র দিতে। কাল রাতে পুজারী স্বকর্ণে দেবতার আদেশ শুনেছেন, আজ রাতে শুভ লগ্নে দৈববাণী সফল হবে। দেবতা নিজ মুখে সংবাদ দেবেন।

রত্নগিরির রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, মন্দিরের দুয়ার বন্ধ কেন?

রাজা বিশ্বনাথ জবাব দিলেন, যখন তিনি কথা বলবেন মন্দিরের কপাট নিজে থেকে খুলে যাবে।

রত্নগিরিরাজের শরীর রোমাঞ্চিত হল। তারপরই তাঁর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হল। বললেন, রাজপুত্র লোকনাথের খবর পাবো। কিন্তু রত্নমালার খবর কে দেবে?

রাজা বিশ্বনাথ কী ভেবে বললেন, আশায় বুক বাঁধুন মহারাজ! রাজকন্যা রত্নমালা লোকনাথের সন্ধানে বার হয়েছেন। লোকনাথের সংবাদের সঙ্গে রত্নমালার সংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

কখন দেবতা কথা বলেন তারই প্রতীক্ষায় জনসমুদ্র কান পেতে রইল। মন্দিরে সকলে মুহূর্ত দন্ড প্রহর গুনতে লাগল। বিশ্বনাথ, পার্বতী ও রত্নগিরির রাজার উৎকণ্ঠা সহ্যের সীমা ছাড়াতে চলল। হঠাৎ এক সময়, সূর্য তখন অস্ত গেছেন, এক এক করে সন্ধ্যার তারারা আকাশে ফুটেছে, মন্দিরের কপাট খুলে গেল, মন্দিরের ভিতর সকালের আকাশের মতো আলোর স্রোতে ভেসে গেল। দেবতার গম্ভীর কণ্ঠ মন্দির ভরে দিয়ে বাইরে জন-সমুদ্রের কানে এসে বাজলো।

দেবতা বললেন, রাজা! আজ শুধু নীল রাজ্যের নয়, সারা পৃথিবীর আনন্দের দিন। হেমাগিরি শ্যামগিরি রাজ্য ছাড়িয়ে এক মহা অরণ্যের শেষে পাহাড়চুড়োয় রাজপুত্র লোকনাথ দৈববাণী সফল করেছেন। তার চেয়ে বড় পৃথিবীতে আজ কেউ নেই। আপনারা সকলে যান। তাঁকে দেবতার সম্মান দিয়ে নিয়ে আসুন। তিনি এলে আমি তাঁকে স্বয়ং রাজমন্দিরে গ্রহণ করব।

জনসমুদ্র স্তব্ধ হয়ে দেবতার কথা শুনলো। তারপর রথ অশ্ব সাজিয়ে রাজা বিশ্বনাথ ও রত্নগিরিরাজ বিশাল জনতার আগে আগে পাহাড়চুড়ো লক্ষ্য করে চললেন।

মশালের আলোয় দুর্গম পাহাড়ী পথে এক পা দু'পা করে এগিয়ে রক্ষিদল নিয়ে রত্নমালা যখন পাহাড়চুড়োয় পৌঁছলেন, তখন মাঝরাতে আকাশে একখানা বাঁকা চাঁদ উঠেছে। সেখানে একফালি সমতল জমি। সেখানে একা কে নীরবে শুয়ে আছে বুঝতে রত্নমালার দেরী হল না। চোখের জল চাপবার চেষ্টা করে

রত্নমালা ছুটে গিয়ে লোকনাথের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে বললেন, এ কী সর্বনাশ করেছ রাজপুত্র! দিতে হলে কি এমন করে দিতে হয়?

লোকনাথ ম্লান হেসে বললেন, হ্যাঁ রাজকন্যা। পাহাড়চুড়োয় ধ্যানে বসেছিলাম। আমাকে সাধু ভেবে পাহাড়ীরা ছেলেটিকে নিয়ে এল। ভেবেছিল দৈববলে তার খোঁড়া পা ঠিক করে দেব। সঙ্গে বৈদ্য ছিলেন। বললেন, সুস্থদেহের নিখুঁত অস্থি পেলে চেষ্টা দেখা যায়। নিতে চায়নি। আমি নিতে বাধ্য করেছি। ছেলেটি শুনলাম উঠে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে উৎসব হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও তার বাপ মা এখানে ছিল। আমাকে ফেলে যেতে চায়নি। বললাম, যাও। আনন্দ করো গিয়ে। তাও যেতে চায়নি। জোর করতে কিছুক্ষণ আগে গিয়েছে।

রত্নমালার দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো। বললেন, রাজপুত্র তোমাকে নিয়ে এখন কী করি?

কাটা আধখানা পা দেখিয়ে লোকনাথ হেসে বললেন, স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করো। সেদিন কথায় প্রমাণ দিয়েছিলাম। আজ চাক্ষুষ প্রমাণ দেব।

চোখের জল মুছতে মুছতে রত্নমালা বললেন, তাই করব।

রাজা বিশ্বনাথ ও রত্নগিরিরাজ তাঁদের বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছবার আগেই ঝড়ের বেগে দুখানা রথ হাঁকিয়ে শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর পাহাড়ের তলায় পোঁছেছিলেন। তারপর দুজনে মৃত্যুপণ করে কাঠবেড়ালীর মতো অবলীলাক্রমে খাড়াই পথ বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চুড়োয় উঠেছিলেন। তাঁদের দেখে রত্নমালার মুখ কঠোর হয়ে উঠেছিল।

শস্ত্রপাণি রাজকন্যার মনের কথা বুঝে নিয়ে বলেছিলেন, রাজকন্যা! আমরা রাজপুত্র। লোভী হতে পারি। হীন হতে পারি না। আজ হার মানতে এসেছি। মহাবীর মহাত্যাগী লোকনাথকে আমি ও শ্রীশঙ্কর বয়ে নিয়ে যাবো। বাধা দেবার চেষ্টা করলে জোর খাটাতে বাধ্য হব।

শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর তাঁদের গায়ের বহুমূল্য আভরণ খুলে নিয়ে রাজশয্যা তৈরী করলেন। সযত্নে লোকনাথকে শয্যায় শুইয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে দুই রাজপুত্র পাহাড়ী পথে দ্রুত নেমে চললেন।

পরদিন রাতে এক বিরাট মিছিল নীলরাজ্যের রাজধানীতে ঢুকলো। সকলের আগে শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর। রাজশয্যায় লোকনাথকে বয়ে আনছেন। তাঁদের পিছনে রত্নমালা। তাঁর এক পাশে রাজা বিশ্বনাথ, আর একপাশে রত্নগিরিরাজ। পিছনে বিশাল জনতা। রাজধানীর সব ঘরের কপাট খুলে গেল। জনতার বুকফাটা জয়ধ্বনিতে আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠলো।

মন্দিরের সোপান বেয়ে উঠতে গিয়ে শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর থেমে গেলেন। মন্দিরের কপাট খুলছে। ভিতর চোখ ধাঁধানো আলোয় উজ্জ্বল। কিন্তু একি? এ কি স্বপ্ন না ছলনা? বিরাট দেবমূর্তি বেদী থেকে নেমে এসেছেন। খোলা কপাট দিয়ে মন্দিরের বিশাল চত্বরে রাতের আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবতার ইঙ্গিতে শস্ত্রপাণি ও শ্রীশঙ্কর লোকনাথকে বয়ে সন্তর্পণে সোপান বেয়ে উঠলেন। দেবতার মুখ আনন্দে করুণায় ও হাসিতে ভরে গেল। মাথার পবিত্র মুকুট খুলে নিয়ে রাজপুত্র লোকনাথের মাথায় পরিয়ে দিলেন। তারপর সযত্নে রাজশয্যা থেকে লোকনাথকে কোলে তুলে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেবতার কথা স্পষ্ট শোনা গেল, মন্দির চিরকালই মানুষের। দেবতা তার প্রতিনিধি মাত্র। আজ মানুষের মতো মানুষ পেয়ে মন্দির ধন্য হল।

অমিতাভ

১

আতা গাছে তোতা পাখি
তালিম দিচ্ছে বৌ,
লনডনে সে নাচতে যাবে
পুরুলিয়ার ছৌ।
পুরুলিয়ার ছৌ না-রে,
কথাকলির লাফ,
লাফের চোটে তুর্কি নাচন
হাঁপ ধরে রে বাপ।
তুর্কি নাচন যখন হলো
ট্যাংগো ফক্সট্রট,
পা পিছলে হাসপাতাল,
বিলাত যাওয়া নট।

২

কী হৈল কী হৈল?
রাজস্থানে গুড়ুম গুড়ুম,
তৈরি হইল শৈল।
নিদ্রা ছাড়ি পাকিস্তান
আমেরিকায় কইল—
“হম ভি এটম ফাটাউঙ্গা
দাও কিঞ্চিৎ তৈল।”

৩

দন্ত্য এবং মূর্ধা যখন
উচ্চারণে না-লভ্য,
বাসকে তিনি ‘বাশ’ বলেছেন,
বেশ বলেছেন তালব্য;
কিন্তু সেটা মানতে নারাজ
মদনমোহন মালব্য।

৪

বন্ধু ডাকলে ভরদুপুরে
ডালহাউসির বাসে.
পেটকাটা আর চুলছাঁটা সব
শাঁকচুন্নি আসে।
কনডাকটার ভাড়া নিতে
যেইনা এলো পাশে,
পেটকাটারা চেঁচিয়ে বলে—
—"পার্লে ভূ ফ্রাঁসে?

৫

মার্জার কহে "প্রিয় মার্জারী
শিখে গেছি চৈনিক সার্জারী।
হাতে নেব সুঁচ দুটো
মগজ করবো ফুটো
শহীদ হবার দায় ভার্যারই।"

৬

অর্থনীতির অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ পাঁজার
বুকপকেটে থাকে টাকা, থলিভরতি বাজার।
একটি বছর গেল কেটে,
বাজার এল বুকপকেটে
এবং থলির মধ্যে থাকে টাকা হাজার হাজার।

ছবি এঁকেছে তমাল মৈত্র ॥ ৭ বছর

সিনেমার অভিনয়

লেখা ও রেখা সিদ্ধার্থ সরকার

৫
নাও, নাচো। আই লাভ ইউ
৬
খুব লাফাও, ঝাঁপাও
জল
জল
৭
উঃ মাগো। জল ছিল নাকি ?
৮
জল। জল।
৯
নাও, উঠে পড়ো।
হাতীটা কই ?
১০
ক্যামেরা রেডি

১১
ওমা ! হাতীটা আবার কথা বলে যে !
ভ্যা ! ভ্যা !
১২
সাইলেন্স ! টেকিং হবে
১৩
একি ! একি !
ইস্ ! আমার কোমর ভেঙে গেল
১৪
কে আছ ? আমার চেন ধরে টান মারো
১৫
কেমন জব্দ ! আমি হাতী সেজেছিলাম দাদা
১৬
তুই ? সমীর ?
হ্যাঁ ।

১৭
দাদা, ক্যামেরাটা যে ভেঙে গেল।
তাতে কি হয়েছে।
১৮
আমি তোমায় একটা ভাল ক্যামেরা কিনে দেবো
১৯
কেঁদনা সমীর। কাঁদার কিছু নেই
২০
বাবু আপনাদের খেতে ডাকছেন
২১
চল, বাড়ি যাই। ছবি তোলা খুব হোল
২২
শেষ।
The end
Thak you god for the word so sweet

দানো বাঘ

মনোজ বসু
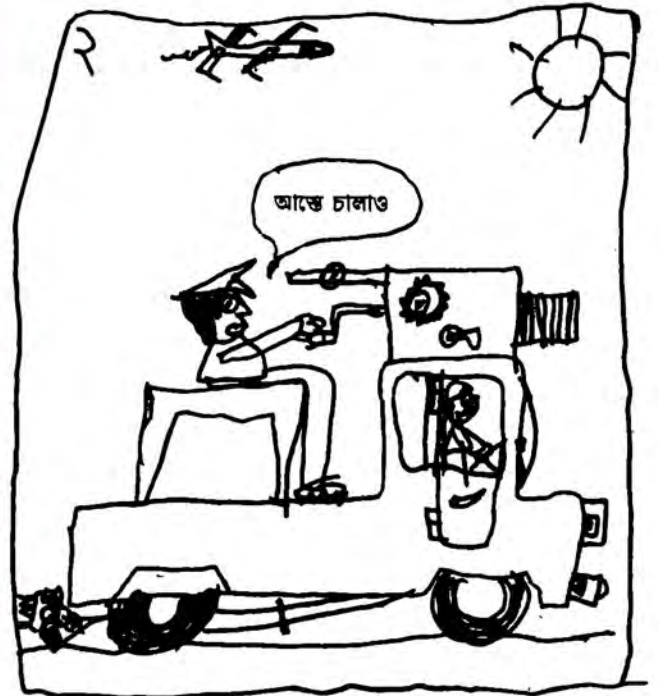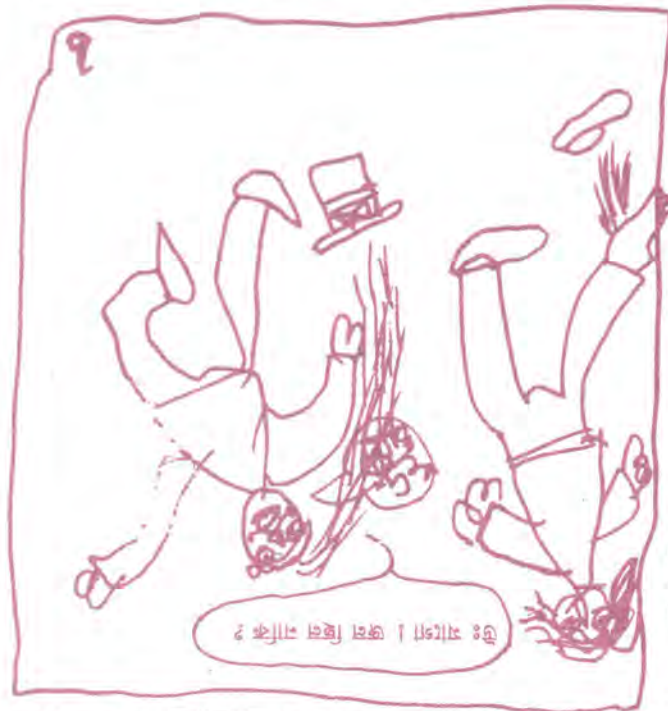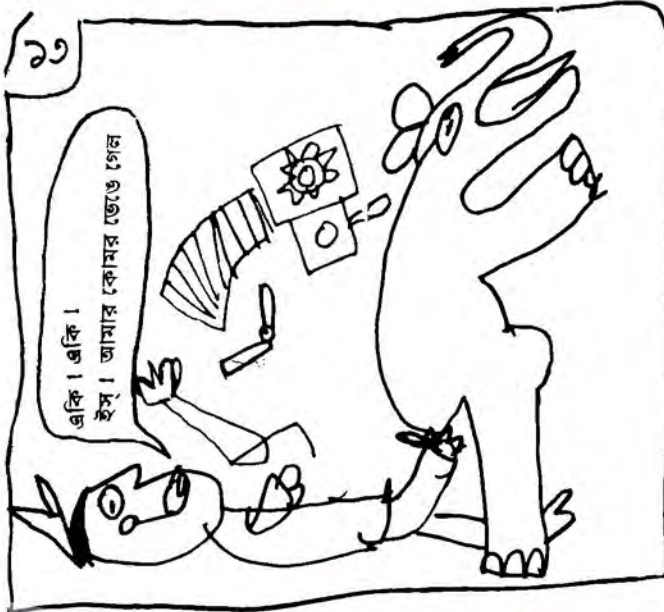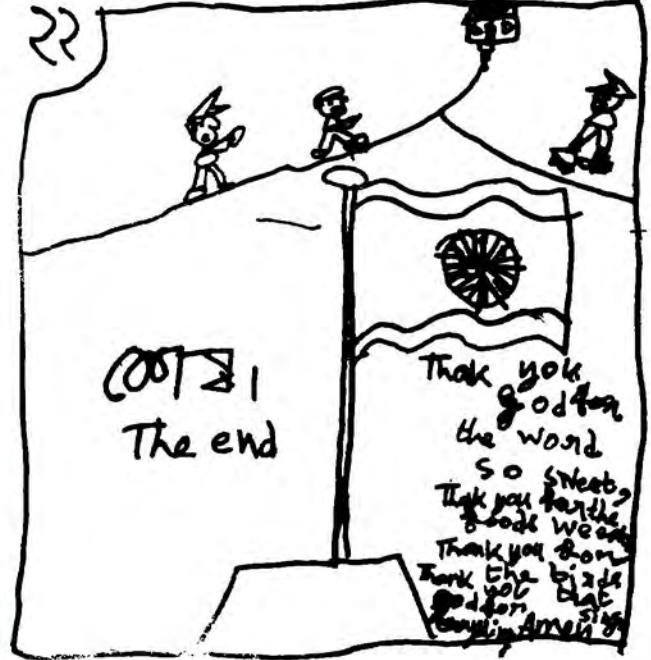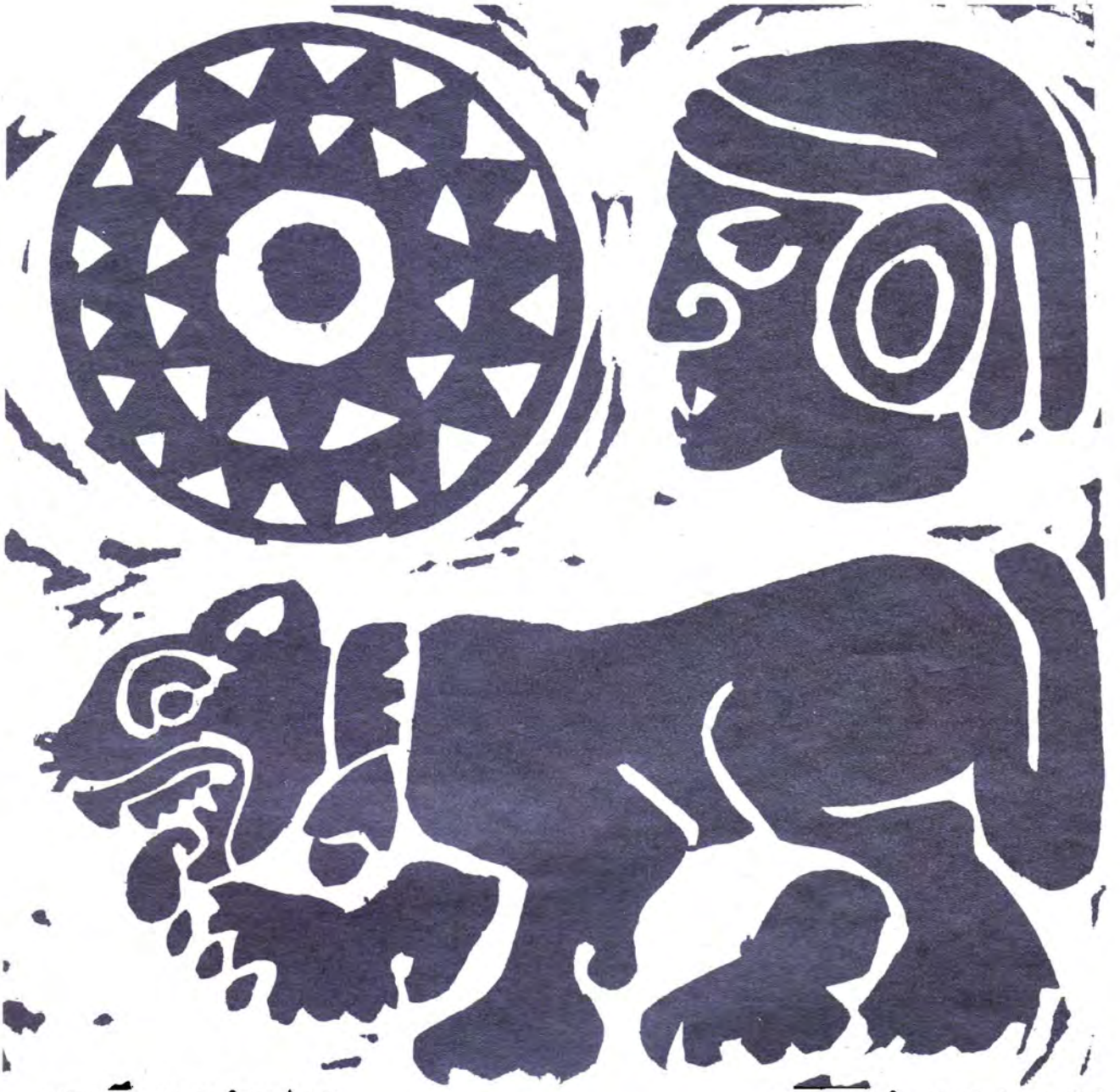
নানান রকমের বাঘ, বিদঘুটে সব নাম। হেঁড়েল বাঘ, ঘড়েল বাঘ, হুমদো বাঘ, মামদো বাঘ, হন্যে বাঘ, কেন্নো বাঘ, কাঁকড়া বাঘ, কুতকুতে বাঘ—কত আর বলি। আর আছে দানো বাঘ—খুশিমতন মানুষ সাজে তারা, মানুষের মতন কথা-বার্তা।

শিকারী অনন্ত ঢালির এ-দেশ-সে-দেশ নাম—দুর্জয় সাহস। জেদ চাপল, অনেক রকমের বাঘ তো মেরেছি এবারে একটা-দুটো দানো মেরে আনব। দুকড়ি মাঝির সঙ্গে চেনা-পরিচয় আছে। সুন্দরবনে হেন জিনিসই নেই যা দুকড়ি জানে না। বুড়ো হয়ে গিয়ে নৌকো বাওয়া ছেড়েছে—গাঁ-গ্রাম শেষ হয়ে যেখানটা জঙ্গলের আরম্ভ, সেই-খানে তেমাথা পথের উপর ঝিম হয়ে বসে থাকে। নিজেও সে এক তেমাথা। তোমার আমার একটা করে মাথা, দুকড়ির মাথা তিনটে—পর পর সাজানো। বুড়ো হয়ে গিয়ে মাথা কাঁপে। সেইজন্য সে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়। হাঁটু দুটো দূর থেকে আলাদা দুই মাথার মতন দেখায় অবিকল।

দুকড়ির কাছে সবিস্তারে জেনে অনন্ত জঙ্গলে ঢুকে গেল। যেতে হবে বেশ খানিকটা দূর—সেই কেওড়াডাঙা ছাড়িয়ে। গেছে তো গেছে—অনন্তর পাত্তা নেই।

অনন্তর ছেলে অর্জুন—তোমাদেরই বয়সী। ডানপিটে—বন্দুকে খুব ওস্তাদ, বাপের কাছে শিখেছে। সে বেরিয়ে পড়ল: দানো বাঘ মারব—কোথায়

আছেন বাবা, উদ্ধার করে আনব।

হাতে বন্দুক, বগলে পুঁটলি—হাঁটছে অর্জুন, হাঁটছে। দরকারী এটা-সেটা পুঁটলিতে বেঁধে নিয়েছে। খাবার জন্য মা গুড়ের নাড়ু আর মর্তমান কলা দিয়েছেন, তা-ও নিয়েছে পুঁটলির মধ্যে। দুকড়ি মাঝির দেখা মিলল, তেমনি সে তেমাথা হয়ে বসে আছে।

গড় করল অর্জুন। 'দাদু' ডেকে মিষ্টি কথায় ভাব জমাচ্ছে। নাড়ু কয়েকটা এগিয়ে ধরে বলে, খান দাদু—

দুকড়ি খিঁচিয়ে উঠলঃ দাঁত আছে নাকি যে নাড়ু খেতে দিস?

তা বটে, তা বটে! হুঁশ হল অর্জুনের, নাড়ু রেখে তাড়াতাড়ি কলা বের করল। খোসা ছাড়িয়ে কলা ভেঙে ভেঙে হাতে দেয়, দুকড়ি কোঁৎ কোঁৎ করে গেলে।

খেয়ে-দেয়ে প্রসন্ন মুখে শুধায়ঃ কে তুই?

অনন্ত ঢালির ছেলে। দানো বাঘ মারব, বাবা নিখোঁজ—তাঁকে খুঁজে আনব। কেওড়াডাঙার পথটা যদি ভাল করে বাতলে দেন।

এক ফোঁটা দুধের বালক—তুই যাবি কেওড়াডাঙা, তুই মারবি দানো বাঘ? আম্বা দেখে বাঁচিনে।

খলখল করে বুড়ো দন্তহীন মাড়িতে হেসে উঠল। অর্জুনের অভিমানে লাগে। দেখুন তা হলে—বলে বন্দুক তুলে দুম করে মারল। উঁচু মগডালে পাখির বাসা—গুলিতে বাসা ভুঁয়ে পড়ল, ডালে এতটুকু নাড়া লাগে না।

সগর্বে অর্জুন বলে, দেখলেন? বাবা আমায় হাতে করে শিখিয়েছেন।

এইটুকুতে কি হবে রে? খুশি নয় দুকড়ি, সেই গাছেরই দিকে সে আঙুল দেখালঃ ওদিককার ডালে ঐ যে রাঙা-রাঙা কচিপাতা—এক বোঁটায় পাঁচটা-ছ'টা পাতা—গুলিতে শুধুমাত্র একটা পাতাই পড়বে, বাকি সব যেমন-কে-তেমন বোঁটার উপর থাকবে।

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলল।

দুকড়ি বলে, দেখে নে আগে খুব ভাল করে। ছোঁড়ার সময় আমার দিকে তাকাবি, পাতা দেখতে পাবি নে।

করল তাই। পাতা একটাই পড়ল, আর একটার ছেঁড়া একটু অংশ। দুকড়ি 'দুত্তো' 'দুত্তো' করে উঠলঃ ফেল। এমন কাঁচা হাতে দানো বাঘ মারা যায় না। এই পরীক্ষা তোর বাবাকেও দিয়েছিলাম, সে পেরেছিল। তবু বেচারা ফিরতে পারে নি। তুই তবে কোন্ সাহসে যাবি?

অর্জুন ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, দুচোখে টপ টপ করে জল পড়ছে। দুকড়ি প্রবোধ দিয়ে বলে, ছেলেমানুষ—উতলা হবার কি আছে? বাড়ি গিয়ে হাত দুরস্ত করগে। আবার আসিস, তখন দেখব।

ফিরে গেল অর্জুন, উপায় কি। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সর্বক্ষণ বন্দুক নিয়ে আছে। মাস ছয়েক পরে আবার দুকড়ির কাছে উপস্থিত। আমের সময়, পুঁটলিতে মা আম দিয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে চাকু দিয়ে টুকরো কেটে কেটে হাতে দিচ্ছে, জিভের উপর নেড়ে-চেড়ে বুড়োমানুষ গিলে ফেলছে। উপাদেয় আম, হাসি আর মুখে ধরে না। শুধায়ঃ যাবি তবে দানো মারতে?

অর্জুন বলে, হাত কেমনটা হল দেখে নিন।

ঘন জঙ্গল, ঘুঘু ডাকছে তার মধ্যে। দুকড়ি বলল, ঘুঘুটা মারতে হবে। উঠবি নে, চোখে দেখবি নে—কানে আওয়াজ পাচ্ছিস, তাই থেকে নিশানা ঠিক করে নে।

গুলি করল অর্জুন। তাই তো, পেরেছে এবার। গুলি-বেঁধা ঘুঘু ঝোপের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। 'সাবাস', 'সাবাস' করে ওঠে দুকড়ি। বলে, সার্থক বন্দুক ধরা শিখেছিস। কেওড়াডাঙার পথ বলে দিচ্ছি, ভাল করে বুঝে সমঝে নে—

কেওড়াডাঙাতেই শেষ নয়, এগোতে হবে। ডাগর খাল একটা, দুধারে ঠাসা গোল ঝাড়। মাঝে-মধ্যে নৌকো এসে পড়ে, দ্রুতহাতে গোলপাতা কেটে নৌকো বোঝাই দিয়ে পালায়। কিছু জেলের বসতিও আছে। জলায় দেদার মাছ—মাছের লোভে প্রাণ হাতে করে তারা থাকে। দানো বাঘের আসল আস্তানা খালের ওপারে—তবে এপারেও যে আসে না, এমন নয়।

যাচ্ছে অর্জুন, যাচ্ছে। পথ দুর্গম—কোথাও জলা, কোথাও ঝোপ-জঙ্গল। এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। অবশেষে সেই জায়গা—বড় বড় আট-দশটা কেওড়াগাছ। কেওড়াডাঙার আরম্ভ। ভয়ের জায়গা, খুব সাবধানে চলাফেরা এবার থেকে—দুকড়ি পই-পই করে বলে দিয়েছে।

ক্লান্ত, ক্ষিধেও পেয়েছে দারুণ। একটা গাছের গোড়ায় অর্জুন বসে পড়ল। বন্দুকটা পাশে ঠেসান দিয়ে পুঁটলি খুলে দেখে, দুটো আম আছে এখনো। খোসা ছুলে একটা খাচ্ছে, গাট্টাগোট্টা মাঝ-বয়সী এক পুরুষ কোন্ দিক দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। লোলুপ চোখে চেয়ে চেয়ে আম খাওয়া দেখছে। সকাতরে সে বলল, আছে-টাছে আর? আম কত দিন যে চোখে

দেখিনি। পুরো না হল, একটু চাকলা কেটে দাও বাবা, তোমার আম থেকে।

পচে উঠেছে আম, রাখা যাবে না, এখনই বিস্বাদ লাগছে। অর্জুন বাকি আমটা দিয়ে দিল। মহানন্দে সে খাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, আঁটি চুষছে লোকটা, সরু সরু দাঁত—এ দাঁত মানুষের হয় না, বাঘের। আর দেখতে হবে না—দানো বাঘ, মানুষের মূর্তিতে। বন্দুক তুলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি। আর মানুষ নেই—গর্জনে বন কাঁপিয়ে প্রকাণ্ড বাঘ ধরাশায়ী হল। এ জায়গায় মুহূর্ত আর নয়, দৌড়, দৌড়—

পথ-ঘাট কিছুই জানে না—এদিকে যায়, সেদিকে যায়। আর পারে না, পড়ে পড়ে হাঁফাচ্ছে এক জায়গায়। গড়িয়ে পড়েছিল—পায়ের শব্দ পেয়ে ধড়মড় করে উঠল। ছোকরা একজন, হাতে লম্বা আঁকশি, তালগাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আঁকশি দিয়ে ফল পাড়বার চেষ্টায় আছে। তাকিয়ে দেখে, কী আশ্চর্য, কাঁদি কাঁদি সোনার বরণ সুপক্ক আনারস ফলেছে। কয়েক টুকরো আম খেয়েছিল অর্জুন, ছোটা-ছুটিতে কখন তা হজম হয়ে গেছে। আনারস দেখে পেট চনমন করে উঠল। বলে, আমায় একটা দিও, দাদা।

কি?

ঐ যে আনারস পাড়ছ।

আনারস বুঝি গাছের মাথায় ফলে?...উজবুক!

গালাগালিতে অর্জুনের রাগ হয়েছে। গরম হয়ে বলে, তালগাছে ঐ আনারস —চোখেই তো দেখছি।

ছোকরা বলল, তালগাছ নয়, আনা-রসও নয়। সঞ্জীবনগাছে সঞ্জীবন ধরেছে। ও ফল খেতে পারবি নে, উৎকট তিতো। আমার বাবা, দেখলাম মরে পড়ে আছেন। সঞ্জীবনের রস খানিকটা মুখে ঢুকিয়ে দিলে জ্যান্ত হয়ে লাফিয়ে উঠবে। কিসে মরেছেন, তখন শুনতে পাবো।

কী শক্ত বোঁটা যে সঞ্জীবনের—আঁকশি দিয়ে প্রাণপণে টানছে, ফল ছিঁড়ে পড়ে না। অর্জুনের নজর পড়ল আঁকশি-ধরা হাতের দিকে। হাত নয় রে, বাঘের থাবা। বাঘ ফল পাড়তে ব্যস্ত—এমন সুযোগ হেলা করে! গুড়ুম। ছোকরা মানুষ পলকে পালটে গিয়ে তাগড়াই বাঘ। লাফ দিল, কিন্তু অর্জুনকে নাগালে পেল না। মুখ থুবড়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ল।

অর্জুন চলেছে। বহুদূর চলে গেল। পরমাসুন্দরী মেয়ে, চমৎকার এক-খানা শাড়ি-পরা, কুয়ো থেকে জল তুলছে। অর্জুন বলে, আমায় একটু জল দাও দিদিমনি, তেষ্টা পেয়েছে।

বিষাক্ত জল, খাওয়া যায় না—। মেয়েটা ঘাড় নেড়ে দিল। বলে, গায়ে ছিটিয়ে দিলে মরা বেঁচে ওঠে। আমার বাপ-ভাই মারা পড়েছে—কিসে কি হল, জানি নে। তাড়াতাড়ি গিয়ে জল ছিটাব। সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর এতে কাজ দেবে না।

কলসি কাঁখে তুলে যেই না মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, শাড়ির তলা থেকে দীর্ঘ এক লেজ বেরিয়ে পড়ল। গুড়ুম। বাঘের মেয়ে পড়ে গেল মাটিতে, কাঁখের কলসি ভেঙে শত-চুর।

সন্ধ্যা আসন্ন। ছুটে চলেছে অর্জুন। সামনে খাল, দু-ধারে গোলঝাড়। এই খালের কথাই দুকড়ি বলেছিল। খর-স্রোত—কুটোগাছটি ফেললে বোধ করি দুই খণ্ড হয়ে যায়।

মস্ত বড় মাটির গামলা স্রোতে ভেসে আসছে, লোক বসে আছে উপরে। লোকটা এই কায়দায় পার হয়ে এসে উঠল। এসেই গামলা উপুড় করে মাথায় তুলে নিচ্ছে। অর্জুন হাঁ-হাঁ করে উঠলঃ থাকুক ওটা মুরুব্বি মশায়, আমি ওপারে যাবো।

লোকটা বলে, কবিরাজ আমি। এপারে-ওপারে রুগী—হামেশাই পারা-পার হতে হয়। গামলা কখনো বেহাত করিনে।

আপনিই তবে পার করে দিন।

তা বই কি! খিঁচিয়ে উঠল কবিরাজঃ আমার তিন মক্কেল মরে পড়ে আছে। বিশল্যকরণী লতা আনতে ওপার গিয়েছিলাম। লতা বুলিয়ে বাঁচাব। সকলের আগে সেই কাজ।

অর্জুন লক্ষ্য করেছে, কবিরাজের লম্বা কান, সরু সরু গোঁফ। ইনিও বাঘ, সন্দেহ কি! গুলি। বাঘ মরে গেল।

রাত হয়েছে। এখন খাল পার হওয়া ঠিক নয়। রাত্রিবাস এখানেই—কোন এক গাছের উপর। পুঁটলি খুলে অর্জুন গামছা বের করে নিল। ডালে শুয়ে নিজেকে গামছা দিয়ে বাঁধবে সেই ডালের সঙ্গে, ঘুমের ঘোরে তলায় না পড়ে যায়। কবিরাজ বিশল্যকরণী আনছিল, সাবধানে সেটা ডালের উপর রাখল। দানো বাঘ চার চারটে শিকার হয়ে গেছে, মনে ভারী স্ফূর্তি। এক ঘুমে রাত কাবার।

সকালে খাল পার হয়ে গেল। চারি-দিক গাছপালায় ঘেরা আধো-অন্ধকার একটা জায়গা। সেখানে মিশকালো রঙের বিশাল দেহ বাঘ। মানুষের মূর্তি নয়, একেবারে খাঁটি বাঘ বড় ঢিবির উপর সম্রাটের মতন বসে আছে। একতলার সমান উঁচু—বেশি বই তো কম হবে না। চওড়ার দিকটাও সেই অনুপাতে। ছেলেমানুষ অর্জুন বন্দুক বাগিয়ে গটমট করে এগোচ্ছে —সম্রাট-বাঘ হেসেই খুন। ঘসর-ঘসর ঘ্যাস-ঘ্যাস করাতে তক্তা-ফাড়াই-এর আওয়াজ তুলে হাসছে।

রেগেমেগে অর্জুন গুলি করল। কী আশ্চর্য, গুলি গায়ে লেগে ছিটকে পড়ে। হাসি বেড়ে যায়। গুলির পর

গুলি করছে, বেঁধে না। হাসির চোটে সম্রাট-বাঘ গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার পরে উঠল বাঘ জায়গা থেকে, মানুষের মতন দুখানা পায়ে টলতে টলতে অর্জুনের দিকে যাচ্ছে। সামনের পা হঠাৎ হাতের মতন বাড়িয়ে দিল। লম্বা করছে—লাটাই-এর সুতোর মতন হাত, দেখি, যত খুশি লম্বা করতে পারে। বাঁহাতে অর্জুনের টুঁটি ধরে শূন্যে তুলেছে, ডান হাতে বন্দুকটা কেড়ে মুখে পুরল। সজনে ডাঁটার মতন কচর-মচর করে চিবিয়ে বিস্বাদ লাগায় থু-থু করে ফেলে দিল। বন্দুক আর নেই—একতাল কাদার মতন হয়ে গেছে। অর্জুনকেই এবার টপ করে গালে ফেলল। ঐটুকু তো ছেলে, ওর আর চিবোবে কি—রসগোল্লার মতন গিলে ফেলল।

অর্জুন কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে নেমে যাচ্ছে। রেলগাড়িতে টানেলের মধ্য দিয়ে যেতে যেমন হয়। সড়াক করে পাকস্থলীতে গিয়ে পড়ল। ছোট-খাট একটা কামরার মতো মনে হচ্ছে। ঘোর অন্ধকার। দম আটকে আসে বড্ড। বাইরের আলো-হাওয়া ঢোকার পথ নেই, সেইজন্য। এ তো ভারী মুশকিল। চারিদিকে হাত বুলাচ্ছে জায়গাটার আন্দাজ নেবার জন্য। হাড়-গোড় ঠেকছে। সম্রাট ইতিপূর্বে এদের ভোজন করেছে হয়ত বা গিলে খেয়েছিল অর্জুনের মতোই। বেচারীরা তারপর দম আটকে মরেছে, জীর্ণ হয়ে গেছে ধীরে ধীরে, হাড়-গোড় কিছু পড়ে আছে। অর্জুনেরও এই গতি যদি না নিশ্বাস নেবার বন্দো-বস্ত করা যায়।

কী করবে এখন? মাথায় মতলব এসে গেল, পুঁটলি খুলে সেই আম-কাটা চাকু বের করল। পেটের সবচেয়ে নরম দিকটা বেছে নিয়ে চাকু দিয়ে সেখানে পোঁচাচ্ছে। ফুটো কেটে ফেলবে। ছোট্ট একটু ফুটো, আলো-হাওয়া ঢোকার পথ। উঃ, দেহ যেন লোহায় গড়ানো, কাটতে কি চায়! অর্জুনও নাছোড়বান্দা—কাটবেই। এ-ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

সামান্য জিনিস—সম্রাট-বাঘ গোড়ার দিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি। কী, না, কী—পেটের মধ্যে কি মশা ঢুকে পড়েছে, মশায় কামড়াচ্ছে? ক্রমশ যন্ত্রণা বাড়ল। তখন বউকে ডেকে বলে, পেটে কী রকম হচ্ছে। কবিরাজকে খবর দাও দিকি, এসে দেখে যাক।

বউ বলে, কবিরাজ কিসে লাগবে? বুড়ো হয়ে গেছ, সে তো তুমি মানবে না। কেবলই মাংস খাবে, আস্ত আস্ত জীব ধরে গিলবে। হজম হয় না, তাই যন্ত্রণা। দিন কতক এখন মাংস খাওয়া একেবারে বন্ধ। ফলমূল খাবে, আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সে কিছু কঠিন নয়। বনের গাছে গাছে বানর—সম্রাটের পেট কামড়াচ্ছে, বউ কিছু ফলের জোগাড় করতে বলল। এদিকে ফুটো বেরিয়ে গেল। বড় কষ্ট গেছে অর্জুনের, এলিয়ে পড়েছে। তবু যা হোক দম বন্ধ হয়ে মরবে না, তার উপায় হল। সামান্য আলোর রেশও আসছে।

বানরেরা গাদা গাদা ফল এনে ঢালছে সম্রাটের জন্য। আম-কাঁঠাল, জাম-জামরুল—রকমারী খাসা খাসা ফল। দু-হাতে সম্রাট টপাটপ পেটে চালান করে। অর্জুনের মজা—খিদেয় কাতর হয়ে শুয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল। কণ্ঠনালী বেয়ে ফল এসে পড়ে, মনের সুখে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়।

তখন ভাবে, নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকা যাবে ঠিকই—কিন্তু পেটের মধ্যে চিরকাল বন্দী থাকতে যাব কেন? ফুটো যখন হয়েছে, ঐ ফুটো বড় করা বেশী কঠিন হবে না। বড় ফুটোয় মাথা গলিয়ে বের হয়ে পড়ব।

লেগে গেল অর্জুন। ফল খেয়ে চাঙ্গা হয়েছে, ঘোর বেগে চাকু চালাচ্ছে। বাঘের পেটের যন্ত্রণা অসহ্য। বউ হেনকালে কবিরাজের খবর নিয়ে এলো। বাড়ি নেই কবিরাজ, ওপারে গেছে। ফিরলেই দেখতে আসবে।

কথাবার্তা অর্জুন শুনছে ভিতর থেকে। হাসি পাচ্ছে। ফিরবে না আর তোমাদের কবিরাজ। খতম।

যন্ত্রণায় বাঘ এপাশ-ওপাশ করছে। বউ বলে, ফলও হজম হচ্ছে না তোমার। খাওয়া একেবারে বন্ধ দু-একদিন। জল খেয়ে থাকবে।

মিঠা-জলের পুকুর আছে জঙ্গলের মধ্যে, বউ জল এনে দিল। যন্ত্রণার চোটে বাঘ ঢক-ঢক করে পুরো কলসি জল খেয়ে ফেলল। অর্জুনের মজা। ফল খেয়ে খেয়ে তেষ্টা পেয়েছিল, জলও পেয়ে গেল। আর তাকে পায় কে? নতুন শক্তি নিয়ে চাকু চালাচ্ছে।

দিন কেটে গিয়ে রাত্রি। চাঁদ উঠল। সম্রাট-বাঘের সাড়াশব্দ নেই, অচেতন। পেট চিরে ফালা-ফালা করে ফেলেছে। মরে গেল বাঘ। হাড়গুলো অর্জুন ভাল করে গামছায় জড়িয়ে নিয়ে বিশাল পেটের গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মাটির গামলা গোলঝাড়ের মধ্যে লুকানো আছে। খাল পার হয়ে গাছতলায় এলো চাঁদের আলোয়। বিশল্যকরণী গাছের উপর—সমস্ত হাড় পাশাপাশি সাজিয়ে বিশল্য-করণী বুলাতে লাগল।

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড। খটাখট এ-হাড়ে ও-হাড় গিয়ে লাগে। হাড়ের উপরটা মাংসে ঢেকে যায়। মাংসের উপর চামড়া। দুটো হরিণ আর একটা মানুষ হয়ে দাঁড়াল। জীবন্ত। মানুষটা—আরে আরে, অর্জুনের বাপ অনন্ত ঢালি যে। জড়িয়ে ধরল অর্জুন—'বাবা' ডেকে উল্লাসে কেঁদে ফেলল। হরিণ দুটো পালিয়ে গেল।

বাপে-ছেলেয় হাত ধরাধরি করে বাড়ি যাচ্ছে।

সমরেশ বসু
মোক্তার দাদুর
কেতুবধ

সুরথ সবে মাত্র মনোমোহন মোক্তার মশাইয়ের ঘরের দরজায় পা ঠেকিয়ে, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বলতে পারলো না। এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে ও থমকে দাঁড়ালো। আশ্চর্য দৃশ্যটা মোক্তার মশাইয়ের ঘরের মধ্যে না, তাঁর বাইরের দরজার একেবারে চৌকাঠের ওপর চল্লিশ পাওয়ারের আলোতে। অবশ্য সন্ধের দিকে সব আলোই একটু কমজোরি থাকে। চৌকাঠের বাইরেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু মোক্তার মশাইয়ের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না। তিনি তখন তাঁর ক্যাম্বিসের আরাম কেদারায় বসে, আদ্যিকালের পুরানো পানের কৌটো থেকে, তাল মিছরির টুকরো নিয়ে মুখে দিচ্ছিলেন। তাঁর পানের কৌটোতে কেবল পানের খিলি থাকে না। আদার কুচি, তালমিছরি, বচ্, টুকরো টুকরো হর্তুকি ইত্যাদি থাকে। তাঁর ঘরে ঢুকলেও, পান আদা বচ্ হর্তুকি তালমিছরি ইত্যাদির মেলানো মেশানো একটা গন্ধ পাওয়া যায়। চোখ বেঁধে দিয়ে এ ঘরে সুরথকে ঢোকালেও, সে বলে দিতে পারবে, এটি মোক্তার দাদুর ঘর। কিন্তু তাঁর বাইরের দরজা জুড়ে যে-মূর্তিটি দাঁড়িয়ে, দেখে সুরথের, গায়ে কাঁটা দিল। ওর মনে হলো, ও মোক্তার দাদুর ঘরে ঢোকবার মুখেই, বাইরের দরজায়, অন্ধকার ফুঁড়ে মূর্তিটা দেখা দিল। ও না পারলো ঘরের মধ্যে ঢুকতে, না পারলো পিছন ফিরে দৌড় দিতে। এমন কি মোক্তারদাদুকে ডেকে উঠবে, গলায় সে-জোরও যেন পেলো না।

সুরথ দেখলো, মোক্তার দাদুর দরজায় জীবন্ত মা কালী দাঁড়িয়ে। এক পা চৌকাঠের এপারে, আর এক পা ওপারে, কিন্তু হাত চারটি, চতুর্ভুজার যেমন থাকা উচিত। তিন চক্ষু, টকটকে, লাল জিভ চিবুক ছাড়িয়ে নেমে পড়েছে বুকের কাছে। সুরথ হয়তো দৌড় দিতো, কিন্তু মা কালীর দুটো চোখের তারা ওর দুই চোখের ওপর বিঁধে, যেন চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে। মনোমোহন মোক্তার, আরাম কেদারার পাশে, তাঁর খাটের বিছানার ধারে পানের কৌটোটি রেখে, শাদা দাড়ি নাড়িয়ে, চোখ বুজে একটু তালমিছরি চুষলেন, তারপরে বললেন, 'তা, মা কালীর এখন দিনকাল কেমন চলছে?'

মা কালী তার চার হাতের একটি হাত দিয়ে ঝটিতি জিভটি তুলে নিয়ে, মোটা গলায় খুব তাড়াতাড়ি বললো, 'আজ্ঞে মোক্তারবাবু, দিনকাল খুবই খারাপ। ধান চালের দাম যেমন চড়া, লোকজনের মেজাজও তেমনি তেড়িয়া।'

বলেই, লাল টকটকে জিভ আবার দাঁতে চেপে দিয়ে, মা কালী, মা-কালীর ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। সুরথের বুকের ধকধকানি এবার একটু কমলো। আচমকা ভয় পাওয়া মনে এবার কৌতূহল জাগলো, আর খুবই অবাক হলো। মা কালী কথা বলে! মোক্তারদাদুর সঙ্গে মা কালীর কথাবার্তা যে আগেই শুরু হয়েছে, তা বোঝা গেল। সুরথ মা কালীর দিকে এবার ভালো করে তাকালো। সব খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো। এলানো খড়খড়ে চুল, নরমুণ্ডের মালা গলায়, কালো রঙের জাঙিয়া পরা, আর সারা গা ভুশো কালি মাখা মা কালীকে এবার যেন একটু চেনা চেনা লাগলো।

মোক্তারদাদু বললেন, 'কথাটা মিথ্যা বলো নি মা কালী। তোমার দু চোখে—থুড়ি, তিন চোখে ঠিক ঠিক ব্যাপারটাই পড়েছে। কেবল ধান চালের না, পান সুপুরি খয়ের চূর্ণ তালমিছরি বচ্ হর্তুকি মায় আদানুনের দামও বেজায় চড়ে গেছে। দিনকে দিন আমার মেজাজই যেরকম তেড়িয়া হয়ে উঠছে, কখন কী করে বসি, তার ঠিক নেই।'

সুরথের যখন মনে হচ্ছে মা কালীকে প্রায় চেনা চেনা লাগছে, তখনই সে আবার লাল টকটকে লম্বা জিভটা, এক হাত দিয়ে চট করে খুলে নিল, আর দুচোখ গোল করে, নিজের সত্যি-কারের জিভ বের করে দাঁত দিয়ে কেটে, কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। বললো, 'অই গো মোক্তারমশায়, আপনি হলেন সদাশিববাবা, গরীবের মা বাপ। আপনার মেজাজ কখনো তেড়িয়া হতে পারে? তা হলে আর কার দরজায় এই ধানুর মতন অধমরা যেয়ে দাঁড়াবে। আমি অন্য লোকদের মেজাজের কথা বলছি।'

মনোমোহন মোক্তার মাথা দুলিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি পুলিশ চোরাকারবারী সাহেবসুবোদের তেড়িয়া মেজাজের কথা বলছো।'

মা কালী সুরথকে একবার দেখে বললো, মোক্তারমশাই, গরীব গুরবো মানুষদের বেশি কথা বলতে নেই। আপনার ঘরে আর একজন অতিথি এসেছেন।'

বলে সে সুরথের দিকে তাকিয়ে, তার সমস্ত দাঁত দেখিয়ে হাসলো, তারপরেই হাতের লম্বা জিভটা আবার দাঁতে চেপে ধরলো। চার হাত আর শরীর টান টান করে, চোখ পাকাবার ভঙ্গি করলো।

মনোমোহন মোক্তার পাশ ফিরে একবার ভিতরে যাবার দরজার ওপারে সুরথকে দেখলেন, বললেন, 'অতিথি কোথায় দেখলে? ও তো সুরথনাথ, তোমার আমার মতো লোকের সঙ্গে ওর বেশি ভাব ভালবাসা। মহাদেবের আর এক নাম সুরথনাথ, জানো তো?'

সুরথ ততোক্ষণে মা কালীকে চিনতে পেরেছে। সে আর কেউ না, ধানু—মানে ধনঞ্জয় বহুরূপী। মোক্তারমশাইয়ের কথা শোনা মাত্র, ধানু বহুরূপী সুরথের দিকে তাকিয়ে একবার মাথার চূড়া শুদ্ধ নোয়ালো। সুরথ হাসলো। দরজা থেকে ঘরের মধ্যে এলো। ধানুর কালীবেশ এখন ও খুটিয়ে দেখছে, মনে মনে অবাক হচ্ছে, মজাও লাগছে। কেবল ধরতে পারছে না, বাকী দুটো হাত কেমন করে লাগিয়েছে। যার একটাতে নরমুণ্ড ঝোলানো, আর একটা মেলে ধরা। ধানুর দুই বগলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে, সেখান থেকে হাত দুটো ঝুলে এসেছে, কোনো রকম নড়াচড়া নেই।

মোক্তারমশাই তাঁর ফতুয়ার পকেটে হাত গলিয়ে, খুচরো পয়সা নাড়াচাড়া করে, আধুলি সিকি সব মিলিয়ে বের করে বললেন, 'মা কালীর দর্শনী এর বেশি দিতে পারছি না। বুড়ো মোক্তারের মক্কেল আজকাল জুটছে না। সুরথনাথ, পয়সাগুলো ভাই ওকে দিয়ে দাও তো।' তিনি পয়সাগুলো সুরথের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় টাকা খানেক, সুরথ নিয়ে, দরজার কাছে গিয়ে ধানু বহুরূপীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো। ধানু ওপর দিকে তোলা অভয় ভঙ্গির ডান হাতটা নামিয়ে সুরথের হাত থেকে পয়সাগুলো নিল। তার কালো জাঙিয়ার কোমরের কাছে একটা ফুটো, চোখে দেখা যায় না। পয়সাগুলো সেই ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। মা কালীর গা থেকে পাট খড় মাটি নানা কিছুর গন্ধ বেরোচ্ছে। তার জাঙিয়ার পকেটে পয়সা রাখা দেখে সুরথ একেবারে চমৎকৃত। ভাবতেই পারে নি, জাঙিয়ার কোমরেও পকেট করা আছে।

মোক্তারমশাই আবার বললেন, 'রাতবিরেতে বলে কথা, মা কালী একটু সাবধানে চলো।' ধানু বহুরূপী তৎক্ষণাৎ আবার জিভটি খুলে নিয়ে বললো, 'আর বলবেন না মোক্তারমশাই, কুকুরেরা হলো মা কালীর সহচর, কিন্তুন্ তাদের মেজাজও খুব তেড়িয়া। দেখলেই তেড়ে কামড়াতে আসে। সেই ভয়ে আজকাল রামের ভক্ত হনুমান সাজা ছেড়েই দিয়েছি।'

সুরথ ধানুর কথা শুনে হেসে উঠলো। মোক্তারমশাই বললেন, 'আজকালকার কুকুর কী না, ওরা মা কালীও চেনে না, রামের ভক্তও বোঝে না। সাবধানে চলাই ভালো। তবে আজকের কালীর সাজটি বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে কেউ দেখলে ভিরমি যেতে পারে, ফলে—।' তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ধানু বলে উঠলো, 'লোকের মারধোরের কথা বলছেন তো? সে আজ্ঞে আপনাদের আর মা কালীর কিরিপায়, মারধোর খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে গেছে।'

মোক্তারমশাই মাথা দুলিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'সেটাই যা বাঁচোয়া।' সুরথ অবাক হবে কি, হো হো করে হেসে উঠলো। ধানু বললো, 'আসি মোক্তারমশাই।' বলে জিভটা দাঁতে কামড়ে ধরে, বাঁ হাতের খড়্গসহ দু হাত কপালে ঠেকালো। মোক্তার-মশাই বললেন, 'এসো।'

কালীবেশে ধানু বহুরূপী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরথ দরজায় গিয়ে বাইরে উঁকি দিল, কোথাও তাকে দেখা গেল না। মোক্তারমশাই তখন আরামকেদারায় মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে, বোধহয় আদা আর তালমিছরি চুষছেন। চোয়ালের সঙ্গে তাঁর দাড়ি নড়ছে। সুরথ ওর হাফ প্যান্টের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে ফিরে বললো, 'জানেন মোক্তারদাদু, আমি প্রথমটায় দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলাম।'

মোক্তারমশাই চোখ না খুলে বললেন, 'আমি ভয় পাই নি, তবে চমকেছিলাম।' সুরথ ওর কিশোর কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, ধানু যে বললো, মার খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে গেছে, সেটা কি সত্যি?'

মোক্তারমশাই বললেন, 'মিথ্যের তো কিছু দেখছি না।'

সুরথ আনমনা হয়ে গেল, মুখ করুণ হয়ে উঠলো। বললো, 'মোক্তারদাদু, ধানুর কথা শুনে আমি হাসলাম, কিন্তু জানেন, আমার মনে খুব কষ্ট লাগছিল।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'এই হাসি আর কষ্ট, দুটোই মানব ধর্ম।'

সুরথের কপাল ঢাকা চুলের নিচে ভুরু কুঁচকে উঠলো, একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'আপনি যে কী বলেন, আমি তা বুঝি না। ওসব বড় বড় কথা আমার ভালো লাগে না।'

মোক্তারমশাই হুঁ হুঁ করে একটু হাসির মতো শব্দ করে বললেন, 'সেইজন্যই ভাই তোমাকে আমার ভালো লাগে কী না! ওই হাসি আর কষ্টের জন্য। তা, এ অসময়ে কী মনে করে?'

সুরথ খাটের ধারে এগিয়ে বললো, 'সে কথা পরে বলছি। এখন আমাকে বলুন তো, ধানু বাকী দুটো হাত লাগিয়েছে কেমন করে?'

মোক্তারমশাই বললেন, ওসব হলো বহুরূপীর রহস্য, সকলের জানবার নয়। আমি দশভুজা দুর্গার বহুরূপীও দেখেছি, এমন কি দশ মুণ্ডু রাবণও।'

সুরথ মোক্তারমশাইয়ের সামনে খাটের ধারে বসলো। ওর দৃষ্টিতে বিস্ময় আর সন্দেহ। মোক্তারমশাইয়ের আধ বোজা চোখের দৃষ্টি বাইরের অন্ধকারে। আদা আর তালমিছরি চুষছেন, তাঁর দাড়ি নড়ছে। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি?'

মোক্তারমশাই তাঁর মোটা শাদা কালো ভুরু কাঁপিয়ে, পুরো চোখ মেলে সুরথের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো যে কতো বড়, এখন বোঝা যাচ্ছে। অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'সুরথনাথকে আমি কখনো মিছে কথা বলি? তার সঙ্গে তো আমার চুক্তি আছে, আমরা আর যাকেই যা বলি, দুজনকে কেউ কখনো মিছে কথা বলবো না।'

সুরথ খুব লজ্জা পেয়ে গেল। এমনিতেই সবাই বলে, ওর মুখটা নাকি বালিকাদের মতো। ওর মা বলেন, 'ভগবান মেয়ে গড়তে গিয়ে, ভুল করে ওকে ছেলে গড়ে ফেলেছে।' বছর দুই তিন আগে, সুরথও মায়ের কথাটা বিশ্বাস করতো। এখন আর করে না, অনেক বয়স হয়েছে—গত অগ্রহায়ণে তেরো বছরে পড়েছে, বুঝতে শিখেছে। মেয়ে গড়তে গিয়ে ছেলে গড়া, ভগবানের ওরকম কোনো খামখেয়ালীপনা নেই। কিন্তু ও লজ্জা পেলে, সত্যি ওকে বালিকার মতোই দেখায়। মাথায় কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল, টানা টানা বড় চোখ, নাকটা সামান্য টিয়ে পাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো চোখা, ঠোঁটের নিচে, চিবুকের মাঝখানে ছোট একটি টোলের ভাব। ও অপ্রস্তুত মুখে হেসে বললো, 'সরি মোক্তারদাদু, আমার ভুল হয়ে গেছে।'

মোক্তারমশাই পানের ডিবেটি হাতে নিয়ে খুলে, এক টুকরো তালমিছরি সুরথের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সুরথ সেটি নিয়ে মুখে দিল। মোক্তারমশাই ডিবে রেখে, আবার চোখ আধবোজা করে, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সরি বলবার কিছু নেই, অবাক হবারই কথা অবিশ্যি। তবে আমি সত্যি সত্যি দশহাত দুর্গা, দশ মুণ্ডু রাবণের বহুরূপী দেখেছি। আমাদের দেশ এমন একটা দেশ, এখানকার লোকেরা অনেক কিছুই বানাতে পারে। দশমুণ্ডুওয়ালা রাবণের মুখোস, কাগজ দিয়ে সুন্দর গড়ে। পুরুলিয়ার মুখোস শিল্পীরা খুব সুন্দর মুখোস বানাতে পারে। বহুরূপীরা অনেক কিছুই সাজতে পারে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

সুরথ বললো, 'কিন্তু মোক্তারদাদু, প্রথম দেখে ধানুকে আমি সত্যি জ্যান্ত মা কালী ভেবেছিলাম।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'সেটাই তো ধানু বহুরূপীর ওস্তাদি।'

সুরথ মুগ্ধ চোখে, আনমনে খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে বলে উঠলো, 'জানেন মোক্তারদাদু, আমারও ধানুর মতো বহুরূপী সাজতে ইচ্ছা করে।'

মোক্তারমশাই আবার ভুরু কুঁচকে অবাক চোখ মেলে, সুরথের দিকে তাকালেন। তারপরেই সজোরে দাড়ি শুদ্ধ, অল্প কিছু পাতলা শাদা চুলের টাক মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'না না না, ও কথাটি বলো না। ভদ্রলোকের ছেলে বহুরূপী সাজবে কী! তুমি লেখাপড়া করবে, ডাক্তার এঞ্জিনীয়ার জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে। ও সব বুদ্ধি মাথায় রাখা একদম ভালো না।' সুরথের মুখখানি যেন তেতো ওষুধ খাবার মতো হলো। বললো, 'আপনার ছেলে তো ম্যাজিস্ট্রেট। আপনাকে একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় না, মরলেন কি বাঁচলেন, খোঁজও নেয় না। আপনি তো বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট হলে তাদের খোল্ নলচে পাল্টে যায়। মাথা ভারি হয়ে যায় বুদ্ধিতে, বুকটা যায় শুকিয়ে, ভালবাসা-টাসা থাকে না।'

মোক্তারমশাই ব্যস্ত ভাবে হাত তুলে বললেন, 'আ হা হা, সে তো আমার ছেলের কথা বলেছি। সব ম্যাজিস্ট্রেট তো আর একরকম হয় না। অনেক হৃদয়বান ম্যাজিস্ট্রেটও আছে।'

সুরথ গম্ভীরভাবে বললো, 'কিন্তু আমার ওসব হতে ইচ্ছে করে না।'

মোক্তারমশাই ব্যস্তভাবে হাত তুলে বললেন, 'আ হা হা, হতে ইচ্ছে করে। তোমার অনেক ইচ্ছের কথাই তো আমি শুনেছি। তোমার ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে, গান গাইতে ইচ্ছে করে, বাঁশী বাজাতে ইচ্ছে করে, নদীতে মাছ ধরতে ইচ্ছে করে, বাবা মা ভাইবোন সবাইকে ছেড়ে বেদেদের মতো দেশে দেশে ঘুরতে ইচ্ছে করে, তাই তো?'

সুরথ জবাব না দিয়ে হাসলো। মোক্তারমশাই বললেন, 'কিন্তু তুমি ভালোই জানো, ওসব হবার যো নেই। কাঁঠাল গাছে আম ফলে না, আম গাছেও পেয়ারা না। বাপ ঠাকুর্দার মতোই, তোমাকেও লেখাপড়া শিখে, ভদ্রলোকের কাজ কারবার করতে হবে।'

সুরথ কিছু বলতে চাইলো, মোক্তারমশাই বাধা দিয়ে বললেন, 'এখন কথা হচ্ছে, অশ্বিনী মাস্টার কি আজ পড়া থেকে ছুটি দিয়েছে?'

সুরথের গৃহশিক্ষকের নাম অশ্বিনী—একজন কলেজের ছাত্র। সুরথ বললো, এখনো আসেন নি।'

মোক্তারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'বোসঠাকুরমশাইও কি বাড়িতে নেই? তাঁর নজর তো বাঘের মতো খাড়া নজর।'

বোসঠাকুরমশাই হলেন সুরথের বাবা। মোক্তারমশাই বোসঠাকুরমশাই বললেও, তাঁকে 'বোসঠাকুর' এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন। সুরথ বললো, 'আছেন। বাবা তাঁর ঘরে আজ মেলাই দলিলপত্র নিয়ে বসেছেন।'

মোক্তারমশাইয়ের দৃষ্টি সুরথের মুখের ওপর, কিন্তু সুরথ জবাব দিচ্ছে অন্যদিকে তাকিয়ে। তিনি একটু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁম্! মা নিশ্চয়ই রান্নাবান্নার দিকে আছেন। কিন্তু জেমস্‌বণ্ড মেজদা, দিদি, তারা সব কোথায়?'

সুরথ বললো, 'দিদি বোধহয় ওপরের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করছে। মেজদার কথা আমি জানি না।'

মোক্তারমশাই একটু সময় সুরথের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজদা কোনোরকম জুজুৎসুর প্যাঁচ ট্যাঁচ দেখায় নি তো?'

অর্থাৎ মেজদা মারধোর করেছে কী না। সুরথের মেজদা ওর থেকে দু বছরের বড়। ও বললো, 'ভুলে গেলেন? বলি নি, সাতদিন ধরে বয়কট দিয়ে রেখেছে, ওর সঙ্গে কথা নেই।'

মোক্তারমশাই তাড়াতাড়ি ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। বুড়ো মানুষ, আজকাল অনেক কথাই মনে থাকে না। কিন্তু আসল কথা হলো, কাল কি ইস্কুলে কোনো পড়া দিতে হবে না?'

সুরথ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। কিন্তু মোক্তারমশাই চোখের পাতা না ফেলে, এমনভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, ও বেশিক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে পারলো না। মোক্তারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো, বললো, 'ভালো লাগে না।'

মোক্তারমশাই দাড়ি গোঁফে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'তা বললে

তো হবে না ভাই। লেখাপড়াটা করতে হবে, ওটা না করলে অনেক কিছু জানা যাবে না। তারপরে বড় হয়ে যা খুশি করো, কেউ কিছু বলতে যাবে না।'

সুরথ এবার বেশ একটু জেদের সঙ্গে বললো, 'কিন্তু বড় হয়ে আমি কিছুতেই বাবা দাদার মতো হতে চাই না।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'সে তো আমি জানি। তোমার মতিগতি যা দেখছি, তাতে বংশছাড়া কিছু একটা না হয়ে যাচ্ছো না। কেন যে এরকমটা হলো, আমার বুদ্ধিতে আসে না। অবিশ্যি তোমার বাবা গান বাজনা ভালোবাসেন, তোমার কাকা ছবি আঁকেন, তোমাকে একেবারে বংশছাড়া বলা যায় না। তবে এ বয়সেই তোমার যেরকম উলটোপালটা ভাব, এটাই কেমন খটকা লাগায়। তোমাকে দেখলে আমার সেই গানটা গাইতে ইচ্ছে করে।' বলে তিনি ঘড়ঘড়ে গলায় সুর করে গেয়ে উঠলেন,

বিবাগী না হইয়ো নিমাই, বৈরাগী না হইয়ো
দিব থাল্য ভরে ননীমাখন, প্রাণতোষে খেয়ো।'...

সুরথ খাট থেকে নেমে হো হো করে হেসে উঠলো। ওর সাদা কালো ডোরা সার্টের কলার টেনে মুখে চাপা দিল। মোক্তারমশাই অপ্রস্তুত হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুরে কোনো ভুলটুল হলো নাকি?'

সুরথ বললো, 'এটা গানের সুর হলো নাকি? আপনি তো সুর করে ছড়া কাটলেন।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'তাই নাকি? তা হবে। চিরদিন তো আইনের বই-ই ঘাঁটলাম, এখন আর গান গাওয়ার শখ হলে কী হবে? সুরটা পরে তোমার কাছে শুনে নেবো, কিন্তু ভাই সুরথনাথ, এতক্ষণে বোধহয় অশ্বিনী মাস্টার এসে গেছে, এবার সটকে পড়ো। কেউ খুঁজতে এসে আমার ঘরে দেখলে, দুর্নাম দিয়ে বলবে, এ বুড়ো মোক্তারটাই ছেলেটার পড়া ভণ্ডুল করছে।'

সুরথ হেসে বললো, 'তা হলে বেশ মজা হয়, আপনাকেও বকুনি খেতে হবে।'

মোক্তারমশাই পানের ডিবে খুলে বললেন, 'সেটা কি ভাই এ বুড়ো বয়সে ভালো দেখাবে? এখন যদি কেউ কান ধরে ওঠবোস্ করায়—।'

সুরথ কথার মধ্যেই হেসে উঠলো, বললো, 'আমার দেখতে ইচ্ছে করে।'

মোক্তারমশাই মাথা নেড়ে বললেন, 'মনোমোহন মোক্তারের কী দুর্গতি! এই নাও ভাই আর এক টুকরো তালমিছরি, কিন্তু ওরকম দেখতে চেও না।'

সুরথ হাসতে হাসতে তালমিছরি নিয়ে মুখে পুরে বললো, 'কিন্তু কী বলতে এসেছিলাম, তা শুনলেন না।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'কোন্ কথা? বিকেলে তো বলে গেলে, বাঁশের বাঁশী বানানো শিখে এসেছো।'

সুরথ বললো, 'সে কথা না। এবার পুজোর ছুটিতে আপনার সঙ্গে আপনাদের দেশে যাবো, বাবাকে সে কথা তো আজো বললেন না।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'ও, সেই কথা! পুজোর ছুটির তো এখনো কয়েকদিন বাকী আছে। বলবো। কিন্তু তোমার বাবাকে আমার ভীষণ ভয়! যদি না যেতে দেন?'

সুরথ বললো, 'আপনি বললে বাবা ঠিক যেতে দেবেন।'

মোক্তারমশাই একটু চোখ বুজে ভাবলেন, তারপরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখি। তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন বলতেই হবে।'

সুরথ বললো, 'কিন্তু দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি বলবেন। এখন আমি যাচ্ছি।'

মোক্তারমশাই বললেন, 'এসো। তবে এখন কয়েকটা দিন একটু সুমতি নিয়ে থাকো, বাবার মেজাজটা যাতে ঠাণ্ডা থাকে। তা না হলে কেচে যেতে পারে। আর তোমার আমার মধ্যে যে কোনো সলাপরামর্শ হয়েছে, সেটা যেন জানাজানি না হয়, বুঝেছো?'

সুরথ মোক্তারমশাইয়ের দিকে তাকালো। মোক্তারমশাইয়ের চোখের কোন দুটো কোঁচকানো, দৃষ্টি সুরথের দিকে, মুখে হাসি। সুরথ হেসে বললো, 'বুঝেছি। আপনি একটু বেকায়দায় পড়ে যাবেন।' বলে হাসতে হাসতে ভিতর দরজা দিয়ে চলে গেল।

সুরথের চালচলনটা যে একটু আলাদা রকমের, সেটা বোঝা যায় তার মনোমোহন মোক্তার মশাইয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো ভাব দেখেই। ও পড়েছে তেরোতে, মোক্তারমশাইয়ের বয়স, সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। এই জেলা শহরের অনেকে বলে, মনোমোহন মোক্তারের বয়সের কোনো হিসাব নিকাশ নেই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ইংরেজরা তাঁকে দুবার জেলে পুরেছে। সাত বছর জেলে থেকেছেন। তাঁর নামে গান চালু আছে।

আমাদের মনোমোহন মোক্তার
মস্ত ইমানদার
হিন্দু মোসলেম ভেদ জানেন না
দয়ার অবতার।
এজলাসেতে শমন তুল্য
বিপক্ষ দলের
মেজিস্টরের বাক্য হরে
লোকে ধন্য করে।
এমন বড় ইংরেজ শক্তি
তারে না করেন ভক্তি
কামানের মুখে দাঁড়িয়ে হাঁকেন
এ দেশ আমার
আমাদের মনোমোহন মোক্তার।...

তাঁকে নিয়ে কে যে গানটা বেঁধেছে, কেউ বলতে পারে না। তবে তাঁকে যে সবাই ভালবাসে, সেটা ধানু বহুরূপীর কথাতেও বোঝা যায়। কিন্তু সুরথের সঙ্গে তাঁর ভাব সাব যেন একটু অন্যরকম। ফাঁক পেলেই, সুরথ মোক্তারমশাইয়ের ঘরে হাজির। হাজির হবার অসুবিধা কিছু নেই। সুরথদের মস্ত উঠোন-ওয়ালা, ছড়ানো বড় বাড়ির বাইরের এক অংশে দেড়খানি ঘর নিয়ে, তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে আছেন। ছড়ানো মানে, একদিকে দোতলা বাড়ি, আর একদিকে একতলা। আবার এদিক ওদিকে দু একখানা টিনের চালাঘরও আছে।

মোক্তারমশাই যখন এ জেলা শহরে মোক্তারি করতে আসেন, তখন থেকেই তিনি এ বাড়ির ভাড়াটে। তখন তিনি কুড়ি একুশ বছরের জোয়ান। সুরথকে জন্মাতে দেখেছেন। তাঁর বয়সের হিসাবে বলতে গেলে, এই সেদিনের কথা। কিন্তু কবে থেকে যে সুরথ তাঁর ঘরে নিয়মিত যাওয়া আসা শুরু করেছে, আর দুজনের মধ্যে নিবিড় একটি বন্ধুত্বের ভাব হয়ে গিয়েছে, কারোরই খেয়াল নেই।

সুরথকে নিয়ে গোলমালটাও সেখানেই। ওর বয়সের ছেলেদের যেটা স্বাভাবিক চালচলন আচার আচরণ, ও তার ধারে কাছে নেই। খেলার মাঠে ওকে দেখা যায় কদাচিৎ। পড়তে বসতে ওর ভালো লাগে না। ইস্কুলে যেতেই যতো ঝামেলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ওর পড়া হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়া শেষ, সবটা বুঝুক না বুঝুক। এমন কি কৃষ্ণকান্তের উইল পর্যন্ত পড়ে ফেলেছে, যা এখনো ওর মেজদা, আর মেজদার ওপরের দিদিও পড়ে নি। আর তা পড়তে গিয়ে ধরা পড়ে, ওর খোয়াড় কিছু কম হয় নি। কারণ বাড়ির নিয়মে, ওর এই বয়সে ও সব বই পড়া নিষেধ। নিষেধ বললে কী হবে, ওর ঝোঁকটাই ওদিকে। মোক্তারদাদুর কাছে বসে ও শুনতে চায়

তার জেল জীবনের কাহিনী, তাঁর মামলা মোকদ্দমার অদ্ভুত সব গল্প। মোক্তারদাদুর কাছে তাঁর জন্মস্থান গ্রামের গল্প শুনে শুনেই, সেই গ্রাম দেখবার জন্য ওর কৌতূহলের অন্ত নেই। ওর যতো মনের কথা, তা ওর বয়সী বন্ধুরা কেউ জানে না। যতো বলাবলি সব মোক্তারদাদুর কাছে।

আজ বিকেলেই ও মোক্তারদাদুকে বলেছে, বাঁশের বাঁশি বানানোর অন্ধিসন্ধি সব ও দেখে এসেছে। ও নিজেও বাঁশি বাজায়। যেমন তেমন বাঁশি না, আড় বাঁশি। মোটামুটি সুর তুলতেও শিখে ফেলেছে। বাড়ি থেকে দূরের মাঠে গিয়ে, রীতিমতো কষ্ট করে শিখেছে। কিন্তু বাবা মা দাদা দিদির সেটাই অসহ্য। এতোটুকু ছেলে বাঁশি বাজাবে কী। ভদ্রলোকের ছেলেরা ওসব করে না। মোক্তারদাদুর সঙ্গে ওর ভাবের ব্যাপারটা এখানেই। তাঁর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, ও বাঁশি বাজিয়ে শোনায়। মোক্তারদাদু চোখ বুজে শোনেন, ঘাড় দুলিয়ে তারিফ করেন, কিন্তু চুপিচুপি বলেন, 'বাজানোটা বেশ ভালোই হচ্ছে, শুনে মনটা আমার তরর্ হয়ে গেল। কিন্তু ভাই লেখাপড়াটাও এরকম জান প্রাণ দিয়ে শিখতে হবে। তা হলেই সব গোল মিটে যায়।'

সুরথ যে-বাঁশিওয়ালার কাছ থেকে বাঁশি কেনে, নাম তার শ্রীনিবাস। সবাই তাকে চিনিবাস বাঁশিওয়ালা বলে। তার বাড়ি, সুরথদের বাড়ি থেকে কম করে দু মাইল দূরে। আজ ও চিনিবাসের সঙ্গে তার বাড়ি গিয়ে, বাঁশি বানানো দেখে এসেছে।

সে কথাটাই মোক্তারদাদুকে বিকালে জানিয়ে বলেছে, এবার ও নিজেই মুরলী বাঁশ নিয়ে এসে বাঁশি বানাবে। মোক্তারদাদু বলেছেন, 'এখন লুকিয়ে চুরিয়ে বাজানোটাই চলুক, বানানোটা পরে হবে। এখন ওসব ঝামেলাতে না যাওয়াই ভালো।'

সুরথ কথাটা মেনে নিয়েছে। বলতে গেলে এরকম ঘটনা অনেক আছে। যেমন, বাড়ি থেকে একটু দূরেই গোপাল দাস নামে একজন শিল্পী আছেন। তিনি থিয়েটারের সিনসিনারি আঁকেন। আরো নানা রকম ছবি আঁকেন। সুরথ তাঁর একজন ভক্ত। গোপাল দাসের সঙ্গে ওর খুব ভাব। ওর নিজের কাকাও একজন শিল্পী, তিনি দিল্লিতে থাকেন। সেটা ওর একটা মস্ত দুঃখ। গোপাল দাসই ওর সে-দুঃখটা ভুলিয়ে রেখেছেন। কোনো কারণে ও দু একদিন না গেলে, তিনি বলেন, 'সেইজন্যই ভাবছিলাম, কাজে তেমন মন বসছে না কেন। তুমি একবার উঁকি দিয়ে না গেলে মনটা কেমন ফস্‌ফস্‌ করে। কাজে কিছু এগোলে নাকি?'

অর্থাৎ সুরথ কোনো ছবি এঁকেছে কী না। ও ভীষণ লজ্জা পেয়ে যায়। ছবি ও সত্যি আঁকে, কিন্তু গোপাল দাসকে কিছুতেই দেখাতে পারে না। গোপাল দাস ছবি আঁকতে আঁকতে ঘন ঘন বিড়ি খান। সুরথকে বাড়ির কাজে কুটোগাছটি ভাঙতে হয় না। গোপাল দাসের বিড়ি কিনে এনে দেয়। এমন কি, রাস্তার জল কল থেকে, তাঁর জন্য কলসীতে জল ভরে এনে দেয়। কাজটা ওকে লুকিয়েই করতে হয়। বাড়ির কারোর চোখে পড়লে রক্ষা নেই। তাও একবার, বিড়ি কিনতে গিয়ে, ধরা পড়েছিল খোদ বাবার কাছেই। ওর বাবা প্রথমে ভেবেছিলেন, ও নিজের জন্যই লুকিয়ে বিড়ি কিনছে। এমনিতেই ও বাবাকে বাঘের মতো ভয় পায়। বাবার সেই অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে, ও এমন থতোমতো খেয়ে গেছলো, মুখ দিয়ে কথাই বের হচ্ছিল না। অবিশ্যি তারপরেই ও বাবাকে সত্যি কথাটা বলতে পেরেছিল, আর গোপাল দাসের কাছে নিয়ে গিয়ে, সত্যি প্রমাণটাও দিয়েছিল। কিন্তু সেই থেকেই, গোপাল দাসের কাছে যাওয়া ওর নিষেধ হয়ে যায়। কারণ, ভদ্রলোকের ছেলেকে যারা বিড়ি কিনতে পাঠায়, তাদের কাছে যাওয়া উচিত না। সেই থেকে গোপাল দাসের ছবি আঁকা দেখতে ওকে লুকিয়ে যেতে হয়। কথাটা জানেন শুধু মোক্তারদাদু।

এরকম একই ব্যাপার, কেদার ঠাকুরের মণ্ডপ বাড়ির আসর। সেখানে যাত্রা গানের মহড়া হয়। মণ্ডপবাড়ির সেই ঘরখানিও তেমনি। বিরাট উঠোনের সামনে, আট ধাপ সিঁড়ি উঠে থাম লাগানো ঠাকুরদালান। তার পিছনে মণ্ডপ ঘর। মণ্ডপবাড়ি বলে। ঠাকুরদালানের দিকে দরজা বন্ধ করে দিলে, বাইরের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগ নেই। তার পিছন দিকেও আরো ঘর আছে, কিন্তু কখনো খোলা দেখা যায় না। সে সব ঘরে কী আছে, সুরথ জানে না। মণ্ডপ বাড়ির প্রকাণ্ড মেঝেটা জুড়েই নিচু তক্তপোষ। তার ওপরে শতরঞ্চি পাতা আর তাকিয়ার ছড়াছড়ি। তিন দিকের দেওয়াল জুড়ে বড় বড় আয়না আর আলমারি। আলমারিগুলোর মধ্যে আছে নানারকম বাজনা; হারমোনিয়ম, ডুগিতবলা, ক্লারিওনেট, বেহালা, এস্রাজ আর পাখোয়াজ। খঞ্জনি করতালের তো কথাই নেই। তা ছাড়াও আছে, মেলাই রাজা রাণী বাদশা বেগম মন্ত্রী আমীরদের পোশাক, তলোয়ার ত্রিশূল অবধি। সবই কেদার ঠাকুরের যাত্রার সাজ সরঞ্জাম। ঘরের দেওয়ালের গায়ে গাঁথা আছে নানারকম কাঁচের বাতি। উঁচু থেকে ঝোলে বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন। দুই দেওয়ালের দুদিকে বড় বড় দুটি রঙীন ছবি—পরীদের নাচ আর চানের ছবি। সুরথের মনে হয়, ঘরটাই একটা রাজরাজড়ার ঘর।

এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, যে খুশি সে কেদার-ঠাকুরের মণ্ডপবাড়ির যাত্রার মহড়ায় ঢুকতে পায়। যাদের নিয়ে তাঁর যাত্রার দল, তাদের অবিশ্যি বারণ নেই। বাদবাকী কারোর সে-ঘরে ঢোকবার অনুমতি নেই। কেদারঠাকুরের যেমন রাশভারি চেহারা, তেমনি দাপুটে লোক তিনি। দেখলেই মনে হয়, রাজার মতো লোক। তাঁর চুলে অবিশ্যি পাক ধরেছে, কিন্তু ঘাড় অবধি ঝাকড়া চুল। খাড়া নাক, টান টান চোখের তারাগুলো ভারি ঝকমকে, টকটকে ফরসা, রঙ, আর রাজারাজড়ার মতোই লম্বা চওড়া মানুষ। সুরথের বাবার রঙও টকটকে ফরসা, কিন্তু ও হিসাব করে দেখেছে, কেদারঠাকুর বাবার থেকে অনেক লম্বা চওড়া মানুষ। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ। জামা গায়ে দেন খুব কম। বেশিরভাগ সময়ে খালি গায়ে তাঁর মোটা পৈতাগাছাটি ক্রশবেল্টের মতো ঝোলে। যেমন নিজের হাতে বাজনা বাজাতে পারেন, তেমনি মিষ্টি দরাজ গলায় গান গাইতে পারেন। আবার যখন আসরে পার্ট করতে নামেন, তখনো তিনি সবার সেরা। তা সে নদের নিমাই; সিরাজদ্দৌল্লা, কংসাসুর, যা-ই করুন।

সুরথ দেখেছে, ওর বাবার সঙ্গে কেদারঠাকুরের দেখা হলে, দুজনেই কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করেন, হেসে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু আড়ালে এসে বাবা বলেন, 'লোকটার সব ভালো, গোলমাল যতো, সব ওই যাত্রার দলে। শহরের যতো উড়নচণ্ডে নিয়ে ওর মতো লোক কেন যাত্রা করে বেড়ায়, বুঝতে পারি না।'

সুরথের কেমন খটকা লাগে, উড়নচণ্ডে কথাটা শুনে। ও দেখেছে, শহরের অনেক বড় বড় লোক কেদারঠাকুরের যাত্রার দলে আছেন। এ বিষয়ে মোক্তারদাদুর মতামতটা একটু আলাদা। তিনি বলেন, 'লোকটা গুণী, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বোকা।'

বোকা! শুনে সুরথ নিজেই বোকা হয়ে মোক্তারদাদুর দিকে তাকিয়ে থাকে, জিজ্ঞেস করে, 'গুণী আবার বোকা হোন কেমন করে?'

মোক্তারদাদু বলেন, 'বোকা খালি, হাড় বোকা। বোকারাই খোশামুদে রামপেসাদে হয়। কেদারঠাকুরের বাপ পিতামহ কিছু টাকা পয়সা সম্পত্তি রেখে গেছে বটে, তা বলে যে তোমার পায়ে হাত দিয়ে দেবতা বললেই, যা চাইবে, তা-ই দিয়ে দেবে? একে বোকা বলে না তো, কী বলে? এই যে যাত্রার দলের এতো খরচ খরচা, সেটা তো তোমাকে উশুল করতে হবে। তা নয়, যেই কেউ এসে হাতে পায়ে ধরলো, অমনি বিনে পয়সায় তার ওখানে গিয়ে যাত্রাপালা করে এলো। শুধু তাই? উবুজে নিজের গাঁটের পয়সাও খরচ করে আসে। এভাবে কি দল রাখতে পারবে নাকি? ও তো বোকা-ই!'

মোক্তারদাদুর কথাগুলো এমন যুক্তিসই, কাটান করা চলে না। সুরথ মন খারাপ করে বলে, 'উনি এরকম করেন কেন? না করলেই তো পারেন।'

মোক্তারদাদু বলেন, 'তা কী করে পারবে। ওর মনটা যে নরম, কারোর দুঃখ দেখতে পারে না। ওইখানেই রাম মরেছে বেগুনে।'

'রাম মরেছে বেগুনে' কথাটার অর্থ, সেই প্রথম মোক্তার-দাদুর কাছে জানা গিয়েছিল। এর ব্যাখ্যাটা হলো, লোকে যা কিছুই বড় বলে, সব রাম দিয়ে বলে। যেমন রাম দা, রাম শিঙে, রাম ওস্তাদ। অর্থাৎ রাম দিয়ে বললে বড় বোঝায়। কিন্তু এক ধরনের জঙলা গাছে, বেগুনের মতো দেখতে খুদে খুদে ফল ধরে, তার নামও রাম বেগুন। সেইজন্যই বলে, রাম সবখানেই বড়, ছোট একমাত্র সেই বেগুনেই। তা-ই, রাম মরেছে বেগুনে। কেদারঠাকুরও খুব বড়, কিন্তু পরের দুঃখে, আর নরম মনের জন্যই লোকটা মরেছেন। কথাটা শুনে সুরথের খুব হাসি পেয়েছিল। তারপরেই ঠিক যেন বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠার মতো, একটা কথা ওর মনে পড়ে গিয়েছিল। মিটিমিটি হেসে বলেছিল, 'আমি আর একজনের কথা জানি, কেদারঠাকুরের মতোই, রাম মরেছে বেগুনে।'

মোক্তারদাদু তাঁর মোটা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'তাই নাকি?

কে বলো তো?'

সুরথ বলেছিল, 'তাঁরও মনটাও খুব নরম, কারোর দুঃখ সইতে পারেন না। কেউ কাছে এসে হাত পাতলেই, পকেটে যা থাকে, তাই তুলে দেন।'

মোক্তারদাদু খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বটে? কে সে?'

সুরথ বলেছিল, 'তাঁকে এ শহরের সবাই জানে, নাম মনোমোহন মোক্তার।'

মোক্তারদাদু প্রথমটা খুবই হতভম্ব হয়ে গেছলেন, তারপরে তাঁর ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে, দাড়ি নাড়িয়ে বলেছিলেন, 'মোটেই না, ওসব একদম ছেদো কথা। আমার মন মোটেই নরম না। কোনো মক্কেল আমাকে একটি পয়সা ফাঁকি দিতে পারে না। ও সব বিষয়ে আমি খুব কড়া।' সুরথ খুব হেসেছিল। কারণ জানতো, কথাটা ও মোটেই মিথ্যা বলে নি। সবাই তাঁকে বলে, সদাশিব মানুষ, গরীবের মা বাপ। কিন্তু উনি, বলতে গেলে ছেলেমানুষের মতোই মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'তুমি তা হলে আমাকে মোটেই চেনো না। আমি কেদারঠাকুরের মতো বোকা না। আমি যাত্রার দলের রাজা না, মনোমোহন মোক্তার।'

সুরথ কেবল সুর করে গেয়ে উঠেছিল,

'তিনি হিন্দু মোসলেম ভেদ জানেন না,
দয়ার অবতার।'

মোক্তারদাদু বলেছিলেন, 'যতো সব ফালতু কথা।' কিন্তু তর্ক করেন নি, চোখ বুজে তালমিছরি চুষেছিলেন।

মোক্তারদাদুর সঙ্গে কথা বলে, সুরথের কাছে কেদারঠাকুরের মর্যাদা কমে নি মোটেই, বরং বেড়েছে। কিন্তু মোক্তারদাদু যা-ই বলুন মণ্ডপবাড়ির যাত্রার মহড়ায় ঢুঁ মারা সহজ ব্যাপার না। কেদারঠাকুরের ভাইপো সতু, সুরথের বন্ধু। ওদের দুজনের একটা জায়গায় মিল, সতু খুব ভালো নৌকা চালাতে পারে, সাঁতারও কাটতে পারে। বাড়ির লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে, ওরা অনেক দিনই, নৌকা ভাড়া করে, নিজরাই নদী পাড়ি দিয়েছে। শহরের একধারে, নদীটা মোটেই ছোটখাটো না। যেমন তার ঢেউ, তেমনি তার স্রোত। একবার যদি একটা স্টিমার চলে যায়, তার ঢেউয়ে ছোট নৌকা মোচার খোলার মতো লাফায়। আর স্টিমার বা লঞ্চের গায়ে ধাক্কা যদি লাগে, কথাই নেই। মাঝ নদীতেই ভরাডুবি। যতোই সাঁতার জানা থাক, মাঝ নদীতে ভেসে থাকা খুব কঠিন। কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। এমনিতেই সময়টা ছিল বর্ষাকাল। নৌকা ছাড়ার পরেই উঠেছিল বাতাস। দুজনের সাধ্য কি, নৌকা ঠিক রাখে। একদিকে ঢেউয়ে উথালি পাথালি, অন্যদিকে বাতাসের টানে নৌকা উল্টো দিকে সাঁ সাঁ করে চলতে আরম্ভ করেছিল। এমন কি নৌকায় জল উঠছিল ছলকে ছলকে। ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল এক মুসলমান জেলে নৌকার কয়েকজন মাঝির। তারা তাড়াতাড়ি নৌকা চালিয়ে কাছে এসেছিল, টেনে ধরেছিল সুরথদের নৌকা। তারপরে জেরা, কোথাকার ছেলে ওরা, কাদের নৌকা নিয়ে কোথায় চলেছে। জবাব শুনে এক দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝি, এই মারে তো সেই মারে। নিজেদেরই নৌকার সঙ্গে সুরথদের নৌকা বেঁধে, বেয়ে নিয়ে গিয়েছিল শহরের ঘাটে, বলেছিল, ওদের ধরিয়ে দেবে ঘাট-পুলিশের হাতে। সতুটা কেঁদেই ফেলেছিল। এমনিতে ও গায়ে হাতে পায়ে খুব শক্ত, সব সময়ে এমন ভঙ্গি করে, যেন মস্ত ব্যায়ামবীর। কোনো কারণে ভয় পেলে বা রাগ হলে, পৈতা বের করে দিব্যিগালা ওর স্বভাব। প্রথমে ও তা-ই করেছিল। তারপরে মাঝিদের জেদ দেখে, হাউমাউ করে কেঁদেই উঠেছিল। সুরথের অবস্থা ওর থেকে ভালো ছিল না। তবে ভয় পেলে বা রাগ হলে, গুম্ খেয়ে যাওয়া ওর স্বভাব। তখন ও মনে মনে সব রকম শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। রক্ষে এই, মাঝিরা শেষ পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দিয়েছিল। সেই থেকে মেঘ বৃষ্টি বাতাস দেখলে, আর ওরা নৌকা বাইতে যায় না। আর, মোক্তারদাদুকে সব কথা বললেও, এ ঘটনাটা কখনো বলে নি। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, এ ঘটনাটা শুনলে, মোক্তারদাদু খুব রেগে যাবেন, এমন কি বাবাকেও বলে দিতে পারেন।

সতুর জ্যাঠামশাই হলেন কেদারঠাকুর। কিন্তু যাত্রার মহড়ার সময়, সতুও কোনোদিন মণ্ডপবাড়িতে ঢুকতে পায় না। অবিশ্যি মহড়ার সময়টা বিদ্‌কুটে, সন্ধেবেলা পড়তে বসার সময় সেটা। তবু সুরথ সেখানে গিয়েছে, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, সেইরকমভাবে। আর কী একটা আশ্চর্য ব্যাপার, অমন মেজাজী কেদারঠাকুর ওকে কোনোদিন ভাগিয়ে দেন নি। ও প্রথম যেদিন মণ্ডপবাড়ির সেই ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেদারঠাকুর তখন একজনকে তার পার্ট শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছিলেন। অন্যরা তা দেখছিল। হঠাৎ তাঁর নজর পড়েছিল সুরথের ওপর, আর ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কে রে তুই? তোকে তো কখনো দেখি নি?'

কেদারঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে আর ধমক শুনেই সুরথের প্রাণ কেঁপে উঠেছিল। ওর আসল ভয়টা ছিল, তাড়িয়ে দেওয়া অপমানের। একজন বলে উঠেছিল, 'এ তো আমাদের সখীর দলের কোনো ছেলে না!'

মহড়ায় এক একদিন একদল ছেলে থাকতো, যাদের বয়সটা সুরথের মতোই। তারা সবাই সখীর নাচের মহড়া দিতো। কেদারঠাকুর সুরথের আপাদমস্তক দেখে, আবার বলেছিলেন, 'কাদের বাড়ির ছেলে তুমি, কোথায় থাকো?'

সুরথ ওর পরিচয়টা দিয়েছিল। ভেবেছিল, এবার এক ধমকে কেদারঠাকুর ওকে বের করে দেবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, বলেছিলেন, 'তুমি বোসঠাকুরতামশায়ের ছেলে তা বাবা, এখানে কেন? পড়াশুনো নেই?'

সুরথ বেমালুম বলে দিয়েছিল, 'কাল ছুটি আছে কী না, তাই একটু দেখতে এসেছি।' কেদারঠাকুর বলেছিলেন, 'তা হলে একপাশে বসে দেখ।'

সুরথ এতো অবাক হয়েছিল, মনে হয়েছিল কেদারঠাকুর যেন আলাদা মানুষ। লোকে তাঁর সম্পর্কে যা বলে, আর তাঁকে যেরকম দেখায়, সেরকমটি তিনি মোটেই নন। সেটা ও পরেও অনেকবার টের পেয়েছে। কেদারঠাকুর বসতে বললেও, চৌকিতে উঠে বসবার সাহস ওর হয় নি। ওর বাবার বয়সী এক ভদ্রলোক, খুব মোটা সোটা, ফিটফাট বাবু ওকে ডেকে বলেছিলেন, 'এসো বৎস, বসো হেথা, হেরো মহড়া।' সুরথ ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করেছিল। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই ওকে হাত ধরে বসিয়েছিলেন।

যাত্রার মহড়ায়, যেতে ইচ্ছা করলেই, যাবার উপায় ছিল না। সময়টা খারাপ, পড়ার সময়। কৈফিয়ৎ দু জায়গাতেই। রোজ যাবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। শনিবারের সন্ধেটা বাঁধাধরা ছিল, অন্যদিনগুলোতে গোলমাল ছিল। শনিবার সন্ধেয় অশ্বিনীবাবু পড়াতে আসেন না। আর প্রায় প্রত্যেক শনিবার সন্ধেয়, বাবার গুরুদেব আসেন। শনিবারের সন্ধেয় বাড়ির মেজাজ আলাদা। কিন্তু মণ্ডপবাড়ির যাত্রার মহড়া দেখবার, গান শোনবার আকর্ষণটা এমনিই, সপ্তাহের একটি মাত্র দিনে মন ভরে না। মহড়াও অবিশ্যি রোজ হয় না। তা ছাড়া মাঝে মাঝে কেদারঠাকুর তাঁর দল নিয়ে বাইরে চলে যান। মফস্বলের গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে পালা করে বেড়ান। তখন মণ্ডপঘরের দরজাগুলো বন্ধ থাকে। ঠাকুর দালানে শোনা যায় কেবল পায়রার বক্‌বকম্। সুরথের মনটা খারাপ হয়ে যায়, আর কেমন একটা আফশোস হয়। ভাবে, আমিও যদি দলের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারতাম!' ভাবলেই মনটা বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ওর মনের কল্পনায় ভেসে ওঠে নানা দেশ, নানান রকম তার ছবি আর রকমারি লোকজন! তারপরেই আবার মনটা হতাশায় ভরে ওঠে। হুস্ করে একটা নিঃশ্বাস

পড়ে। সে সুযোগ বোধহয় কোনো দিনই পাবে না।

যাই হোক, সুরথকে দেখা গিয়েছে, শনিবারের সন্ধে ছাড়াও, মাঝে মধ্যে, অতি দুঃসাহস করে মণ্ডপবাড়ির মহড়ায় যেতে। তার অবিশ্যি কারণ থাকে। বিশেষ বিশেষ অভিনয়ের মহড়ার কথা আগে জানা থাকলে, ওর আর মন মানে না। কিন্তু বেশ কয়েকবার দেখলেও, কেদারঠাকুর ওকে সব সময়ে চিনে উঠতে পারেন না। তাই দেখলেই, ধমকে ওঠেন, 'এই তুই কে রে?' তারপরেই হেসে বলেন, 'ও, ছোটবোসঠাকুর? আজো পড়া নেই বুঝি? ঠিক আছে, বসে যাও এক ধারে।' তাঁর 'ছোটবোসঠাকুর ডাকটা সুরথের খুব পছন্দ। নিজেকে ওর কেমন একটু মান্যিগণ্যি মনে হয়। তা ছাড়া কেদারঠাকুর মাঝে মাঝে পার্ট বলে, ওকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন বুঝলে ছোটবোসঠাকুর?'

সুরথ জবাব দিতে পারে না। লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। অথচ সেই কথাটাই বুক ফুলিয়ে, খুব একটা হামবড়াই ভাব করে, মোক্তারদাদুকে গল্প করে। মোক্তারদাদু দাড়িতে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলেন, 'তোমার মতো সমঝদার বলে কথা! কেদারঠাকুর না জিজ্ঞেস করে পারে?'

সুরথ ভুরু কুঁচকে, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তার মানে আপনি বলছেন, আমি যাত্রার পার্টের কিছু বুঝি না?'

মোক্তারদাদু বলেন, 'তা তো মোটেই বলি নি। অমন যার যাত্রা গানের টান, তাকে আমি অবুঝ বলতেই পারি না। তা ছাড়া আমি তো ঘরে বসেই কেদারঠাকুরের আসল পার্ট শুনতে পাই।' বলে চোখ পিটপিট করে, মিটমিটিয়ে হাসেন। সুরথও হাসে। কথাটা মিথ্যে না। কেদারঠাকুরের নিমাই বা সিরাজদ্দৌলার পার্ট, সুরথ অবিকল নকল করে, মোক্তারদাদুকে দেখায় আর শোনায়। সুরথ যখন, 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে বুক চাপড়ে কাঁদে, আর বলে, 'ওগো প্রেমের ঠাকুর, মায়ার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দাও!'...তখন মোক্তারদাদুর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। কিংবা সিরাজদ্দৌলাকে যখন কারাগারের মধ্যে ঘাতক তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারতে থাকে, আর সুরথ সিরাজদ্দৌলার মতো চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আ হা, বড় কষ্ট! মোহাম্মদীবেগ, কেন ভাই আমাকে এমন করে হত্যা করছ? তোমাকে তো ভাই আমি অনেক উপকার করেছি। এই কি তার প্রতিদান! আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তা শুধু ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করেছি। আহ্ আহ্, পায়ে পড়ি, আর আমাকে এমন করে কুপিয়ে মেরো না।'......তখন মোক্তারদাদু সুরথকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'সত্যি, কী মহাপাপ! চুপ করো ভাই, আমার প্রাণটা কেমন অস্থির হয়ে উঠছে!'

তারপরে একটু শান্ত হয়ে, গড়গড়ার নল টানতে টানতে বলেন, 'সবই তো বুঝলাম ভায়া, তোমার যে কী ভবিষ্যৎ, তাই আমি ভাবি।'

সুরথ সে কথার কোনো জবাব দেয় না।

একদিন সন্ধেবেলা, সুরথ মণ্ডপবাড়িতে ঢুকে দেখেছিল, কেদারঠাকুর একলা। আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছেন। সুরটা যেন চেনা চেনা, কান্নায় ভরা। সুরথের মনে হয়েছিল, বেহালায় গাল চেপে, কেদারঠাকুরই যেন কাঁদছেন। ওরকমটি ও আর কখনো দেখে নি। অমন জেল্লাদার মণ্ডপঘরের চেহারাটাই যেন কেমন পাল্টে গিয়েছিল। আলো জ্বলছিল মাত্র একটা। বেহালার বাজনাটা শুনতে খুবই ইচ্ছে করছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস হয় নি। সুরথ গুটি গুটি পা বাড়িয়েছিল দরজার দিকে। তখনই হঠাৎ বাজনা থেমে গিয়েছিল, কেদার-ঠাকুর বলে উঠেছিলেন, 'কে? কে ওখানে?'

সুরথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কেদারঠাকুরের গলাটা যেন কেমন মোটা আর জড়ানো শোনাচ্ছিল। সুরথ একটু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু পালায় নি। আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে বলেছিল, 'আমি।'

কেদারঠাকুর বলেছিলেন, 'ও, ছোটবোসঠাকুর। আজ তো বাবা আমাদের মহড়া নেই। আমাদের যে রাজা পরীক্ষিতের পার্ট করতো সুরেন বক্সী, সে মারা গেছে। এখন কদিন মহড়া বন্ধ। সুরেন বড় ভালো মানুষ ছিল। যাত্রার আসরে রাজা পরীক্ষিৎ যখন মরে যেতো, তখন আমি ব্যায়লায় এ সুরটা বাজাতাম।

সুরথ স্পষ্ট দেখেছিল, কেদারঠাকুরের চোখ দুটো জলে টলটল করছে। তখন ও বুঝতে পেরেছিল, সুরটা কেন চেনা চেনা লেগেছিল। সুরেন বক্সীর দশাসই বিরাট চেহারা, বড় বড় চোখ, আর হাসিখুশি মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মনটা কেমন টনটন করে উঠেছিল।

কেদারঠাকুর বেহালাটা হাত থেকে নামিয়ে, ছরের বালামে রজং ঘষতে ঘষতে বলেছিলেন, 'আচ্ছা ছোটবোসঠাকুর, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

সুরথ আরো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কী জিজ্ঞেস করবেন কেদারঠাকুর? কেদারঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি হলে আমাদের বোসঠাকুরমশায়ের ছোট ছেলে। লেখাপড়া শিখে মস্ত পণ্ডিত হবে। তোমার কেন এ সব যাত্রা টাত্রা গান বাজনার দিকে ঝোঁক?' সুরথ প্রথমে ভেবেছিল, কেদারঠাকুর বোধহয় রাগ করে জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে তা মনে হয় নি। বরং একটু যেন হাসছিলেন। সুরথ বলেছিল, 'আমার ভালো লাগে।' কেদারঠাকুর বলেছিলেন, 'এর পরে আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু বাবা, এসব ভালো লাগলে তো হবে না। তোমরা হবে আরো বড় কিছু, যাত্রা থিয়েটার গান বাজনা দিয়ে কি বড় হওয়া যায়?'

সুরথ বলেছিল, 'রবীন্দ্রনাথ তো থিয়েটারে পার্ট করতেন, গান বাজনাও করতেন।' কেদারঠাকুর অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ? ও, তুমি রবিঠাকুরের কথা বলছো?' সুরথ বলেছিল, 'হ্যাঁ। আমি ওঁর থিয়েটারের ছবি দেখেছি।'

কেদারঠাকুর চোখ বড় করে, খুশি খুশি মুখে বলেছিলেন, 'তুমি তো দেখছি, মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে গেছ। কিন্তু তিনি তো ছিলেন মস্তবড় কবি, লিখিয়ে, গাইয়ে, অভিনেতা। তুমি কি সেরকম হবে, ভেবে রেখেছ?' সুরথ এক কথায়, মনের ইচ্ছেটা বলতে পারে নি। লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে হেসেছিল। কেদারঠাকুর বলেছিলেন, 'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু ছোটবোসঠাকুর, সে ভারি শক্ত ব্যাপার!'

সুরথ ভেবেছিল, উনি নিশ্চয়ই লেখাপড়ার কথা বলবেন। তা-ই তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'জানি!'

কেদারঠাকুর খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জানো?'

সুরথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, অনেক লেখাপড়া শিখতে হবে।'

কেদারঠাকুর বলেছিলেন, 'ঠিক কথা। বড় হলে, আরো একটা কথা বুঝতে পারবে, এর মধ্যে আনন্দ যতো আছে, দুঃখও ততো আছে। যাই হোক, এতো কথাই যখন হলো, তোমাকে একটা বাজনা বাজিয়ে শোনাই।'

বলে তিনি মুখ দিয়ে ঘুঙুরের শব্দ করে, বেহালায় তালে তালে সুর বাজিয়েছিলেন। চেনা গানের সুর,

'ঝিঙে ফুল, কাঁকুড় কাঁকুড়
ও কনে বউ ও কনে বউ
ঘোমটা টানো
পথে ঠাকুর।'......

সুরথের এরকম ঘটনা বলতে গেলে, বিস্তর গল্প বলতে হয়। আরো অনেক লোকের কথা বলতে হয়। আর তারা এমন লোক, ওর মতো ছেলের পক্ষে যাদের সঙ্গে মেলামেশা

একেবারে বেমানান। বাঁশিওয়ালা, ছবি আঁকিয়ে, অভিনেতা, গাইয়ে বাজিয়ে, এসব তো আছেই, শহরের কোথায় বাজীকর, জাদুকর আছে, তাও ও জানে। ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও আছে। এমন কি, সতেরো আঙুলে লোকটা, যার একটা হাতের তিনটে আঙুল কাটা, সে লোহার তার দিয়ে নানা রকম নকশা কাটা জিনিস বানাতে পারে। তা-ই দেখেই সুরথের একটা বেলা কেটে যায়। কিন্তু বাড়িতে এসব মোটেই ভালো চোখে দেখা হয় না। যতোই লুকিয়ে করুক, কখনো কখনো ধরা পড়তেই হয়। তখনই লাগে গোলমাল। সেইজন্য বাড়িতে ও একটি মূর্তিমান অশান্তি। অথচ ইস্কুলের ফুটবল খেলায়, এখনই ওর মেজদা নাম করা সেন্টার ফরওয়ার্ড। ওর বড়দাদা কলকাতায় রেলের একজন বড় চাকুরে। সেটা শুধু লেখাপড়ার জন্য না, একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় বলেও। সুরথ যাবে খেলার মাঠে? সে সময়টা ও হয় তো তখন নিকিরি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, জঙ্গলের ধারে জলায় গিয়ে ছিপ দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরছে।

যাই হোক, মোক্তারদাদুর সঙ্গে তাঁর দেশে বেড়াতে যাবার বৃত্তান্তটাই এখন বলা যাক।

মহালয়ার দু'দিন পরে, ভোরবেলা সুরথকে দেখা গেল, মোক্তার-দাদুর সঙ্গে, স্টিমারের দোতলার কেবিনে, জানালার ধারে বসে আছে। 'বিজয়' নামে মস্ত স্টিমার মেঘনা নদীর ওপর দিয়ে, জল কেটে চলছে। মাঝ নদী দিয়ে স্টিমার চলেছে। দু পাশে তীরভূমি, মাঠ গ্রাম তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। রেলগাড়ির মতো দ্রুত না হলেও, স্টিমার জলের ওপর দিয়ে বেশ জোরেই চলে। সেটা জলের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। রেলগাড়ি যখন মাঠের ওপর দিয়ে চলে, আর মনে হয় মাঠও রেলগাড়ির সঙ্গে দৌড়চ্ছে, স্টিমারে বসে, নদীকেও সেইরকম মনে হয়। দূরের দিকে তাকালে অবিশ্যি মনে হয়, স্টিমার যেন তেমন জোরে চলছে না। কিন্তু মাছ ধরা জেলেদের নৌকাগুলোকে দেখাচ্ছে যেন মোচার খোলার মতো ছোট, আর চোখের নিমেষে হারিয়ে যাচ্ছে।

সুরথের খুশি উজ্জ্বল চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, ও যেন একটা দারুণ সুখের স্বপ্নে ডুবে আছে। এর আগেও ও লঞ্চে বা স্টিমারে চেপেছে। কিন্তু এতো বড় স্টিমারে কখনো চাপে নি। এই 'বিজয়' নামে স্টিমারে ওঠবার সময়েই, বাইরে ডাঙা থেকে দেখে, ওর মনে হয়েছিল, যেন রেলিং ঘেরা প্রকাণ্ড একটা আড়াইতলা বাড়ি। মোক্তারদাদু ওকে আগেই

বলে রেখেছেন, স্টিমারটা প্রথমে মেঘনা নদী দিয়ে যাবে, তারপরে গিয়ে পড়বে ব্রহ্মপুত্র নদে। অবিশ্যি ট্রেনে চেপে, আরো দূরে গিয়েও অন্য স্টিমারে ওঠা যেতো। মোক্তারদাদু তা চান নি। মালপত্র নিয়ে বারে বারে ওঠা নামার দরকার কী? একেবারে স্টিমারে ওঠাই ভালো। পোঁছুতে দু চার ঘণ্টা দেরি হয় বটে। হলেই বা, ক্ষতি কী? এ তো আর কোর্ট কাছারির কাজে যাওয়া না, দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া।

সুরথ মনে মনে এসব ভাবছে, আর দু চোখ ভরে দেখছে, স্টিমারের জল কেটে যাওয়া ঢেউগুলো কী রকম ভাঙতে ভাঙতে, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ওর চুলগুলো নরম ঝাউপাতার মতো উড়ছে, কপালে পড়ছে। উড়ছে শাদা কালো ডোরাকাটা সার্টের কলার। ও বসে দেখছে বটে, কিন্তু আসলে ওর বুকের ভেতরটা নদীর ঢেউয়ের মতোই দুলছে। ওর মনে হচ্ছে, ও যেন স্টিমারটারও আগে আগে ছুটছে।

উড়ছে মোক্তারদাদুর দাড়িও, আর চকচকে টাক মাথার কয়েকগাছি চুল। কিন্তু তিনি গলাবন্ধ কোটের, গলার বোতামটিও এঁটে রেখেছেন। কদিন ধরে বেশ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আকাশে এখনো বেশ মেঘের ছড়াছড়ি। কেবিনের জানালা দিয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। তবে মেঘের গায়ে রোদ লেগে, নানা রকমের রঙ ফুটেছে। নদীর বুকে বাতাসটাও জলো। মোক্তারদাদুর ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আছে। তিনি সুরথকে বলছিলেন, 'তোমার বাবার অবিশ্যি তোমাকে আসতে দেবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। তাঁর ভয়, তুমি কখন কী একটা করে বসবে, আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবো। আমি বলেছি, সুরথ আমার কথার অবাধ্য কখনো হয় না, সেজন্য তুমি একটুও ভেবো না। কথাটা মনে রেখো ভাই, বুঝলে? তা না হলে, আমার মান ইজ্জত থাকবে না।'

মোক্তারদাদুর কথা শেষ হবার আগেই, হঠাৎ এক ঝাঁক পাখী উড়ে যেতে দেখে, সুরথ জিজ্ঞেস করে উঠলো, 'ওগুলো কী পাখী মোক্তারদাদু?'

সুরথ আসলে মোক্তারদাদুর কথা শুনছিলই না। নদী, ঢেউ, জেলে নৌকা, দূরের গ্রাম এসবই দেখছিল। তার মধ্যেই হঠাৎ পাখীর ঝাঁক। মোক্তারদাদু একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে, পাখীর ঝাঁক দেখে বললেন, 'মনে তো হচ্ছে কাদাখোঁচা, ঠিক ধরতে পারছি নে। চোখে চশমাটা নেই তো। বেলেহাঁসও হতে পারে।'

সুরথ একটু ভয় ভয় অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'নদীর জলে পড়ে যাবে না?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'বোধহয় না। পাখীরা ওরকম পারাপার করে থাকে। কিন্তু আমার কথাগুলো তুমি শুনেছ তো?'

সুরথ দূরে মিলিয়ে যাওয়া পাখীর ঝাঁকের দিকে চোখ রেখে বললো, 'এর পরে ব্রহ্মপুত্র নদী পড়বে, সেই কথা তো?'

মোক্তারদাদু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মোটেই না।'

সুরথ এবার মোক্তারদাদুর দিকে ফিরে তাকালো। তিনি বললেন, 'প্রথম কথা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী নয়, নদ। ব্রহ্মপুত্র এলে, আমি নিজেই বলবো। আমি বলছিলাম, বোসঠাকুরতার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল, সেই কথা। পাছে তুমি কোনোরকম দুষ্টুমি করো, সেজন্য তোমার বাবা আসতে দিতে চাননি। আমি কথা দিয়েছি—।'

সুরথ বলে উঠলো, 'আমি ভালো হয়ে থাকবো। আমি তো বলেছি ভালো হয়ে থাকবো। বলিনি?'

সুরথের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে উঠলো।

মোক্তারদাদুর দাড়ির ফাঁকে একটু হাসি দেখা দিল। বললেন, 'তা বলেছ। তবু আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম, আমার কথা না থাকলে, মান ইজ্জত বেবাক যাবে।'

সুরথ গম্ভীরভাবেই বললো, 'জানি তো।'

মোক্তারদাদু ওর কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, 'রাগ করো না। মনটা আমার দুর্বল তো, সব সময়েই চিন্তা হয়।'

এ সময়েই অন্যান্য দুঃখের কথাগুলো সুরথের মনে পড়ে গেল। বললো, 'বাবা আমাকে কোথাও যেতে দিতে চান না। আপনার সঙ্গে যাচ্ছি শুনে দিদি পর্যন্ত চুল টেনে দিয়েছে, আর মেজদা—।'

রীতিমতো কান্না এসে সুরথের গলায় কথা আটকিয়ে গেল। মোক্তারদাদু ওর কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'জানি, কাল রাত্রে খুব জোর ফাইট মেরেছে। আসলে ওরা তোমাকে বুঝতে পারে না। তুমি শুধু বেড়াবার আনন্দে বেড়াতে যাও না, তুমি হলে সুদূর পারের রহস্য সন্ধানী, আমি জানি।'

সুরথ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলো না। মোক্তারদাদুর দাড়ির ভাজে আর চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো, উনি ঠাট্টা করছেন কী না। সেরকম মনে হলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'সুদূর পারের রহস্য সন্ধানী মানে?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'মানে, যাদের মন অনেক কিছুই খুঁজে বেড়ায়, আর তাতেই ভেসে যায়। এখন কথা হলো, খুঁজতে গিয়ে এমন ভাসাই হয় তো ভাসলে এ বুড়ো মনোমোহন মোক্তারের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল।'

বলে চোখের পাতা পিটপিট করে হাসলেন। সুরথও হেসে উঠলো। তিনি কেবিনের টেবিল থেকে কৌটো নিয়ে, সুরথকে তাল মিছরির টুকরো দিয়ে, নিজের মুখে এক টুকরো বচ্ পুরে দিলেন। বললেন, 'সেইজন্যই একটু বলছিলাম আর কী। পাখীগুলো কি এখন আর দেখা যাচ্ছে?'

বলে দূরের আকাশের দিকে তাকালেন। সুরথও তাকালো। পাখীর ঝাঁক তখন অদৃশ্য। নদীর বুকে জেলে নৌকা ভাসছে। আশ্বিন মাস, নদী এখনো ভরা। বড় বড় পাল খাটিয়ে, বড় বড় নৌকাও চলেছে কিছু কিছু। দু পাশের তীরে সবুজ ধানের খেত-ই বেশি। এখন মাঠ জুড়ে আমন।

সুরথের মনটা কেবিনের মধ্যে টিকছিল না। কেবিনের জানালা দিয়ে যেন চোখ ভরে সব দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া, বাইরের ডেক থেকে লোকজনের হাসি কথাবার্তার শব্দ একটু আধটু ভেসে আসছে। স্টিমারে ওঠার সময়েই দেখেছে, নিচে ওপরে ডেক জুড়ে, যাত্রীরা শতরঞ্চি মাদুর বিছানা পেতে বসেছে। যেন নানা লোকের নানা হাট বসেছে সেখানে। কেন যে মোক্তারদাদু এরকম একটা কেবিনের মধ্যে এসে ঢুকলেন। বাইরে অনেকের সঙ্গে থাকলে কতো ভালো হতো। কেবিনের মধ্যে নিজেকে বন্দী মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ও বলেই ফেললো, 'মোক্তারদাদু, একটু বাইরে যাবো?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'যাবে? যেও। এখুনি জলখাবার খেতে দেবে, খেয়ে তারপরে যেও।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই, জলখাবারের ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঢুকলো। কলা ডিম পাউরুটি মাখন আর চা। সুরথ খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়িই সারলো। চা ও খায় না। মোক্তারদাদুর দাঁত নেই, তিনি একটু আস্তে আস্তে খান। সুরথ বললো, 'এখন আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'ঘুরে এসো। রেলিং-এর খুব ধারে যেও না। দৈবের কথা কিছুই বলা যায় না। ঝুঁকতে গিয়ে পড়ে গেলে, একেবারে ভরাডুবি।'

সুরথ সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। দু পাশে কেবিনের, মাঝখানের সরু প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই, একেবারে নতুন জগত! আর এখানে এসে না দাঁড়ালে বোঝা-ই যায় না, এ জগতটা ভাসমান এবং চলন্ত। প্রকাণ্ড স্টিমার আর বিশাল নদীকে যেন তার আসল রূপে দেখা যাচ্ছে। সুরথ পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো। কোনো জায়গায় তাশ খেলা চলছে। দাবা খেলাও চলছে দু এক জায়গায়। কেউ কেউ গল্প গুজব হাসাহাসি করছে। মেয়ে বউরাই সেটা

বেশি করছে। কোথাও বা কোনো বিষয় নিয়ে বেজায় তর্কাতর্কি লেগে গিয়েছে। তার মধ্যেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড় ঝাঁপ করছে। বড়োরা বকুনি দিলেও ওরা শুনছে না। কোথাও বা দই চিড়ে কলা দিয়ে ফলার হচ্ছে। আবার কেউ কেউ এই হট্টগোলের মধ্যেই. দিব্যি গুটিশুটি হয়ে ঘুমোচ্ছে।

আরো কিছু এগিয়ে যাবার পরে দেখা গেল, রীতিমতো রেস্টুরেন্ট। কেক বিস্কুট কলা চানাচুর ডিম আর চা। বেঞ্চিতে বসে অনেকেই তা খাচ্ছে. আর নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। পাশেই আবার একটা স্টেশনারি দোকান. শোকেসে তেল সাবান শাম্পু মাজন পাউডার, অনেক কিছু সাজানো।

রেস্টুরেন্ট আর দোকানের পাশ দিয়ে. পিছনে যাবার ফালি পথ, রেলিং ঘেঁষে। সুরথ আস্তে আস্তে সেদিকে গেল। পিছনে গিয়ে দেখলো. মাঝখান দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। আর সামনেটা রেলিং ঘেরা, স্টিমারের শেষ। সেখানে কেউ নেই. একেবারে ফাঁকা। সুরথ সেখানে দাঁড়িয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। পুরো নদীটা দেখা যাচ্ছে। সামনে বহুদূরে একটা বাঁকের মুখে নদীটা যেন আকাশে মিশে গিয়েছে। নদীটা যে কতো চওড়া আর বিশাল, এখন বোঝা যাচ্ছে। আর নানা রকমের এতো নৌকা যে নদীতে ভাসছে, এখানে এসে না দাঁড়ালে, তা মোটে বোঝা-ই যেতো না। পাল তোলা নৌকাগুলোকে যেন মনে হচ্ছে. স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে চলছে. দূর থেকে এইরকম মনে হচ্ছে। এখানে বাতাসটাও বেশ জোর।

সুরথ কতোক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল. ওর খেয়ালই নেই। হঠাৎ পিছনে খস্ খস্ শব্দে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। দেখলো. ওরই বয়সী একটা ছেলে, মুখে সিগারেট নিয়ে. দেশলাইয়ের কাটি জ্বালাবার চেষ্টা করছে, আর বাতাসে বারে বারে নিভে যাচ্ছে। কড়াদের মতো ট্রাউজার আর সার্ট পরা ছেলেটা কেমন হতে পারে, ও ঠিক বুঝতে পারলো না। বারে বারে দেশলাইয়ের কাটি নিভে যেতে দেখে. ও মনে মনে বেশ খুশি হচ্ছিল। নিশ্চয়ই লুকিয়ে সিগারেট খেতে এসেছে। আর এই বাতাসে যে কাঠি ধরাতে পারবে না. তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য, অনেকবারের চেষ্টায়. ছেলেটা ঠিক সিগারেট ধরিয়ে ফেললো। আর তারপরে সুরথের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো। চোখাচোখি হতে, আর ছেলেটাকে হাসতে দেখে. সুরথের লজ্জা হলো, রাগও হলো। ও তাড়াতাড়ি নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে. ছেলেটা ওর কাছে এসে বললো. 'এই, খাবি? আরো সিগারেট আছে।'

তার মানে ছেলেটা ওকে 'তুই' করে বলছে। তাও আবার সিগারেট খাবার জন্য! মনে মনে ওর আরো রাগ হলো। বললো, 'না।'

ছেলেটা গায়ে পড়ে আবার বললো. 'তুই বুঝি সিগারেট খাস না?'

সুরথ কোনো জবাব দিল না। সতুর সঙ্গে একদিনই ও সিগারেট খেয়েছিল, ভালো লাগেনি।

সে কথা এ ছেলেটাকে ওর বলতে ইচ্ছা করলো না।

ছেলেটা আবার বললো, 'আমি মাঝে মাঝে খাই, বেশ লাগে। স্টিমারে চাপলে আরো বেশি খেতে ইচ্ছা করে।

সুরথ একটু অবাক হয়ে, ছেলেটার দিকে একবার দেখলো। ছেলেটা হেসে বললো, 'সত্যি বলছি, স্টিমারের হাওয়ায় খুব মজা লাগে।' বলে ভক্ করে এক মুখ ধোয়া ছাড়লো, আর নিমেষে তা বাতাসে মিশিয়ে গেল। সুরথ কথা না বলে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কোথায় যাবি?'

নতুন অচেনা ছেলের মুখে তুই-তুই শুনে, সুরথের মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ও কোনো জবাব তো দিলই না, একটু-খানি দাঁড়িয়ে থেকেই, ছেলেটার কাছ থেকে সরে, পিছন ফিরে এগিয়ে গেল। কয়েক পা যেতেই, ছেলেটার গলা শুনতে পেল, 'তুই স্টিমারের মেসিন ঘর দেখেছিস? আর বয়লারে কয়লা দেওয়া?'

কথাটা শুনে সুরথ এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো, যেন ওর পায়ের তলায় চুম্বক টেনে ধরেছে। স্টিমারের মেসিন ঘর আর বয়লারে কয়লা দেওয়া, ও কখনো দেখে নি। কোথায় যে মেসিন ঘর, আর কোথায় বয়লার, তা-ই ওর জানা নেই। কিন্তু ওই ছেলেটাই কি দেখেছে নাকি?

পিছন থেকে ছেলেটার গলা আবার শোনা গেল, 'যদি দেখতে চাস্, তোকে আমি দেখাতে পারি। হেড খালাসী ইয়াসিন চাচার সঙ্গে আমার ভাব আছে, আমাকে খুব ভালোবাসে।'

সুরথের মনটা কেমন চনমন করে উঠলো। স্টিমারের মেসিন ঘর, আর বয়লারে কয়লা দেওয়া দেখতে পাওয়াটা একটা দারুণ-সাংঘাতিক ব্যাপার বলে মনে হলো। কিন্তু ছেলেটা কি সত্যি কথা বলছে? হেড খালাসীর সঙ্গে ওর ভাব হবে কেমন করে? ও কি স্টিমারে কাজ করে? কখনোই তা হতে পারে না। না।

ছেলেটা এবার ওর কাছে এসে বললো, 'তোর বিশ্বাস হচ্ছে না, না?'

সেটা ঠিক কথা। সুরথ ছেলেটার দিকে ফিরে তাকালো। ছেলেটা প্রায় ওর মাথায় মাথায়, কিন্তু মাথার চুল বেশ বড় আর তেল চকচকে। ওর ট্রাউজার, জামা ঝকঝকে নতুন, গলায় কালো কারের সঙ্গে একটা চৌকো তাবিজ দেখা যাচ্ছে। আঙুলের ফাঁকে এখনো সিগারেটটা রয়েছে। সুরথ সন্দেহের চোখেই ওকে দেখছিল। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা বললো, 'আমার নাম বসন্ত সিং।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ ক্লাসে পড়ো?'

বসন্ত ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বললো, 'আমি আবার কোন্ কেলাসে পড়বো? আমি কি ইস্কুলে পড়ি নাকি?'

সুরথও এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তবে কী করো?'

বসন্ত সিগারেটে একটা টান দিয়ে হেসে বললো, 'আমি তো বাবা মা'র সঙ্গে ভাটিতে যাই, কাপড় কাচি।'

সুরথ একেবারে থ! ভাটিতে যায়? কাপড় কাচে? বসন্তর সিগারেটটা তখন প্রায় শেষ। ও সেটা রেলিং টপকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর হাসতে হাসতে বললো, 'তুই আমাকে ইস্কুলের ছাত্র ভেবেছিলি? ছিনাথ মাস্টেরের পাঠশালায় দু বছর পড়েছিলাম। আমরা হলাম রজক, বুঝলি? তোরা যাদের ধোপা বলিস। আমাদের তো আর কেউ নেই, তাই বাবা মা'র সঙ্গে আমি কাপড় কাচতে যাই। আমি না গেলে বাবা মা'র কষ্ট হবে না?'

সুরথের চোখের সামনে, বসন্তর গোটা চেহারাটাই যেন বদলিয়ে গেল। মনে হলো, বসন্ত একটি অসামান্য ছেলে! ও বাবা মায়ের সঙ্গে কাজ করতে যায়? এখন থেকেই ও কাজের ছেলে! তার মানে, ওকে দেখে যা মনে হচ্ছে, ও মোটেই তা না? ও একটা বড় মানুষের মতোই মানুষ!

সুরথের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ওদের বাড়িতে ভাজ করা পাঁজা পাঁজা শাড়ি ধুতি জামা প্যান্ট। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তুমি ইস্তিরি করতে পারো?'

বসন্ত ঠোঁট উল্টে হেসে বললো, 'কেন পারবো না। আমি এখন সব কাজই পারি, আড়ং ধোলাই পর্যন্ত।'

সুরথের হঠাৎ মনে হলো, বসন্তর সঙ্গে একদিন ও কাপড় কাচতে যাবে। বসন্ত জিজ্ঞেস করলো, 'মেসিন ঘর দেখতে যাবি?'

সুরথ তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে বললো, 'যাবো। কিন্তু ওই

যে হেড খালাসীর কী নাম বললে, তার সঙ্গে তোমার ভাব হলো কী করে?'

বসন্ত বললো, 'নদীর ধারেই তো আমাদের কাপড় কাচার ভাটি। স্টিমার যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমি মাঝে মাঝে যাই। এই যে আমি এখন যাচ্ছি, আমি কি টিকেট কেটে যাচ্ছি?'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তবে?'

বসন্ত বললো, 'আমি ইয়াসিন চাচার লোক, আমার টিকেট লাগবে না। স্টিমারে যাচ্ছি, আবার স্টিমার যখন ফিরে আসবে, তখন ফিরে আসবো। ইয়াসিন চাচাই আমাকে খাওয়াবে।'

'তোমার বাবা মা জানে?'

'জানবে না? আমি তো বলেই এসেছি।'

সুরথের মনে হলো, বসন্তর জীবনটা কতো সুখের! নিজের ইচ্ছায় ও যেখানে খুশি যেতে পারে, ওর বাবা মা তাতে রাগ করেন না। তাও কী না, একলা একলা স্টিমারে করে যাচ্ছে, আবার এই স্টিমারেই ফিরে আসবে। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'এ স্টিমার কখন ফিরে আসবে?'

বসন্ত বললো, 'আজ আর ফিরবে না, কাল ফিরে আসবে।'

তার মানে, পুরো দু'দিন ছুটি। পুরো দুটো দিন ও স্টিমারে বেড়াবে, স্টিমারেই থাকবে। তাও আবার টিকেট ফিকেটের কোনো বালাই নেই। খাওয়াবেও ইয়াসিন চাচা। ইস্, সুরথেরও যদি এরকম হতো! ভেবেই মনটা চনমনিয়ে উঠছে।

বসন্ত ডাকলো, 'মেসিন ঘর দেখবি তো চল্, আর দেরি করিস না।'

বসন্তর সঙ্গে সুরথ স্টিমারের দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলো। দেখা গেলো, একতলার ডেকেও লোকজন কিছু কিছু হোগলা মাদুর বিছিয়ে বসেছে। তবে একতলায় জায়গা কম। মাঝখানের অনেকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। গোলাকার বিরাট লোহার দেওয়াল দোতলার ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। তা ছাড়া একতলাটার ডেকে, এখানে সেখানে জল ছিটানো, ভেজা ভেজা, আর মানুষের পায়ে পায়ে ময়লার দাগ লেগেছে। নদীর জল খুব কাছ থেকে দেখা যায়, আর বোঝা যায়, স্টিমারটা জল কেটে, কতো জোরে ছুটছে।

মাঝখানের যে জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা, সেখানে ঢোকবার জন্য একটা লোহার শিকের দরজা রয়েছে। দরজার সামনে দিয়েই, সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচের দিকে। নিচে বিশেষ কিছু দেখা যায় না, অন্ধকার মতো। বসন্ত সেই শিকের দরজা খুলে, সুরথকে ডাকলো, 'আয়।'

বসন্ত নিচে যাবার সিঁড়িতে পা দিল। মেসিন ঘর দেখবার খুব কৌতূহল থাকলেও, নিচের অন্ধকারে নামার আগে, সুরথের মনটা একটু খচ্ খচ্ করে উঠলো। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েই ওর গায়ে যেন গরম ভাঁপ লাগছে, আর নিচের অন্ধকারে ছায়ার মতো দু একটা মূর্তিকে চলা ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। ছায়াগুলো যেন মানুষ না, আর কিছু। সুরথের আগ্নেয়গিরির গুহার ছবির কথা মনে পড়লো। কেমন একটু ভয় ভয় লাগছে। বসন্ত ততোক্ষণে দু তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। ওর কোনো ভয় ডর নেই। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, যাবি না?'

বসন্ত যেন বেশ বিরক্ত হয়েছে। সুরথ লজ্জা পেলো, ভয়ের কথাটা বলতে পারলো না। বসন্তর সঙ্গে নিচে নেমে গেল। নামতেই কে যেন চিৎকার করে উঠলো, 'হেই, কে রে তোরা?' বসন্ত তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি বসন্ত।'

তারপরে আর কিছু শোনা গেল না। সুরথ বসন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। দু একটা টিমটিমে আলো থাকলেও, বেশ অন্ধকার। আর গায়ে যেন আগুনের হলকা লাগছে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানে কয়লার একটা মস্ত স্তূপ। অন্ধকারটা একটু থিতিয়ে আসার পরে, সুরথ দেখতে পেলো, কয়েকজন কালি ঝুলি মাখা লোক, আশেপাশে কী সব করছে। কেউ কেউ বিড়িও খাচ্ছে। আশেপাশে নানান রকম শব্দ হচ্ছে। কেত্লিতে জল টগবগ করে ফুটলে যেমন সোঁ সোঁ শব্দ হয়, কোথাও সেই রকম হচ্ছে। কোথাও আবার সরু করে শিস্ দেবার মতো, তার মধ্যেই তালে তালে ঝম্ ঝম্, ঘ্যাটা ঘ্যাং, ঝম্ ঝম্, ঘ্যাটা ঘ্যাং শব্দ বেশ জোরে বাজছে। আস্তে কথা বললে, শোনবার কোনো উপায় নেই।

সুরথ হঠাৎ চমকে উঠলো, একটা প্রচণ্ড শব্দে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, যে সিঁড়ি দিয়ে ওরা নেমেছে, তার মুখটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। যেটুকুও বা বাইরের আলো দেখা যাচ্ছিল, তাও আর নেই। সুরথের মনে হলো, এখন ও আর স্টিমারেও নেই, একটা অন্য জগতে চলে এসেছে। ও ভয় পেয়ে বসন্তকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা বাইরে যাবো কী করে?'

বসন্ত বললো, 'কেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবো।'

সুরথ বললো, 'বন্ধ করে দিল যে?'

বসন্ত বললো, 'তাতে কী হয়েছে? আবার খুলে দেবে। ওটা বন্ধ করে রাখাই নিয়ম। চল্, আমার সঙ্গে আয়।'

বলে, সুরথের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। চলতে গিয়ে সুরথ বড় বড় কয়লার ঢ্যালায় হোঁচট খেলো। কে যেন ওদের এক পাশে ঠেলে দিয়ে, প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। বসন্ত বললো, 'ভয় পাস্নে, ওরা ওদের কাজ করছে।'

খানিকটা গিয়ে ওরা একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালো। ভিতরে আলো জ্বলছে বসন্ত সুরথকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। জোর শব্দটা এখানেই হচ্ছে। এখানে নানান রকম মেসিন, লোহার চেয়ে পেতল আর তামার যন্ত্র আর কলকব্জাই যেন বেশি। কয়েকজন কাজ করছে। তাদের জামার হাতে তেল কালি মাখা। তারা কেউ বসন্ত বা সুরথের দিকে তাকিয়ে দেখলো না, নিজেদের কাজেই ব্যস্ত।

বসন্ত সুরথের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'এটাই হলো মেসিন ঘর, মানে ইস্টিম্ ঘর, বুঝলি? এই যে মেসিনটা চলছে, তাতে, ইস্টিমারের নিচে, অনেকগুলো পাখা-ওয়ালা মস্ত বড় একটা পেডিল হুইল জলের মধ্যে পাক খাচ্ছে, তাইতেই ইস্টিমারটা বাঁই বাঁই করে চলছে। ইয়াসিন চাচা আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে। শাফটু জানিস? শাফটুর সঙ্গে পিডলারটা ঘুরছে।' সুরথও ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলো। কিন্তু স্টিমারের তলায়, জলের মধ্যে যে পাখাওয়ালা পেডিল হুইল ঘুরছে, এটা ওর জানা ছিল না। পেডিল হুইল-এর হুইল কথাটা বুঝলেও, পেডিল কথাটা বুঝতে পারলো না, আর শাফটু কাকে বলে, তাও বুঝলো না। মেসিন ঘরে দাঁড়িয়ে, এখন ওর ভয়টাও কমে গিয়েছে। মেসিনের দিকে তাকিয়ে আরো ভালো করে দেখবার কৌতূহল বাড়ছে। ওর মনে পড়লো, বইয়ে পড়েছে স্টিমার মানে বাষ্পীয় পোত— মানে, জাহাজ। স্টিম মানে বাষ্প, বাষ্পেতেই স্টিমার চলে, কিন্তু কী ভাবে, সেটাই ওর জানার ইচ্ছা।

এমন সময় কোথায় যেন দু তিনবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। মেসিনে যারা কাজ করছিল, তাদের একজন, আর একজনকে জিজ্ঞেসা করলো, 'কী হলো বলো তো?' যাকে জিজ্ঞেস করলো, সে বললো, 'বাইরের কিছু ব্যাপার হবে। এখানে তো গোলমাল নেই।'

সুরথ বসন্তকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?'

বসন্ত বললো, 'ওসব ওদের কাজের ব্যাপার। চল্, বাইরে যাই।'

ওরা মেসিন ঘরের বাইরে এলো। কে যেন তখন চিৎকার করে বলছে, 'হ্যাঁ, ইয়াসিন ওপরে গেছে।'

সুরথ দেখলো, ওপরে যাবার সিঁড়ির মুখটা আবার খুলেছে, সেখান দিয়ে দিনের আলো আসছে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই
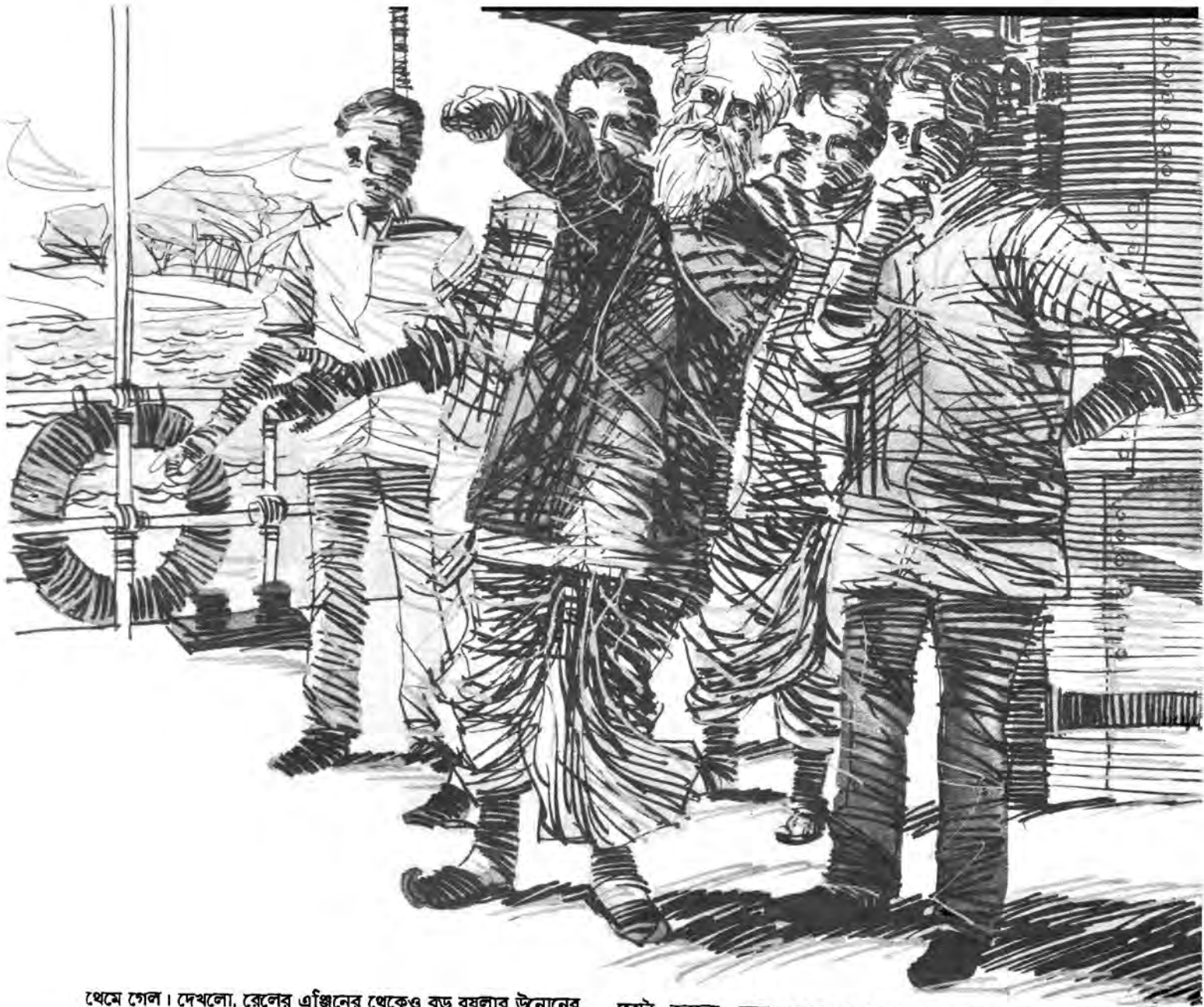
থেমে গেল। দেখলো, রেলের এঞ্জিনের থেকেও বড় বয়লার উনোনের দুটো মুখ খোলা। ভিতরে গনগনে লাল আগুন জ্বলছে। দুজন খালাসী, বেলচায় করে কয়লা নিয়ে, সেই উনোনের দুই মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বেলচায় ঠং ঠং করে শব্দ হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে সেই বিরাট আগুনের তাপ গায়ে মুখে লেগে যেন পুড়ে যাচ্ছে। আগুনের ফুলকি বাইরে ছিটকে আসছে।

বসন্ত বললো, 'জানিস, এটাকে বলে বয়লার। ফারনিস জানিস, ফারনিস্?'

ফারনিস্? সুরথের কেমন সন্দেহ হলো, ও বললো, 'মানে ফারনেস্?'

বসন্ত বললো, 'ইংরেজিতে তাই হবে। ইয়াসিন চাচারা ফারনিস বলে। এটা হলো আসলে ফারনিস্।'

বলে বসন্ত এগিয়ে গিয়ে একজনকে বললো, 'হোসেন চাচা, আমাকে একটু কয়লা মারতে দেবে?'

হোসেন চাচা বেলচাটা বসন্তর সামনে ফেলে দিয়ে বললো, 'মার।'

বসন্ত এক গাল হেসে সুরথের দিকে একবার তাকালো, তারপর বেলচায় কয়লা তুলে, ফারনেসের মুখে ছুঁড়ে দিল। সুরথকে জিজ্ঞেস করলো, 'পারবি?'

আগুনটা দেখে ভয়ংকর মনে হলেও, সুরথ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কাছে গিয়ে দু হাতে বেলচাটা তুলে এতো ভারি মনে হলো, তারপরে কয়লা তুলবে কী করে ভেবে পেলো না। তবু চেষ্টা করলো, আর কোনোরকম দু এক চাংড়া কয়লা তুলে, ফারনেসের মুখে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু মাত্র এক টুকরো কয়লা ভেতরে ঢুকলো। তাতেই ও হাঁপিয়ে উঠলো, আর আগুনের তাতে যেন মুখটা ঝলসে যেতে লাগলো।

এমন সময় স্টিমারের ভোঁ কয়েকবার বেজে উঠলো, আর মনে হলো, স্টিমারটার চলার জোর যেন কমে গেল। খালাসীরা ফারনেসের মুখ দুটো বন্ধ করে দিল। একজন, আর একজনকে বললো, 'মনে হচ্ছে, ওপরে কিছু একটা ঘটেছে।'

অন্যজন বললো, 'তা হবে। ইয়াসিন ভাই তো ঘণ্টা শুনে চলে গেছে।'

সুরথ তখন ভাবছে, স্টিমার চালানো একটা কতো বড় ব্যাপার। আর কী কষ্টের কাজ। বসন্ত ডেকে বললো, 'চল্, ওপরে যাই।'

সুরথ গরমে ঘেমে উঠেছিল। ইচ্ছা হলেও আর থাকতে পারলো না, বসন্তর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। কাছেই কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করছিল। ওরা ওদের দুজনের দিকে এমন ভাবে তাকালো, যেন একটা কিছু সন্দেহ করছে। বসন্ত সুরথের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, বললো, 'তোর সারা গায়ে মুখে কয়লার কালি লেগেছে।'

সুরথ বসন্তর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললো, 'তোমারও লেগেছে।'

বলতে বলতে ওরা দুজনে দোতলায় উঠলো। দেখলো, ডেকের

মাঝখানেই বেশ বড় একটা ভিড়। তারা ঘিরে রয়েছে মোক্তারদাদুকে, কী সব বলছে। মোক্তারদাদু সুরথকে দেখা মাত্রই চিৎকার করে উঠলেন, 'ওই যে, ওই যে ও এসেছে।'

সবাই বড় বড় চোখে সুরথের দিকে ফিরে তাকালো। মোক্তারদাদু প্রায় ছুটে এসে, ওর একটা হাত চেপে ধরলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কেমন কঠিন দেখাচ্ছে। বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেছলে তুমি?'

মোক্তারদাদুর সঙ্গে গোটা স্টিমারের লোকগুলোও যেন সুরথের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সুরথ এমন থতোমতো খেয়ে গেল, চট করে কিছু বলতেই পারলো না। মোক্তারদাদু আবার ঝেঁজে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো, কোথায় গেছলে তুমি? তোমার জামায় প্যাণ্টে মুখে এতো কালিই বা কিসের?'

সুরথ পাশে তাকিয়ে দেখলো, বসন্ত নেই। ওকে যে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে, মনে মনে অপরাধী হয়ে উঠলো। বললো, 'নিচের মেসিন ঘর দেখতে গেছলাম।'

কে একজন বলে উঠলো, 'ইয়াল্লা, ছেলে গেছে মেসিন ঘর দেখতে! আর সবাই ভেবে মরছে, জলে পড়ে ডুবে গেল কী না!' আর একজন বললো, 'হতেও তো পারতো। দৈবের কথা কিছু বলা যায়? মানুষের মনটা আগেই খারাপ গায়, মোক্তারমশাইয়ের আর দোষ কী?'

এমন সময়ে একজন, কালো কুচকুচে গোঁফ দাড়িওয়ালা, সাদা ট্রাউজার আর সার্ট পরা লোক এসে মোক্তারদাদুকে জিজ্ঞেস করলো, নাতিকে পেয়েছেন মোক্তারসাহেব?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'পেয়েছি ভাই। কী করে জানবো বলো, এ ছেলে নিচে বয়লার ঘরে চলে গেছে? তাও কি এখন গেছে? আমার কাছ থেকে চলে এসেছে প্রায় এক ঘণ্টা হতে চললো?' সবাই সুরথের দিকে তাকালো। সুরথ মুখ নিচু করলো। মোক্তারদাদু ওর একটি হাত ধরে বললেন, 'চলো, কেবিনে চলো।'

সুরথের খুব লজ্জা করছে, ভয়ও করছে। মোক্তারদাদুর সঙ্গে কেবিনের দিকে চললো, আর লোকজনরা দু' পাশে সরে দাঁড়ালো। সুরথ ওর জীবনে, মোক্তারদাদুর এরকম কঠিন মুখ আর ঝাঁজালো স্বর শোনে নি। মোক্তারদাদু ওকে নিয়ে কেবিনের মধ্যে ঢুকে, গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার বাকসো থেকে পরিষ্কার জামা প্যাণ্ট বের করো। বাথরুমে গিয়ে ভালো করে চানটান করে, এ ময়লা জামা প্যাণ্ট ছাড়ো। এর পরেই যেখানে স্টিমার দাঁড়াবে, সেখানেই আমরা নেমে যাবো, ফিরতি কোনো স্টিমারে ফিরে যাবো। তোমাকে নিয়ে আমি আমাদের বাড়ি যাবো না। যাও যাও, তাড়াতাড়ি জামা প্যাণ্ট নিয়ে বাথরুমে যাও।'

মোক্তারদাদু বেশ ধমকেই তাড়া দিলেন। সুরথের বুকটা টনটন করে উঠলো। কিন্তু তাড়াতাড়ি জামা প্যাণ্ট বের করে বাথরুমে ঢুকে গেল। সাবান দিয়ে চান করে, ধোয়া জামা প্যাণ্ট পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাইরে এলো। দেখলো, মোক্তারদাদু গম্ভীর মুখে জানালার ধারে বসে আছেন। সুরথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মোক্তারদাদু মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'মাথাটা আঁচড়ে এখানে এখন এসে বসো।' সুরথ তা-ই করলো। কিন্তু ফিরে যেতে হবে শোনার পর থেকেই, কান্না পেয়ে যাচ্ছে। কেন যে বসন্তর কথায় মেসিন ঘর দেখতে গিয়েছিল! ও পাশে গিয়ে বসার পরেও, মোক্তারদাদু ওর দিকে তাকালেন না। ও মোক্তারদাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মোক্তারদাদু মুখ ফেরালেন না, কিন্তু আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি হয় তো বুঝবে না, আমি কী ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। একবার আমার চোখের সামনেই, একটি ছেলে স্টিমার থেকে জলে পড়ে ডুবে গেছলো, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। তোমাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে, কোথাও খুঁজে না পেয়ে...!'

মোক্তারদাদুর গলাটা ধরে এলো, আর তাঁর চোখের কোণ্ দুটো চিকচিক করে উঠলো। ফিরে যেতে হবে শোনার পর থেকেই, সুরথের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন মোক্তারদাদুর ধরা গলা শুনে, আর তাঁর চোখের কোণে জল দেখে, নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারলো না। বুকটা মোচড় দিয়ে, চোখ ফেটে জল এসে পড়লো। ও দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মোক্তারদাদু গলা-বন্ধ কোটের আস্তিনে চোখ মুছে, আস্তে আস্তে সুরথের কাঁধে একটি হাত রাখলেন। সুরথের কান্না তাতে যেন আরো বেড়ে উঠলো। যাকে বলে, একেবারে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠে, মোক্তারদাদুর বুকের কাছে মুখটা চেপে ধরলো। মোক্তারদাদু ওর মাথায় হাত রাখলেন, বললেন, 'কেঁদো না। আমার মনের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল, তুমি বুঝতে পেরেছ তো?'

সুরথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জবাব দিল, 'আমি আর কখনো এরকম করবো না।' মোক্তারদাদু আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। সুরথের কান্না আস্তে আস্তে কমে এলো। মোক্তারদাদু নরম গলায় বললেন, 'তুমি মেসিন ঘর দেখতে গেছলে, তাতে আমার কিছু মনে হয় নি। সব কিছু দেখা ভালো। আমি তো তোমার সবই জানি। তুমি আমাকে বলে গেলে, আমি চিন্তা করতাম না। আমি তো স্টিমার পর্যন্ত থামিয়ে দিতে গেছলাম।' সুরথ ওর অপরাধের মাত্রাটা বুঝতে পারলো, কিন্তু জেনে শুনে না বুঝে ও কিছু করে নি। মোক্তারদাদু ওর মুখটা বুকের কাছ থেকে তুলে ধরলেন। সুরথের চোখ দুটো এখনো কান্নায় লাল। মোক্তারদাদুর চোখে ঝিলিক, গোঁফদাড়ির ফাঁকে ফাঁকে সেই চেনা হাসি উঁকি দিচ্ছে। সুরথের হাসি পেলো, কিন্তু হাসতে গিয়ে লজ্জায় মুখ নামালো। মোক্তারদাদু ওর গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে তুমি নিচের মেসিন ঘরে চলে গেলে? একলা একলাই?'

সুরথ মোক্তারদাদুকে সব কথাই বললো। বসন্তর কথাও। কোনো কথাই লুকালো না, কারণ মোক্তারদাদুর সঙ্গে ওর সেই রকম বোঝাবুঝি আছে, যা সত্যি, সবই তাঁকে বলে দেবে। বসন্ত যে সিগারেট খায়, বাবা মায়ের সঙ্গে কাপড় কাচে, আর বসন্তকে যে ওর ভালো লেগেছে, সব বললো। এমন কি, বসন্তর সঙ্গে একদিন ভাটিতে কাপড় কাচতে যাওয়ার ইচ্ছাটার কথাও বলেছিল। শুনে তো মোক্তারদাদু হাঁ। বললেন, 'বসন্তর সঙ্গে ভাটিতে কাপড় কাচতে যাবে?'

সুরথ লজ্জা পেয়ে হাসলো, কিন্তু বললো, 'আমার মনে হয়, খুব মজা লাগবে।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'সে একদিনের জন্য তোমার মজা লাগতে পারে। আসলে ওটা খুবই কষ্টের কাজ। হাতে পায়ে হাজা হয়, তার খুব জ্বালা। সোডা আর ক্ষারে অনেক সময় তাদের আঙুলের ডগা, নখ ক্ষয়ে যায়। পাটে ফেলে কাপড় আছড়াতে বুকে দম চাই।'

সুরথ বললো, 'কিন্তু বসন্ত সে সবই করে।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'বসন্তকে আমি মোটেই খারাপ বলছি না। ওর মতো বয়সের ছেলে, আমাদের দেশে, মাঠে ঘাটে কতো যে কষ্টের কাজ করে বেড়ায়, আমরা তার অনেক খবরই রাখি না। বসন্ত যে বাবা মায়ের সঙ্গে কাজ করে, খাটে, এর জন্য ওকে ভালো লাগবারই কথা। কিন্তু বসন্ত মজা করবার জন্য ভাটিতে কাপড় কাচতে যায় না, সে-কথাটাই তোমাকে বলছি। বরং কাপড় না কেচে, তুমি ওর সঙ্গে একদিন ভাটিতে গিয়ে, ওদের কাজকর্ম দেখে আসতে পারো। সেটাই ভালো না?'

সুরথ মোক্তারদাদুর দিকে তাকালো। ওর চোখ থেকে এখনো কান্নার লাল আভাটা একেবারে মিলিয়ে যায় নি। মোক্তারদাদুর গোঁফ দাড়ি আর মোটা ভুরুর নিচে চোখ দুটিতে হাসিও আছে। সুরথ বললো, 'হ্যাঁ, সেটাই ভালো।'

মোক্তারদাদু সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'এখন কথা হচ্ছে, তুমি যে বসন্তর সঙ্গে নিচে মেসিন ঘর দেখতে গেছলে, সেটাও আমার খারাপ লাগছে না। কিন্তু তোমার উচিত ছিল আমাকে

বলে যাওয়া।' বলতে বলতে মোক্তারদাদুর চোখ দুটি কেমন উদাস হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আমাকে বললে হয় তো, আমিই মেসিনরুম, ফার্নেসে কয়লা দেওয়া, সবই দেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারতুম।'

সুরথ বললো, 'সেটা আমার খুব ভুল হয়েছে।'

কিন্তু মোক্তারদাদু নদীর দিক থেকে চোখ ফেরালেন না। সুরথের মনটা আবার খারাপ হয়ে উঠলো, আর মনের মধ্যে একটা ভয়ও ছিল। ও মোক্তারদাদুর, নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা উদাস মুখের দিকে চেয়ে করুণভাবে বললো, 'বলেছি তো আর কখনো এরকম হবে না।'

মোক্তারদাদু আস্তে আস্তে সুরথের দিকে ফিরে তাকালেন, বললেন, 'তা হলে আমার তরফ থেকেও বলছি, পরের কোনো ঘাট স্টেশনে নেমে, ফিরতি স্টিমারেই আমরা ফিরবো না। জেন্টলমেনস এগ্রিমেন্ট?'

মোক্তারদাদু তাঁর মোটা মোটা আঙুলের ডান হাতটি সুরথের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সুরথ ওর ছোট হাতে মোক্তার-দাদুর হাত চেপে ধরে বললো, 'জেন্টলমেনস এগ্রিমেন্ট।'

মোক্তারদাদুর গোঁফদাড়ির ভাজে আর মোটা ভুরুর নিচে দু' চোখে হাসি চিকচিক করে উঠলো। তিনি সুরথের হাত ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিলেন। বললেন, 'তাহলে এখন কি একটা গান টান হবে? দুপুরের খাবার আসতে এখনো একটু দেরি আছে।'

সুরথ বললো, 'বেশ।'

মোক্তারদাদু টেবলের ওপর থেকে তাঁর পানের কৌটো নিয়ে, একটুকরো তালমিছরি সুরথকে দিয়ে বললেন, 'তা হলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক্।'

সুরথ তালমিছরির টুকরো মুখে নিয়ে, গালের পাশে রেখে, গুনগুন করে গাইলো,

'আমাদের মনোমোহন মোক্তার
মস্ত ইমানদার
হিন্দু মোসলেম ভেদ জানেন না...'

'উঁহু উঁহু উঁহু।' মোক্তারদাদু মুখে হর্তুকির টুকরো পুরেই, মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'ও গান আমি মোটেই শুনতে চাই নি। কোথায় ভাবলাম, একটা বেশ ভালো গান শুনবো, তা না, যতো সব বাজে গান।'

সুরথের চোখে মুখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক, বললো, 'এটা বুঝি বাজে গান হলো?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'যাচ্ছেতাই। ওটা কি একটা গান নাকি? সেই গানটা গাও না, ওই যে সেই কী বলে—।'

সুরথ বলে উঠলো, সেই, "মনুয়া মাঝির গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়ে যায়...?"'

মোক্তারদাদু তাঁর মোটা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আর পুঁটি মাছে পান চিবোয়, গাল ফুলিয়ে খায়? আসলে ওটাও তো আমাকে নিয়েই গাওয়া। আমাকে পুঁটি মাছ বলা হচ্ছে, জানি না?'

সুরথ মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'মোটেই না। তা হলে ভ্যাদা মাছ বলা হতো।'

মোক্তারদাদুর দাড়ি শুদ্ধ কেঁপে উঠলো, 'কী, আমি ভ্যাদা মাছ?'

সুরথ আরো জোরে মাথা নেড়ে বললো, 'না না, সত্যি বলছি, আপনাকে—।' কথা শেষ করবার আগেই সুরথ খিলখিল করে হেসে উঠলো। মোক্তারদাদু গোঁফদাড়ি ফুলিয়ে, বাইরে নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

সুরথ হাসি থামিয়ে, একটু কেসে, আস্তে আস্তে গান ধরলো; 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার পরে।'...

মোক্তারদাদুর গোঁফদাড়ির ফাঁকে ফাঁকে আবার হাসি ঝিক-মিক করে উঠলো। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে, সুরথকে একবার দেখে চোখ বুজে গান শুনতে লাগলেন। কিন্তু গানটা পুরো শেষ হবার আগেই, সুরথ দেখলো, স্টিমার থেকে একটু দূরের আকাশ দিয়ে বিরাট একটা সাপ যেন এঁকেবেঁকে উড়ে চলেছে। সাপটার শরীরের যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে শরীরটা একটু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, আবার জোড়া লেগেও যাচ্ছে। ও গান থামিয়ে বলে উঠলো, 'মোক্তারদাদু, ওটা কী যাচ্ছে, আকাশের ওপর দিয়ে?'

মোক্তারদাদু চোখ খুলে, বাইরের আকাশের দিকে তাকা-লেন। ভুরু কুঁচকে একটু দেখে বললেন, 'এতো দেখছি বেলে হাঁসেরই দল।'

সুরথ যেন বিশ্বাস করতেই পারলো না, জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু ওরকম লম্বা সাপের মতো দেখাচ্ছে কেন?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'অনেকগুলো এক সঙ্গে উড়ছে তো, তা-ই। একজন হচ্ছে সর্দার, তার পেছনে পেছনে সবাই উড়ে চলেছে।'

সুরথ অবাক হয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে, কয়েক শো বেলে হাঁস আছে!'

মোক্তারদাদু বললেন, 'কয়েক শো কেন, হাজার খানেকের বেশি হতে পারে। শরৎকাল পড়েছে তো, এ সময় থেকেই ওরা এদিকে আসতে আরম্ভ করে। শীতকালের পরে আবার ফিরে যাবে।'

সুরথ অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, ঠিক যেন একটা কালো রঙের সরু বিরাট লম্বা সাপ, আকাশের এক দিক থেকে, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সবটা মিলিয়ে যাবার পরে, সুরথের খেয়াল হলো, নদীটা যেন হঠাৎ সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে উঠেছে। তার কোনো কূলকিনারা চোখে পড়ছে না। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'দাদু, এটা কী নদী?'

মোক্তারদাদুর মুখে এখন রোদ পড়েছে। তিনি কপালের ওপর হাত মেলে, নদীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ জায়গাটায় পদ্মা আর মেঘনা মিশেছে। সেজন্যই এত বড় দেখাচ্ছে। এর পরে আমরা যে-নদী দিয়ে যাবো, সেটাকে যমুনা বলা যেতে পারে, তবে ওটা আসলে ব্রহ্মপুত্রেরই ধারা। তুমি নাঙ্গলবন্ধ স্নানের কথা শুনেছ?'

সুরথ বললো, 'হ্যাঁ, বাবা মা নাঙ্গলবন্ধের স্নানে যান প্রত্যেক বছর। কী নাকি পুণ্যি হয়।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'সে তো ও'রা যান নারায়ণগঞ্জে, মনে করা হয়, ব্রহ্মপুত্র নদের জল সে সময়ে ওখানে আসে। আসলে, এর পরেই, আমরা যতোই উত্তর দিকে যাবো, বলতে গেলে, সবটাই ব্রহ্মপুত্র নদ। এবার বোধহয় আমাদের দুপুরের খাবার দেবে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই, কেবিনের খোলা দরজায় বাবুর্চিকে দেখা গেল। তার দু হাতে ধরা ট্রে—এর ওপর ধবধবে শাদা ন্যাপকিনে ঢাকা। বললো, 'মোক্তারবাবু, আপনাদের খাবার নিয়ে এলাম।'

মোক্তারদাদুকে সবাই চেনে। কিন্তু সুরথের নাকে তখন মুরগীর মাংসের গন্ধ লেগেছে। মনে হলো, খিদেটা হঠাৎ পেলো, আর জিভেও জল এসে পড়ছে। মোক্তারদাদু বললেন, 'দাও, টেবলের ওপরে দাও।'

টেবলের ওপর ট্রে রেখে, ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল, ভাত, ডিম আর আলু ভাজা, মুশুরির ডাল, আর মুরগীর মাংস। সব গরম, আর ধোঁয়া উঠছে। একটা প্লেটে, বড় বড় ক্ষীরমোহন। মোক্তারদাদু বললেন, 'নাও সুরথ, তুমি হাত ধুয়ে এসে আরম্ভ করো। আমিও আরম্ভ করবো, তবে আমার তো দাঁত নেই, খেতে অনেক সময় লাগবে।'

হাত ধুয়ে, দুজনেরই খাওয়া শুরু হলো। কিন্তু সুরথের খাওয়া অনেক আগেই শেষ হলো। ও হাত মুখ ধুয়ে বললো, 'আমি একটু বাইরে ডেকে গিয়ে দাঁড়াবো?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'যেতে পারো, তবে কাছেই থেকো।'

সুরথ বাইরের ডেকে যেতেই, সবাই ওর দিকে এমনভাবে তাকালো, ভীষণ লজ্জা করলো। একজন বলেই উঠলো, 'মোক্তারমশাইয়ের সেই নাতি, আবার বেরিয়েছে।'

সুরথ আর দাঁড়াতে পারলো না, তাড়াতাড়ি কেবিনে ফিরে এলো। মোক্তারদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হলো, ডেকে গেলে না?'

সুরথ মুখ ভার করে বললো, 'সবাই যেভাবে আমাকে দেখছে, কী করে যাবো?'

মোক্তারদাদুর গোঁফ দাড়িতে মাংসের ঝোল লেগেছে। হেসে বললেন, 'খুব মুশকিল হয়ে গেল তো? তার মানে এখন তুমি বাইরে গেলেই, সবাই তোমার দিকে নজর করবে।'

সুরথ ঠোঁট উলটে বললো, 'আমি যাবোই না। আমরা কখন পেঁছুবো?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'তা সন্ধে ছ'টা হবে।'

সুরথ মনে মনে হিসাব করলো, ভোর ছ'টায় স্টিমার ছেড়েছে, সন্ধে ছ'টায় পেঁছুবে। বারো ঘন্টা! ও ক্যাম্পখাটের ওপর শুয়ে পড়লো। মোক্তারদাদু মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

সুরথ তা দেখতে পেলো না, ও চোখ বুজলো।

মোক্তারদাদুর ডাকে সুরথের ঘুম ভাঙলো। সুরথ চোখ তাকিয়ে, মাথার ওপরে একটা আলো জ্বলতে দেখলো। কোথায় আছে, হঠাৎ মনে করতেই পারলো না। মোক্তারদাদু বললেন, 'এসে গেছি, আমাদের এবার স্টিমার থেকে নামতে হবে।'

ঠিক এই সময়েই ভোঁ ভোঁ করে স্টিমারের বাঁশি বেজে উঠলো। অমনি সুরথ ক্যাম্পখাট থেকে লাফ দিয়ে নামলো। মোক্তারদাদু বললেন, 'আমাকে একলা রেখে, দিব্যি নিজে ঘুম দিয়ে নিলে।'

সুরথ খুবই লজ্জা পেলো। আসলে, মোক্তারদাদুর সঙ্গে আসবে বলে, উত্তেজনায় রাত্রে ওর ভালো ঘুমই হয় নি। ভোরের দিকে যদি বা একটু ঘুম এসেছিল, তখনই তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। ঘুমের আর দোষ কী? তবু ও বললো, 'আমাকে ডেকে দিলেন না কেন?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'ডেকে দিলে তো আমার সঙ্গে কেবিনেই বসে থাকতে হতো। আর বাইরে গেলেই, ডেকের প্যাসেঞ্জাররা তোমার পেছনে লেগে থাকতো। তাই আর ডাকি নি।'

মোক্তারদাদুর চোখে চিকচিক করছে হাসি। সুরথের মেজাজটা একটু খারাপ হয়ে গেল। বললো, 'আপনি মজা করে সব দেখেছেন, আর আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'দেখবার অবিশ্যি তেমন কিছু ছিল না, একমাত্র জগন্নাথগঞ্জের ঘাটটা ছাড়া। সেটা পরেও দেখা যাবে।'

স্টিমার ঘাটে ভিড়েছে, বোঝা গেল, গোটা স্টিমারটা ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠতে। তারপরেই লোকজনের চিৎকার আর ছোটা-ছুটির শব্দ পাওয়া গেল। সুরথদের কেবিনে একজন এসে ঢুকলেন। তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়স হবে, গায়ে মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, মোটা ধুতির কোঁচা, চেহারাটি বেশ সুন্দর। এসেই মোক্তারদাদুকে প্রণাম করে, বললেন, 'ভালো আছেন জ্যাঠামশাই, আসতে কোনো কষ্ট হয় নি তো?'

মোক্তারদাদু বললেন, 'কে? নবীন এসেছিস? ভালোই আছি, কষ্ট কিছু হয় নি। বাড়ির খবর সব ভালো?'

নবীন বললেন, 'হ্যাঁ, সব ভালো।'

মোক্তারদাদু সুরথকে দেখিয়ে বললেন, 'এর নাম সুরথ।'

নবীন সুরথের কাঁধে একটি হাত দিয়ে সামনে টেনে বললেন, 'ওর আসবার কথা তো আপনি লিখেছিলেন।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'হ্যাঁ।' সুরথকে বললেন, 'এই নবীন হলো তোমার কাকা, আমার ছোট ভাইয়ের ছেলে।'

সুরথ নবীনকে প্রণাম করতে নিচু হলো, নবীন ওর হাত ধরে বললো, 'ওসব করতে হবে না। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি আরো বড়।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'ও দেখতে ছোট, বয়সও কম, কিন্তু আসলে বড়।'

মোক্তারদাদুর চোখে হাসির ইশারা, ঠিক কিছু বোঝা গেল না। নবীন হাসলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন কুলি এলো। নবীন বললেন, 'জ্যাঠামশাই, আপনি সুরথকে নিয়ে নিচে নেমে ঘাটে গিয়ে দাঁড়ান, আমি সব মালপত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছি।'

মোক্তারদাদু তাঁর মোটা বেতের ছড়ি নিয়ে, পানের ডিবেটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, 'তাই আয়। এসো সুরথ।'

বলে সুরথের একটি হাত ধরলেন। সুরথ বাইরে বেরিয়ে দেখলো, অনেক যাত্রীরাই নামছে। নিচে নেমে, স্টিমারের গায়ে, একটা গাধাবোটের ওপর উঠলো। সেখানে অনেক যাত্রী ওঠবার জন্য অপেক্ষা করছে। গাধাবোট থেকে, একটি সাঁকোর ওপর দিয়ে, ডাঙায় নামলো। সেখানেও লোকের ভিড় কম না। ইলেকট্রিকের আলো নেই, হ্যাজাক বা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে নানান রকমের দোকানে, খাবারের দোকানে, হোটেলে। অনেকে লোকজন ডাকাডাকি করছে, খাবার জন্য।

একটি টকটকে ফরসা ছেলে, প্রায় সুরথের বয়সীই হবে, ঢলঢলে হাফপ্যান্ট আর নীল রঙের একটা শাদামাটা হাফসার্ট গায়ে, এগিয়ে এলো। প্রণাম করলো মোক্তারদাদুকে। মোক্তারদাদু অবাক হেসে, ছেলেটির গাল টিপে ধরলেন, বললেন, 'দীপুবাবু যে! তুমিও স্টিমার ঘাটে এসেছো?'

দীপু ছেলেটি দু'হাত দিয়ে, মোক্তারদাদুর একটি হাত চেপে ধরলো, বললো, 'মা আসতে দিতে চাইছিল না, আমি ছোটমামার সঙ্গে জোর করে চলে এসেছি।'

মোক্তারদাদু হেসে হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'তা এসেছ, বেশ করেছ, তোমার মা জানে তো? তা না হলে আমাকেই বকুনি খেতে হবে।'

দীপু বললো, 'ছোটমামা বলে দিয়েছে।'

সুরথ মোক্তারদাদুর স্নেহের হাসি আর কথাবার্তা শুনে, দীপু ছেলেটার ওপর রেগে যাচ্ছিল। মোক্তারদাদুর ওপরও একটু অভিমান হচ্ছিল। তিনি যেন সুরথকে এখন ভুলেই গিয়েছেন।

সেটা মোটেই সত্যি না, কারণ তারপরেই মোক্তারদাদু বললেন, 'এই দেখ, আমার একটি শহুরে নাতী, এর নাম সুরথ।' সুরথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝলে সুরথ, দীপু আমার নাতী, ও হলো আমার মেয়ের ছেলে—মানে ওর মা হবে তোমার পিসিমা। দু'জনেই তোমরা সমবয়সী, দেখ, বন্ধুত্ব করতে পারো কী না।'

ফর্সা টকটকে দীপু, কালো বড় বড় চোখে সুরথের দিকে তাকালো। ওকে খুব নিরীহ আর সরল দেখাচ্ছে। চুলে সিঁথি নেই, সামনের দিকে টেনে আঁচড়ানো। সুরথের থেকে রোগা, একটু লম্বাও। পায়ে ব্রাউন কেডস্। সুরথের দিকে ও যেন খুব অবাক চোখে তাকালো। দেখলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। হাসবে কী না, বুঝতে পারছে না।

ইতিমধ্যে কিছু লোক মোক্তারদাদুকে ঘিরে ধরেছে। কেউ বলছে কর্তা, কেউ বাবু। তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান, গরীব-বড়লোক, সব রকমের লোক রয়েছে। সুরথ সেই দিকে তাকিয়ে মোক্তারদাদুর কথা শুনতে লাগলো। হঠাৎ ওর হাতটা কেউ ধরতেই, ও মুখ ফিরিয়ে দেখলো, দীপু ওর হাত ধরে, মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সুরথ প্রথমটা হাসবে কী না বুঝতে পারলো না। গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো, 'তোমার পুরো নাম কী?'

দীপু সুরথের গম্ভীর মুখ দেখে, একটু যেন থতিয়ে গেল,

বললো, 'শ্রীদীপেন্দ্রমোহন সরকার।'

কিন্তু দীপু সুরথকে পালটা জিজ্ঞেস করলো না, ওর পুরো নামটা কী। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি দাদুর বাড়িতেই থাকো?'

দীপু অবাক হয়ে বললো, 'তা কেন? আমাদের বাড়ি সুন্দরীগ্রাম, মামাবাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে।'

সুরথের মনে পড়ে গেল, মোক্তারদাদুর গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। দীপু আবার নিজেই যেচে বললো, 'আমরা পরশুদিন মামাবাড়ি এসেছি, আবার বিজয়াদশমীর পরেই চলে যাবো। মাকে বাড়ি গিয়ে লক্ষ্মীপুজো করতে হবে তো, তাই।'

সুরথ কোনো জবাব দিল না। দীপু আবার বললো, 'লক্ষ্মীপুজোর পরে আবার আসতে পারি, কিন্তু মা আর আসবে না। তুমি কতদিন থাকবে?'

সুরথ বললো, 'বলতে পারি না।'

দীপুকে দেখে বোঝা গেল, সে বেশ দমে গিয়েছে। ও টকটকে ফরসা বটে, কিন্তু কীরকম হাঁদা যেন। সুরথের তা-ই মনে হলো।

ইতিমধ্যে নবীন কুলিদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে নেমে এলেন। মোক্তারদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'নৌকো নিয়ে কে এসেছে?'

তৎক্ষণাৎ একজন ডিগডিগে লম্বা, খালি গা, মাথায় গামছা বাঁধা, হাঁটু অবধি ধুতি পরা লোক, প্রায় লাফিয়ে পড়লো মোক্তারদাদুর পায়ের কাছে, বললো, 'আজ্ঞে আমি ইন্দির, নৌকো নিয়ে এসেছি।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'থাক থাক ইন্দির, ভালো আছো তো?'

ইন্দির বললো, 'একরকম আছি বাবু, আপনাদের দয়ায়।'

মোক্তারদাদু নবীনকে বললেন, 'চলো, এগোনো যাক। কই হে সুরথ, এসো। দীপু আয়।'

মোক্তারদাদুর সঙ্গে তখনো কয়েকজন লোক কথাবার্তা বলতে বলতে চলেছে। সুরথ দীপুকে জিজ্ঞেস করলো, 'চণ্ডীপুর কতো দূর?'

দীপু বললো, 'নৌকোয় যেতে এক ঘণ্টা লাগবে।'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কি আমরা নৌকোয় চেপে যাবো?'

দীপু বললো, 'হ্যাঁ। রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না, এখনো অনেক জায়গা জলে ডুবে আছে।'

সুরথের মনটা একটু দমে গেল। সারাদিন স্টিমারে এসে এখন আবার এক ঘণ্টা নৌকোয় যেতে হবে? ওর কেমন ধারণা ছিল, স্টিমার থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ি-টাড়ি যাবে। ও আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ নদী দিয়ে যাবে?'

দীপু বললো, 'নদী না, তিসিয়া গাঙের ওপর দিয়ে যাবো। নদীর থেকে অনেক ছোট তিসিয়া গাঙ।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে কি আলো আছে?'

দীপু বললো, 'গাঙে আলো থাকবে কেমন করে। অন্ধকারেই যেতে হবে। নৌকোর মধ্যে আলো থাকবে।'

নবীনকাকার হাতে টর্চ লাইট, ইন্দিরের এবং আরো দুজনের হাতে হ্যারিকেনের আলো ছিল। সেই আলোতে খানিকটা চলার পরেই, এক জায়গায় সবাই দাঁড়ালো। অন্ধকার হলেও, জলের ধারে অনেকগুলো নৌকো দেখা গেল। লোকজনের ভিড়ও কিছু আছে। নবীনকাকার গলা শোনা গেল, 'জ্যাঠামশাই, সাবধানে নামবেন, কাদা আর পেছল আছে।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'আমি ঠিক যাবো, সুরথকে একটু সাবধানে নিয়ে এসো। ওর সঙ্গে দীপু আছে।'

নবীনকাকা নিজেই এসে সুরথের হাত ধরলেন। আর ওর পাশ দিয়ে, ঢালু পিছল কাদা-মাটি রাস্তার ওপর দিয়ে, দীপু তরতর করে নেমে গেল। সুরথের ইচ্ছা হলো, ও নবীনকাকার হাতটা ছেড়ে দিয়ে, দীপুর মতোই নেমে যায়। এরকম কাদামাটিতে ও যথেষ্ট চলতে পারে। বললো, 'ছেড়ে দিন, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

নবীনকাকা বললেন, 'পড়ে গেলে একেবারে গড়িয়ে জলে পড়বে। এই তো এসে পড়েছি, নৌকোয় উঠে পড়ো।'

কুলিরা নৌকোয় মালপত্র তুলে দিয়েছে। মোক্তারদাদু নৌকোয় উঠে, গলুইয়ের কাছে জুতো খুলে রেখে, ছইয়ের ভিতরে গেলেন। সেখানে আলো জ্বলছিল। দীপুও ওর কেডস্ খুললো। সুরথ ওর ক্রোম লেদারের জুতোর ফিতে খুলে, জুতো খুলে, শুধু মোজা পরে পাটাতনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। চারদিকের অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কেবল আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা। মোক্তারদাদু ভিতর থেকে বললেন, 'সবাই ছইয়ের ভেতরে এসে বসো। আশ্বিনের হিমটা মোটেই ভালো না।'

নবীনকাকা বললেন, 'বাইরে মাদুর বিছিয়ে নিচ্ছি। একটু বাইরে বসি, তারপরে ভেতরে যাওয়া যাবে।'

নবীনকাকা একটা মাদুর পাটাতনের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসো সুরথ, দীপু বোস। ইন্দির, নৌকো ছাড়ো।'

সুরথের ভিতরে যাবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। ও মাদুরের ওপর বসতেই, ওর পাশে দীপু বসে, কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, 'ছোটমামা না থাকলে, এখন ছইয়ের ভেতরে গিয়ে বসতে হতো। বাইরে বসে যেতে বেশ ভালো লাগে।'

সুরথ কোনো কথা বললো না। নৌকো ছেড়ে দিল। নৌকোর একদিকে কেদার, আর একদিকে অন্য একজন মাঝি। নৌকোটা একটু দুলছে, কিন্তু জোরে চলছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আকাশের তারা, আর জলের সামান্য চকচকে রেখা ছাড়া, সুরথ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে গাছপালা ঝুপসি-ঝাড়গুলোকে তারাভরা আকাশের গায়ে পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে শত শত জোনাকি জ্বলছে। চারদিকেই জোনাকি। এতো জোনাকি সুরথ কখনো দেখেনি।

সুরথ বলে উঠলো, 'মেলা জোনাকি এখানে।'

দীপু জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কখনো জোনাকি পোকা ধরেছ?'

সুরথ বললো, 'না।'

দীপু বললো, 'ধরো না, ধরতে নেই।'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

দীপু সুরথের কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'জোনাকি ধরলে বিছানায় হিসি হয়ে যায়—হিসি।'

সুরথ বললো, 'ওসব আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। পোকা ধরলে আবার বিছানায় কেউ ওসব করে নাকি?'

দীপু প্রতিবাদ করতে সাহস পেলো না। মোক্তারদাদু তখন নবীনকাকা আর ইন্দির মাঝির সঙ্গে নানা কথা বলছিলেন। একটু পরে দীপু আবার ফিসফিস করে বললো, 'জানো, এই তিসিয়ার গাঙে না, খুব ডাকাতি হয়।'

সুরথ এবার একটু সচকিত হলো। চারপাশের ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের দিকে তাকালো। গা-টা একটু শিরশির করেও উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কীভাবে হয়?'

দীপু বললো, 'এই আমরা যেমন যাচ্ছি তো, ধরো, ডাকাতরা অন্ধকারে চুপিসাড়ে নৌকো নিয়ে এসেই ধাঁই করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপরে দা দিয়ে লাঠি দিয়ে, মেরে কেটে সব লুটপাট করে নিয়ে চলে গেল।'

সুরথ চারপাশের গাঢ় অন্ধকারের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'আমাদের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পরতে পারে?'

দীপু বললো, 'না, এটা দাদুর নৌকো তো। ডাকাতরা দাদুকে খুব ভয় পায়। তাছাড়া এখন তো বেশি রাত হয়নি। বেশি রাত হলে ডাকাতরা আসে। একবার আমাদের সুন্দরীগ্রামের একটা লোককে ডাকাতরা রামদা দিয়ে কেটে ফেলেছিল।'

সুরথ দীপুর কথা বিশ্বাস করবে কী না, ঠিক করতে পারলো না। কিন্তু চারদিকের অন্ধকার, গাছপালার ঝুপসিঝাড় আর জোনাকি ঝিকিমিকি দেখে, গা-টা কেমন ছমছমিয়ে উঠলো। অনেক দিকেই সুরথের মন টানে বটে, ডাকাতদের সঙ্গে দেখা হোক, এটা মোটেই ইচ্ছা নয়। অবিশ্যি ডাকাতও নানারকম হয়। সেটা দেবী-

চৌধুরানী পড়ে সুরথ জেনেছে। ভবানীপাঠকের মতো ডাকাত ওর খারাপ লাগে না। কিংবা রবিনহুডের মতো ডাকাত। কিন্তু ওর মেজদা এখনো দেবীচৌধুরানী পড়েনি, অথচ ধাঁই-ধুঁই ফাইট খুব হাঁকতে পারে, যেটা সুরথের মোটেই ভালো লাগে না। মারামারি ব্যাপারটা ওর মোটেই পছন্দ না।

এই সময়ে হঠাৎ ইন্দির মাঝি চিৎকার করে হাঁক দিল, 'হেই-ই-ই...হুঁশিয়া-ই-ই-য়ার!'...সুরথ চমকে উঠলো। মোক্তারদাদু ছইয়ের ভিতর থেকে বলে উঠলেন, 'কী হলো রে!'

নবীনকাকা উঠে দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে টর্চ লাইটের আলো ফেললেন। ইন্দির মাঝি বললো, 'মনে হচ্ছে, সামনে খান কয়েক নৌকো রয়েছে।'

টর্চের আলোয়, দূরে কয়েকটা নৌকো দেখা গেল। সেদিক থেকে চিৎকার করে জবাব এলো, 'চলি যাও।'...

নবীনকাকা টর্চের আলোটা চার পাশে ফেললেন। গাঙের ধারে বড় বড় ঘাস জঙ্গল, পাড়ে বড় বড় গাছপালা আর বাঁশঝাড়। দীপু বললো, 'ইন্দির মাঝি সামনের নৌকোগুলোকে জানিয়ে দিল, তা না হলে অন্ধকারে ধাক্কা লাগতে পারে তো।'

সুরথের কাছে এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হলো। ভিতর থেকে মোক্তারদাদু বললেন, 'সুরথ, কেমন বুঝছো? খারাপ লাগছে না তো?'

সুরথ বললো, 'না।'

কথাটা পুরোপুরি সত্যি না। এরকম অন্ধকারে নৌকোয় যেতে ওর বিশেষ ভালো লাগছিল না।

তিতিসয়া গাঙের যেখানে এসে নৌকো দাঁড়ালো, তার উঁচু পাড়ে, অনেকগুলো হ্যারিকেনের আলো আর লোকজন দেখা গেল। নবীনকাকা টর্চের আলো ফেললেন ওপরে। ছোট বড় সব রকমের লোকই সেখানে রয়েছে। কে একজন ওপর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবীন নাকি রে? বড়দা এসেছেন?'

নবীনকাকা বললেন, 'এসেছেন।'

নৌকো নোঙর করতে করতেই, আবার ওপর থেকে সেই একজনই জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সেই বোসঠাকুরতা মশাইয়ের ছেলে? সে এসেছে?'

নবীনকাকা গলুইয়ের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'এসেছে।'

তারপরে মোক্তারদাদুর সঙ্গে সুরথ উঁচু পাড়ে উঠতেই, বড় ছোট এক গাদা মানুষকে দেখা গেল, মোক্তারদাদুকে প্রণাম করতে একদল ছেলে ঘিরে ধরলো সুরথকে। দীপু তাদের সবাইকে ঠেকিয়ে রাখলো, ধমক দিয়ে বললো, 'এই, তোরা গায়ের ওপর পড়ছিস কেন, সরে যা।'

দীপু সুরথের গা ঘেঁষে, তার হাত ধরে রইলো। আর সমবয়সী বা একটু ছোটর দল, সুরথের দিকে এমন করে দেখতে লাগলো, যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে। সুরথের খুব লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু একটি মেয়েকে দীপু কিছুই বললো না, সে সুরথের গায়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। দেখতে অনেটা দীপুর মতোই, টকটকে ফরসা রঙ, গায়ে ফ্রক, বেড়াবিনুনি বাঁধা চুল, খালি পা। ন'-দশ বছর বয়স হতে পারে। সেও দু'-একজনকে, সুরথের সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। সুরথ দীপুকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখান থেকে বাড়িটা কতো দূর?'

দীপু হেসে বললো, 'কতোদূর আবার? এটা তো দাদুদের বাগান। বাগানটা পেরিয়েই বাড়ি।'

মোক্তারদাদু ডাকলেন, 'কই সুরথ, এসো।'

দীপু বললো, 'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি দাদু।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তো সেই স্টিমারঘাট থেকেই সুরথের লেফটেন্যান্ট হয়ে গেছ দেখছি, কিন্তু তুমি কি ভাই ওকে সামলাতে পারবে?'

বড়রা কেউ কেউ হেসে উঠলেন। সবাই তখন চলতে আরম্ভ করেছে। নবীনকাকা বললেন, 'ঠিক আছে জ্যাঠামশাই, আমি আছি।'

কয়েকটা হ্যারিকেনের আলোয়, ঘন গাছপালার মধ্যে, সকলের ছায়াগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। বাগানটাও মস্ত বড়, যেন শেষ হতে চায় না। তারপরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে, সুরথ গোটা বাড়িটার কোনো হাতা মাথাই খুঁজে পেলো না। মস্ত বড় একটা উঠোন। তার কোনোদিকে দোতলা পাকা বাড়ি, কোনোদিকে ঢেউ টিনের দেওয়াল আর টিনেরই চাল মাথার ওপরে। মোক্তারদাদু পাকা বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, অনেক মহিলা তাঁকে এসে প্রণাম করলেন। কারোর মাথায় ঘোমটা আছে, কারোর মাথায় নেই। মোক্তারদাদু সবাইকেই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, কারোকে বা দু'একটি কথা বললেন। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার শ্যামা মা কোথায় রে?'

'এই যে বাবা, এসেছি।' বলেই একজন ফরসা মহিলা এগিয়ে মোক্তারদাদুকে প্রণাম করলেন। মোক্তারদাদু তাঁকে হাত ধরে কাছে টেনে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো আছিস মা?'

শ্যামা নাম, অথচ তিনি দীপুর মতোই ফরসা, দেখতেও অনেকটা দীপুর মতো। সুরথের বউদির থেকে একটু বড় হবেন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মাথার সিঁথিতেও সিঁদুর। লালপাড় শাড়ি আর লাল জামা তাঁর গায়ে। তাঁর সারা গায়ে অনেক সোনার গহনা পরা। বললেন, 'বাবা, আমি তোমার পান সাজিয়ে রেখেছি, আর তুমি আসছো শুনেই চায়ের জল বসিয়ে এলাম। তুমি এবার একটু বসো।'

মোক্তারদাদু বসলেন, হেসে বললেন, 'তোর কাছে তো সব চাইবার আগেই হাতে এসে পড়ে। আমার সুরথভায়াকেও একটু দেখ, তোমার দীপু তার সঙ্গে আছে।'

শ্যামা তৎক্ষণাৎ সুরথের দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে বললেন, 'ও মা, সে যে আমাদের সব থেকে বড় অতিথি।' বলে সুরথের হাত ধরে একেবারে গায়ের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'বাহ্, ভারি মিষ্টি দেখতে।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'খুব। তবে একটু একটু ঝালও আছে, কী বলো হে সুরথ?'

সুরথ লজ্জা পেলো, বাকীরা সবাই হেসে উঠলেন। মোক্তারদাদু আবার বললেন, 'সুরথ, ইনি হলেন তোমার পিসিমা, আমার মেয়ে—তোমার লেফটেন্যান্ট দীপুর মা।'

সুরথ অমনি নিচু হয়ে শ্যামা পিসিমাকে প্রণাম করলো। শ্যামা সুরথকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলে। ঝালের তো আমি কিছুই দেখছি না।'

মোক্তারদাদু বলে উঠলেন, 'সেই ঝিন্‌কি ঝিন্‌কি ঠুন্‌কি ঠিনিক্‌টাকে দেখছি না কেন?'

সুরথের গায়ের কাছ থেকেই, সেই বেড়াবিনুনি বাঁধা মেয়েটি বলে উঠলো, 'এই তো আমি। বাগানের ঘাটে তোমাকে নমস্কার করলাম, দেখতেও পেলে না।'

মোক্তারদাদু তাঁর মোটা ভুরু তুলে, চোখ বড় করে বললেন, 'হায় হায়, তাই নাকি গো ঝিন্‌কিদিদি? আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তা, সেইজন্যেই বুঝি আমাকে ছেড়ে সুরথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছো? আমার সঙ্গে কি আড়ি?'

মেয়েটি চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় কাত করে, ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'আহা, তাই বলেছি বুঝি?'

ওর ফরসা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠলো। সবাই হেসে উঠলেন। মোক্তারদাদু বললেন, 'তবে এসো ঝিন্‌কি রানী, তোমার গালে একটু গোঁফ দাড়ি বুলিয়ে দিই!'

ঝিন্‌কি অমনি মোক্তারদাদুর কোলের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মোক্তারদাদু ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, সত্যি সত্যি দাড়ি বুলিয়ে দিলেন ওর গালে। আর ঝিন্‌কি খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'উ দাদু, সুড়সুড়ি লাগছে।' বলে ছিটকে সরে এলো।

মোক্তারদাদু বললেন, 'শামু মা, তুমি আমার জন্য একটু গরম

জল করতে বলো। আমি গরম জলেই হাত মুখ ধোব। আর সারাদিন নদীপথে এসেছে, জলো বাতাস ছিল। সুরথকে অল্প জলে, আজ রাত্রের মতো হাত মুখ ধুতে দিও। জামা প্যাণ্ট বদলে দিও। অবিশ্যি, স্টিমারে একপ্রস্থ জামা প্যাণ্ট কয়লার কালি মাখামাখি করে—।' এই পর্যন্ত বলেই, মোক্তারদাদু সুরথের রুষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন, তারপরে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে-সব কথা বলবো না। তুমি সারাদিনের জামা প্যাণ্ট জুতো মোজা খুলে, এবার অন্য কিছু পরো গিয়ে।'

শ্যামা সুরথের হাত ধরেই ছিলেন, টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'চলো, আমরা ভেতরে যাই।'

কিন্তু মোক্তারদাদু যে শ্যামাকে চোখ টিপেছেন, সেটা সুরথ দেখতে পায়নি। সুরথের সঙ্গে ভিতরে দীপু আর ঝিন্‌কি তো এলোই, ওদের বয়সী আরো তিন-চারজন এলো। দীপু বলে উঠলো, 'তোরা এখন তোদের ঘরে যা না।'

শ্যামা ধমকের সুরে বললেন, 'ও কি দীপু, ওদের ওরকম বলছিস কেন? ওরা তোর ভাই বোন না? নাকি ওরা এ বাড়ির ছেলেমেয়ে না?'

ঝিন্‌কি বলে উঠলো, 'দাদাটা ভারি ইয়ে!'

সুরথ তাকালো ঝিন্‌কির দিকে। দীপু ভেংচে, মাথা ঝাঁকিয়ে শব্দ করলো, 'এ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ!'...

ঝিন্‌কি সুরথের তাকানো দেখেই লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সুরথ দীপুর দিকে তাকাতে, সেও লজ্জা পেলো, আর হাসলো, কিন্তু ফরসা মুখে রাগের ছাপটা রয়েছে। সুরথের মনে হলো, ঝিন্‌কি আর দীপু যেন, অনেকটা, ও আর ওর মেজদা। ওদের মা হেসে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তোরা ভাই বোন ঝগড়া কর, আর সুরথ মনে মনে হাসবে, ভাববে কোথাকার পাড়াগেঁয়ে কুঁদুলে দুটো ছেলে মেয়ে।'

সবাই হেসে উঠলো, দীপু আর ঝিন্‌কি ছাড়া। সুরথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'না না, আমি তা মনে করবো না।'

শ্যামা হেসে বললেন, 'মনে করবে না? তুমি তো আসলে লক্ষ্মী ছেলে।'

সুরথ একটু লজ্জা পেয়ে গেল। লক্ষ্মী ছেলে ওকে বড় একটা কেউ বলে না। বাইরের ঘর থেকে, দালান পার হয়ে, একটা ঘরের মধ্যে সবাই ঢুকলো। সেটা একটা বড় শোবার ঘর। সুরথের মামারবাড়ির মতো, সেকালের মস্ত বড় খাট, জলচৌকির ওপর পা দিয়ে, সেই খাটে উঠতে হয়। সেই ঘরের এক পাশে সুরথের স্যুটকেশ ছিল। শ্যামা পিসিমা বললেন, 'সুরথ, ওই যে তোমার স্যুটকেশ, রাত্রে যা পরবে, তুমি খুলে বের করে নাও।' বলে তিনি ঝিন্‌কির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঝিন্‌কি, তুই সুরথকে নিয়ে, রান্নাঘরের বারান্দার কোণে যে জলের বালতি রয়েছে, সেখানে নিয়ে যাবি। আমি বোঁচাকে বলছি, ওখানে একটা বাতি আর একটা শুকনো গামছা রেখে আসবে।' বলেই শ্যামা পিসিমা বাকী সকলের দিকে তাকিয়ে, বেশ একটু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই এক জায়গায় বসো। সুরথ হাত মুখ ধুয়ে, একটু কিছু খেয়ে নিক, তারপরে সবাই মিলে গল্প করবে।'

সুরথের মনে হলো, শ্যামা পিসিমার গায়ের রঙ যেমন ফরসা, চোখগুলো তেমনি কুচকুচে কালো আর বড়। ওঁর নাকটাও বেশ টিকলো, বাঁ দিকে পাথরের নাকছাবি চিকচিক করছে। ঠিক যেন দুর্গা প্রতিমার মতো। তিনি বেরিয়ে গেলেন। সুরথ গেল স্যুটকেশ খুলে, রাত্রে পরার জামা প্যাণ্ট আর স্যাণ্ডেল বের করতে। তখন শুনতে পেলো, কে যেন বলছে, 'রাঙাপিসি ডাঁট না দেখিয়ে কথা বলতে পারে না।'

একটি মেয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের ইস্কুলের পূরবীদির মতো।'

কয়েকজন হেসে উঠলো। ঝিন্‌কি বলে উঠলো, 'কেয়া, আমার মাকে এসব বলা হচ্ছে, না? আমি মাকে ঠিক বলে দেবো।'

দীপু বললো, 'তোদের চণ্ডীপুরের গার্লস ইস্কুল আবার একটা ইস্কুল নাকি? আর তোদের পূরবীদি আমার মা'র মতো? সে তো একটা মোষের মতো কালো আর মুটকি।'

ঝিন্‌কি খিলখিল করে হেসে উঠলো। সুরথ তখন মেঝেতে বসে ওর জুতো আর মোজা খুলছে, আর ওদের কথা শুনছে। কেয়া যার নাম, ঝিন্‌কির মতোই তার ন'-দশ বছর বয়স হবে। ও রেগে বলে উঠলো, 'ইস্কুলের দিদিমনিদের নামে এসব বলতে লজ্জা করে না? তোদের সুন্দরিগাঁয়ের ইস্কুলে বুঝি এসব শেখায়?'

দীপু বললো, 'আর গোপাল যে আমার মায়ের নামে বললো, ডাঁট দেখায়? আর তুই তোদের পূরবীদির কথা বললি কেন? মা কি পূরবীদির মতো? তোদের চণ্ডীপুরের ইস্কুলে বুঝি নিজের পিসিমার নামে এসব বলতে শেখায়?'

গোপাল, যার বয়স সুরথদের মতোই হবে, ও বললো, 'পিসিমা তো কী হয়েছে? একটা নতুন লোকের সামনে ইন্‌সাল্ট করবে?'

সুরথ অবাক চোখে গোপালের দিকে তাকালো। নতুন লোক! সেটা আবার কে? সুরথকে বলছে নাকি? আর ইন্‌সাল্ট? ওর মনে মনে খুব হাসি পেলো। পিসিমা আবার ইন্‌সাল্ট কী করবেন? শ্যামা পিসিমা তো সেরকম কিছু বলেন নি? কিন্তু গোপালকে কিছু বলতে পারলো না। গোপাল খুব রেগে গিয়েছে, আর ওকে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছে। কেয়াকেও খুব রাগী দেখাচ্ছে। কেবল একটি মাত্র ছেলে, প্রায় সুরথদের সমবয়সী, কিছুই বলছে না। সকলের কথা শুনছিল। এবার হঠাৎ বলে উঠলো, 'গোপালটা কাট গোঁয়ার, বাজে বাজে কথা বলে।'

বলতেই গোপাল সেই ছেলেটির দিকে রেগে তাকালো। ছেলেটি বললো, 'দ্যাখ গোপাল, মারবি না বলে দিচ্ছি, তাহলে পেয়ারাপাতা চিবোবার কথা সব্বাইকে বলে দেবো।'

গোপাল অমনি চুপ্‌সে গেল। ঝিন্‌কি বলে উঠলো, 'আমি জানি।' বলেই মুখে হাত চাপা দিল।

এই সময়ে, খালি গা ধুতি পরা কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলে এসে বললো, 'ঝিন্‌কি, আমি গামছা আর বাতি রেখে এসেছি।'

বলেই চলে গেল। ঝিন্‌কি তাকালো সুরথের দিকে। সুরথ তখন গায়ের জামাটাও খুলে ফেলেছে। ঝিন্‌কি ওর কাছে গিয়ে বললো, 'জামাটা আমাকে দাও, আল্‌নায় রেখে দিই।'

সুরথ ওর হাতে জামাটা দিল। খাটের এক পাশেই আল্‌না ছিল। তার এক ধারে জামাটা রেখে ডাকলো, 'চলো।'

সুরথ ওর রাত্রে পরার জামা প্যান্ট হাতে নিয়েই যাচ্ছিল। ঝিন্‌কি অবাক হয়ে বললো, 'ওগুলো কোথায় নিয়ে যাবে? হাত মুখ ধুয়ে এখানে এসে ওগুলো পরবে।'

সুরথ অবাক হয়ে বললো, 'এখানে? এখানে বাথরুম কোথায়? বদলাবো কেমন করে?'

ঝিন্‌কিও অবাক হলো। কথাটা ও প্রথমে বুঝতেই পারে নি। তারপরে বুঝতে পেরে, খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ঝিন্‌কিও বেশ ফরসা, চোখ দুটোও বড়, কিন্তু শ্যামা পিসিমার মতো সুন্দর না, ওর মুখটা একটু অন্যরকম। ও বললো, 'তাহলে ওগুলো আমাকে দাও। টিউবওয়েলের কাছে, বেড়া দিয়ে ঘেরা চানের জায়গায়, এগুলো পরে নেবে।'

ওদিকে তখন গোপালের অবস্থা খুব কাহিল, ও বারে বারে বলছে, 'নিমু, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। তোমারো আমি অনেক কথা ফাঁস করে দিতে পারি।'

নিমু খুব হাসছিল, তার সঙ্গে দীপুও। সুরথ ঝিন্‌কির সঙ্গে, দালান পার হয়ে, বাইরের ঢাকা বারান্দায় গেল। বারান্দার ডান পাশে রান্নাঘর। সেখানে শ্যামা পিসিমা ছাড়াও, আর একজন মহিলার গলা শোনা যাচ্ছে। সুরথ ঝিন্‌কির পিছনে পিছনে, বাঁ দিকে একটা থামের কাছে রাখা হ্যারিকেন বাতির সামনে গেল। থামের গায়ে পেরেকে শুকনো গামছা ঝুলছে। পাশেই জলের বালতি, আর একটা এলুমিনিয়ামের ঘটি। সুরথ ঝিন্‌কিকে জিজ্ঞেস করলো, 'সাবান নেই?'

ঝিন্‌কি বললো, 'এখন সাবান লাগবে?'

সুরথ দু'হাত মেলে বললো, 'লাগবে না? এত ময়লা?'

ঝিন্‌কি সুরথের জামা প্যান্ট হাতেই ছুটলো। অথচ নিজেদের বাড়িতে, সাবান দিয়ে হাত না ধোবার জন্য, সুরথকে রীতিমতো বকুনি খেতে হয়। সেখানে হাত ধোবার কথা মনেই থাকে না, দূর পাড়াগাঁয়ে এসেই যতো ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য মাথা ব্যথা। আসলে ঝিন্‌কিকে বোঝাতে চাইলো, সাবান ছাড়া ও হাত মুখ ধোয় না।

ঝিন্‌কি আবার ছুটতে ছুটতে এলো। ওর হাতে একটা ঝকঝকে সাবানের বাকসো। সুরথ সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে খুলতেই, সুন্দর গন্ধ পেলো। জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কার?'

ঝিন্‌কি বললো, 'মায়ের।'

সুরথ বেশ খুশি হয়ে, সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। পা পরিষ্কার করে ধুয়ে, গামছা দিয়ে মুছলো। ঝিন্‌কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখলো। তারপরে বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে, ঝিন্‌কি বেড়া দিয়ে ঘেরা চানের জায়গা দেখিয়ে, সুরথের হাতে জামা প্যান্ট তুলে দিল। সুরথ নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, বেড়ার আড়ালে। সেখানে জামা প্যান্ট বদলে বারান্দায় উঠে এলো। গোপালের পেয়ারাপাতা চিবনোর কথাটা ওর মনে ছিল। বললো; 'গোপাল সিগারেট খায়, না?'

ঝিন্‌কি অবাক বড় বড় চোখ মেলে, সুরথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী করে জানলে?'

সুরথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বললো, 'জানি। তা না হলে, পেয়ারাপাতা চিবোবে কেন?'

ঝিন্‌কির ভুরু কুঁচকে উঠলো, চোখে সন্দেহ। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী করে জানলে, সিগারেট খেলে পেয়ারাপাতা চিবোয়?'

সুরথ হাসতে হাসতে বললো, 'আমি জানি, পেয়ারাপাতা চিবোলে আর সিগারেটের গন্ধ থাকে না। শুধু শুধু কেউ পেয়ারাপাতা চিবোয় নাকি? আমি তো শুনেই বুঝে নিয়েছি।'

ঝিন্‌কির মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ও কিছু না বলে, মুখ ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। ওর ভাবটা সুরথ তেমন লক্ষ্য করলো না। ওর পিছনে পিছনে, দালানে ঢুকে, ঘরের মধ্যে এলো। দেখলো, গোপাল ছাড়া, বাকী সকলেই আছে। ঝিন্‌কি ঘরের দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে, সুরথের হাতে একটা চিরুনি এগিয়ে দিল, ওর মুখ তেমনি গম্ভীর। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'আয়না নেই?'

ঝিন্‌কি আলমারি দেখিয়ে বললো, 'ওর মধ্যেই আছে।'

সুরথ আলমারির কাছে গিয়ে, তাকের ওপর বসানো আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেলো। সেখানে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ানো হতে হতেই, শ্যামা পিসিমা ঢুকলেন হাতে খাবারের থালা নিয়ে। বললেন, 'ঝিন্‌কি, আলনার নিচে থেকে, সুরথকে একটা আসন পেতে দে।'

ঝিন্‌কি তাই দিল। শ্যামা পিসিমা খাবারের থালা রাখলেন। গরম লুচি আর বেগুন ভাজা, তার সঙ্গে কুমড়োর ছেঁচকি। আর একটা ছোট বাটিতে ক্ষীরের মধ্যে কিস্‌মিস্‌ দেখা যাচ্ছে। সুরথ আসলে বেশ পেটুক, খিদেও পেয়েছে খুব। তবু নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে এসে, কেমন লজ্জা করলো, বললো, 'এ তো অনেক খাবার।'

শ্যামা পিসিমা বললেন, 'ও কিছু না। রান্না হতে এখনো অনেক দেরি, ওটুকু খেয়ে নাও।'

বলে তিনি নিজেই, ঘরের এক পাশ থেকে, পিতলের কলসী থেকে কাঁসার গেলাসে জল গড়িয়ে দিলেন। সুরথ ঘরের এক পাশে. সকলের দিকে তাকালো। শ্যামা পিসিমা বললেন, 'বিকেলে সবাই খেয়েছে, তুমি সারাদিন ইস্টিমারে অনেকটা পথ এসেছো, খেয়ে নাও।'

বলে তিনি সামনেই বসলেন। সুরথের আরো লজ্জা লাগলো, কিন্তু খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকাও মুস্কিল। আর খেলোও যেন চোখের পলকে। শ্যামা পিসিমা আরো খাবার দিতে চাইলেন। সুরথ লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। আসলে ওর খাওয়াটাই তাড়াতাড়ি। শ্যামা পিসিমা বললেন, 'যাও, এবার সবাই মিলে গল্প করো। গিয়ে।'

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুরথ সকলের সামনে এসে, হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'গোপাল পালিয়ে গেছে?'

দীপু বললো, 'যাবে না? নিমু ওর আসল কথা ফাঁস করে দিচ্ছিল।'

সবাই হেসে উঠলো। কেয়াও এখন এ-দলে ভিড়ে গিয়েছে। ঝিনুকি বলে উঠলো, 'গোপালদা-ই বুঝি খালি দোষ করেছে। সিগারেট খেয়ে, আর কেউ বুঝি পেয়ারাপাতা চিবোতে জানে না?' সবাই অবাক হয়ে ঝিনুকির দিকে তাকালো। ঝিনুকির ফরসা মুখটা যেন রাগে দপ্ দপ্ করছে। নিমু আর দীপু নিজেদের মুখের দিকে দেখলো। দীপু বেশ রেগে গিয়ে বললো, 'কাকে বলছিস তুই?'

ঝিনুকি তাকালো সুরথের দিকে, তারপরে আঙুল দিয়ে সুরথকে দেখিয়ে বললো, 'সিগারেট খেয়ে, পেয়ারাপাতা চিবোলে মুখে গন্ধ থাকে না, ও জানে। আমাকে বলেছে।'

সবাই সুরথের দিকে তাকালো। সুরথ আকাশ থেকে পড়লো, ঝিনুকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি সিগারেট খাই, তোমাকে বলেছি?'

ঝিনুকি যেন চোখ পাকিয়ে বললো, 'তুমি বলো নি, সিগারেট খেয়ে, পেয়ারাপাতা চিবোলে মুখে গন্ধ পাওয়া যায় না?'

সুরথের ইচ্ছা হলো, মেয়েটার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। বললো, 'বলেছি তো, তা বলে আমার কথা বলেছি নাকি? আমি আমাদের শহরের একটা ছেলেকে খেতে দেখেছি, তাই বলেছি। আমি খেয়েছি, বলেছি?'

ঝিনুকি চট করে কোনো জবাব দিতে পারলো না, সুরথের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। সুরথ সকলের মুখের দিকে তাকালো। সবাই তখন ঝিনুকিকেই দেখছে, সকলেই ওর ওপর রেগে গিয়েছে, চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। সুরথ বললো, 'আমি তো নিমুর কথা শুনেই বুঝেছি, তাই ওকে বলেছি। আর ও ভেবেছে, আমি সিগারেট খাই!'

দীপু বলে উঠলো, 'ও একটা পেত্নি, ঝগড়ুটি। দাঁড়া, আমি মা'কে এখুনি বলে দিচ্ছি।'

ঝিনুকির কী হলো বোঝা গেল না, ও হঠাৎ দৌড়ে সেখান থেকে চলে গেল। নিমু বললো, 'দীপু, রাঙা পিসিকে কিছু বলিস না, তাহলে গোপালের কথা ফাঁস হয়ে যাবে।'

সুরথের মনে হলো, নিমু ঠিক বলেছে। কিন্তু ওর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। শ্যামা পিসিমার মেয়ে বলে, ঝিনুকিকে ওর ভালো লেগেছিল। এখন মনে হলো, মেয়েটা শুধু ঝগড়াটে নয়, মনটাও প্যাঁচে ভরা। তা না হলে, ওকে মিছিমিছি দোষ দেয়?

কেয়া বললো, 'ওসব যাকগে, আমরা বসে গল্প করি।'

দীপু বললো, 'সেই ভালো।'

কিন্তু সুরথের ভালো লাগলো না। ও বললো, 'আমি মোক্তারদাদুর কাছে যাচ্ছি!' বলে উঠে পড়লো।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে, সুরথ একটু অবাক হয়ে প্রকাণ্ড মশারিটার দিকে তাকালো। তারপরে পাশ ফিরতেই চোখে পড়লো দীপুকে। দীপু পাশ ফিরে শুয়ে, ওর দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। বললো, 'আমি দেখছিলাম, কখন তোমার ঘুম ভাঙে।'

সুরথের মনে পড়লো, সেই বিরাট উঁচু খাটের ওপরে ও আর দীপু শুয়েছে। নিচে, মেঝেয় বিছানা পেতে, শ্যামা পিসিমা ঝিনুকিকে নিয়ে শুয়েছিলেন। সুরথ উঠে বসে দেখলো, মেঝেয় কোনো বিছানাই নেই। দীপু বললো, 'মনে আছে তো, সকালবেলা জলখাবার খেয়েই আমরা গ্রামের সব ঠাকুর দেখতে যাবো।'

সুরথ ঘাড় কাত করে জানালো, মনে আছে। গতকাল রাত্রে ঝিনুকির ব্যাপারে ওর মনটা একটু খারাপ ছিল। এখন আর নেই। ওই মেয়েটার সঙ্গে কথা না বললেই হলো। নতুন গ্রামটা ঘুরে দেখবার জন্য মনটা খুশি কৌতূহলে ভরে উঠলো। প্রতিমা গড়া ও অনেক দেখেছে। কিন্তু সেই দেখাটা কখনো পুরনো হয় না। একবার দেখতে আরম্ভ করলে, নাওয়া খাওয়া সব ভুলে যায়। ও তাড়াতাড়ি মশারির বাইরে, খাট থেকে লাফিয়ে নামলো। দীপুর সঙ্গে পিছন দিকের বারান্দা দিয়ে টিউবওয়েলের কাছে গেল। মোক্তারদাদুর বিশেষ বারণ আছে, সুরথ যেন পিছনের পুকুরঘাটে মুখ ধুতে বা চান করতে না যায়। দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া, সব কিছু সেরে, সুরথ বেরোবার জন্য প্যান্ট শার্ট জুতো মোজা পরে ফিটফাট হয়ে নিল। দীপু ওর কোমরের সোনালী কাজ করা বেল্টটা হাত দিয়ে দেখে বললো, 'আমাদের এখানে এসব পাওয়া যায় না।'

সুরথের আরো দুটো ভালো বেল্ট ছিল। কোমরের বেল্টটা খুলে দীপুকে দিয়ে বললো, 'তুমি এটা পরো, আমি অন্য আর একটা পরছি।'

দীপু খুব লজ্জা পেলো, পরতে চাইলো না। শেষটায় সুরথ নিজেই দীপুর কোমরে বেল্টটা পরিয়ে দিল। এই সময়ে ঝিনুকি একবার ঘরে ঢুকে উঁকি দিয়ে দেখেই চলে গেল। একটু পরেই ঢুকলেন শ্যামা পিসিমা, বললেন, 'হ্যাঁরে দীপু, তুই নাকি সুরথের বেল্ট পরেছিস?'

দীপু একটু থতোমতো খেয়ে গেল। সুরথ বললো, 'ওটা আমিই দীপুকে পরতে দিয়েছি। আমি তো আর একটা পরেছি।'

শ্যামা পিসিমা হেসে বললেন, 'তা বলে একেবারে দিয়ে দিও না, এখন পরুক।' বলে দীপুর দিকে ফিরে বললেন, 'তুই রান্নাঘরে বসে খেয়ে নিবি চল, সুরথের খাবার আমি এখানে নিয়ে আসছি।'

সুরথ বললো, 'কেন, আমিও রান্নাঘরে গিয়ে খাবো।'

শ্যামা পিসিমা বললেন, 'তোমার খারাপ লাগবে না?'

সুরথ অবাক হয়ে বলো, 'না তো! আমি তো বাড়িতেও অনেকদিন রান্নাঘরে বসে খাই।'

শ্যামা পিসিমা সুরথের কাঁধে হাত দিয়ে, কাছে টেনে, গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'সত্যি লক্ষ্মীছেলে! তাহলে তুমি দীপুর সঙ্গে এসো, আমি যাচ্ছি।'

শ্যামা পিসিমা ফিরতেই, সুরথ দেখতে পেলো ঝিনুকি দরজার কাছ থেকে চট করে সরে গেল। সুরথ বললো, 'বেল্টের কথাটা নিশ্চয়ই ঝিনুকি গিয়ে লাগিয়েছে।'

দীপু বললো, 'ঠিক বলেছ।'

সুরথ বললো, 'ওরকম যারা লাগায়, তাদের আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আমিও না।' তারপরে আবার বললো, 'কিন্তু ঝিনুকিটা তো লাগানি মেয়ে না, আজ এ রকম করছে কেন?'

সুরথ গম্ভীর হয়ে বললো, 'মোটের ওপর, ওর সঙ্গে আমি আর কথা বলবো না। ও নিশ্চয়ই ঝগড়ুটি আর লাগানি।'

দীপু সুরথের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে, কিছু বলতে সাহস পেলো না। মুখ দেখে বোঝা গেল, বোনের জন্য ওর মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওরা দুজনেই রান্নাঘরে খেতে গেল। দুটো লুচি আর এক বাটি দুধ খেয়েই, সুরথের পেট ভরে গেল।

পড়ে রইলো নারকেলের ছাঁচ, নাড়ু। এমন কি ওর জন্যেই বিশেষ করে ডিমের ওমলেট করা হয়েছে, ও তা মুখেই দিল না। শ্যামা পিসিমা অনেক করে বলেও খাওয়াতে পারলেন না। খাওয়া ছেড়ে ওঠবার পরেই, তিনি বললেন, 'দাদুর সঙ্গে দেখা না করে যেন বেরিও না।'

সুরথ আগেই ঘরে গিয়ে, ওর স্যুটকেশ খুললো। বড় একটা হলদে কাগজের প্যাকেট বের করলো। দীপু জিজ্ঞেস করলো, 'ওতে কী আছে?'

সুরথ বললো, 'কাগজ, পেন্সিল আর ইরেজার। ছবি টবি আঁকতে হতে পারে।'

দীপু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ছবি আঁকতে পারো?'

সুরথ বললো, 'একটু একটু শিখেছি।'

দীপুর দৃষ্টি তখন সুরথের স্যুটকেশের মধ্যে পড়েছে। বলে উঠলো, 'আরে, ওগুলো কী? বাঁশি নাকি?'

সুরথ বললো, 'হ্যাঁ।'

দীপু আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কার বাঁশি, কে বাজায়?'

সুরথ হেসে বললো, 'কার আবার? আমারই বাঁশি, আমিই বাজাই।'

বলতে বলতে ও স্যুটকেশটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। দীপু একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সুরথ বললো, 'চলো মোক্তারদাদুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

দীপু দালান দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো, তুমি দাদুকে মোক্তারদাদু বলো বুঝি?'

সুরথ বললো, 'আমরা সবাই বলি।'

বলেই সুরথের শিশু বয়স থেকে, এই প্রথম মনে কেমন খটকা লাগলো। তাই তো! এখানে সবাই ওঁকে দাদু নয়তো ঠাকুর্দা বলে ডাকে। মোক্তারদাদু ডাকটা যেন কেমন খাপছাড়া, বাজে লাগছে। ও মনে মনে ঠিক করলো, আর কখনো মোক্তার-দাদু বলে ডাকবে না, শুধু দাদু বলে ডাকবে।

বাইরের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই, মোক্তারদাদুর ঘরের সেই চেনা গন্ধ পাওয়া গেল। পান, আদা, মিছরি, লবঙ্গ, বচ, হরতুকি সব মেলানো গন্ধ। বসেছিলেন একটা মস্ত আরামকেদারায়। তাঁর এক পাশে ঝিনুকি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের চেয়ারে তক্তপোষে আরো কয়েকজন বসে আছেন, কথাবার্তা বলছিলেন। সুরথকে দেখেই তিনি বললেন, 'এই যে সুরথভাই, দেখে মনে হচ্ছে, সাজো সাজো রব পড়ে গেছে? ঘুমটুম ভালো হয়েছিল তো?'

সুরথ বললো, 'হ্যাঁ। এখন গ্রামে একটু বেড়াতে যাচ্ছি।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'তা নিশ্চয়ই যাবে। আমার দু'-একটি কথা মনে রাখবে। গাঙের ধারের দিকে গেলেও, জলে কখনো নামবে না. কারোর নৌকোয় উঠবে না। গ্রামের বাইরে কোথাও যাবে না। ঝগড়া-বিবাদ তুমি কারোর সঙ্গে করবে না জানি, তবু বলে রাখি, কেউ কিছু বললে, আমাকে বলে দেবে।'

বলেই দীপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুইও যাচ্ছিস্ তো?'

দীপু বললো, 'হ্যাঁ।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'যা বলে দিলাম, তা মনে রেখো। তোমার বাবা এবেলাই এসে যাচ্ছেন।' বলে, আবার সুরথের হাতের দিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কী জিনিস?'

সুরথ লজ্জা পেয়ে গে,ল, ঘরের চারদিকে সকলের দিকে একবার দেখে. মুখ নামালো। মোক্তারদাদু ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওহ্, ভারি দুঃখিত, মনেই ছিল না। মানে এই তো?' বলে তিনি হাতে আঁকার ভঙ্গি করে দেখালেন।

সুরথ মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাথায় ছোট ছোট চুল, কিন্তু মস্ত গোঁফওয়ালা, ফতুয়া গায়ে একজন হেসে বললেন, 'দাদু নাতীতে কথাটা কী হলো, ঠিক ধরতে পারলাম না তো?'

মোক্তারদাদু তাঁর মোটা ভুরু কাঁপিয়ে বললেন, 'সব কি আর বোঝা যায় হে হরনাথ, এসব হচ্ছে অন্য ধরনের মামলা। এসব জজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল মোক্তারেরা বোঝে না, কী বলো হে সুরথ?'

সুরথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল। দীপুর দিকে তাকিয়ে, দুজনেই হাসলো। একজন বলে উঠলো, 'তবে মজুমদার কাকা, আপনার শহুরে নাতীটির রঙটা একটু ময়লা বটে, চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার দলে ভিড়িয়ে নিলেই হয়। নিমাইঠাকুর বলুন, আর কৃষ্ণঠাকুরই বলুন, আসরে নামিয়ে দিলে আর দেখতে হবে না'

মোক্তারদাদু একটু ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি চুপ করো কেতু, অমন কথাটিও বলো না। আমার সুরথ ভায়া, তোমার যাত্রার দলের থেকেও অনেক বড় যাত্রার দলের খোদ কর্তার সঙ্গে বসে মহড়া দেখে। তোমরা কী ছাই পার্ট বলো, ও তার চেয়ে অনেক ভালো পারে। তা বলে, তোমার দলে ও যাত্রা করতে যাবে?'

কেতু যাঁর নাম, তাঁর মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল, গায়ের রঙ কালো, রোগা, আর চোখ দুটোর রঙ কুমড়ো ফুলের মতো হলদে অথচ গলার স্বরটা যেন যাত্রার মহীরাবণের মতো গমগমে। গায়ের পাঞ্জাবির বুকের বোতাম খোলা, ভিতরে পৈতা দেখা যাচ্ছে। বেশ একটু থতিয়ে গিয়ে বললেন, 'না না, তা বলিনি, কিন্তু যেন একেবারে শিখিপুচ্ছ বাঁকা বংশীধারী।'

মোক্তারদাদু আগের মতোই বললেন, 'দুত্তোরি তোমার বংশী-ধারী আর শিখিপুচ্ছ। ভায়ার আমার গান শুনলেই তোমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।' বলে সুরথের দিকে ফিরে বললেন, শুনিয়ে দাও তো ভাই, দু'কলি গান শুনিয়ে দাও।'

সুরথ যেন লজ্জায় আর মরমে মরে গেল। মোক্তারদাদু যে ওকে এরকম একটা অনুরোধ করে বসবেন, ভাবতেই পারেনি। ও প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে, ভুরু কুঁচকে, মাথা নেড়ে বললো, 'উম্, না না দাদু, আমি গান গাইতে পারবো না।'

মোক্তারদাদু তাঁর দাড়িতে হাসি ছড়িয়ে, ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'শুনিয়ে দাও ভাই একটা গান, শুনুক ওরা, আমার সুরথভায়া কেমন গাইতে পারে।'

কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনি একটু।'

সুরথ মোক্তারদাদুর দিকে তাকালো, তাঁর হাসিটা দেখে, এখন ওর খুব রাগ হচ্ছে। তার ওপরে আবার পাশেই আদুরে ঝিনুকিটা! মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল। তারপরেই সুরথের চোখে মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। ও গেয়ে উঠলো,

আমাদের মনোমোহন মোক্তার
মস্ত ইমানদার
হিন্দু-মোসলেম ভেদ মানেন না
দয়ার অবতার...

মোক্তারদাদু একেবারে হৈ হৈ করে উঠলেন, 'ও গান না ও গান না...।'

অন্যান্যরা বেশ উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই হোক, বেশ সুন্দর, চমৎকার।'

এই হৈ চৈ-এর মধ্যে সুরথ হা হা করে হেসে উঠলো তার সঙ্গে দীপুও। মোক্তারদাদু বললেন, 'যাও ভাই, তুমি বেড়াতে যাও। আমার অস্ত্র দিয়ে, আমাকেই ঘায়েল!'

ঘরের মধ্যে তখন সবাই হাসছেন। সুরথ আর দীপু বেরিয়ে গেল।

দরজার বাইরে নিমু কেয়াও ছিল। ওরাও এক সঙ্গে চললো। বাড়ির বাইরে যেতেই, গোপালও এসে ভিড়লো। সুরথ বললো, 'গোপাল, তুমি সিগারেট খাবে না তো? তোমার জন্য কাল রাত্রে ঝিনুকি আমাকে যা তা বলেছে।'

গোপাল যেন কেমন থতোমতো খেয়ে গেল। কিন্তু ঠিক তখনই, পিছনে, বড় একটা গাছের আড়াল থেকে ঝিনুকি বেরিয়ে এলো। বললো, 'গোপালদার জন্য আমি কিছু বলেছি? আমি

তো তোমার কথা শুনে বলেছি।'

সুরথের সঙ্গে সবাই, অবাক চোখে ঝিন্‌কির দিকে ফিরে তাকালো। ঝিন্‌কি আবার বললো, 'তোমার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, তা-ই বলেছি।'

সুরথ বললো, 'তুমি আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলেছ।'

ঝিন্‌কি ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, 'আমি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলেছি?'

সুরথ সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বলেনি?'

নিমু আর কেয়া বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, বলেছে।'

ঝিন্‌কির মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে উঠলো, বললো, 'বলেছি, বেশ করেছি। সবগুলো হিংসুটে।' বলেই পিছন ফিরে হন হন করে চলে গেল।

কেয়া বলে উঠলো, 'ঝিন্‌কিটা নিজেই হিংসুটে।'

ওর কথার জবাব কেউ দিল না। সুরথ চলতে আরম্ভ করলো, সঙ্গে সবাই। কিন্তু দীপুর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, রাগও হয়েছে। ও বললো, 'তোরা আমাদের সঙ্গে আসছিস কেন। তোদের কে ডেকেছে?'

নিমু বললো, 'আমরা গেলে কী হয়েছে। সুরথ রাগ করবে?'

দীপুর আসল রাগটা কেয়ার ওপরে, তাই বললো, 'কেয়া কেন আমাদের সঙ্গে যাবে? ও তো মেয়ে। মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে যাবে।'

কেয়াও রেগে বললো, 'তা তো বলবিই। ঝিন্‌কি আসতে পায় নি বলে, এখন আমাকে তাড়াতে চাইছিস্‌। খুব বুঝেছি।'

ঝগড়া আর পথ চলা এক সঙ্গেই চলছিল। সুরথের খারাপ লাগলো। ঝগড়া-বিবাদ ওর একটুও ভালো লাগে না। ঝিন্‌কি এলে ও যেতো না, কারণ ঝিন্‌কিকে ওর ঝগড়ুটি মেয়ে মনে হয়েছে। ও বললো, 'দীপু, ঝগড়া করো না, আমার ভালো লাগছে না।'

ওরা চুপ করে গেল। দীপু চলতে লাগলো সুরথের পাশে পাশে। সুরথের মনে হলো, ওর মামারবাড়ির গ্রামের থেকে, এখানকার গ্রামের চেহারা যেন আলাদা। হিজল বট অশত্থ গাছ এখানেও আছে, অন্যান্য গাছও অনেক। কাঠচাঁপা শিমুল কৃষ্ণ-চূড়া অনেক চোখে পড়ছে। আম জাম নারকেলের তো কথাই নেই। কিন্তু টিয়া পাখির ঝাঁক এখানকার মতো কোথাও দেখে নি, আর পাহাড়ি ময়না দেখে তো থ!

গোটা গ্রামে চারটে দুর্গা পুজো হয়। একটা সেকালের পুরনো জমিদার বাড়িতে। বাকী তিনটেই তিন পাড়ার বারোয়ারি পুজো। ওরা প্রথম যে পাড়ায় গেল, তার নাম ডালিমতলা। আজ তৃতীয়া, প্রতিমার গায়ে সবেমাত্র শাদা রঙ পড়েছে। সুরথ লক্ষ্য করে দেখলো, তাও এককোট। দু কোট শাদা রঙ না লাগালে, আসল রঙ লাগানো চলে না। এদিকে কুমোরেরা মাটির মালসায় অন্যান্য রঙও গুলেছে, কিন্তু তাদের ভাবটা এমন, যেন কোনো তাড়া হুড়ো নেই। সব কুমোরেরাই এরকম হয়। সুরথ ওদের নিজেদের শহরের, কাছাকাছি পুজো বাড়ি আর কুমোরপট্টিতেও এই রকমই দেখেছে, সবাই যেন নিশ্চিন্ত। অথচ ওর বুকের মধ্যে

ধুকপুকুনি শুরু হয়ে যায়। ভেবে উঠতে পারে না, মাত্র একদিন, কিংবা দেড়দিনের মধ্যে কী করে, রঙ লাগানো থেকে শুরু করে, একেবারে ঘামতেল পর্যন্ত মাথা হয়ে যায়। অবিশ্যি ও শুনেছে, এ সময়ে কুমোরেরা নাকি সারারাত্রি জেগে কাজ করে। তবে ডালিমতলার এই প্রতিমার মুখ সুরথের পছন্দ হলো না। রঙ না পড়লে, আর চোখ আঁকা না হলে, প্রতিমার মুখ ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু মুখের গড়ন দেখে, কিছু আন্দাজ করা যায়। এ প্রতিমার চিবুকটা কেমন থ্যাবড়া মতো দেখাচ্ছে।

অন্য দিকে, সুরথকে দেখে, ছোট বড় অনেকেই দীপুদের ওর পরিচয় জিজ্ঞেস করছে। আর তা বলতে গিয়ে, দীপুর সঙ্গে গোপালের ঝগড়া লেগে গিয়েছে। গোপাল বলেছে, সুরথ ওদের বাড়িতে এসেছে। দীপু বলছে, 'মোটেই না, সুরথ আমার দাদুর বাড়িতে এসেছে।' গোপাল বলে উঠলো, 'হোক তোর দাদুর বাড়ি, তবু ওটা আমাদের বাড়ি। তোদের বাড়ি তো সুন্দরিপুর।'

এসব শুনে সুরথের খুব লজ্জা করতে লাগলো। ওর বয়সী বা ছোট, কেউ কেউ কাছে এসে ওকে দেখতে লাগলো। যেন সুরথ একটা অদ্ভুত কিছু। ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল কেয়া। সুরথ কেয়াকে বললো, 'চলো, অন্য জায়গায় যাই।'

কেয়া বললো, 'চলো, দস্তিদার পাড়ায় যাই, সেখানেও ঠাকুর গড়ছে।'

সুরথ কোনো দিকে তা তাকিয়ে, ডালিমতলার মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। ওর সঙ্গে কেয়া। কেয়া বললো, 'চলো, আমরা দৌড়ুই, এক জায়গায় লুকিয়ে পড়বো, ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না।'

সুরথের মজা লাগলো কথাটা শুনে, বললো, 'চলো।'

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে দৌড়ুতে শুরু করলো। ডালিমতলা পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই, ডান দিকে বিরাট ধানের ক্ষেত দেখা গেল। বাঁ দিকে বড় বড় গাছপালা, প্রায় বনের মতো। কেয়া বললো, 'বাঁ দিকে চলো।'

কেয়া সুরথের আগে আগে ছুটলো। সুরথ ওর পিছনে। কেয়ার খালি পা, সুরথের পায়ে জুতো, কিন্তু খালি পায়ে কেয়া ওর থেকেও তাড়াতাড়ি দৌড়ুচ্ছে। গাছপালার ভিতরে, খানিকটা যাবার পরেই, শুনতে পাওয়া গেল, দীপু সুরথের নাম ধরে চিৎকার করছে। আর নিমু কেয়ার নাম ধরে। সুরথ দাঁড়িয়ে পড়লো। কেয়াও দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দাঁড়ালে কেন?'

সুরথ বললো, 'ওরা আমাদের খুঁজে না পেয়ে বাড়ি চলে গেলে, দাদু খুব ভাববেন।'

সুরথ তো ঘেমে উঠেছেই, কেয়াও ঘেমে উঠেছে। ওর চুলগুলো খোলা। কপালে আর গালের ঘামে চুল লেপ্টে গিয়েছে। সুরথের প্রায় চোখের ওপর চুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কেয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'ওরা তো এদিকেই আসবে।'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী করে বুঝলে?'

কেয়া বললো, 'ধান মাঠের পথটা তো অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ওরা ঠিক দেখে নেবে, আমরা ওদিকে যাইনি, তখন ওরাও এই পথে আসবে।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি যে বললে, দস্তিদারপাড়ায় যাবে, সেটা কি এদিকে?'

কেয়া মাথা নেড়ে বললো, 'না, এদিকে তো গড়।'

এ সময়েই, কিছু দূরে দীপু আর নিমুর গলা শোনা গেল। কেয়া ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে, চোখের ইশারা করলো। তারপরে সুরথের হাত ধরে, টেনে নিয়ে গেল আর একটু দূরে, একটু ঢালু জায়গায়। ফিসফিস করে বললো, 'এখানে মাথা নিচু করে বসে পড়ো। তোমাকে বললাম না তখন, আমরা লুকিয়ে পড়বো, ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না।'

খুব কাছেই দীপুর গলা শোনা গেল, 'সুরথ কখখনো ও জঙ্গলে ঢুকবে না।'

নিমু বললো, 'সুরথের সঙ্গে কেয়া আছে না? কেয়া ঠিক এদিকে নিয়ে গেছে।'

সুরথ আর কেয়া চোখাচোখি করে হাসলো। বললো, 'গোপাল মাঠের মোড় অবধি আমাদের সঙ্গে এসেছিল। ও ঠিক বাড়িতে গিয়ে লাগাবে।'

নিমু বললো 'লাগাকগে। কী লাগাবে? বলবে, সুরথ হারিয়ে গেছে?'

দীপু বললো, 'ও অনেক কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে। ও কী রকম মিথ্যে কথা বলতে পারে, জানিস না?'

নিমু বললো, 'বলুক গে।'

বলতে বলতে ওরা এগিয়ে চলে যেতে লাগলো। সুরথ মাথা তুলে দেখে, কেয়াকে বললো, 'ওরা যে চলে যাচ্ছে?'

কেয়া বললো, 'যাক না, আমরা ওদের পেছনে পেছনে যাবো।'

কিন্তু সুরথ কী ভেবে হঠাৎ শব্দ করে উঠলো, 'কুক্!'...

কেয়া ওর মুখে হাত চাপা দিল। দীপুদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। দীপুর চিৎকার শোনা গেল, 'কেয়া, এই কেয়া! সুরথ!'

সুরথ ওর মুখের ওপর থেকে কেয়ার হাতটা সরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলো। কিন্তু শব্দ না করে। কেয়া বললো, 'তুমি ভারি বোকা। ওরা এইবার ঠিক আমদের খুঁজে পাবে।'

নিমুর গলা শোনা গেল, 'কেয়ার গলা বলে মনে হলো না।' দীপু বললো, 'কিন্তু আমি কুক্ শুনতে পেয়েছি।'

নিমু বললো, 'সে তো আমিও শুনতে পেয়েছি। হাতী ডাকলো না তো?'

হাতীর কথা শুনে সুরথ অবাক চোখে কেয়ার দিকে তাকালো। কেয়া চুপিচুপি বললো, 'বর্ষাকালে যখন বন্যা হয়, তখন অনেক হাতী এই গড়ের জঙ্গলে আসে। এখন তো বন্যার সময় না।'

সুরথ আশেপাশে তাকালো। গাছের ফাঁকে ফাঁকে, রোদ আর ছায়া। দীপুর গলা শোনা গেল, 'যাঃ, এখন হাতী আসবে কোথা থেকে?'

সুরথ আবার দু'হাতে মুখ ঘিরে, শব্দ করে উঠলো, 'কুক্।'

কেয়া ওকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে, ভুরু কুঁচকে চোখের ইশারা করলো। নিমুর স্বর শোনা গেল, 'ওই যে, ওদিকটায় শব্দ হয়েছে।'

দীপু ডেকে উঠলো, 'সুরথ! সুরথ!'

ওদের পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। কেয়া সুরথের মাথাটা চেপে ধরে আরো নিচু করে দিল, নিজেও আরো নিচু হলো। নিমুর গলা এবার খুব কাছ থেকে শোনা গেল, 'কেয়া, এই কেয়া, ভালো হচ্ছে না বলে দিচ্ছি। কোথায় আছিস, বেরিয়ে আয় বলছি।'

'ওই যে! ওই যে!' দীপুর উল্লসিত গলা শোনা গেল, আর সুরথের বাঁ দিক থেকে ও দৌড়ে, প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো।

সুরথ আর কেয়া, দু'জনেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। নিমুও ছুটে এলো কাছে। দীপু সুরথের হাত টেনে ধরলো। নিমু বললো, 'এই কেয়াটার যতো দোষ।'

সুরথ বললো, 'কেয়ার কোনো দোষ নেই, আমিই ওকে চলে আসতে বলেছি।'

দীপু জিজ্ঞেস করলো, 'কেন চলে এলে?'

সুরথ বললো, 'তোমরা ঝগড়া করছিলে বলে? আমি তো বলেছি, ঝগড়া আমার একটুও ভালো লাগে না।'

নিমু বললো, 'সে তো গোপালের জন্য। ও চলে গেছে। তবে ও বাড়িতে গিয়ে অনেক কিছু লাগাতে পারে।'

সুরথ বললো, 'লাগাক গে। আমরা তো দুষ্টুমি কিছু করি নি।'

কেয়া বললো, 'সুরথ যদি কুক্ না দিতো, তোরা কী

করতিস্ ?'

নিমু বললো, 'কী আবার, গড় পর্যন্ত গিয়ে, ফিরে আসতাম।'

সুরথ বলে উঠলো, 'চলো গড় দেখে আসি। গড় মানে তো কেল্লা ?'

দীপু বললো, 'না না, কেল্লাটেল্লা কিছু নেই, খালি উঁচু ঢিবি, ঝিল, আর জঙ্গল।'

নিমু বললো, 'কেন, রাজার ভাঙা বাড়িও আছে। আসলে ওটা এক রাজারই গড় ছিল।'

দীপু জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে দস্তিদারপাড়া যাবি না ?'

সুরথ বললো, 'বিকেলে যাবো দস্তিদার পাড়ায়। এখন চলো, গড়টা দেখে আসি, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

চারজনেই গড়ের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। যেতে যেতে আবার হাতীর কথা উঠলো। দীপু বললো, 'তবে গড়ে যাবার কথা দাদুকে বলা চলবে না। আমরা এই জঙ্গলে এসেছি শুনলে, দাদু ঠিক রেগে যাবেন।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ?'

দীপু বললো, 'ওদিকটায় তো লোকজন নেই, তাই আমাদের আসা বারণ।'

নিমু বললো, 'তা ঠিক। তবে আমরা বাড়ি গিয়ে কেউ বলবো না। কেয়া, খুব সাবধান!'

কেয়া ঠোঁট উলটে বললো, 'আমার বয়ে গেছে বলতে, কেন বলবো ? আমাকে বুঝি বকবে না ?'

ক্রমে গাছপালা একটু কমে এলো, জমি উঁচু নিচু, অনেকটা ছোট ছোট টিলার মতো। তারপরে আবার গাছপালা দেখা গেল, আর লম্বা ঝিল, ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে গিয়েছে। তার ওপারে উঁচু টিলা। দীপু বললো, 'এই হলো রাজার গড়।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'আর রাজার ভাঙা বাড়িটা কোথায় ?'

নিমু বাঁ দিকে পা বাড়িয়ে বললো, 'এসো এদিকে।'

খানিকটা যেতেই দেখা গেল, ঝিলের ওপারে, অনেকটা জায়গা জুড়ে ভাঙা পড়ো বাড়ি, যার কোনো ছাদ নেই, কয়েকটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, আর সবই ইঁটের স্তূপ। কিন্তু একটা দিকে সুরথের নজর গেল, ঝিলের ওপর ভাঙা সাঁকো। মাঝ-খানটা ভেঙে গিয়েছে, বোঝা যায়, এক সময়ে ইঁটের বাঁধানো পাকা সেতু ছিল। সুরথ ওর বড় খামের প্যাকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে ফেললো, ভাঙা সেতুটা আঁকবার জন্য। ও মাটির ওপরেই বসে পড়লো। কোলের ওপর খামটা পেতে, তার ওপরে কাগজ রেখে, আঁকতে আরম্ভ করলো। বাকীরা অবাক হয়ে সুরথের ব্যাপার দেখতে লাগলো।

কিন্তু সুরথ বিশেষ ভালো আঁকতে পারলো না। দীপু নিমু কেয়াদের সামনে কেমন একটা লজ্জা আর আড়ষ্ট ভাব এসে গেল, আর ওপারের ভাঙা খিলানটা কোনোরকমে আঁকতে পারলেও, জলের ওপর রোদ আর বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ মোটেই সুবিধে করতে পারলো না। তবু ওরা তিনজন মুগ্ধ হয়ে গেল। কেয়া বলে উঠলো, 'ছবিটা আমাকে দেবে ?'

সুরথ মাথা নেড়ে বললো, 'না, এতো আমার এ-দেশের স্মৃতি, রেখে দেবো।'

ইতিমধ্যে বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে। চারজনেই বাড়ি ফিরে চললো।

ওরা বাড়ি ঢুকতেই, নিমু আর কেয়ার বাবা কাকারা বলে উঠলেন, 'এই তো সব এসেছে। কোথায় গেছলে তোমরা ?'

মোক্তারদাদু দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দীপু, তোরা কোথায় গেছলি ?'

দীপুর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। নিমু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমরা তো গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

নবীনকাকা এগিয়ে এসে বললেন, 'গোপাল যে এসে বললো, সুরথ একলা একলা তিসিয়া গাঙের দিকে চলে গেছলো ?'

সুরথ বলে উঠলো, 'কখ্খনো না। আমরা চারজনে তো এক সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

মোক্তারদাদু এবং বড়োরা সকলেই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। মোক্তারদাদু বললেন, 'হুম্, গোপালটা তাহলে বাজে কথাই বলেছে। তবে তোমাদের বেশ দেরি হয়েছে। বেলা সাড়ে বারোটা বাজে। যাও, সবাই একটু বিশ্রাম করে, চান করে নাও গে।'

দীপু আর সুরথ ঘরে ঢোকবার সময়ে, মোক্তারদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সুরথ, কিছু আঁকাটাকা হলো নাকি?'

সুরথ চমকে উঠে বললো, 'না তো!'

মোক্তারদাদুর মোটা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো। কিন্তু কিছু বললেন না। সুরথের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেবল মিথ্যে কথা বলার জন্য না, ছবিটা তাঁকে দেখানো গেল না। ওরা দালান দিয়ে যাবার সময়, ঝিন্‌কিকে দেখা গেল, এক ধারে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর আঁচড়ানো চুল আর মুখে পাউডার লাগানো দেখে বোঝা গেল, চান হয়ে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলো, 'এই দাদা, ডালিমতলা থেকে তোরা কোথায় গেছলি রে?'

দীপু বললো, 'আমরা ঘুরছিলাম।'

ঝিন্‌কি একটু যেন ঝাঁজিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ঘুরছিলি?'

দীপু বললো, 'কোথায় আবার, গ্রামের মধ্যেই।'

ঝিন্‌কি বললো, 'মোটেই না। তোরা গ্রামের কোথাও ছিলি না।'

দীপু বললো, 'তুই জানলি কী করে?'

ঝিন্‌কি বললো, 'বলবো কেন?'

সুরথ ডাকলো, 'দীপু, চলে এসো।'

দীপু তৎক্ষণাৎ সুরথের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সুরথ আগেই ওর খামের প্যাকেটটা স্যুটকেশের মধ্যে রেখে দিল। এই সময়ে শ্যামা পিসিমা এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, 'এসেছ তোমরা? আর আমরা ভেবেই অস্থির। কে নাকি বলেছে, তুমি একলা গাঙের ধারে চলে গেছ। বাবা ইন্দির মাঝিকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন।'

সুরথ বললো, 'আমি মোটেই ওদিকে যাই নি।'

শ্যামা পিসিমা বললেন, 'কিন্তু চেহারা যে পোড়ামূর্তি হয়ে গেছে। এখন এত রোদ লাগিও না। এবার চানটান করো। আমার রান্নাবান্না শেষ।' বলে ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বললেন, 'ঝিন্‌কি, তুই দেখবি, সুরথের কী লাগে না লাগে।'

ঝিন্‌কি এর মধ্যেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছিল। দীপু গায়ের জামাটা খুলে, খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলেই, কেন যেন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঝিন্‌কি হেসে উঠলো। সুরথ ওর দিকে একবার তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে, কোমরের বেল্ট খুললো। ঝিন্‌কি বললো, 'তুমি টিউবওয়েলের জলে চান করবে।'

সুরথ কোনো জবাব না দিয়ে, জামাটা প্যান্টের ভিতর থেকে টেনে বের করলো। ঝিন্‌কি আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি সাবান মাখবে?'

সুরথ কোনো জবাব না দিয়ে, জামার বোতাম খুলতে লাগলো। ঝিন্‌কি ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। সুরথ তাকালো না। ঝিন্‌কি বললো, 'আমার সঙ্গে কথা বলবে না, না?'

সুরথ তবু কোনো কথা বললো না। ঝিন্‌কি আবার বললো, 'আমি কি ইচ্ছে করে কিছু বলেছি? আমি তো ভুল করে বলেছি।'

সুরথ চোখ তুলে তাকালো। ঝিন্‌কির চোখ দুটো যেন ছলছল করছে। ও আবার বললো, 'তোমার বুঝি এরকম ভুল হয় না।'

সুরথ বললো, 'তুমি যে খুব রেগে রেগে কথা বলো।'

ঝিন্‌কি মুখ ভার করে বললো, 'মোটেও আমি রেগে কথা বলি না।'

কথাটা বলেই, ঝিন্‌কি কেমন একটু অপরাধীর মতো হাসলো। সুরথ বললো, 'আমি সাবান মেখে চান করবো।' বলতে বলতে ও সার্টটা খুলে ফেললো। ঝিন্‌কি ওর হাত থেকে সার্টটা নিয়ে নিল। ঝিন্‌কির মুখ আর চোখ এখন হাসিতে ঝকমক করছে। সার্টটা আলনায় রাখতে রাখতে বললো, 'তোমরা কোথায় ঘুরছিলে বলো তো? আমি তো কোথাও তোমাদের দেখতে পেলাম না।'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমাদের খুঁজেছিলে নাকি?'

ঝিন্‌কি বললো, 'আমি ডালিমতলা, দস্তিদারপাড়া, আর চণ্ডীতলার সব জায়গায় ঘুরেছি, তোমাদের দেখতে পাই নি।'

সুরথ এখনই ঝিন্‌কিকে বিশ্বাস করে সব বলতে পারলো না। বললো, 'আমরা তো ডালিমতলা ছাড়া কোনো বারোয়ারি-তলায় যাই নি, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

ঝিন্‌কি বললো, 'আমার খুব খারাপ লাগছিল।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

ঝিন্‌কি বললো, 'তোমাদের সঙ্গে যেতে পেলাম না বলে। কেয়ার ওপরে আমার খুব রাগ হয়েছিল, ও আমাকে একবারও ডাকলো না।'

সুরথ এখন আর বলতে পারলো না, ঝিন্‌কি গেলে ও নিজেই যেতো না। কিন্তু ঝিন্‌কির জন্যে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললো, 'এখন থেকে তোমাকে নিয়ে যাবো।'

ঝিন্‌কির চোখ খুশিতে ভরে উঠলো, তারপরে বললো, 'জানো, আমার বাবা এসেছেন।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বাবাকে দেখছি না তো?

ঝিন্‌কি বললো, 'বাবা এখন অন্য মামাদের ঘরে গল্প করছে।'

এই সময়ে শ্যামা পিসিমা আবার ঘরে এলেন। আলমারির পাল্লা খুলে, কিছু বের করতে করতে বললেন, 'সুরথ, শুনেছি তুমি খুব ভালো গান গাইতে পারো, আজ সন্ধ্যেয় কিন্তু গান শোনাতে হবে।'

সুরথ লজ্জা পেয়ে হাসলো। শ্যামা পিসিমা চলে যেতে যেতে বললেন, 'চুপ করে থাকলে হবে না কিন্তু, ঠিক শোনাতে হবে।'

ঝিন্‌কি হেসে উঠে বললো, 'তুমি সকালবেলা দাদুকে নিয়ে এমন গাইলে, আমার খুব মজা লেগেছিল। ওটা কি সত্যি একটা গান?'

সুরথ বললো, 'হ্যাঁ, ওটা সত্যিকারেরই একটা গান।'

ঝিন্‌কি আবদার করে বললো, এখন একটু গাও না।'

সুরথ নিচু গলায়, পুরো গানটা ঝিন্‌কিকে শুনিয়ে দিল। গানের মধ্যেই দীপু এসে পড়েছিল। গান শেষ করেই, সুরথ চান করতে গেল। ওর সঙ্গে গেল ঝিন্‌কি আর দীপুও।

খেতে বসার সময়, ঝিন্‌কির বাবাকে দেখা গেল। উনি শ্যামা পিসিমার মতো ফরসা নন, আর বেশ গম্ভীর মানুষ, বেশি হাসেন না, কথাও বলেন না। সুরথ প্রণাম করতে, কেবল বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে।' তাছাড়া গতকাল রাত্রে বা আজ সকাল পর্যন্ত যাঁর সঙ্গে সুরথের পরিচয় হয়নি, তিনি হলেন মোক্তার-দাদুর বোন। তিনি বিধবা। তাঁর সঙ্গেও খাবার সময় দেখা আর পরিচয় হলো।

দীপু আর সুরথকে খেতে দেওয়া হলো মোক্তারদাদু আর পিসেমশাই, অর্থাৎ ঝিন্‌কির বাবার সঙ্গে। কতো রকম যে রান্না হয়েছে! চালকুমড়োর বড়া, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, সরলপুঁটি আস্ত ভাজা, অসময়ের মুলো দিয়ে থোড় ছেঁচকি, চিতল মাছের পেটির ঝাল, চালতার অম্বল, আর ক্ষীরের মতো মিষ্টি দই। আর শ্যামা পিসিমা এমন জোর করে খাওয়ালেন, সুরথের মনে হলো, ও আর হেঁটে চলে বেড়াতেই পারবে না। ফল যা হবার, তাই হলো। ও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

বেলা চারটের মধ্যেই সুরথের ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো খাটের এক পাশে শ্যামা পিসিমাও ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু দীপু পাশে নেই। সুরথ উঠে রান্নাঘরের দিকে বারান্দায় গিয়ে, চোখে মুখে জল দিল। তারপরে দালান দিয়ে, বাইরের ঘরে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলো, মোক্তারদাদু চোখ বুজে বসে আছেন তাঁর আরামকেদারায়। পাশের চৌকির ওপর পা ঝুলিয়ে, দীপু বসে আছে মুখ চুণ করে। সুরথের দিকে ওর চোখ পড়তেই, কিছু একটা ইশারা করলো।

মোক্তারদাদু চোখ না খুলেই বললেন, 'তোমরা রাজারগড়ে গেছলে, সেটা বড় কথা না, কথা হচ্ছে, তোমরা মিথ্যে কথা বললে কেন? তাছাড়া, এখন গড়ের জঙ্গলে হাতী নেই সত্যি, কিন্তু যেতে বারণ করা হয় এজন্য, পুরনো গড়ে অনেক সাপ আছে। ভীষণ বিষাক্ত বড় বড় সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যায় না। গড়ের ঝিলে মেছো কুমীর আছে। তার মানে এই নয়, মানুষ ঝিলে পড়ে গেলে, মেছো কুমীর তাকে ছেড়ে দেবে। এই সব কারণেই গড়ের জঙ্গলে যেতে বারণ করা হয়।'

সুরথ লজ্জায় আর ভয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেল। খবরটা মোক্তারদাদুর কানে এসে গিয়েছে! কী করে? দীপু বললো, 'আমরা গড়ের জঙ্গলে যাবো ভাবিনি। কেয়াটাই সুরথকে নিয়ে আগে চলে গেছলো।'

মোক্তারদাদু চোখ না খুলেই বললেন, 'কে কাকে নিয়ে গেছে, সেটা আমি জানতে চাই না। তোমরা গেছলে, অথচ সত্যি কথা বলো নি। সুরথ কখনো আমাকে মিথ্যে কথা বলে না। ওকে তোমরাই মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছ।'

সুরথ চুপ করে থাকতে পরলো না, ওর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, 'না দাদু, আমাকে কেউ শেখায় নি, আমি নিজে থেকেই মিথ্যে কথা বলেছি।'

মোক্তারদাদু চোখ খুলে, অবাক দৃষ্টিতে সুরথের দিকে তাকালেন। সুরথ মুখ নিচু করলো।

মোক্তারদাদু বললেন, 'আরে সুরথবাবু, এসো এসো। তোমার ঘুম ভাঙলো কখন?'

সুরথ মুখ নিচু করেই বললো, 'এই একটু আগে।'

মোক্তারদাদু বললেন, 'এসো, আমার কাছে এসে বসো।'

সুরথ গিয়ে দীপুর পাশে বসলো। দাদু বললেন, তাহলে মোটামুটি কথাটা শুনেছ, আমি কেন গড়ের জঙ্গলে যেতে বারণ করছি।'

সুরথ বললো, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি—।'

দাদু বলে উঠলেন, 'ব্যস্ ব্যস্, ওতেই মিথ্যে কাটান হয়ে গেল। তোমার ছবিটাও আমি দেখেছি, আঁকাটা খুব খারাপ হয়নি।'

সুরথ যতো অবাক হলো, ততো লজ্জা পেলো। ও সন্দেহের চোখে দীপুর দিকে তাকালো। দীপু ঘাড় নাড়লো। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'কী করে দেখলেন? কে দেখালো?'

দাদু মাথা নেড়ে, দাড়িতে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ওটি বলতে পারবো না ভাই। কোর্ট কাচারিতে যাই বলি, এ বুড়ো বয়সে আর তোমাদের কাছে মিছে কথা বলতে পারবো না। কী করে জানলাম, কে আমাকে ছবি দেখালো, এসব ফাঁস করলে, আমার গর্দান যাবে। তবে এটুকু বলতে পারি, কেউ কোনো অন্যায় করে নি। কথাটা আমার কানে এসে ভালোই হয়েছে। তা না হলে, তোমার ছবিটা আমার দেখা হতো না। আর একটা কথা, এ বিষয়টা একদম মাথায় রাখবে না। রাখলেই মেজাজ খারাপ হবে, আর সবাইকে সন্দেহ হতে থাকবে। সন্দেহ রোগটা খুব খারাপ। কথাটা মনে থাকবে?'

সুরথ চট করে কিছু বলতে পারলো না। মোক্তারদাদু তাঁর হাত বাড়িয়ে বললেন, 'হাতে হাত, মরদকে বাত।'

সুরথ হেসে, দাদুর হাত ধরলো। দাদু ওর হাত ঝাঁকুনি দিয়ে দীপুর দিকেও হাত বাড়ালেন। দীপু দাদুর হাত ধরলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল মানুষটিই ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল। সুরথের মনটা এতোই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ও বিকালে কোথাও বেড়াতে যায় নি। বাড়ির পিছনে, পুকুরধারের বাগানে বসেছিল। দীপু কাঠের গুলতি আর মাটির গুলি এনে দিয়েছিল। সুরথ সেটাও হাতে করে নি। নিমু কেয়া গোপাল ঝিনুকি, সকলেই অনেক চেষ্টা করেছিল, সুরথকে নিয়ে বেড়াতে যাবার। সুরথ যায়নি। তারপরে এক সময়ে দেখা গেল, কেউ নেই, সুরথ একলা বসে আছে। দীপুকে শ্যামা পিসিমা কী কারণে যেন ডেকে পাঠিয়েছেন। ও এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু তার আগেই এলো ঝিনুকি। ঝিনুকি বিকালে খুব সেজেছে। ওর বেড়াবিনুনির বদলে, আজ দুটো বিনুনি দুলিয়েছে। নতুন না হলেও, লাল আর সোনালী ফুল ছাপের জামা পরেছে। ও মুখ টিপে টিপে হাসছে দেখে, সুরথ ওর দিকে তাকালো। ঝিনুকি বললো, 'আমি জানি, তোমার মন কেন খারাপ হয়েছে।'

সুরথ কিছু না বলে, ঝিনুকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঝিনুকি আবার বললো, 'দাদুকে আমিই সব বলেছি।'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি জানলে কী করে?'

ঝিনুকি বললো, 'তুমি কারুকে বলবে না তো?'

সুরথ বললো, 'না।'

ঝিনুকি বললো, 'আমাকে দুপুরে কেয়া বলেছে। আমি তখন দাদুকে বলেছি। আর তোমার স্যুটকেশ খুলে, আমিই ছবিটা দাদুকে দেখিয়েছি।'

সুরথ মনে মনে কেয়ার ওপর চটে গেল। ঝিনুকি জিজ্ঞেস করলো, 'সুরথ, আমি অন্যায় করেছি?'

সুরথ প্রথমে কিছু বললো না। একটু পরে বললো, 'না। দাদুকে না বলে, আমিই অন্যায় করেছি।'

ঝিনুকি আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার ওপর খুব রাগ করছো, না?'

সুরথ ঝিনুকির মুখের দিকে তকালো। ঝিনুকি বললো, তোমাকে কথাটা বলবার জন্য, আমার মন খুব ছটফট করছিল।'

সুরথ বললো, 'না, আমি তোমার ওপর রাগ করি নি।'

ঝিনুকি সুরথের পাশে বসে বললো, 'সত্যি বলছো?'

সুরথ বললো, 'সত্যি। আমরা মিথ্যে বলে অন্যায় করেছি, কিন্তু কেয়া কথা রাখে নি। কেয়া কেন বললো তোমাকে?'

ঝিনুকি বললো, 'কেয়া আসলে বলতে চায় নি। তোমার ছবি আঁকার কথা বলতে গিয়ে, মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। ও আমাকে দিব্বি দিয়েছিল, না বলতে, কিন্তু আমি তো নিজে কোনো দিব্বি গালি নি। আমার একটু রাগ হয়েছিল।'

ঝিনুকির অকপট সত্যি কথায়, সুরথ ওর ওপর সত্যি রাগ করতে পারলো না। ঝিনুকি নিজের থেকে না বললে, কখনো জানতে পারতো না, আর ওর মনটা ভার হয়েই থাকতো। এখন আর মনের ভারটা নেই।

ঝিনুকি অবাক খুশির স্বরে বললো, 'তোমার ছবিটা খুব সুন্দর হয়েছে! তুমি কী করে এ রকম আঁকতে শিখলে?'

সুরথ বললো, 'ওটা ভালো আঁকা হয় নি।'

ঝিনুকি বললো, 'ইস্, খুব ভালো হয়েছে, মনে হচ্ছে, ঠিক গড়ের ভাঙা সাঁকোটাই দেখছি। ওটা আমাকে দেবে?'

সুরথের মনে পড়লো, কেয়া ছবিটা চেয়েছিল, ও দিতে চায় নি। বললো, 'দেবো।'

ঝিনুকি খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠলো। তারপরে বললো 'তোমার স্যুটকেশ খুলে ছবি নিতে গিয়ে দেখলাম, তিনটে বাঁশি রয়েছে। এমনি বাঁশি না, আড় বাঁশি। ওগুলো কার?'

সুরথ বললো, 'আমারই বাঁশি।'

ঝিনুকি চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বাঁশি বাজাতে পারো!'

সুরথ কিছু না বলে হাসলো। ঝিনুকি খুব অবাক হয়ে

বললো, 'ইস্! তুমি কী রকম যেন। আমার খুব অবাক লাগছে!'

সুরথ ঝিন্‌কির মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠলো।

শ্যামা পিসিমা সন্ধ্যেবেলার গানের কথাটা ভোলেন নি। কিন্তু তিনি যে দালানে এ রকম একটা বড় আসর বসাবেন, তা ভাবা যায় নি। মোক্তারদাদুর ভাই ভাইপো, মহিলারা সবাই এসেছেন। ছোটদের তো কথাই নেই। এমন কি সকালবেলার সেই, কালো, আর ঝাঁকড়াচুল, কেতুবাবুও এসেছেন, যিনি বলেছিলেন, সুরথকে যাত্রায় অভিনয় করাবেন। সুরথ খুবই লজ্জায় পড়ে গেল। কিন্তু শ্যামা পিসিমা ওকে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এমনভাবে বসলেন, ওর না গেয়ে উপায় রইলো না।

একটা গান শুনে, সবাই আরো গাইতে বললেন। ও রবীন্দ্রনাথের আর অতুলপ্রসাদের গান গাইল। মোক্তারদাদু বলে উঠলেন, 'সেই শ্যামা সঙ্গীতটা হবে নাকি, "মা আমার জগতের আলো?"'

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন। সুরথ এখন বুঝতে পারছে, শ্যামা পিসিমার সঙ্গে দাদুর পরামর্শ করেই আসর হয়েছে। শ্যামা সঙ্গীতের পরে, কেতুবাবু গমগমে গলায় বলে উঠলেন, 'একটা পালার গানটান হবে না?'

সুরথ কেদারঠাকুরের আসরে শোনা, 'দেবলাদেবী' নাটকের একটা গান করলো। কেতুবাবু লাফিয়ে উঠে চিৎকার করলেন, 'সাধু সাধু, চমৎকার! একে আমার চাই-ই চাই।'

দাদু ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কেতু, ও কথা মুখেই এনো না।'

ঠিক এ সময়েই ঝিন্‌কি একটা বাঁশি সুরথের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। দাদু বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, রাধাঠাকরুণ আবার বাঁশিও নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

শ্যামা পিসিমা অবাক হয়ে বললেন, 'ওমা, বাঁশিও বাজাতে জানো?'

সুরথ লজ্জা পেয়ে, ঘাড় নেড়ে বললো, 'না না, আমি বাঁশি বাজাবো না।'

দাদু বললেন, 'বাজাও ভাই, রাধা নিজের হাতে এনে দিল।'

সবাই হেসে উঠলেন। সুরথ দেখলো, ঝিন্‌কি হাসছে, বাজাবার জন্য ঘাড় দুলিয়ে চোখের ইশারা করছে। সুরথ তেমন একটা বাজিয়ে না। তবু বাজাতে হলো। তাতেই সবাই খুশি হয়ে উঠলেন।

তারপর থেকে, সুরথের শুধু অনেক ভক্ত জুটলো না, গ্রামের সবাই ওকে চিনে ফেললো। কেতুবাবু প্রথমে একদিন ওকে তাঁদের যাত্রার মহড়ায় নিয়ে গেলেন। পালা 'কংসবধ'। কেদার ঠাকুরদের 'কংসবধ' সুরথের মুখস্থ। ইস্তক গান পর্যন্ত। বিশেষ করে কৃষ্ণের। কেতুবাবুদের কৃষ্ণ, সুরথেরই বয়সী, পালার কৃষ্ণও বালককৃষ্ণ। কিন্তু কেতুবাবুদের কৃষ্ণকে বিশেষ ভালো লাগলো না। তার কথা বলার ভঙ্গি আড়ষ্ট, গানের গলাও ভালো না। ও মহড়ায় কৃষ্ণর দু'-একটা ভুল ধরিয়ে দিতেই কেতুবাবু ধরে বসলেন, 'তুমি একটু নিজে দেখিয়ে দাও।'

লজ্জা পেলেও, সুরথ গান গেয়ে, পার্ট বলে দেখিয়ে দিল। অমনি সবাই ওকে চেপে ধরলো। বিশেষ করে কেতুবাবু, কৃষ্ণর পার্টটা সুরথকেই করতে হবে। দাদুর কথা ভেবে, সুরথ কিছুতেই রাজী হলো না। কিন্তু কেতুবাবু ছাড়বার পাত্র না। তিনি আড়ালে নিয়ে গিয়ে, সুরথকে অনেক বোঝালেন, দাদু জানতেই পারবেন না। সুরথকে মহড়া দিতে হবে না, সবই ওর জানা। কেবল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন, পোশাক পরে নেমে গেলেই হলো। কেতুবাবু পাগলের মতো সুরথকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা, এটা তোমাকে করতেই হবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মোক্তারদাদা কিছু জানতে পারবেন না। তুমিও কারোকে বলো না। আমি আমার দলের লোকদের পর্যন্ত বলবো না। তুমি যখন সাজগোজ করে নামবে, তখন তারা জানতে পারবে।'

সুরথ মনে মনে উত্তেজনা বোধ করলেও, আমতা আমতা করলো। কেতুবাবু শেষটায় কেঁদেই ফেললেন, রীতিমতো চোখে জল। বললেন, 'একবার ছাড়া দু'বার তো নয়। চণ্ডীপুরের লোককে একবার দেখিয়ে দিতে চাই আমি। রাজী হয়ে যাও বাবা।'

কেতুবাবুর জন্য, সুরথের মনে কষ্ট হলো। ও রাজী হয়ে গেল।

এদিকে পুজোর ক'দিন খুব ধুমধামে কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন ঝিন্‌কির সঙ্গে তিসিয়ার গাঙে নৌকো বাওয়াও হয়েছে। ঘটনাটা কেউ জানে না। পুজোর আনন্দে, অন্যান্য আমোদ প্রমোদে, সুরথ কেতুবাবুর যাত্রার কথা ভুলেই গেল। আর ভুলে গিয়ে, ত্রয়োদশীর দিন, শ্যামা পিসিমার সঙ্গে, তাঁদের বাড়ি সুন্দরীগ্রামে চলে গেল। লক্ষ্মীপুজোটা সেখানে কাটিয়ে, আবার চণ্ডীপুরে ফিরে আসবে। তারপরে আবার বাড়ি ফেরা। মোক্তারদাদুর কোর্ট খুলে যাবে।

লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন, কেতুবাবু সুরথের চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কিন্তু বসে থাকতে পারলেন না। লক্ষ্মীপুজোর দিন, ভোররাত্রের অন্ধকারে সাত মাইল হেঁটে সুন্দরীগ্রামে চলে গেলেন। গিয়ে, দীপুদের বাড়ির আশেপাশে লুকিয়ে ঘুরতে লাগলেন, সুরথের দেখা পাবার জন্য। দীপুদের বাড়ির কেউ টের পেলে, সব ভেস্তে যাবে।

সুরথ সকালবেলার জলখাবার খেয়ে, ঝিন্‌কির সঙ্গে বেরোলো ওদের ইস্কুল দেখতে। দীপু গেল না, ও ওর বাবার সঙ্গে, কলাগাছের বাস্‌না দিয়ে নৌকো বানাতে বসলো। ওটা লক্ষ্মীপুজোয় লাগে। সুরথ বলে গেল, ও ঝিন্‌কির সঙ্গে ইস্কুল দেখে ঘুরে এসে নৌকো দেখবে। ও ঝিন্‌কির সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ছোট গাব্বিল ফল, ওর পিঠে এসে লাগলো। সুরথ চমকে পিছন ফিরে তাকালো। দেখলো, কেতুবাবু চট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। ঝিন্‌কি দেখতে পেলো না, জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো, দাঁড়ালে কেন?'

সুরথের হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু ঝিন্‌কিকে সত্যি কথা বলতে পারলো না। বললো, 'না, কিছু না, চলো।'

কিন্তু সুরথ একেবারে আনমনা হয়ে গেল। যাত্রার কথাটা ও একেবারে ভুলেই গিয়েছে। মনে থাকলে সুন্দরীগ্রামে আসতো না। ঝিন্‌কির সঙ্গে চলতে চলতে ও বুঝতে পারছে, কেতুবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে পিছনে আসছেন। উনি নিশ্চয়ই ওকে নিতে এসেছেন, আর সেটা ঝিন্‌কিদের কারোকেই জানাতে চান না, আর সেইজন্যেই ঝিন্‌কির সামনে আসছেন না। কিন্তু একেবারে না বলেই বা সুরথ কী করে যাবে? ও কয়েকবার পিছন ফিরে দেখলো। কেতুবাবু আসছেন ঠিক, হাতের ইশারাও করলেন, আর মাথা চাপড়ালেন। ঝিন্‌কি জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তোমার কী হলো বলো তো। তুমি যেন আমার কথা শুনছো না।'

সুরথ চমকে উঠে বললো, 'হ্যাঁ, শুনছি তো।'

ঝিন্‌কি মোটেই বোকা মেয়ে না। সুরথের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি বাড়ি গিয়ে বাবার নৌকো বানানো দেখতে ইচ্ছে করছে?'

সুরথ ঘাড় নেড়ে বললো, 'না তো।'

কিন্তু ঝিন্‌কির মন খারাপ হয়ে গেল। কোনোরকমে ওদের গার্লস ইস্কুলটা দেখিয়েই, আবার বাড়ির দিকে ফিরে চললো। সুরথ ঝিন্‌কির সঙ্গে বাড়ি ফিরে ভাবলো, কেতুবাবু বাইরে নিশ্চয় কোথাও অপেক্ষা করছেন। একবার দেখা করে আসা উচিত। ঝিন্‌কি ঘরে ঢুকতেই ও পিছন ফিরে ছুট দিল। বাড়ির বাইরে, ডান দিকেই একটা পুকুর ঘিরে খানিকটা জঙ্গল।

কেতুবাবু সেখান থেকে সুরথকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সুরথ সেখানে যেতেই, কেতুবাবু ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে, প্রায় কেঁদে ফেললেন। সুরথ দেখলো, কেতুবাবুর চোখ দুটো লাল, চুল উসকোখুসকো, রোগা আর কালো মানুষটি যেন আরো কালো আর রোগা হয়ে গিয়েছেন। বললেন, 'সুরথ, রক্ষে করো বাবা। তুমি না গেলে যাত্রা হবে না, গাঁয়ের লোকেরা যারা চাঁদা দিয়েছে, তারা আমাকে আস্ত রাখবে না। যে-ছেলেটার কেষ্ট করার কথা ছিল, সে রেগেমেগে, গাঁ ছেড়েই চলে গেছে। দোহাই বাবা আমার, বাঁচাও আমাকে।'

সুরথ বললো, 'আমি তাহলে শ্যামা পিসিমাকে বলে আসি।'

কেতুবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'মোক্তারদাদার মেয়েকে? সর্বনাশ! শ্যামা জানলে, তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না, আমারো বারোটা বেজে যাবে।'

সুরথ বললো, 'তাহলে কী হবে?'

কেতুবাবু সুরথের হাত ধরে বললেন, 'কিছু না, যেমনটি আছো, তেমনি চলো, আর ফিরে যেও না। আমি গাঙের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছি। তোমাকে নৌকোয় করে নিয়ে যাবো। চারটে মাঝিকে লাগবো, তারা ঝপ্ ঝপ্ করে বৈঠা চালিয়ে বাইচের মতো স্পীডে পৌঁছে দেবে। জানাজানি যখন হবে, তখন আমি সব দেখবো, এখন চলো।'

সুরথ তবু কিন্তু কিন্তু করলো। কেতুবাবু প্রায় শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন, 'বাবা সুরথ, চলো, আর দেরি করো না।'

বলেই. সুরথের হাত ধরে হন্‌হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। সুরথ কিছুই বলতে পারলো না, কিছু ভাবতেও পারলো না। কেতুবাবুর সঙ্গে গাঙের ঘাটে এলো। কেতুবাবু তাঁর কথা মতো, চারজন জোয়ান মাঝি যোগাড় করে, তাদেব বললেন, 'এক ঘন্টার মধ্যে চন্ডীপুরে পৌঁছতে পারবে, এ রকম হালকা আর ছোট নৌকো নাও। যা টাকা চাইবে, তাই পাবে। চাই কি, খেয়েদেয়ে যাত্রা দেখেও আসতে পারো।'

মাঝিরা রাজী হয়ে গেল। মাথার ওপর ছই নেই, এ রকম একটা ছোট নৌকোয় তারা সুরথ আর কেতুবাবুকে তুলে, ঝপা-ঝপ্ বৈঠা চালালো। সুরথ সুন্দরীগ্রামে আসবার সময়ও, দীপুদের সঙ্গে নৌকোতেই এসেছিল। সেটা ছিল অনেক বড় নৌকো। ইন্দির আর একজন মাঝি চালিয়েছিল। আর এখন নৌকো চলতে লাগলো যেন স্টিমারের মতো, কিংবা তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। বলতে গেলে, এক ঘন্টার একটু আগেই তারা চন্ডীপুরে পৌঁছে দিল। কেতুবাবু গ্রামের বাইরে দিয়ে ঘুরে, কিছুটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, একটা বাড়িতে সুরথকে এনে তুললেন। সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কাদের বাড়ি?'

কেতুবাবু বললেন, 'এটা আমাদেরই বাড়ি।'

সুরথ বললো, 'সবাই দেখে ফেলবে না?'

কেতুবাবু বললেন, 'সবাই বলতে, এ বাড়িতে আমি থাকি, আর আমার এক বুড়ি বিধবা জ্যাঠাইমা থাকেন।'

সুরথ জিজ্ঞেস করলো, 'আর সবাই কোথায়?'

কেতুবাবু বললেন, 'আর তো কেউ নেই।'

সুরথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার ছেলেমেয়ে?'

কেতুবাবু এই প্রথম হেসে বললেন, 'আমি তো বাবা বে থা কিছু করি নি।'

এ সময়েই ঘরের বাইরে ডাক শোনা গেল, 'কেতুদা বাড়ি আছো?'

কেতুবাবু চুপিচুপি বলে উঠলেন, 'এই রে, কংস ব্যাটা এসেছে। তুমি ঘরের মধ্যে থাকো, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

বলে তিনি বাইরে গেলেন, বললেন, 'কী খবর বিশ্বম্ভর?'

বিশ্বম্ভরবাবুই কংসের পার্ট করবেন, তাঁর গলা শোনা গেল, 'সর্বনাশের কথা তো সব শুনেছ কেতুদা? মোক্তারকাকার সেই শহুরে নাতী সুঁদুরিগাঁয়ে তাঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। আমাদের তিলক ছোঁড়ারও কোনো পাত্তা নেই। কেষ্ট ছাড়া কংসবধ কী করে হবে?'

কেতুবাবুর হাসি আর গম্‌গমে গলা শোনা গেল, 'হবে হবে, কিছু ভেবো না। কেষ্ট দিয়েই কংস বধ হবে, এর কোনো এদিক ওদিক হবার জো নেই। তোমরা ওদিককার ব্যবস্থা সব ঠিক রাখো, আর নিজেদের পার্ট মুখস্থ করো।'

বিশ্বম্ভরবাবুর অবাক গলা শোনা গেল, 'কী বলছো তুমি কেতুদা, তোমার মাথাটা—।'

কেতুবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার মাথার ঠিক আছে, যখন খারাপ হবার, তখন হবে। এখন তোমাকে যা বললাম, তাই করো গে। আর সবাইকে গিয়ে বলে দাও, ভাববার কিছু নেই, সব ঠিক আছে।'

সুরথ ঘরের মধ্যে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগলো।

সুন্দরীগ্রামে, সরকার বাড়িতে—অর্থাৎ দীপুদের বাড়িতে. লক্ষ্মীপুজোর শুভদিনে. কান্নাকাটি পড়ে গেল। এক ঘন্টার মধ্যেও যখন সুরথকে বাড়িতে দেখা গেল না. তখন চারদিকে

খোঁজ পড়ে গেল। দীপুর বাবা অবনীবাবুই শুধু না, তাঁদের বাড়ির ছোট বড়, পাড়ার লোকজন, সবাই সুরথকে খুঁজতে লেগে গেল। শ্যামা তো কেঁদে, পাগলের মতো হয়ে গেলেন, আর বলতে লাগলেন, 'আমি বাবাকে কী করে এ মুখ দেখাবো?'

ঝিন্‌কিও কাঁদতে লাগলো। পুজোর কাজকর্ম পড়ে রইলো। সকাল আটটা থেকে, বেলা বারোটার মধ্যে, আশেপাশের পুকুর জাল ফেলেও যখন পাওয়া গেল না, তখন তিন মাইল দূরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। অবনীবাবু নিজে গেলেন, দীপুকে সংগে নিয়ে চণ্ডীপুরে। সুন্দরীগ্রাম আর চণ্ডীপুর, একই থানার মধ্যে। পুলিশ যখন শুনলো, চণ্ডীপুরের মনোমোহন মোক্তার মশাইয়ের নাতীর থেকেও বেশি আদরের ছেলে সুরথ, তখন খোদ্ অফিসার-ইন-চার্জ তাঁর দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মোক্তারমশাইয়ের প্রতাপের কথা তিনি জানেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও., সকলের কাছে খবর চ'লে যাবে। তাঁর চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে।

বেলা তিনটে নাগাদ, অবনী পিসেমশাই এসে মোক্তারদাদুর কাছে সব কথা বললেন। দাদু সব শুনে, প্রথমে খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন, বারে বারে বললেন, 'কেন যে ওকে আমি সংগে আনতে গেলাম।'

নবীনকাকারা এসে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। দাদু বললেন, 'নবীন, তুমি থানায় গিয়ে, এখনই বড় দারোগাকে আমার কাছে আসতে বলো।'

অবনীবাবু বললেন, 'থানায় খবর দেওয়া হয়েছে।'

দাদু বললেন, 'তবু ও. সি.-কে আসতে বলো, আমি তার সংগে কথা বলতে চাই। একটা থানায় না, থানায় থানায় খবর দিতে বলো।'

নবীনকাকা বেরিয়ে গেলেন।

পুলিশ সুন্দরীগ্রামের গাঙের ঘাটের মাঝিদের কাছে খবর পেলো, সকালবেলা চারজন মাঝি, একটি বারো তেরো বছরের ছেলে, আর একজন ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে. তারা বলতে পারলো না, তবে মাঝিদের নাম বললো। পুলিশ তৎক্ষণাৎ মাঝিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করলো। বাড়ির লোকদের জিজ্ঞসাবাদ করলো, এমন কি ভয়ও দেখালো। কিন্তু কেউ বলতে পারলো না, মাঝিরা কোথায় গিয়েছে। তারা বাড়িতে কিছুই বলে যায় নি। সেজন্য মাঝিদের বাড়ির লোকজনেরাও ভাবছে।

বড় দারোগা দলবল নিয়ে আবার ঘাটে এসে, যেদিকে নৌকোটা গিয়েছিল, সেদিকে চলাতে লাগলেন, আর পথে যতো মাঝির দেখা পেলেন, সবাইকেই জিজ্ঞেস করলেন। এমন কি পথে যেতে যে ক'টা গ্রাম পড়লো, সেই সব গ্রামের লোকদের বাড়ি গিয়েও খোঁজ-খবর নিলেন। কেউ কিছু বলতে পারলো না। বিকাল পাঁচটা নাগাদ পুলিশ চণ্ডীপুরে পৌঁছুলো।

বড় দারোগা আগে, মোক্তারমশাইয়ের সংগে দেখা করলেন। গোটা বাড়িটা আতংকে আর শোকে যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। বড় দারোগাকে দেখে, জলভরা চোখ নিয়ে, মোক্তারদাদু বললেন. 'আমার সুরথকে যদি ফিরিয়ে না আনতে পারো, বড়বাবু, তাহলে আমার হাতে বিষ তুলে দাও। আত্মহত্যা ছাড়া, আমার কিছু করার নেই।'

তাঁর কথা শুনে, থানার অফিসার-ইন-চার্জের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠলো। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, সে যদি এই জেলা ছেড়ে চলে গিয়ে না থাকে, তাহলে আজ রাত্রের মধ্যে তাকে আপনার কাছে এনে দেবো।'

বলে তিনি গাঙের ঘাটের চার মাঝির কথা বললেন, যারা একটি সুরথের বয়সী ছেলে, আর এক ভদ্রলোককে নিয়ে, নৌকোয় করে কোথাও গিয়েছে। এখনো তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। কথাটা শুনে মোক্তারদাদু একটু ভাবলেন, কিন্তু

কুলকিনারা কিছু পেলেন না। দুজনের কথাবার্তা, আলোচনা করতে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এলো। ভৃত্য বোঁচা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। বড় দারোগা বললেন, 'আমি এখন উঠছি, রাত্রে আমি আবার আসবো।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

এই সময়ে, ঘরের দরজায় একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো। মোক্তারদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে রে? দীপু?'

ছেলেটি বললো, 'না, আমি তিলক।'

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তিলক?'

তিলক বললো, 'আমি দস্তিদারপাড়ার তিলক। আমার বাবার নাম নরহরি দস্তিদার।'

দাদু বললেন, 'তুই নরহরির ছেলে? কী চাস এখানে।'

তিলক বললো, 'আমি সুরথের কথা বলতে এসেছি।'

মোক্তারদাদু তাঁর আরামকেদারা থেকে, প্রায় ছেলেমানুষের মতো লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'কী কথা? সুরথ কোথায়, কী রকম আছে, তুই জানিস? আমার কাছে আয় তুই।'

তিলক দাদুর কাছে এসে বললো, 'সুরথকে কেতুকাকা লুকিয়ে রেখেছে। এখুনি 'কংসবধ' পালা আরম্ভ হবে। সুরথ কেষ্টর পার্ট করবে।'

মোক্তারদাদু প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেন, আরপরেই চিৎকার করে উঠলেন, 'বুঝেছি, এবার বুঝেছি, কেতু হারামজাদাই সুন্দুরিগাঁ থেকে সকালে সুরথকে নিয়ে এসেছে। আয় তিলক, আয়, তুই আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিস। তুই নিজের চোখে সুরথকে দেখেছিস?'

তিনি তিলককে জড়িয়ে ধরলেন। তিলক বললো, 'হ্যাঁ, একবার লুকিয়ে দেখেছি, কেতুকাকার বাড়িতে। সেখানেই সুরথকে কেষ্ট সাজিয়ে, এখন কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ঠিক সময়ে আসরে নামাবে। বলতে বলতে তিলক কেঁদে ফেললো, আবার বললো, 'জানেন দাদু, কেষ্টর পার্টটা আমারই করার কথা ছিল।'

মোক্তারদাদু হুংকার দিলেন, 'দ্যাখ্ না, কেতুর আজ কী করি। ওকে আমি নাবালক হরণের দায়ে, জেলে পাঠাবো। বোঁচা, বোঁচা, শীগ্‌গির এদিকে আয়।'

তাঁর চিৎকার শুনে, শুধু বোঁচা না, অনেকেই ছুটে এলেন। দাদু বললেন, 'বোঁচা, শীগ্‌গির যা, বড় দারোগাবাবু এখুনি বেরিয়েছে। কোন্‌দিকে গেল, দ্যাখ্। বল্, আমি ডেকেছি।'

তারপরেই হঠাৎ তিনি বোঁচার দিকে ভালো করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি, তুই এত সাজগোজ ক'রেছিস কেন?'

বোঁচা বললো, 'দস্তিদার পাড়ার বারোয়ারিতলায় কংসবধ যাত্রা—।'

দাদু চিৎকার করে ধমক দিলেন, 'চুপ! যাওয়াচ্ছি তোমাকে যাত্রায়। বাড়িতে এত বড় একটা বিপদ, ও যাবে যাত্রা দেখতে। যা, শীগ্‌গির দারোগাবাবুকে ডাক।'

অবনী পিসেমশাই প্রায় অচৈতন্যর মতো, ভিতর বাড়িতে শুয়েছিলেন। দাদুর চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

দাদু বললেন, 'এই যে বাবা অবনী, তোমার কথাই ভাবছি। সুরথের খোঁজ পাওয়া গেছে। তুমি আর দেরি করো না, এখুনি বাড়ি চলে যাও। শ্যামাকে গিয়ে পুজো করতে বলো। আর বলবে, যতো রাত্রিই হোক, আমি সুরথকে নিয়ে সুন্দুরিগাঁয়ে যাচ্ছি। আজ ফটফটে পূর্ণিমার জ্যোছনা, রাত্রে কোনো অসুবিধে হবে না। দীপু থাক, ও আমার সঙ্গে যাবে।'

অবনী পিসেমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

দাদু বললেন, 'সব বৃত্তান্ত আমি গিয়ে বলবো। শ্যামাকে গিয়ে বলবে, সুরথ চণ্ডীপুরেই আছে, ভালো আছে।'

অবনীবাবু যেন প্রাণ ফিরে পেলেন, তিনি ঘর থেকে

বেরিয়ে যেতে না যেতেই, বড় দারোগা তাঁর দলবলসহ ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মোক্তারমশাই?'

দাদু বললেন, 'খবর পেয়েছি, সুরথ কাছেই আছে। তুমি আমার সংগে দলবল নিয়ে চলো, একজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

বলেই তিনি বোঁচার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার চাদর আর লাঠি দে তাড়াতাড়ি।'

বড় দারোগা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। দাদু তাঁকে কাছে ডেকে, কানে কানে কিছু বললেন। তারপরে, গলা খুলে বললেন, 'বুঝেছ তো? চারদিক ঘিরে ফেলতে হবে, তা না হলে, পাপী ফুড়ুত করে পালিয়ে যাবে।'

বড় দারোগা বললেন, 'ঠিক ঠিক।'

দস্তিদারপাড়ার বারোয়ারিতলায়, যাত্রার আসরে বিরাট ভীড় হয়েছে। অনেকগুলো গ্রামের লোক এসেছে। আসরের বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ঝাঁজ পাখোয়াজ ক্লারিওনেট আর পাইপ-বাঁশিতে সুর বাজছে। তিন বারের ঘণ্টার পরে, যাত্রা শুরু হলো। কংস সদলবলে আসরে এসে নানা আস্ফালন করতে লাগলো, কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। এই সময়ে দূর থেকে দৈব্যবাণী শোনা গেল, 'রাজা কংস, তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।'...

রাজা কংস সেই দৈববাণী শুনে, উন্মত্ত হয়ে গেল। তার অনুচরদের গোকুলে পাঠালো। তারপরের দৃশ্য গোকুলের বেণুবন। কৃষ্ণ তার সখাদের নিয়ে গান গাইতে গাইতে ঢুকলো। দাদু পুলিশ আর দারোগা নিয়ে আগেই আসর ঘিরে রেখে-ছিলেন। তাঁর ইঙ্গিত মাত্র, পুলিশের হুইস্‌ল বেজে উঠলো। তখনই দাদুর চিৎকার শোনা গেল, 'ওই আমার সুরথ! দারোগা-বাবু, তুমি আগে কেতুকে ধরো।'

দেখতে দেখতে পুলিশের দল, যাত্রার আসরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কৃষ্ণবেশে সুরথ তো থ! দাদু একেবারে আসরে উঠে, ওর হাত চেপে ধরলেন। লোকজন সব দৌড়োদৌড়ি আর চিৎকার শুরু করে দিল। বড় দারোগা নিজে বসুদেব বেশে সাজা কেতুকে ধরে আসরে টেনে নিয়ে এলেন। দাদু লাঠি তুলে বললেন, 'এই যে, এসো। কংসবধ না, আজ কেতুবধ পালা হবে।'

বলেই ঠাস করে, কেতুবাবুর পিঠে এক ঘা লাঠি মারলেন। কেতুবাবু হাত জোড় করে বললেন, মোক্তারকাকা, আগে আমার কথাটা শুনুন—!'

দাদু চিৎকার করে উঠলেন, 'চুপ, তুমি আমার বুড়ো বয়সের সব রক্ত শুষে নিয়েছ।'

যাত্রার আসরের মাঝখানে তখন গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরাও এসে পড়েছেন। তাঁরা সব ঘটনা শুনলেন। দাদু বললেন, 'আমি কেতুকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়বো।'

কেতুবাবু দাদুর পায়ের ওপর পড়ে বললেন, 'মোক্তারকাকা, তাই পাঠাবেন, আমি জেলেই যাবো, কিন্তু পালাটা করতে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।'

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও দাদুকে ধরে পড়লেন। অনেক অনুরোধ উপরোধের পরে, দাদু রাজী হলেন, কিন্তু পালাটা একটু ছোট করতে বললেন, কারণ রাত্রেই তিনি সুরথকে নিয়ে সুন্দরীগ্রামে যাবেন।

তারপরে আবার যাত্রা শুরু হলো। দাদু, বড় দারোগা সবাই যাত্রা দেখতে বসে গেলেন। দীপু দাদুর কোলের কাছে বসলো। সবাই মুগ্ধ হয়ে, সুরথের কৃষ্ণর পার্ট আর গান শুনলো। কংস-বধের পরে, যেখানে কৃষ্ণ আর মুক্ত বন্দী বসুদেবের মিলন হলো, দেখে দাদুও চোখের জল রাখতে পারলেন না। বললেন, 'নাহ্‌, কেতুটাও আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়লো।'

বড় দারোগা বললেন, 'যা বলেছেন। লোকটি গুণী আছেন।'

দাদু তাঁর মোটা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সেই তো হয়েছে মুসকিল। তবু তুমি ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে একটু ধমকে ধামকে দিও।'

বড় দারোগা বললেন, 'তা দিয়ে দেবো।'

রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময়, দাদু দীপু আর সুরথকে নিয়ে, দীপুদের বাড়ি পৌঁছুলেন। সেই চার মাঝিই খুব তাড়াতাড়ি নৌকো চালিয়ে নিয়ে এলো। পথে সুরথ দাদুকে সব ঘটনাই বলেছে, আর চোখের জল পড়েছে দুজনেরই।

দীপুদের বাড়িতে সবাই জেগেছিলেন। এমন কি ঝিন্‌কিও। শ্যামা পিসিমা ছুটে এসে সুরথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতোই, সকলের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। দাদু বললেন, 'আজকের রাতটা অবিশ্যি জেগে থাকবারই কথা। কো জাগর? অর্থাৎ কে জাগে? আজ রাত্রে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ সব ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে যান, কে জাগে। যারা জেগে থাকে, তাদেরই তিনি বর দেন।'

ঝিন্‌কি তখন আলপনা আঁকা উঠোনে দাঁড়িয়ে সুরথের সংগে গল্প করছিল। দাদু বললেন, 'ওগো আমার ঝিন্‌কি রাধে, ঘরের মধ্যে এসো। মাথায় হিম লেগে অসুখ করবে।'

এই ঘটনার সাতদিন পরে, মোক্তারদাদুর সংগে সুরথ ওদের শহরের বাড়ি ফিরে গেল। তারপরেই, এ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফেল করলো দেখে, ওর বাবা ওকে কলকাতায় বড়দার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সুরথ প্রথম চিঠি লিখলো মোক্তারদাদুকে, 'শ্রীচরণেষু, দাদু, আপনার কথা আমার সব সময় মনে পড়ে। কলকাতা আমার একটুও ভালো লাগে না। চণ্ডীপুর আর সুন্দরীগ্রামের কথা মনে পড়লে, আমার বুক টনটন করে। দাদু, আপনাকে খুব কষ্ট দিয়েছিলাম। আপনি কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। জানি না, কবে আবার আপনাকে দেখতে পাবো।'....

গোটা চিঠিটা শেষ করবার আগেই, দাদুর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। তিনি চোখ বুজে, চিঠিটা বুকের ওপর চেপে ধরলেন। চোখের জল তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়তে লাগলো। তিনি যেন সুরথের গান শুনতে পাচ্ছেন, 'আমাদের মনোমোহন মোক্তার...।'
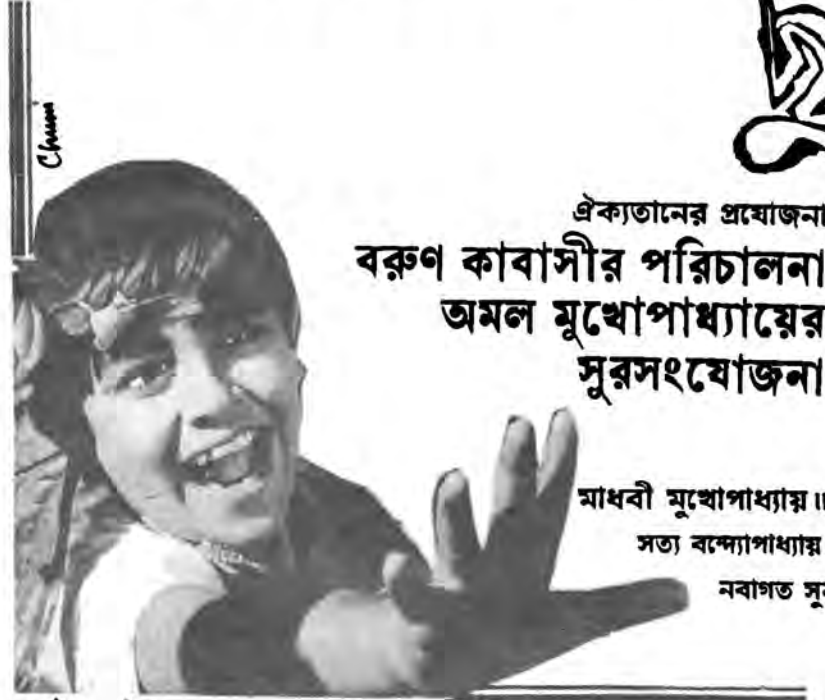
আপনার জীবনে অনেক আনন্দময় মুহূর্ত আসে

মাথাধরার জন্য সে আনন্দকে নষ্ট হ'তে দেবেন না

A.G.63.BN

শোধ বোধ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ননীমাধব ক্লাবের নাম রাখল মুড়াগাছা কৃষ্টি কেন্দ্র।

সারা বছরের মধ্যে দুটো উৎসব। একটা পল্লীসেবা অর্থাৎ দল বেঁধে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কচুরিপানা তোলা। বেশির ভাগই দলের ছেলেদের পুকুরে। আর একটা উৎসব কি করা যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক হ'ল জলসার আয়োজন।

জমিদার নেই, ভগ্নদশা জমিদার বাড়িটা আছে। সেই জমিদার বাড়ির ভিটেয় ম্যারাপ বেঁধে জলসা। গাছে গাছে ফলাও করে বিজ্ঞাপন আটকে দেওয়া হ'ল। শহর থেকে প্রথমশ্রেণীর গাইয়ে বাজিয়ে আসবে। ননীর দল মুড়াগাছা থেকে কলকাতায় ছুটোছুটি করতে লাগল। বাসে আর ট্রেনে। যাঁরা খেয়াল গান, তাঁদের বদখেয়ালের অন্ত

নেই। মিনিটে মিনিটে চা চাই। তা ছাড়া যোগাযোগ করাই মুস্কিল। আগাম টাকা গুঁজে দিলেও জলসার তারিখ ভুলে যান। মনে থাকে না। এত বড় আর্টিস্টদের কাছ থেকে রসিদও চাওয়া যায় না। আধুনিক, ভজন, ভাটিয়ালি যাঁরা গান, তাঁদেরও নাগাল পাওয়া মুস্কিল। গ্রামোফোন কোম্পানী আছে, স্টুডিয়ো আছে। ফলে জলসার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ননীমাধবের দলের তত স্নান আহারের চিন্তা শিকেয় উঠল।

ভৈরব ব্রহ্মচারী হাঁড়ি বাজিয়ে গান করেন। সেজন্য নতুন হাঁড়ির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মচারীর ফরমায়েস মত সাইজের। এ ছাড়া চুয়ান্ন খিলি পান তৈরি রাখার কথা। আঠার খিলি একসঙ্গে মুখে দিলে, তবে গাইতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত বাইরের আর্টিস্ট একমাত্র ভৈরব ব্রহ্মচারী ছাড়া কেউ এলেন না। যারা আনতে গিয়েছিল তারা মুখ চুণ করে ফিরে এল। কেউ বাড়িতে নেই। নিরুপায় হয়ে ননীমাধব পাড়ার গাইয়ে বাজিয়েদের স্টেজে তুলল। মল্লিকদের পরাণ বাঁশের বাঁশী, ঘোষালদের সুধীর খোঁনা গলায় আধুনিক গান, শেষকালে স্টেশনের ধারে যে কানা ভিখারিটা দেহতত্ত্বের গান করে, তাকেই ধরে আনতে হ'ল। লোকেরা তুমুল হৈ চৈ শুরু করল। কেউ কেউ পয়সা ফেরতও চাইল।

ননীমাধবের স্থির বিশ্বাস এসব গোপীমোহনের দলের কারসাজি। তারাই সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে।

ননীমাধব যেমন পুবপাড়ার, গোপীমোহন তেমনই পশ্চিম পাড়ার। দুজনের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি। দুজনের দুটো দোকান ছিল। গোপীমোহনের চায়ের, আর ননীমাধবের খাটিয়ার। ননীমাধব বলত, গোপীর দোকানে দিন কতক চা খেলেই আমার খাটিয়ায় চাপতে হবে। সেইজন্যই পাশে দোকান করেছি। এখন অবশ্য গোপীমোহন দোকান সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু আক্রোশ কমে নি।

ননীমাধবের কৃষ্টিকেন্দ্রের পত্তন হ'তেই অন্য দল গোপীমোহনকে ধরল।

গোপীদা, আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব?

দুপুর বেলা। দোকানে খদ্দের নেই। গোপীমোহন ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে একটা চেয়ারের ওপর বসেছিল। সব শুনে হেসে বলল, দেখ, ওসব দ্বিতীয়ভাগের যুগ চলে গেছে। আজকাল লোকেরা সাদামাটা জিনিস পছন্দ করে। এবার কলকাতায় গিয়ে দেখে এলাম কাপড় চোপড়ের দোকানের নাম পোশাক, জুতোর দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা, জুতোঘর, সেইজন্যই তো আমার দোকানের নাম দিয়েছি, চা পান।

হরগোবিন্দ বলল, তাতে মুস্কিলও হয়েছে গোপীদা। ননীর দল বলে বেড়াচ্ছে, চায়ে কাঠের গুঁড়ো, কাটলেটে গিরগিটির মাংস চাপানো হয় বলে, দোকানের এই চা পান নাম।

গোপীমোহন হাসল, ননের দলের কাছে আর এর চেয়ে বেশী আশাও করি না। আধুনিকতার ওরা জানে কি। সব কুপমণ্ডুকের দল।

সতীশ বয়সে সব চেয়ে ছোট। সে একপাশে বসে মাঠ থেকে তুলে আনা ছোলা চিবচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করল, ওই কথাটার মানে কি গোপীদা?

আমারও যেমন হয়েছে মুর্খ নিয়ে কারবার। কুপমণ্ডুক মানে জানিস না? কুপ মানে কুয়ো তাতো জানিস? আর মণ্ডুক মানে, ওর নাম কি, মণ্ডা। যারা কুয়োর জলে মণ্ডা ভিজিয়ে খায়, তারা কুপমণ্ডুক, অর্থাৎ মুর্খ।

সকলে এবার মাথা নাড়ল। এ কথাটার মানে তারা আগেই জানত। সতীশটার একেবারে বুদ্ধি সুদ্ধি নেই।

পরাশর বলল, কুয়োর জলে মণ্ডা ভিজানোর কথা থাক গোপীদা, আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।

আলবৎ, উত্তেজিতভাবে কথাটা বলতে গিয়েই গোপীমোহন বেসামাল হয়ে গেল। চেয়ারের তিনটে পায়া, আর একটা ইঁট নির্ভর। ইঁট সরে যেতেই চেয়ার কাত হয়ে পড়ল গোপীমোহনকে নিয়ে। সনাতন চেয়ারের পাশে বসেছিল। গোপীমোহন কাত হ'তে তার মাথার গামছা সনাতনের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

অ্যাঁ, তোমার গামছায় কি দুর্গন্ধ গোপীদা, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার দাখিল।

নিজেকে সামলে গোপীমোহন হাত বাড়িয়ে গামছাটা নিয়ে আবার মাথায় চাপিয়ে বলল, দুর্গন্ধ কেন হবে। পুকুরের পচা পাঁক গামছায় দিয়েছি। মাথা ঠান্ডা হয়। শহরে যে এয়ার-কণ্ডিশন মেসিন দেখিস, তার বেশীর ভাগের মধ্যেই তো পাঁক ভরা থাকে। সেইজন্যই এত ঠান্ডা।

পরাশর বলল, যাক গোপীদা, এবার আসল কথাটা ভাব।

ও আর ভাবাভাবি কি। আমি ঠিক করে ফেলেছি।

ফেলেছ? বলে ফেল।

আমরা থিয়েটার করব। আমাদের ক্লাবের নাম, নাটুকে দল।

দলের সবাই চীৎকার করে উঠল। বা, বা, এমন না হলে মাথা। নাটুকে দল যুগ যুগ জিয়ো।

সতীশ লাফিয়ে উঠে বলল, আমি আজই সাইনবোর্ডের অর্ডার দেব।

সতীশের মামাদের সাইনবোর্ড আঁকার দোকান। সতীশও দোকানে বসে হাত মক্স করে।

কথাটা সতীশ ভালই বলেছিল, কিন্তু সে লাফিয়েই সর্বনাশ করল। তাকের ওপর কাঁচের জারে বিস্কুট আর কেক ছিল। একটা জার ভেঙে বিস্কুট মেঝের ওপর পড়ে গেল। গোপীমোহনের মাথায় পাঁকভর্তি গামছা থাকলেও তার মেজাজ গরম হয়ে গেল।

লোকসানের বরাত। গেল তো দামী বিস্কুটগুলো। না নেচে কি তুই কথা বলতে পারিস না? কুপমণ্ডুক কোথাকার।

অন্য সকলে ব্যাপারটা থামিয়ে দিল।

সাইনবোর্ড এল। গোপীমোহনের চায়ের দোকানে সাইনবোর্ড আটকানো হ'ল। বই ঠিক হ'ল, সীতাহরণ। সব পার্টই ঠিক হ'ল, কিন্তু হনুমানের পার্ট করতে কেউ রাজী নয়। দু একজন রাজী হল, কিন্তু তারা ল্যাজ জুড়তে নারাজ। গোপীমোহন রেগে লাল। ল্যাজ ছাড়া হনুমান? ডিম ছাড়া অমলেট? তাহলে লঙ্কাদহনটা হবে কি করে? হনুমান কাঁধে করে এ যুগের মতন পেট্রলের টিন নিয়ে যাবে?

এ ব্যাপারেও একটা নিষ্পত্তি হ'ল। সবাই মিলে সতীশকে রাজী করাল। গোপীমোহনের বিস্কুট নষ্ট হবার রাগ বোধহয় যায় নি।

সে বলল, খুব তো লাফাতে ওস্তাদ। এ পার্ট-ই তোকে মানাবে।

তাতো হ'ল, কিন্তু ননীমাধবদের জলসা পণ্ড করার কি হবে? একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করে ননীমাধবের দল ঢাক পেটাতে পেটাতে মুড়াগাছা প্রদক্ষিণ করছে। মুড়াগাছার ইতিহাসে এমন অভিনব জলসা এই প্রথম।

আবার গোপীমোহনের চায়ের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ ধরে ঢাক পেটাল। চোঙার মধ্যে মুখ দিয়ে ননীমাধব নিজে চেঁচাল সুর করে। দলটা চলে যেতে গোপীমোহন বলল, ওরে একটা কাজ করতে পারিস?

কি বল গোপীদা?

ননের দল শহর থেকে যে সব আর্টিস্ট আনবে তাদের নাম তো

গাছে গাছে লটকে দিয়েছে। তাদের ঠিকানাগুলো যোগাড় করতে পারিস?

সনাতন বলল, খুব পারি গোপীদা। আমার এক পিসতুতো ভায়ের কাকার ছেলে রেডিয়ো অফিসে কাজ করে। তার কাছ থেকে সব ঠিকানা পেয়ে যাব।

ঠিক আছে, তুই ঠিকানাগুলো নিয়ে আয়। তারপর যা করবার আমি করছি।

ঠিকানা এল। সবসুদ্ধ পাঁচজন।

জলসার দিন দুয়েক আগে গোপী-মোহন বেরিয়ে পড়ল। এ দুদিন দোকান চালাবে তার ভাগ্নে বিশ্বনাথ। দলের সবাই তো রয়েইছে। তবে তাদের খুব বিশ্বাস নেই।

কলকাতা শহর গোপীমোহনের খুব চেনা। সওদা করতে মাসে দুবার তাকে আসতে হয়।

ননীমাধবের জলসায় যাঁদের যাবার কথা, তাঁরা সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্টিস্ট।

গোপীমোহন প্রথমে গেল অমলেন্দু বসাকের কাছে। অমলেন্দু তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করছিলেন। রেওয়াজ থামিয়ে বললেন, কি ব্যাপার?

আজ্ঞে মুড়াগাছা থেকে আসছি। বড় বিপদ।

বিপদ? কি বিপদ?

জলসার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ ননীমাধববাবুর পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সেটা আর হচ্ছে না।

অমলেন্দু বললেন, না হলেও অগ্রিম যে টাকা আপনারা দিয়েছেন, সেটা ফেরত দিতে পারব না। আমি তা দিই না। সেটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এক রকম ভালই হ'ল, নৈহাটি থেকে লোক এসেছিল, ওই একই দিনে তাদের জলসা, সেখানেই যাব।

গোপীমোহন দু হাত জোড় করে বলল, আজ্ঞে, আগাম টাকা আমরা ফেরত চাই না। আপনি অপেক্ষায় থাকবেন, সেইজন্যই বলে গেলাম।

ঠিক এইভাবে হিমাংশু সরখেল, পিনাকি দে আর জীতেন পুর-কায়স্থকে গোপীমোহন একই কথা বলল। জীতেন পুরকায়স্থ অসুস্থ। খুব জ্বর। তিনি এমনিতেই যেতে পারতেন না।

শুধু ভৈরব ব্রহ্মচারীকে কায়দা করা গেল না। তিনি বললেন, না মশাই, কথা দিয়েছি, তখন আমি যাবই। না হয়, ফিরে আসব। গোপীমোহন বলল, সে আপনার ইচ্ছা। পাছে আপনার হয়রানি হয়, তাই বলতে এসেছিলাম।

গোপীমোহন ফিরে এল। মুড়া-গাছায় এসে দলের কাছে সব বলল। জলসা বানচাল হবেই। একলা ব্রহ্ম-চারী আর কি করবে।

তাই হ'ল। কলকাতার আর্টিস্টদের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মচারী এলেন। তাঁর গান শেষের দিকে। বড় আর্টিস্ট না আসাতে সবাই হৈ চৈ শুরু করল। ননীমাধব স্টেজে উঠে হাতজোড় করে সবাইকে বোঝাল।

রাত বারোটা নাগাদ ব্রহ্মচারী গান শুরু করলেন। মঞ্চের একদিকে নতুন হাঁড়ি উপুড় করা ছিল। মুখে কাপড় বাঁধা।একজন সেই হাঁড়িটা ব্রহ্মচারীর কোলের ওপর তুলে দিল। হাঁড়ির মুখের কাপড় খুলে ব্রহ্মচারী গাইলেন।

দেহের মধ্যে যত রিপু দেয় মা কেবল যন্ত্রণা।

সবটা গাইতে হ'ল না। হাঁড়িতে বার কয়েক আঙুলের ঠেকা দিতেই বোঁ বোঁ শব্দ। ব্রহ্মচারী বিরাট হাঁ করে, মাগো মা, বলেই বাবাকে স্মরণ করলেন।

ওরে বাবারে, গেলুম রে।

হাঁড়ির মধ্য থেকে বোলতার ঝাঁক বেরিয়ে মঞ্চ অন্ধকার করে ফেলল।

ব্রহ্মচারীও চোখে অন্ধকার দেখলেন। মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে স্টেশনের দিকে ছুট।

ভোরের দিকে স্টেশনের প্ল্যাট-ফর্মের ওপর তাঁকে যখন পড়ে থাকতে দেখা গেল, তখন মনে হ'ল ভৈরব ব্রহ্মচারী যেন মাস দুয়েক নৈনিতাল ঘুরে এসেছেন। একেবারে ডবল স্বাস্থ্য। গালের মাংস এত ফুলেছে যে দুটো চোখ উধাও।

ননীমাধবের দলের স্থির ধারণা যে গোপীমোহন আর তার সাকরেদদের বদমাইসি। হাঁড়ির মধ্যে কখন বোল-তার চাক ঢুকিয়ে দিয়েছে কিংবা হাঁড়িই বদলে দিয়েছে।

দলের মিটিং বসল।

ননীমাধব বলল, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। গোপীরা থিয়েটার করছে, কি ক'রে করে দেখি। কবে, কোথায়, কি বই হচ্ছে, খবর আন।

খবর আনা শক্ত কিছু নয়। দিন কুড়ি পরেই গাছে গাছে, লোকের পাঁচিলে ছাপানো পোস্টার দেখা গেল। নাট্কে দল-এর প্রথম নিবেদন, সীতাহরণ। পরিচালনা ও রামের ভূমিকায় গোপীমোহন লস্কর। আগামী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় স্টেশন ময়দানে।

ননীমাধব বুঝতে পারল, গোপী-মোহনের দল এবার রীতিমত হুঁসিয়ার থাকবে। তার দলকে ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবে না। অন্য মতলব বের করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

দলের দুজন রঘুনাথ আর নরেন গোপীমোহনের কাছে গিয়ে হাজির। তখনও রিহার্সাল শুরু হয় নি। অনেকে এসে বসে আছে। গোপী-মোহনের চায়ের দোকানের পিছনেই রিহার্সাল হয়। ভাগ্নেকে বসিয়ে গোপীমোহন রিহার্সালে আসে। তবে খদ্দেররা চেঁচামেচি করলে, গোপী-মোহনকে রামের পার্ট ছেড়ে দোকানে আসতে হয়। মাঝে মাঝে গোলমালও হয়ে যায়। রাম চুপচাপ বসে আছে। বিভীষণরূপী সনাতন এসে দাঁড়াল।

কি আদেশ সখা?

রামের মন চায়ের দোকানে। একটু আগে একজন খদ্দের হাঙ্গামা করেছে।

সে বিভীষণের প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ বলে ফেলল—

পিছনের টেবিলে দুটো চা, দুখানা বিস্কুট।

সবাই হেসে উঠতে গোপীমোহনের খেয়াল হ'ল। গোপীমোহন রিহার্সালে ঢুকতে গিয়ে দেখল রঘুনাথ আর নরেন এককোণে দাঁড়িয়ে আছে।

কি ব্যাপার ননের দলের ছোকরা-দুটো এখানে কেন?

রঘুনাথ বলল, গোপীদা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

আমার সঙ্গে? কেন, তোদের ননে কি হ'ল?

সেই কথাই তো বলব। শোনবার সময় হবে তোমার?

আয় এদিকে। আমার বেশী সময় নেই। রিহার্সাল আছে।

চায়ের দোকানের পিছনে মাঠ। সেই মাঠে গোপীমোহন আর রঘুনাথ বসল। পাশে নরেন।

ননীর অত্যাচারে আর পারি না গোপীদা। আমাদের ওপর কেবল তম্বি। জলসা জমল না, তার সব দোষ আমাদের। হাঁড়ির ভিতর আমরা নাকি বোলতা পুরে রেখে ননীকে বে-ইজ্জত করেছি। আর আমরা ওর কাছে যাচ্ছি না।

গোপীমোহন আড়চোখে দুজনকে দেখে নিয়ে বলল, কিন্তু সীতাহরণ বইতে সব পার্ট দেওয়া হয়ে গেছে। আর দেবার মতন কিছু নেই।

নরেন বলল, পার্ট আমাদের দরকার নেই গোপীদা।. ওসব আমাদের আসে না। আমরা তোমার ফাই ফরমাস খাটব। যা বলবে তাই করব। ওই ননীর দলে গিয়ে এতদিন যে কি ভুল করেছি গোপীদা। এই নাক কান মলছি।

গোপীমোহন বলল, ঠিক আছে, কাল আসিস। আজ রাতটা ভেবে দেখি।

রঘুনাথ আর নরেন রয়ে গেল।

প্রথমদিকে গোপীমোহনের একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু কদিন এদের হালচাল দেখে সে নিশ্চিন্ত হ'ল। না, এরা ননীর কাছে আঘাত পেয়ে দল ছেড়েছে।

রিহার্সাল-এর সময় রঘুনাথ আর নরেন এক পাশে বসে থাকত। দরকার হলেই জল নিয়ে আসত, কিংবা কারও জন্য বিড়ি সিগারেট। গোপীমোহনের দোকানের খদ্দেরও সামলাত। খুশী হয়ে গোপীমোহন বলেওছিল—

কিরে তোরা ছোটখাট পার্ট করবি নাকি? রাম কিংবা রাবণের সৈন্য। বেশী কথা বলতে হবে না। স্টেজে ঢুকবি আর মরবি।

রঘুনাথ হাতজোড় করেছে, দোহাই গোপীদা, ওসবে দরকার নেই। স্টেজে যতক্ষণ সিন ফেলা থাকে, ঠিক আছে। কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সিন উঠলেই লোকের কালো কালো মাথা দেখলে নিজের মাথা ঘুরে যায়। মুখ দিয়ে একটি কথা ফোটে না।

নরেন বলল, আমারও সেই অবস্থা গোপীদা। মামার বাড়ীতে একবার অনুচরের পার্ট দিয়েছিল, দক্ষযজ্ঞ পালায়। ভয় পেয়ে এমন জোরে শিবকে জড়িয়ে ধরেছিলাম যে শিবের দমবন্ধ হবার যোগাড়। প্রাণ বাঁচাতে শেষকালে শিব ত্রিশূল দিয়ে পেটে এমন খোঁচা মেরেছিল যে পেটে এখনও দাগ আছে।

সনাতন বলল, যাক, গোপীদা সবাই পার্টে নামলে থিয়েটারের দিন কাজের

আমি কি বলতে চাই দেখুন –
একমাত্র বিনী কটনের মতো
উঁচু মানের সুতী কাপড়ই
দিনের পর দিন
এতো ঘর্ষণের ধকল
সইতে পারে।
টেঁকসই ও মজবুত সুতোয় তৈরি
একমাত্র বিনী কটনই
অবিরাম ঘর্ষণের ধকল সয়ে
অনেক বেশিদিন চলে।
বিনী – ফ্যাশনদুরস্ত টেঁকসই
সুতী কাপড়

BCCM-16 BEN

লোকই পাওয়া যাবে না।

তাই ঠিক হ'ল। রঘুনাথ স্টেজের ভিতরের সব ব্যবস্থার ওপর নজর রাখবে আর নরেন বাইরের ভিড় সামলাবে। অবাঞ্ছিত লোক না এসে জোটে।

গোপীমোহনকে একান্তে ডেকে নরেন বলল, একটা কথা তোমায় বলে দিই গোপীদা, ননী কিংবা তার দলের কাউকে ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবে না। ওদের মতলব ভাল নয়। ওরা থিয়েটার পন্ড করবার চেষ্টায় থাকবে।

কিন্তু, গোপীমোহন উত্তর দিল, টিকেট কেটে যদি আসে আটকাবি কী করে?

জলসার টিকেট ছিল একটাকা। থিয়েটারের টিকেট হয়েছে আটআনা।

নরেন বলল, টিকেট ওদের দলের কাউকে যেন বিক্রিই না করা হয়। কেউ কিনতে এলে পরিষ্কার বলে দেবে, টিকেট সব বিক্রি হয়ে গেছে।

বেশ, তা করতে পারলে আমার আপত্তি নেই।

গোপীমোহন খুব ব্যস্ত। কলকাতা থেকে সিন, পোশাক, পেন্ট করার লোক আনার সব দায়িত্ব তার ওপর। তা ছাড়া, সকলকে অভিনয় শেখানোর ব্যাপার তো রয়েইছে।

অভিনয় আরম্ভ আটটায়, ছটা থেকে মাঠে লোকারণ্য।

প্রথম কথা, টিকেটের দাম কম। দ্বিতীয়, পাড়ার ছোকরাদের থিয়েটার। ছেলে বুড়ো সবাই এসে হাজির। নরেন আর কয়েকজন গেটে রইল। স্টেজের মধ্যে রঘুনাথ।

পাঁচটা থেকেই সকলে রং মাখতে শুরু করল। বিশেষ করে সতীশকে নিয়েই মুস্কিল। তার পোশাক ছাড়াও পরিপুষ্ট ল্যাজের ব্যাপার রয়েছে। খড় পাকিয়ে লম্বা করে তার ওপর কাপড় জড়ানো। কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে আবার জরির ফিতা। দুজন ড্রেসার হিমসিম খেয়ে গেল। তাদের সঙ্গে রঘুনাথও হাত লাগাল।

আপনারা আর সকলকে দেখুন, আমি ল্যাজের ভার নিচ্ছি।

ঠিক আছে ভাই, তুমি ফিতাটা জড়িয়ে দাও। আমরা রাম রাবণকে দেখি।

একটা টুলে সতীশ বসেছিল। মুখে হনুমানের মুখোশ।

সে বলল, রঘু, এ যে আমার চেয়ে ল্যাজ ভারি হয়ে গেল রে। ল্যাজ আমি আছড়াব কি করে?

ল্যাজের তরিবত করতে করতে রঘুনাথ বলল, একবারই তো তোমাকে ল্যাজ আছড়াতে হবে। তখন দুহাত দিয়ে ল্যাজটা তুলে নিও।

পারব তুলতে? তাই ভাবছি।

ড্রেসাররা রাবণের জন্য দশমুণ্ড এনেছিল। গোপীমোহন ধমক দিয়েছে।

এ যুগে ওসব অচল। মহা প্রতাপ-শালী রাবণ, তাই বলে দশমুণ্ড বিশহাত। সত্যিই কি তাই ছিল নাকি। তাহলে লোকটা ঘুমাত কি করে? অতগুলো হাত কখনও ম্যানেজ করা যায়। একমাত্র গায়ে মশা মাছি বসলে কাজে লাগে। ওসব দরকার নেই। বিরাট একটা গোঁফ শুধু আটকে দাও।

তাই হ'ল। পরাশর রাবণ। বিরাট চেহারা। গোল মুখ। প্রকাণ্ড গোঁফ লাগাতেই চেহারা বদলে গেল।

রামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র রাবণ। পরাশরের চেহারা যেমন বিরাট, গলার জোর সেই অনুপাতে নীচু। অথচ হুঙ্কার ছাড়া রাবণকে কল্পনা করা যায় না। রঘুনাথ যখন রাবণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও রাবণ পার্টে মগ্ন। রঘুনাথকে দেখে বলল, বড় মুস্কিলে পড়েছি রে।

কি দাদা, এক কাপ চা এনে দেব? গরম চা?

উহুঁ, চায়ে হবে না। গলাটা নিয়ে কি করি বল তো?

তোমাকে তো কিছু করতে হবে না। গলা তো রামই কেটে ফেলবে।

আরে তার আগে। গোপীদার গলার আওয়াজ খুব ভরাট। আমার গলাটা তেমন সুবিধার নয়। নানা রকম করেছি, গলার আওয়াজটা তুলতে পারছি না।

রঘুনাথ হাসল, এ আবার একটা সমস্যা। এমন বড়ি তোমায় দিতে পারি যে খেলে গলার স্বর একেবারে মেঘের ডাকের মতন হয়ে যাবে।

বলিস কি? কি বড়ি?

রঘুনাথ পকেট থেকে কাগজে মোড়া দুটো বড় সাইজের বড়ি বের করল।

এই নাও, দুটো খেয়ে নাও। কথাটা আর কাউকে বল না। আমার কাছে আর বড়ি নেই পরাশরদা।

মাথা খারাপ। কাকে আবার বলতে যাব। নে, দে শিগ্গির। কি করে খেতে হয়?

দাঁড়াও, তোমার জন্য এক গ্লাশ জল নিয়ে আসি।

রঘুনাথ জল নিয়ে এল। পরাশর বড়ি খেয়ে গলায় জল ঢেলে দিল। তোর উপকার কোনদিন ভুলব না রঘু।

ঠিক আছে, এখন কথা বল না। মুখ বন্ধ করে বসে থাক। একেবারে স্টেজে গিয়ে গলা খুলবে। আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি। রঘুনাথ সনাতনের কাছে এসে দাঁড়াল। সনাতন রং মেখেছে কিন্তু পোশাক পরে নি। রঘুনাথ বলল, কি সনাতনদা সময় তো প্রায় হ'য়ে এল। পোশাক পরে নাও।

সনাতন মুখ বিকৃত করে বলল, দূর, আগে জানলে কে বিভীষণের পার্ট করত। একে তো বিশ্বাস-ঘাতকের পার্ট, তারপর ভেবেছিলাম রাবণের যখন ভাই, তখন জমকালো পোশাক পরতে পাব, কিন্তু এখন শুনছি সাত্ত্বিক বিভীষণ সাদামাঠা পোশাক পরবে। মেজাজটাই খারাপ করে দিলে।

রঘুনাথ হাসল, নামকরা লোকদের পোশাক তো খুব সাধারণই হয়। বিদ্যাসাগর, অশ্বিনী দত্ত, গান্ধিজীর পোশাক দেখ নি? পার্টে তুমি মেরে দেবে। দাঁড়াও তোমার পোশাকটা আমি নিয়ে আসছি।

সাদা সিল্কের পোশাক। রঘুনাথ যত্ন করে পরিয়ে দিল।

প্রায় আটটা বাজে। কনসার্ট আরম্ভ হয়েছে। রঘুনাথ গোপীমোহনের খোঁজে গিয়ে দেখল, গোপীমোহন একেবারে তৈরি। দুটো হাত পিছনে দিয়ে পায়চারি করছে আর বিড় বিড় করে পার্ট বলছে।

রঘুনাথকে দেখে বলল, কি রে, কেমন মানিয়েছে?

চমৎকার। একেবারে আসল দুর্বা-দলশ্যাম। গলা ঠিক আছে তো গোপীদা?

কেন, এ কথা বলছিস কেন?

না, ওই পরাশরদা গলার জন্য কি সব খাচ্ছে। বলছে, আওয়াজ যা একটা তুলব রামের পিলে চমকে যাবে।

পিলে?

ওই রকম বুদ্ধি। রাম দেবতা। দেবতাদের আবার পিলে হয় নাকি। একি আমাদের গাঁয়ের তারাচরণ সরখেল যে জোড়া পিলে বয়ে বেড়াবে।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে গোপীমোহন বলল, নারে, গলার জন্য কিছু একটা করতে হবে। মাঝে মাঝে বসে যাচ্ছে। বোধ হয় ঠান্ডা-গরমে এ রকম হয়েছে।

ওষুধ আমার কাছে আছে গোপীদা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আছে? আর তুই চুপচাপ বসে আছিস?

তুমি না বললে আনি কি করে? দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।

মিনিট দশেকের মধ্যে রঘুনাথ

ফিরে এল। হাতে বড় একটা গ্লাশ।
কিরে ওতে?

কাবুলি সিদ্ধি। কাবুলিদের গলার আওয়াজ শুনেছ তো? পিলে শুধু চমকায় না, ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

আর কথা না বলে গোপীমোহন চোঁ চোঁ করে গ্লাশ শেষ করে বলল, ভাল জিনিস রে, কোথায় পেলি।

তোমাকে এরপর আর এক গ্লাশ খাওয়াব গোপীদা। দেখবে, তীর লাগবে না, শুধু তোমার হুঙ্কারেই রাবণ বধ হয়ে যাবে।

ঠিক আটটা পনেরোয় সিন উঠল।

প্রথম আধঘণ্টা খুব জমল। বিশেষ করে রামের পার্ট। সীতাকে হারিয়ে রাম যখন পঞ্চবটিতে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তখন মেয়েমহলে সবাই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। লোচন মুচি পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, রাবণের চামড়া খুলে রামের জুতোর হাফসোল বানিয়ে দিতে হয়।

গোলমাল শুরু হ'ল বিভীষণ ঢুকতেই।

নবদুর্বাদলশ্যাম, আমি রাবণের ভ্রাতা। আজীবন সত্যের পূজারী।

পার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ মুখ চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করতে লাগল। দোলাতে লাগল দুটো হাত। ভীষণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে বোঝা গেল। কিছুক্ষণ পরে অবস্থা চরমে উঠল।

রাম রঘুমণি এ পরাণ সমর্পিব তোমার চরণে। জানকীহরণ করি যে পাপ করিয়াছে দশানন, সমুচিত শাস্তি তার করহ বিধান। উঃ, জ্বালিয়ে দিলে রে বাবা। গেলুম, গেলুম।

রামের পবিত্র সান্নিধ্যে আশ্রয় নিতে এসে বিভীষণের এ ধরনের জ্বলুনী দেখে সবাই অবাক। কি আবার হ'ল?

ততক্ষণে বিভীষণ পোশাক খুলে ফেলেছে। নিজের গেঞ্জিও। স্টেজের ওপর একেবারে নটরাজ নৃত্য। গোপী-মোহন পাকা অভিনেতা। সামলে নিয়ে বলল, সখা বিভীষণ, কি হেতু চঞ্চল?

বিভীষণের নাচ থামে নি। সারা গায়ে লাল লাল দাগ। ফুলে উঠেছে! সব ভুলে বিভীষণ চেঁচিয়ে উঠল, কি হেতু চঞ্চল! ডেয়ো পিঁপড়ের কামড়ে একেবারে পাগল করে দিয়েছে। উঃ, কি জ্বালা রে বাবা।

নাচতে নাচতে বিভীষণ ছুটে পালাল। দর্শকদের মধ্যে হাততালি আর হাসির ধুম।

ড্রপ পড়ে যেতে গোপীমোহন সনাতনের খোঁজ করল। কোথায় সনাতন। সে তখন এক মাইল দূরে পচা পুকুরে গা ডুবিয়ে বসে আছে।

কিছুক্ষণ কনসার্ট চলল। ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্য। তার পরের সিন লক্ষ্মণ আর হনুমানকে নিয়ে। লক্ষ্মণের বিশেষ পার্ট নেই। হনুমানেরই সব কথা।

সীতাকে কোথায় রেখেছে দুর্বৃত্ত রাবণ সেটা দেখবার জন্য হনুমান লাফিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যাবে। সতীশ ল্যাজসুদ্ধ ঢুকতেই লোকরা হেসে উঠল। চমৎকার মানিয়েছে।

দু একটা বদমায়েস ছেলে বলে উঠল, এই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি। হনুমান কোন কিছুতে কান না দিয়ে জোড়হাতে সীতা বন্দনা শুরু করল, তারপর বলল, রামানুজ, সীতা মোর অন্তরে, বাহিরে। তন্ন তন্ন করি খুঁজি ত্রিভুবন জানকীরে আনিব ফিরায়ে। জয় রাম, জয় সীতা। হুপ্ হুপ্।

লাফাবার আগে সতীশ দু হাতে নিজের ল্যাজটা তুলে স্টেজে সজোরে আছড়াল।

দুম্, দুম্, দমাস্। প্রচণ্ড শব্দ। চারদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার।

লক্ষ্মণ পিছনেই ছিল। কাপড় হাঁটুর ওপর উঠিয়ে, গেছিরে বাবা, বলে দর্শকদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

স্টেজের প্রথম সারিতে থানার দারোগা দুঃখতারণ সামন্ত গড়গড়া নিয়ে বসেছিলেন। লক্ষ্মণ পড়ল একেবারে তাঁর গড়গড়ার ওপর। তামাকের আগুন ছিটকে পড়ল চারধারে।

দুঃখতারণ মারমূর্তি। মানুষ মারার কারসাজি। সব কটাকে থানায় পুরব।

ওদিকে বীর হনুমান টান হয়ে স্টেজের ওপর শুয়ে পড়েছে।

কান্না জড়ানো গলায় বলছে, আমি মরে গেছি। আমি আর বেঁচে নেই। ল্যাজে কে বোমা বেঁধে দিয়েছে। কে আছ বাঁচাও।

আবার ড্রপ পড়ল।

গোপীমোহন একটা চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল। তাঁর কাছে সবাই এসে দাঁড়াল। গোপীমোহন কেমন অন্য-মনস্ক। কোন কিছুতে মন নেই। সব শুনে বলল, একেবারে রাবণ বধের সিন আরম্ভ করে দাও। শেষ সিন।

তাই ঠিক হল।

দুজনেই তীর ধনুক নিয়ে তৈরি। কনসার্টে যুদ্ধের বাজনা। মোক্ষম দৃশ্য। গোপীমোহন আর পরাশরের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কে হারে, কে জেতে। প্রথমেই রাবণের হুঙ্কার।

আরে আরে ভিখারী রাঘব এত স্পর্ধা তোর। শমন-বিজয়ী রাবণের সনে রণসাধ।

রাবণ বেশ চড়া গলায় শুরু করে-ছিল কিন্তু শেষদিকে গলা থেকে তিন চার রকম সুর বের হ'ল। জলতরঙ্গের মতন। কয়েকজন হেসে উঠল।

গোপীমোহনের মুস্কিল হ'ল। ধনুকে তীর লাগিয়ে একটা পা বাড়িয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু চোখের সামনে তিনটে রাবণ দেখল। দশমুণ্ড বিশহাত রাবণ। মাথাগুলো যেন ওপরে বাঁশে গিয়ে ঠেকেছে। কাবুলি সিদ্ধি পেটে যাবার পর থেকেই এই অবস্থা।

রাবণ বলে চলল, সীতা নাহি পাবে, অরণ্যে ফিরিয়া যাও বানর-বান্ধব।

আবার শেষদিকে তিন চার রকম গলা।

এবার রাম শুরু করল, আরে দুর্মতি রাক্ষস, খণ্ড খণ্ড করি তোরে বানাইব কিমা। তারপর চপ করি সাজাইব প্লেটে। দশানন চপ নামে বাড়িব দোকানে।

যে লোকটি প্রম্পট করছিল, তার চুল খাড়া হয়ে গেল, চোখ থেকে চশমা খসে পড়ল। সর্বনাশ, একি করছে রামচন্দ্র। বইয়ের কোথাও তো এসব কথা লেখা নেই।

কিংবা যদি চাস তুই কাটলেট হ'তে, তাও বানাইব, নাম দিব দশমুণ্ড কাটলেট।

ব্যস, রামকে আর বলতে হ'ল না, স্টেজের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁট বৃষ্টি। স্টেজ একদিকে কাত হয়ে পড়ল, কারণ কারা সব বাঁশ খুলে নিতে আরম্ভ করেছে। অভিনেতারা যে যেদিকে পারল পালাল। কেবল দশানন আর রাম ছাড়া।

দশানন একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। একটার পর একটা ঢেঁকুর উঠছে। ঢেঁকুরের সঙ্গে ওলের গন্ধ। বোঝা গেল ওল বেটে বড়ি তৈরি করা হয়েছে। তাতেই রাবণের গলার দফা রফা।

রামের সিদ্ধির নেশা কেটে গেছে। হাতে ধনুকবাণ নেই, আধলা ইঁট।

একজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে রাবণবধ নয়, রঘুনাথ বধ হবে।
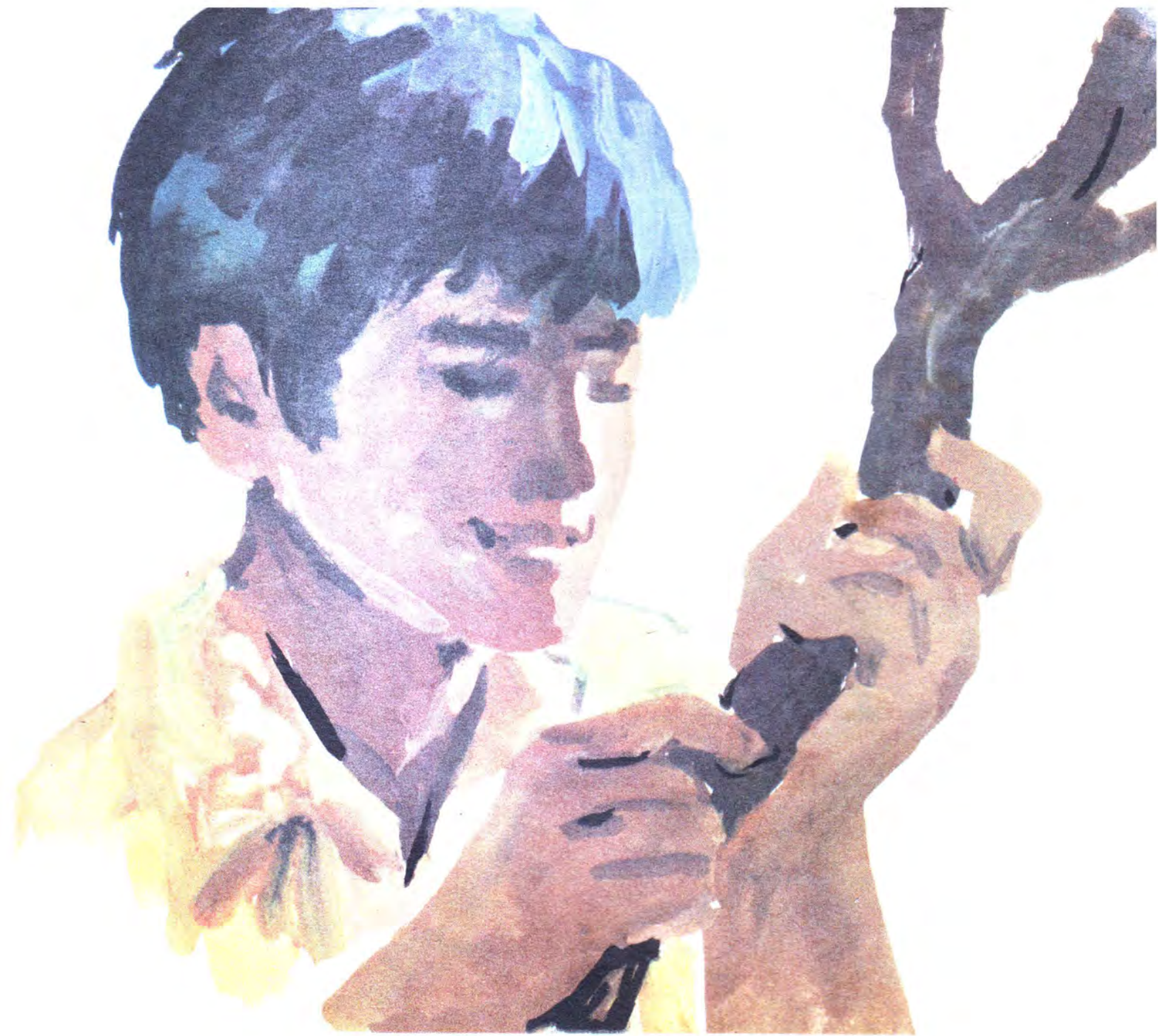
জ্যান্ত খেলনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বারান্দায় বসে গল্প করছিল সবাই, এমন সময় দীপু ছুটতে ছুটতে সেখানে এলো। তার হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল। দীপুর মুখ চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। যেন সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে একটা নতুন কিছু।

শুকনো ডালটা উঁচু করে তুলে সে চেঁচিয়ে বললো, মা, দেখো, কি সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি।

বড়রা গল্প থামিয়ে তাকালো দীপুর দিকে। তার হাতে শুধুই একটা শুকনো গাছের ডাল। সুন্দর কিছু না।

মা বললেন, দীপু, তুই আবার

একলা একলা বাগানে গিয়েছিলি?

বাবা বললেন, সেই জন্যই অনেকক্ষণ দীপুকে দেখতে পাইনি!

বাড়ির পেছনেই বেশ বড় বাগান। বাগান মানে অবশ্য শুধু ফুল গাছের বাগান নয়। বড় বড় আম গাছ আর নারকোল গাছে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। আরও অনেক রকম গাছ আছে। কেউ যত্ন করে না। আগাছা জন্মে গেছে মাটিতে। বাগানের মধ্যে একটা পুকুরও আছে, সেটাও কচুরি পানায় ভর্তি।

দীপুর বড় মামাদের এই গ্রামের বাড়িতে এখন আর বিশেষ কেউ থাকে না। এবার দীপুরা সবাই বেড়াতে এসেছে।

বড়মামা বললেন, ও বাগানে খেলুক না। ভয় তো কিছু নেই।

মা বললেন, যদি সাপ টাপ থাকে!

বড় মামা বললেন, তোর কি বুদ্ধি! শীতকালে বুঝি সাপ বেরোয়?

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন, তা হোক। এই দুপুর বেলা বাগানে একলা একলা থাকা ভালো নয়। একটা পুকুর আছে, যদি পড়ে টড়ে যায়।

দীপু তাড়াতাড়ি বললো, না, আমি পুকুরের কাছে যাইনি।

বাবার বন্ধু অমলকাকু এক পাশে বসে চুরুট টানছিলেন। তিনি বললেন, দীপু, তুমি কি সুন্দর জিনিস এনেছো?

দীপু গাছের ডালটা এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন অমলকাকু, এটা খুব সুন্দর না? আমি আগে আর এরকম একটাও পাইনি!

বাবা বললেন, এটার মধ্যে আবার সুন্দর কি আছে?

একটা এক হাত প্রায় লম্বা আম গাছের ডাল। ওপরের দিকে কয়েকটা শুকনো পাতা তখনো আছে, মাঝখান দিয়ে আবার দু'দিকে দুটো শুকনো ডাল বেরিয়েছে।

দীপু বললো, দেখুন, দেখুন, এটা ঠিক মানুষের মতন দেখতে না?

অমলকাকু বললেন, তাই নাকি?

দীপু জোর দিয়ে বললো, দেখতে পাচ্ছেন না? অবিকল ছোট মামার মতন!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো এক সঙ্গে। শুধু দীপুর ছোট মামা হাসতে পারলেন না! ছোট মামার চেহারাটা রোগা আর লম্বা, মাঝে মাঝে ওপরের দিকে হাত তুলে আড়-মোড়া ভাঙেন। তাঁর চেহারা সম্পর্কে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যান।

অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, ঠিকই বলেছে কিন্তু! এ ছেলে দেখছি বড় হলে নির্ঘাৎ আর্টিস্ট হবে!

মা বললেন, আর্টিস্ট হবে না ছাই! এই এক অদ্ভুত খেলা আছে ছেলেটার!

অমলকাকু ছোট মামাকে আরও রাগাবার জন্য বললেন, কিন্তু যাই বলো তোমরা, আমি কিন্তু খুব মিল দেখতে পাচ্ছি।

ছোট মামা মনের ভুলে ঠিক সেই সময়েই আড়মোড়া ভাঙার জন্য হাত দুটো উঁচু করলেন। সবাই হেসে উঠলো আবার!

দীপু বললো, মা, আমি কিন্তু এটা নিয়ে যাবো বাড়িতে!

আর কিছু না বলে দীপু লাফাতে লাফাতে চলে গেল তার ঘরের দিকে।

মা বললেন, ছেলেটা যত রাজ্যের জঞ্জাল এনে জমাচ্ছে ঘরে। এই সব নাকি আবার নিয়ে যেতে হবে!

বাবা বললেন, কালকে একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে এনে বলেছিল সেটাকে নাকি দেখতে একেবারে জগন্নাথের মতন।

অমলকাকু বললেন, ভুল তো বলেনি তাহলে। দারু ভূতো মুরারি।

মা বললেন, কেন, সেই যে আর একটা কঞ্চি এনে একবার বলেছিল সেটা ওর ঠাকুমা!

এই সব গল্প করতে করতে বড়রা আবার বড়দের গল্পে ফিরে গেলেন।

আর কোনো ছোট ছেলে মেয়ে নেই বলে এখানে দীপুকে খেলা করতে হয় একলা একলা। মা বারণ করলেও সে টুক টুক করে লুকিয়ে চলে যায় বাগানে। সে যে পুকুরটার কাছে নেমে একবার জলে পা দিয়ে এসেছে, মা সে কথাও জানেন না।

বাগানটা খুব ঠান্ডা। এত সব বড় বড় গাছ. তাদের ডালে পাতায় হাওয়ায় লেগে লেগে কত রকম সব মিষ্টি মিষ্টি শব্দ হয়। দীপুর মনে হয়, গাছগুলো সব যেন বেশ মানুষ, সবাই তাকে দেখছে। পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে কি যেন কথা বলতে চাইছে তার সঙ্গে। অনেক রকম পাখিও আছে এখানে। পাখিদের সঙ্গে গাছদের খুব ভাব, কক্ষনো ওরা ঝগড়া করে না। পাখিগুলো সব সময় ব্যস্ত। হয় ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে কিংবা বসে বসে ডাকছে। একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরে কুং কুং কুং করে ডাকে, সেটাকে কিছুতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে বড় আম গাছটার নীচে দুটো ছোট্ট গাছ। দীপুরই সমান লম্বা। দীপু ওদের নাম দিয়েছে অরিজিৎ আর সুমন্ত। ঐ নামে দীপুর ইস্কুলের দু'জন বন্ধু আছে। গাছ দুটোকে দীপু ঐ নাম দিয়ে দীপু ওদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে খেলা করে।

দীপু বলে, জানিস ভাই, আমি টিনটিনের বইগুলো আনতে ভুলে গেছি। তোরা কি টিনটিনের নতুন বই পেয়েছিস? আমাকে দিবি তো?

গাছগুলো হাওয়ায় দোলে। ঠিক যেন মাথা নাড়াচ্ছে।

দীপু আবার বলে, কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর শুনলুম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে বাইরে। আমি মাকে ডাকিনি, বাবাকেও ডাকিনি। ভাবলুম কি. নিজেই একলা একলা বাইরে গিয়ে দেখবো। একটুও ভয় পাইনি, সত্যি! যেই খাট থেকে নেমেছি, অমনি শব্দটা থেমে গেল। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, একটা বেড়াল! আমাকে দেখেই পালালো। ওটা কিন্তু আসলে বেড়াল নয়। নিশ্চয়ই মিশমিদের সর্দার এসেছিল, সেই যে যে ইচ্ছে করলেই অন্যরকম চেহারা নিতে পারে—আমাকে দেখেই বেড়াল হয়ে গেল, বুঝলি?

এই রকম গল্প করতে করতেই দীপুর সময় কেটে যায়। মাঝে মাঝে দু' একটা প্রজাপতি এসে বসে সেই ছোট গাছ দুটোতে। তখন দীপু কথা থামিয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে। একটা প্রজাপতির নাম সে দিয়েছে বুবাই। ওটা তার মাসতুতো বোনের নাম।

একবার দীপু দেখলো অরিজিৎ নামের গাছটার গা বেয়ে বেয়ে একটা শুঁয়োপোকা উঠছে। দীপু খুব রেগে গেল সেটা দেখে। সে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুমি আমার বন্ধুর গায়ে উঠছো কেন? শিগগির নামো!

শুঁয়োপোকাটা এমন পাজি যে কোনো কথাই শোনে না।

দীপু তখন একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। শুঁয়োপোকাটার নাম দেয় সে কুম্ভ-কর্ণ, তারপর অনেকক্ষণ ধরে সেটার সঙ্গে লড়াই করে। সেটাকে হারিয়ে দিয়ে দীপু আবার বাড়িতে ফিরে আসে মাকে খবরটা জানাবার জন্য।

দীপুর মামাবাড়ির গ্রামের খুব কাছেই বক্রেশ্বর। সেখানে গরম জলের ফোয়ারা আছে। পরের দিন সবাই সেখানে বেড়াতে যাবে। দীপু যেতে চায় না। তার বেশী ভালো লাগে ঐ বাগানে খেলা করতে। কিন্তু দীপুকে একা রেখে যেতে মা রাজি হলেন না। দীপুকে যেতেই হলো। গিয়ে অবশ্য

একটা লাভ হলো। সেখানে দীপু একটা পাথরের টুকরো পেয়ে গেল, সেটাকে দেখতে একদম সুতপা মাসীর মতন। ঠিক সেই রকম হাসি হাসি মুখ। পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে এলো দীপু।

সাতদিন কেটে যাবার পর, এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। বাবার আপিসের আর ছুটি নেই। ফেরা হবে বড়মামার গাড়িতে। মালপত্তরে একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে গাড়ি। সবাই এক বস্তা করে নারকোল নিয়েছে। তার ওপরে আবার ঝুড়ি ঝুড়ি পাটালি গুড়। এর ওপর আছে আবার দীপুর নিজের জিনিস। সাতটা গাছের ডাল, তিনটে কঞ্চি আর চারখানা পাথরের টুকরো। বড়দের সব জিনিস পত্তর ঠিক ঠিক তোলা হলো, শুধু দীপুর জিনিসগুলো নেবার বেলাতেই গাড়িতে জায়গা কম পড়ে যায়।

বাবা বললেন, এই সব আজে বাজে জিনিসগুলো নিয়ে কি করবি! ওগুলো ফেলে দে!

দীপু কিছুতেই রাজি নয়। এগুলো তার খেলার জিনিস, সে কিছুতেই ফেলে যাবে না।

দীপু প্রায় কেঁদে ফেলছে দেখে মা বললেন, যাক্ গে, নিতে চাইছে যখন নিয়ে যাক!

গাছের ডালগুলো রাখা হলো গাড়ির মাথায় ক্যারিয়ারে, বিছানা পত্তরের পাশে। পাথরগুলো দীপু নিজের পায়ের কাছে রাখলো।

দীপুর ছোটমামা শুধু থেকে গেলেন, তিনি আর ক'দিন পরে একা ফিরবেন। আর সবাই উঠে পড়লো গাড়িতে। অমলকাকু বসেছেন দীপুর ঠিক পাশেই। পাথরগুলোতে পা লাগায় অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, এই পাথরগুলো নিয়ে গিয়ে কি হবে দীপু? এরকম পাথর তো সব জায়গাতেই পাওয়া যায়!

দীপু বললো, না, মোটেই না। এই দেখুন না, এই পাথরটাকে দেখতে ঠিক ক্যাপটেন হ্যাডকের মতন।

অমলকাকু জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাপটেন হ্যাডক কে?

দীপু বললো, সে আছে একজন আমার গল্পের বইতে।

অমলকাকু আর একটা পাথর তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর এইটা?

—এটা তো সুতপা মাসী!

—তাই নাকি? তা হলে ওটা?

দীপু মুচকি হেসে বললো, অমলকাকু আপনার মতন দেখতেও একটা পাথর পেয়েছি!

অমলকাকু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, তাই নাকি? কই দেখি দেখি!

দীপু একটা বিশ্রী দেখতে পাথর তুলে দিল। অমলকাকু হাসতে হাসতে বললেন, আরে, তাই তো, এটা তো ঠিক আমার মতন অবিকল দেখতে!

সবাই দারুণ হাসতে লাগলো। বড়মামা গাড়ি চালাতে চালাতে এমন হাসতে লাগলেন যে আর একটু হলে গাড়িটা রাস্তার পাশে গড়িয়ে যেত। কেউই কিন্তু পাথরটার সঙ্গে অমলকাকুর মুখের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না!

বাবা বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল! কি যে ওর খেলা!

অমলকাকু বললেন, না, না, পাগল কেন হবে? আর্টিস্টস এরকম অনেক কিছু দেখতে পায়, আমরা সাধারণ লোকরা তা পাই না!

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর অমলকাকুর চা খেতে ইচ্ছে হলো। গাড়ি থামানো হলো সেইজন্য। চায়ের দোকানের কাছে সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। অন্যদের হাতে চায়ের কাপ, দীপু নিয়েছে বোতলের সরবৎ।

সেখানে একজন মেয়ে কতকগুলো বড় বড় রং করা বেতের ঝুড়ি বিক্রি করছিল। অমনি মায়ের একটা পছন্দ হয়ে গেল। যে-কোনো জায়গা থেকে জিনিস কেনা মায়ের স্বভাব।

কিন্তু অতবড় ঝুড়িটা নেওয়া হবে কোথায়? গাড়ির মাথাতেই বেঁধে নিতে হবে। বাবা আর অমলকাকু সেটা বাঁধাবাঁধি করছেন, হঠাৎ দীপু চিৎকার করে ছুটে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো একি, কি করলে? ছোটমামার হাতটা যে ভেঙে গেল!

সবাই অবাক হয়ে থমকে গেল। চায়ের দোকানের লোকগুলো পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়েছে।

তারপরই বোঝা গেল ব্যাপারটা। ঝুড়িটা রাখতে গিয়ে ঠেলাঠেলিতে দীপুর একটা গাছের ডাল খানিকটা ভেঙে গেছে!

বাবা আর অমলকাকু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসছিলেন, কিন্তু দীপু কাঁদতে লাগলো। কেন তার খেলনা ভেঙে দেওয়া হলো! অমলকাকু বললেন ঠিক আছে, রাস্তায় যেতে যেতে আর একটা ডাল কুড়িয়ে নিলেই তো হবে। কিন্তু দীপু সে কথা শোনে না। সে তো যে-কোনো গাছের ডাল নেয় না। এই ডালটা ঠিক ছোটমামার মতন ছিল, এটার কেন হাত ভাঙলো, ঠিক এই রকম একটা তার

আবার চাই।

বাবা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বড্ড বিরক্ত করছো। ঐ রকম করলে সব কটা ফেলে দেবো। যাও, চুপ করে গাড়িতে বসে থাকো!

দীপু গাড়িতে গিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইলো। সারাটা রাস্তা আর কারুর সঙ্গে কথা বললো না।

কলকাতায় ফিরে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। দীপু তার খেলনাগুলো সাজিয়ে রেখেছে নিজের ঘরে। তার স্কুল খুলতে এখনো কয়েকদিন দেরি আছে। খেলনার গাছের ডাল, পাথর, রাংতা কাগজ কিংবা পাখির পালক—এই সব কিছুই যেন তার চোখে জ্যান্ত। সে প্রত্যেককে একটা কিছু নাম দিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলে। এদের মধ্যে আছে নানান চেনাশুনো আত্মীয় স্বজন, স্কুলের বন্ধু, জগন্নাথ, নেপোলিয়ান, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, অরণ্যদেব, ভীম, অর্জুন, এই সব। দীপু অনেক সময় আপন মনে এদের সঙ্গে এত জোরে জোরে কথা বলে যে পাশের ঘর থেকে মা পর্যন্ত চমকে ওঠেন।

দুপুরবেলা মা শুনতে পেলেন, দীপু বলছে, বাবা, তুমি সিগারেট খাবে? দেশলাই এনে দেবো?

দীপু যেন সত্যিই তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। মা চমকে উঠে এ ঘরে এসে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস? তোর বাবা কোথায়? অফিস থেকে ফিরেছে নাকি?

দীপু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ তো বাবা!

মা দেখলেন, একটা পুরোনো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের জালের ফাঁকে কাগজ পাকিয়ে সিগারেটের মতন আটকে রেখেছে দীপু। সেইটাকেই বাবা বলছে।

মা আজ আর রাগ করলেন না। হাসলেন। তারপর বললেন, তোকে নিয়ে আর পারি না! আচ্ছা, তোর আর কোন্ কোন্ খেলনা কার মতন দেখতে, শুনি তো!

দীপু পর পর সব কটা শুনিয়ে গেল। এমনকি সেই ভাঙা ডালটাও সে এখনো ফেলেনি। মা সবচেয়ে বেশী হাসলেন একটা কালো পাথরের নাম সুতপা মাসী শুনে। সুতপা মাসীর গায়ের রং দারুণ ফর্সা।

তারপর মা জিজ্ঞেস করলেন, আমার মতন দেখতে কোনটা রে? আমি কোনটা?

দীপু মাকে জড়িয়ে ধরে বললো,

তোমার মতন দেখতে একটাও পাই না মা। কত খুঁজেছি, তবুও পাই না।

সেদিন বিকেলবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরে গম্ভীরভাবে মাকে বললেন, তোমার দাদা ফোন করেছিলেন, একটা খারাপ খবর আছে।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? কি হয়েছে?

বাবা বললেন, অনন্তপুর থেকে খবর এসেছে, কেষ্টর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

অনন্তপুর গ্রামেই দীপুরা বেড়াতে গিয়েছিল। আর কেষ্ট হচ্ছে ছোটমামার ডাক নাম। তিনি ঐ গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন।

মা চোখ মুখে ভয় ফুটিয়ে বললেন, কি হয়েছে কেষ্টর?

বাবা বললেন, কেষ্ট গাছ থেকে পড়ে গেছে। ঐ রোগা চেহারা নিয়ে কেষ্ট জোর করে একটা নারকোল গাছে উঠেছিল। নারকোলগাছে কি আর যে সে উঠতে পারে। অনেক উঁচু থেকে পরে গেছে শুনলাম।

—কোথায় লেগেছে?

—খুব জোর বেঁচে গেছে। মাথায় কিছু হয়নি। কিন্তু একটা হাতে খুব জোর চোট লেগেছে। কালকেই নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।

তারপর এই নিয়ে অনেক কথা হলো। মা সারা সন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন তাঁর ভাই সম্পর্কে। শুধু চিন্তা নয়, তাঁর মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইলো। কি রকম যেন একটা অস্বস্তি।

মা এসে একবার দীপুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দীপু তখনও একমনে কথা বলে যাচ্ছে তার খেলনাদের সঙ্গে। সে তখন কর্ণ সেজে যুদ্ধ করছে অর্জুনের সঙ্গে। মা দূরে থেকে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ দেখলেন। কিছু একটা বলি বলি করেও বললেন না। একবার তাকালেন সেই ভাঙা ডালটার দিকে। তাঁর ভুরু কুঁচকে রইলো অনেকক্ষণ।

এর তিনদিন বাদে, দীপু স্নান করছে দুপুরবেলা, মা রান্না ঘরে, বাড়ির ঝি সব ঘর দোর মুছচে, এমন সময় দীপুর পড়ার ঘর থেকে দড়াম করে একটা শব্দ হলো।

বাথরুম থেকেই সেই শব্দ শুনতে পেয়ে দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, কি হলো? কি ভাঙলো?

কোনো উত্তর না পেয়ে দীপু ভিজে গায়েই ছুটে এলো নিজের ঘরে। এসে দেখলো, বাড়ির ঝি দু' টুকরো ভাঙা পাথর হাতে নিয়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে আছে।

দীপু চিৎকার করে বললো, রাধামাসী, তুমি আমার খেলনা ভেঙে ফেললে?

রাধামাসী বললো, কি জানি বাবা! মা বললেন ঘরটা মুছে দিতে। এই পাথরটা মেঝে থেকে টেবিলের ওপর তুলে রাখতে যাচ্ছিলাম, আপনি আপনি কি রকম পড়ে ভেঙে গেল!

দীপু কান্না মেশানো অভিযোগের সঙ্গে বললো, আপনি আপনি আবার কিছু পড়ে যায় নাকি!

মা রান্নাঘর থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

দীপু বললো, দ্যাখো না মা! ঠাকুমাকে দু' টুকরো করে দিয়েছে!

মা একটু কেঁপে উঠলেন। তারপর বললেন, এসব আবার কি অলুক্ষণে কথা! চুপ কর্।

দীপু তবু বললো, তোমরা কেন আমার সব খেলনা ভেঙে দেবে!

মা হঠাৎ রাধামাসীকে খুব বকতে লাগলেন। একটু দেখে শুনে কাজ করতে পারো না? সব সময়ই তো এটা ভাঙছো, সেটা ভাঙছো।

রাধামাসী গজগজ করে উঠে বললো, একটা সামান্য পাথর, তাও আপনা আপনি পড়ে গেল টেবিল থেকে—তাতেও আমার দোষ বলো!

সেইদিনই সন্ধেবেলা এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাম এলো। দীপুর ঠাকুমা হঠাৎ মারা গেছেন।

এলাহাবাদে দীপুর জ্যাঠামশাইরা থাকেন। ঠাকুমাও কয়েকমাস আগে সেখানে গিয়েছিলেন।

টেলিগ্রামটা পেয়ে বাবা ধপ করে বসে পড়লেন। কান্না কান্না গলায়

বললেন, সামনের সপ্তাহেই মাকে নিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলো না!

এই সময় মা এত জোরে কেঁদে উঠলেন যে বাবা পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তারপর বাবা উঠে এসে মায়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি অত ভেঙে পড়ো না। আমার বাক্স গুছিয়ে দাও। আমি আজই রাত্রের ট্রেনে এলাহাবাদ রওনা হবো!

মা বাবার হাত চেপে ধরে বললেন, আমার ভয় করছে! আমার ভীষণ ভয় করছে!

বাবা বললেন, ভয় কি! কয়েকটা দিন তুমি একা থাকতে পারবে না?

মা বললেন, সে জন্য না! তোমার মনে আছে, দীপুর খেলনা সেই গাছের ডালটা যখন ভেঙেছিল, তখন দীপু কি বলেছিল?

—কি বলেছিল?

—তোমার মনে নেই? দীপু বলেছিল, ছোটমামার হাত ভেঙে গেল যে! তারপর সত্যি সত্যি কেষ্টর হাত ভাঙলো। তারপর আজই দুপুরে, ও যে খেলনাটাকে ঠাকুমা বলে সেটাকে ঝি ভেঙে দিয়েছে!

বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু' এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, যাঃ, এসব কি বলছো! এ আবার হয় নাকি!

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, সত্যি যে মিলে যাচ্ছে!

বাবা বললেন, মিললেই বা কি হয়েছে! একে বলে কাকতালীয়। এই থেকেই মানুষের কুসংস্কার জন্মায়।

বাবা চলে গেলেন এলাহাবাদ। এই ক' দিন মা দীপুকে সব সময় চোখে চোখে রাখলেন। তাকে আর বেশী খেলতে দেন না। সব সময় নিজের কাছে এনে জোর করে পড়তে বসান।

বাবা এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন ক' দিন বাদেই। মাথা ন্যাড়া করেছেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন আরও কয়েকদিন। দুপুরবেলা বাড়িতেই থাকেন। দীপুর ইস্কুল খুলে গেছে।

বাবা ঠাকুমার একটা ছবি বাঁধিয়ে এনেছেন সেদিন সকালে। ছবিটা তাঁর শোওয়ার ঘরের দেয়ালে টাঙাবেন। পেরেক ঠোকার জন্য একটা শক্ত কিছু দরকার। বাড়িতে হাতুড়ি টাতুড়ি নেই। বাবা এ ঘর সে ঘর খুঁজতে খুঁজতে দীপুর পড়ার ঘর থেকে একটা বড় পাথর পেয়ে গেলেন। এটাতেই কাজ চলবে।

বাবা পেরেকটা ঠুকছেন, এমন সময় মা দৌড়ে এসে বললেন, একি, তুমি একি করছো! ওটা রেখে দাও!

বাবা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি হয়েছে?

—তুমি দীপুর খেলনা নিয়েছো!

—তাতে কি হয়েছে? পাথর দিয়ে পেরেক ঠুকতে পারবো না।

—ও খুব ভালোবাসে খেলনাগুলো। এটাকে যে ও অমলকাকু বলে!

পেরেকটা তখন ঠোকা হয়ে গেছে। বাবা বললেন, ঠিক আছে, আমি রেখে দিচ্ছি। আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিলেই তো হলো। পাথরতো আর ক্ষয়ে যায়নি!

মা বাবার হাত থেকে পাথরটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, এই দ্যাখো, মাঝখানটা কি রকম খুবলে গেছে!

বাবা বললেন, মাঝখানটায় একটা চলটা উঠে গেছে শুধু। ও দীপু কিছু বুঝতে পারবে না। যাও, পাথরটা রেখে এসো।

মা তবু সেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অনেকদিন অমলের কোনো খবর নেই। এ বাড়িতেও আসে নি।

বাবা বললেন, হুঁ, বেশ কিছুদিন অমলের পাত্তা নেই বটে। আমিও এলাহাবাদে ছিলাম। এসেও খোঁজ নেওয়া হয়নি!

মা বললেন, তুমি এক্ষুনি ফোন করো!

মায়ের গলার আওয়াজটা এমনই অন্যরকম যে বাবা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফোন তুললেন।

—হ্যালো, অমল?

—কে, প্রশান্ত? কি খবর?

—তোর খবর কি? অনেকদিন পাত্তা নেই।

—ক' দিন খুব সর্দি কাশী আর জ্বরে ভুগছিলাম।

—এখন ভালো আছিস?

অমলকাকু সব কথাতেই হাসেন। এবারেও হাসতে হাসতে বললেন, আজ এক্স রে রিপোর্ট পেলাম। বুকটা একটু জখম হয়েছে ভাই। ডাক্তার বলছে, আমার প্লুরিসি হয়েছে।

মা আর বাবা দু' জনেই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ!

টেলিফোন রেখে দিয়েই বাবা একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অমলকাকু তাঁর খুবই প্রিয় বন্ধু। মা তখনও সেই বুকের কাছে চলটা-ওঠা পাথরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

বাবা বললেন, তোমার ছেলের এই সাংঘাতিক খেলা বন্ধ করতেই হবে!

মা বললেন, দীপুর দোষ কি! আমরাই তো ওর খেলনাগুলো ভেঙে দি কিংবা নষ্ট করি।

বাবা বললেন, তা বলে জ্যান্ত মানুষের নাম নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা। একটার পর একটা বিপদ ঘটে যাচ্ছে!

বাবা রেগে গেলে আর কারুর কথা শোনেন না। দীপুর ঘরে ঢুকে তিনি সব পাথরের টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন পেছনের মাঠে। গাছের ডাল, কঞ্চি, ভাঙা ব্যাড-মিন্টনের র‍্যাকেট এগুলোও ফেলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মত বদলে বললেন, এগুলো সব আমি আগুনে পুড়িয়ে দেবো!

দীপু তখন ইস্কুলে। তার সব খেলনা শেষ হয়ে যেতে লাগলো। বাবা তার সব গাছের ডাল আর কঞ্চিগুলো গুঁজে দিতে লাগলেন রান্না ঘরে জ্বলন্ত কয়লার উনুনে।

ভাঙা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটাও যখন উনুনে দিতে যাচ্ছেন, তখন মা তাঁর হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, ওটা দিও না, ওটা থাক, ওটা দিও না!

বাবা সেকথা শুনলেন না। জোর করে, র‍্যাকেটটা ভরে দিলেন উনুনে। তখুনি উনুন থেকে একটা আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠলো। আগুনের জিভ ছুঁয়ে দিল বাবার পাঞ্জাবীর হাতা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কোনো-ক্রমে তিনি উনুন থেকে টেনে তুললেন র‍্যাকেটটা।

আগুন বেশী ছড়ায় নি। বাবার হাতটা একটু শুধু ঝলসে গিয়েছিল, বেশী কিছু হয়নি, মলম লাগাতেই সেরে গেছে।

বাবা দীপুর জন্য অনেকগুলো পুতুল ও মূর্তি কিনে দিয়েছেন। যেমন, বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ান, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, সৈন্য, নাবিক, শিকারী, রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী এইসব—অর্থাৎ যাঁরা কেউ এখন বেঁচে নেই।

সুলেখার অ্যাবোল তাবোল ছড়া
চানক্য পন্ডিতের নামটি সবাই জান
হিসেবে তিনি পাকা
রাখতেন তিনি হিসেব ধরে
থাকতো যদি সুলেখা ॥
সুলেখা যদি থাকতো
রাজা অশোক তখন কি আর
কাহিনীগুলি খোদাই করে রাখতো ?
হাতে লিখেই রাখতেন তিনি,
ভবিষ্যতের জন্য
সকল লোকই পড়তো লিপি
বলতো সবাই ধন্য ॥
মোহাম্মদ বিন তুঘলোক
রাজধানী নিয়ে যতই না সে মাতুক—
বলতে পারি হলপ করে,
সুলেখা কালি থাকলে ঘরে,
রচনা করতেন গজল কিম্বা রুবাইতের
শোলক ॥
মুরাদ ছিল আরঙ্গজেবের ভাই
নেশা নিয়ে যতই করুক বড়াই
সে যদি তখন সুলেখার কথা জানতো
সব ছেড়ে তার মনটি হতো শান্ত
নেশার বালাই থাকতো নাকো আর
রাজত্ব নিয়ে করতেন কারবার ॥
আজতো আছে সেই সুলেখা
ভাল হউক সবার লেখা ॥
WITH SOLVENT
Sulekha
সুলেখা
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

iam-13/74

নাগেশ্বরোয়া

বুদ্ধদেব গুহ

যখনকার কথা বলছি তখন আমি মারুমায়ের বাংলোয় ছিলাম।

এই মারুমায়ের বাংলোটি আমার দারুণ লাগে। সামনেই মাথা-উঁচু মুচুক্‌বাণীর পাহাড়। চতুর্দিকে গভীর নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গল। একপাশে গাড়ু। অন্য পাশে কোয়েল নদী পেরিয়ে কুট্‌ক। গাড়ুর পাশ দিয়েও কোয়েল গেছে। সেখানে পাকা ব্রিজ আছে, কিন্তু কুট্‌কুর কোয়েল ব্রিজ নেই। যখন জল থাকে শীতকালে, তখন বাঁশের চাটাই-এর উপর দিয়ে জীপ ও ট্রাক পেরোয়। গরমের দিনে বালির উপর দিয়েই স্পেশ্যাল গীয়ার চাপিয়ে চলে যায়।

বিকেলে রোদ পড়ে গেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোদের তেজ কমলেও

সমস্ত রুক্ষ বনপাহাড় থেকে এক তীব্র উষ্ণ ঝাঁঝ বেরোচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি ডাকছিল একসঙ্গে। এ ঝিঁঝিগুলো অবাক করে। ভরদুপুরে যখন তাপাঙ্ক একশো পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে থাকে তখনও ওরা কোন্ আনন্দে যে ঝিন্‌ঝিন্ করে তা ওরাই জানে।

একদল শম্বর দৌড়ে রাস্তা পার হলো সামনে দিয়ে। একটা বড় শিঙাল আর চারটে মাদী শম্বর।

সামনেই পথটা একটা বাঁক নিয়েছে। তারপরে মীরচাইয়া ঝর্ণা। এই মীর-চাইয়া বড় সুন্দর জায়গা। বর্ষায় ও শীতে এর রূপ অন্যরকম। যদিও এখন গ্রীষ্মে এক ফোঁটাও জল নেই।

মীরচাইয়া ঝর্ণার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এমন সময় একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এলো।

প্রথমে ভেবেছিলাম, উধাও হাওয়াটাই বুঝি পাহাড়ের কোনো গুহায় ধাক্কা খেয়ে অমন গোঙানি তুলছে। কিন্তু বাঁকটা নিতেই দেখি মীরচাইয়া ফল্‌স্-এর কালো পাথুরে বুকে সাদা ধুতি পরা একজন লোক শুয়ে আছে। ঐ গরমে পাথরের উপর খালি পায়েই হাঁটা যায় না, অথচ লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে হাত দুটো সামনে মেলে দিয়ে। ডান পা-টা বুকের কাছে গোটানো।

লোকটা আমাকে দেখতে পায়নি। উপুড় হয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে কান্না-মেশা গোঙানি তুলছে।

আশ্চর্য হলাম। তারপর পায়ে পায়ে ওদিকে এগিয়ে গিয়ে সাবধানে মীর-চাইয়ার পাথর বেয়ে উঠতে লাগলাম। যখন ওর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তখন ও অনেক কষ্টে মাথাটা আমার দিকে ঘোরালো।

আঁৎকে উঠলাম। রক্তে লোকটার সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ঝর্ণার পাথর বেয়ে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, ও কাঁদতে কাঁদতে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। তারপর গোঙাতে গোঙাতে বলল, লাট্টু সিং, সাহাব, লাট্টু সিং।

বলেই, মুখ থুবড়ে পড়ল আবার।

এ তবে লাট্টু সিং-এর শিকার। এই লাট্টু সিং লুটেরার নাম শুনছি এখানে এসে অবধি। তার অত্যাচারে এখানের সব লোক তটস্থ, আতঙ্কগ্রস্ত।

ওকে তুলে নিয়ে, কাঁধের উপরে ফেলে আস্তে আস্তে পাথর বেয়ে ঝর্ণটার নীচে নেমে এলাম। একটা বড় গাছের নীচে নামিয়ে রেখে ঐখানেই ওকে থাকতে বলে, বাংলোর দিকে দৌড়ে চললাম যত জোরে পারি।

বাংলোয় পেঁছেই, ওয়াটার বট্‌লে জল ভরে নিয়ে আর রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আমি জীপ স্টার্ট করে জোরে চালিয়ে মীরচাইয়া ফল্‌সে ফিরে এলাম।

লোকটাকে ভালো করে জল খাইয়ে ধরে ধরে নিয়ে এলাম জীপ অবধি। তারপর ওকে পিছনের সীটে শুইয়ে দিয়ে, খুব জোরে জীপ ছোটালাম গাড়ুর দিকে।

গোঙানির মধ্যে যা বলেছিল, তাতে বুঝেছিলাম যে ও থাকে গাড়ু বস্তিতে। লুটেরা লাট্টু সিং তার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, তার চার বছরের ছেলেকে দুপা ধরে ছুঁড়ে ফেলেছে নীচের পাথরভরা খাদে, ওর ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর ওকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে রেখে গেছে শকুনে খাওয়ার জন্যে।

কেন লুটেরা লাট্টু সিং এসব করেছে তা ও বলতে পারল না। ওর তখন বলার মতন অবস্থা ছিলো না। জীপটা কিছুদূর যেতে না যেতেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ওর কি নাম তাও শুধোনো হলো না।

গাড়ুর ফরেস্ট রেঞ্জার আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমি সোজা জীপ নিয়ে তাঁর বাংলোয় এসে পেঁছলাম।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। উনি উক্যালিপট্যাসের গাছের ছায়ায় ইজি-চেয়ার পেতে বসে খস্‌স্-এর গন্ধ দেওয়া লাল-রঙা রুহ্-আফ্‌জা সরবৎ খাচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই উনি উঠে দাঁড়ালেন। লোকটিকে দেখে উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, আরে বুধাই, ক্যা হো গয়া তেরা?

কোনো উত্তরই পাওয়া গেলো না বুধাইর কাছ থেকে। তখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছে।

যতটুকু শুনেছিলাম ওর কাছ থেকে তাই-ই বললাম রেঞ্জার সাহেবকে। উনি তক্ষুনি থানার বড়বাবুকে খবর পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিলেন বুধাইকে ডালটনগঞ্জ নিয়ে যাবার জন্যে। এখানে কোনো হাস-পাতাল নেই। বুধাইর যা-অবস্থা তাতে ওকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডালটনগঞ্জ অবধি অতখানি দূরত্ব এই পাহাড়ি পথে যেতে অনেক সময় লাগবে, অথচ এখানে কিছুই করার নেই। এতখানি পথ যাওয়ার ধকল ও আদৌ সইতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হলো।

দেখতে দেখতে থানার বড়বাবু এসে গেলেন। বড়বাবুকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। উনি বললেন, আজহি ইস্‌কা ফ্যায়সালা করুংগা। নেহীতো ই ইলাকামে সরীফ্ আদ্‌মীকো জীনাহি মুশ্‌কিল হ্যায়।

বড়বাবু বললেন, এর আগে লুটেরা লাট্টু সিং পাঁচজন লোক খুন করেছে, এই গাড়ু-মারুমার-কুট্‌কু অঞ্চলে ও এক ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। তিন-তিনবার পুলিশ ফোর্স নিয়ে গিয়েও কিছু করা যায়নি ওকে। ও যে-পাহাড়ে ডেরা বানিয়েছে, সেখানে পাহারা বসানো থাকে। তার উপর এখনতো গরমের দিন। জঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে এক-দম। এখন একমাইল দূরে থেকে ও দেখতে পাবে যে যাবে তাকে। দেখতে পেলেই গুলি চালাবে গাদা বন্দুক দিয়ে। ওদের কাছে আট-দশটা বন্দুক আছে। হয়তো রাইফেলও আছে, কে জানে?

রেঞ্জার সাহেব তক্ষুণি তাঁর জীপে, দুজন ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে বুধাইকে নিয়ে ডালটনগঞ্জ রওয়ানা হয়ে গেলেন সময় নষ্ট না করে।

বড়বাবু আমাকে নিয়ে থানায় এলেন। এসেই কনস্টেবলকে বললেন, খাঁরওয়ার নাগেশ্বরোয়াকে খবর ভেজো। তারপর আমার দিকে ফিরে আমার হাত ধরে বললেন, লাল সাব্, আপ জারা মদত দিজিয়ে হামলোঁগোকো।

বললাম, কি সাহায্য চান বলুন?

বড়বাবু আমাকে নিয়ে থানায় এলেন। বড়বাবু বললেন, হাম বুঢ্‌ঢা হো গ্যায়ে। হাম্‌সে ই কাম হোগা নেহী। আপ ঔর নাগেশ্বরোয়া দোনো মিল্‌কে ইয়ে মামলাকা ফয়সালা কিজিয়ে।

নাগেশ্বরোয়া এখানকারই ছেলে। ওর সঙ্গে আমার আলাপ বহুদিনের। এরকম ভালো শিকারি খুব কম দেখেছি। আগে ও এক নম্বর চোরা-শিকারি ছিল। বন্দুক রাইফেলে দারুণ ভালো হাত। কলকাতার সৌখীন বাবুরা এখানের জঙ্গলে পাহাড়ের বাংলোয় বসে আরাম করতেন আর নাগেশ্বরোয়া তাঁদের বন্দুক-রাইফেল দিয়ে চিতল, শম্বর, কোটরা, বাঘ, ভাল্লুক মেরে দিত। কলকাতায় গিয়ে বাবুরা তাঁদের নিজেদের শিকার বলে তা চালিয়ে দিতেন গোল-গোল-চোখে গল্প করে, তাঁদের বসার ঘরের মজলিশে।

ওর দৌরাত্মে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ও মাংস বিক্রি করে, চামড়া বিক্রি করে খেত। কেন এসব করে, একথা ওকে জিগেস্ করলেও ও হাসত, আর বলত, "দিল খুশ হো-যাতা হ্যায়।"

রেঞ্জার সাহেব আর বড়বাবু মিলে

পরামর্শ করে নাগেশ্বরোয়াকে পুলিশের চাকরীতে বহাল করেছিলেন এই সবে তিনদিন হলো। এখানকার পুলিশ ফোর্সে এরকম লোকের দরকার ছিল, যে সমস্ত জঙ্গল পাহাড়কে নিজের হাতের রেখার মতন চেনে, যে গুলি করলে গুলি ফস্‌কায় না, যে বেপরোয়া দুঃসাহসী।

খাঁরওয়ার নাগেশ্বরোয়া এসে হাজির হলো। আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছে ও। হাত দুটো ওর ইয়া-চওড়া। চওড়া চোয়াল, ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। একটা লম্বা টিকি। উপরের ঠোঁটটা চেপে বসেছে নীচের ঠোঁটের উপর। দেখলেই মনে হয় ও কম কথার লোক; কিন্তু কাজের লোক।

নাগেশ্বরোয়া সব শুনল চুপ করে। তারপর বলল, ঠিক হ্যায় বড়বাবু, ম্যায় উস্‌কো জান্‌সে মার দুংগা।

বড়বাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, ও না হয় ডাকাত। তুই তো ডাকাত নোস্‌।

তখন নাগেশ্বরোয়া বলল, ও লোককে জ্যান্ত ধরে এনে জেলে রাখার মানে নেই। জেল দিতেও পারবেন না আপনি। সাক্ষী রেখে তো ও একটাও খুন করেনি বা অন্য কিছুই করেনি।

বড়বাবু বললেন, একান্ত আত্মরক্ষার জন্যে ছাড়া কাউকে জানে মারিস না। আর দেখিস্‌ নিজের জান্‌টাও সামলাস্‌।

তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমাকে আর নাগেশ্বরোয়াকে সব কিছু বোঝালেন বড়বাবু। বললেন, দেখিয়ে লালসাব, ইস্‌ নাগেশ্বরোয়া ডাকুকোভি সামহাল্‌না।

অন্ধকার হয়ে যাবার পর আমি আর নাগেশ্বরোয়া বেরিয়ে পড়লাম গাড়ু থেকে।

ও বলল, ওদের ধোঁকা দিতে হবে। আমরা জীপ থেকে স্পটলাইট ফেলতে ফেলতে ওদের গাঁয়ের পাশের পথ ধরে ঘাটে-ঘাটে পাহাড়ে-পাহাড়ে চলে যাব। ওরা ভাববে, কোনো চোরা-শিকারির দল বুঝি শিকারে এসেছে। ওর প্রহরীরা সন্দেহই করবে না যে, আমরা এমন বুক ফুলিয়ে খোলা জীপে ওদের আস্তানার এত কাছে আসতে পারি। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের আন্‌জান্‌ আন্‌কোরা কোনো শহুরে লোক বলে ভুল করবে।

জীপ চালাতে চালাতে আমি বললাম, আগামী কাল পূর্ণিমা। এমন চাঁদনী-রাতে আমাদের পক্ষে লুকিয়ে যাওয়া অসুবিধা।

নাগেশ্বরোয়া বলল, চলুনই না। প্ল্যান-ট্যান আমি মোটামুটি ভেবে রেখেছি।

গাড়ু বস্তি ছাড়িয়ে যাবার সময় নাগেশ্বরোয়া বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়াবেন?

ব্রেক কষে দাঁড় করালাম জীপটা। নাগেশ্বরোয়া বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল।

একটু পরই, ও ফিরে এলো একটা থ্রি-ফিফ্‌টিন রাইফেল নিয়ে। ইণ্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে এ রাইফেল তৈরী হয়। খুব হালকা আর এ্যাকুরেট রাইফেলগুলো।

নাগেশ্বরোয়া বলল, মেয়েটাকেও একটু আদর করে এলাম। রাইফেলটাও নিয়ে এলাম। সার্ভিস রাইফেলগুলো এত ভারী যে বইতে বড় অসুবিধা হয়। তাছাড়া এটা আমার হাতের রাইফেল, এ রাইফেল দিয়ে আমি তিনশো গজ দূরের শম্বরের দু'চোখের মাঝে গুলি করতে পারি।

শুধোলাম, তোমার কি একই মেয়ে? কি নাম তোমার মেয়ের?

নাগেশ্বরোয়া হাসল। বলল, মুন্নী। তারপর বলল, একই মেয়ে, একই বউ। প্রথম মেয়ে, প্রথম বউ।

আমিও হাসলাম। বললাম, তোমার মেয়েকে খুব ভালোবাসো বুঝি? কত বয়স হলো।

ও বলল, বাসি। মুন্নীর আড়াই বছর।

তারপর বলল, আমার এই আড়াই বছরের মুন্নীকে যত ভালোবাসি, তত আর কাউকেই বাসিনি কখনও। এমন কি এই রাইফেলটাকেও না।

মাইল দশেক গিয়ে, একটা পাহাড়ের চুড়োয়, যেখানে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে এবং যেখান থেকে সামনে কোয়েল নদীটা চোখে পড়ে, সেখানে জীপটা জঙ্গলের পথে বাঁদিক করে রেখে, লাইট নিভিয়ে দিলাম।

নাগেশ্বরোয়া নেমে বনেট খুলে, বনেটটার নীচের ব্যাটারীর সঙ্গে স্পটলাইটের ক্ল্যাম্পটা লাগাল। মাটির দিকে মুখ করে লাইটটা একবার জ্বালিয়ে দেখল ঠিক জ্বলছে কি না। তারপর নিবিয়ে দিল।

ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় আটটা বাজে।

নাগেশ্বরোয়া বলল, এখানে আমাদের প্রায় রাত বারোটা অবধি বসে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমরা বেরোব।

চতুর্দিকের বনপাহাড় চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছিল। সামনের কোয়েলের সাদা বালির উপর দিয়ে একদল বাইসন এদিকের জঙ্গল থেকে নেমে, নদী পেরিয়ে আস্তে-আস্তে ওদিকের জঙ্গলে যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় ওদের কালো শরীরগুলো কতগুলো ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল। ওদের পায়ের সাদা লোমের মোজাগুলো চাঁদের আলোতেও দেখা যাচ্ছিল।

বাইসনদের মাথার উপরে দুটি টি-টি পাখি, টি-টির-টি, টিট্টী টিট্টী করে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। নির্জনতার মধ্যে ঐ ছোট পাখিদের গলার চিকন ডাক পাশের মাথা-উঁচু পাহাড়ে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছিল। একটা হাওয়া বইছিল চাঁদের বনে শুকনো পাতা উড়িয়ে। তার মচ্‌-মচানি শোনা যাচ্ছিল একটানা।

আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার বাঁ দিকের খাদ থেকে একটা ছোট পেঁচা ডাকছিল উড়ে উড়ে—কিঁচর্‌ কিঁচর্‌ কিঁচর্‌—উড়তে উড়তেই অন্য একটা পেঁচার সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে গেল। উড়ন্ত অবস্থায় তাদের সেই ঝগড়া আর কিঁ-চি-কিঁ-চি-কিঁচর্‌ ডাক চতুর্দিকের পাতা-ঝরা গাছে-গাছে অনুরণিত হতে লাগল।

একটা কোটরা হরিণ শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নেমে গেল আচম্‌কা আমাদের সাড়া পেয়ে। তার অপসৃয়মাণ বাদামী শরীরের পেছনে নড়ে-ওঠা লেজটুকুর সাদা রঙ চোখে পড়ল এক ঝলক। মহুয়া এখন শেষ হয়ে গেছে। তবু দূরের কোনো গ্রামের কিছু গাছে হয়তো কিছু কিছু মহুয়া এখনও ফলছে। হাওয়ায় মাঝে মাঝে মহুয়ার গন্ধ আসছে। একটা খাপু পাখি ডেকে চলেছে দূর থেকে খাপু-খাপু-খাপু-খাপু। এখন আর গরমের গ-ও নেই। আশ্চর্য! দিনের বেলা এত গরম থাকে, অথচ রাত নেমে আসার দু'তিন ঘণ্টা পরই চারদিক কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন মনেই পড়ে না যে, দিনে ঘর থেকে বাইরে বেরুতে কষ্ট হতো।

এই সুন্দর শান্ত চাঁদের আলোয় ভরা পাহাড়ে বসে বসে রেঞ্জার সাহেবের চাকরের বানানো পুরী-তরকারী খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম, আর যাই-ই হোক এ রাতটা লুটেরা লাট্টু সিং-এর জন্যে একেবারে বরবাদ্‌ হয়ে গেল। কার ইচ্ছে করে এমন রাতে খুনোখুনি করতে।

নাগেশ্বরোয়া বলল, মেরী আরজু এহি হ্যায় কি ইস্‌ মামলেমে আপ্‌ মদত মত্‌ দেনা। লাট্টু সিংকো ম্যায় একলাহি গোলিসে ভুঞ্জ দুংগা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এ্যাইসেহি মালুম হোতা কি আপ্‌সে তারিফ মিল্‌নেকো মওকা মিলা আজ।

ওকে থামিয়ে বললাম, এখনও ওসব বলো না। এখনও কেউ জানে না, আমা-দের কপালে ফওত্‌ ক্যা মওত্‌। জিতব

না মরব এখনও অজানা।

নাগেশ্বরোয়াকে শুধোলাম, লাট্টু সিং লুটেরা হয়ে গেল কেন? তুমি জানো?

নাগেশ্বরোয়া অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। কি যেন কি ভাবল একটুখন। তারপর বলল, কেন যে হলো তা ও নিজেই বলতে পারবে। আমি তো লাল সাব ওর বুকের মধ্যে ঢুকিনি। তবে প্রথম প্রথম জমি নিয়ে, নালার জল নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ হয় অন্যদের সঙ্গে। লাট্টু সিং জাতে ক্ষত্রিয়। ওর মেজাজটা বরাবরই চড়া, গায়েও বাঘের মতন জোর। ও দেখল, থানা-পুলিশ পঞ্চায়েৎ করে যা না হয়, লাঠির জোরে তাই হয়। এ বনে-পাহাড়ে জোর যার মুলুক্ তার। তাই ও প্রথম প্রথম লাঠিই চালাতে লাগল। তারপর বন্দুক। তারও পর লাঠি ও বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক অত্যাচারও চালিয়ে যেতে যেতে মস্ত বড় জমিদারীর মালিক হয়ে উঠল লাট্টু সিং লুটেরা। এখন ও পেটের খিদের জন্যে ডাকাতি করে না, ওর ক্ষমতা দেখাবার জন্যে করে।

একটু থেমে নাগেশ্বরোয়া বলল, বুঝলেন লাল সাব, যোগ্যতার চেয়ে বেশী ক্ষমতা যে-কোনো লোকের হাতে পড়লেই সে বা তারা অমানুষ হয়ে ওঠে। আমি তো চোখ চাইলেই চতুর্দিকে এমন বহু লুটেরা লাট্টু সিং দেখতে পাই। আপনি পান না?

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সীটে গা এলিয়ে একটু শুয়ে নিলাম।

নাগেশ্বরোয়া বুক পকেট থেকে তামাক পাতা বের করে একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে ঠোঁটের নীচে রাখল।

চাঁদের আলোয় ওর বোঁচা নাক, রুক্ষ গাল আর মাথায় লম্বা টিকিসমেত মুখটা দারুণ শান্ত ও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল।

রাত বারোটা বেজে গেলে নাগেশ্বরোয়া স্পট লাইট হাতে করে পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। লাইটের তারের অন্যপ্রান্ত রয়ে গেল বনেটের নীচে—ব্যাটারীর সঙ্গে আটকানো।

ঠিক-ঠাক করে দাঁড়িয়ে, রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাঁ হাতে জীপের রড ধরে ডান হাতে স্পট লাইট নিয়ে নাগেশ্বরোয়া বলল, চলিয়ে লাল সাব, অব্ চলা যায়।

যেমন করে চোরা-শিকারীরা জীপ চালায়, তেমনি করে ফার্স্ট গীয়ারে, সেকেন্ড গীয়ারে আস্তে আস্তে জীপটা চালিয়ে পাহাড়টা নামতে লাগলাম।

নাগেশ্বরোয়া স্পট লাইটটা এদিকে-ওদিকে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে দেখাতে লাগল। উদ্দেশ্য ঃ লাট্টু সিং-এর কোনোরকম চিহ্ন পাওয়া।

মাঝে-মাঝেই রাস্তায় বসে থাকা নাইট-জার পাখিগুলো তাদের লাল লাল চোখ মেলে প্রায় জীপের বনেট ফুঁড়ে উড়ে যেতে লাগলো খয়েরী আর সাদা ডানা মেলে।

প্রায় মাইল দুই যাওয়ার পর নাগেশ্বরোয়া বলল, হুঁশিয়ার লাল সাব, আমরা লুটেরার এলাকাতে ঢুকে গেছি।

বাঁ দিকের পাহাড়ের ছোট বস্তি থেকে সারহুল উৎসবের গান আর মাদলের শব্দ ভেসে আসছিল। হঠাৎ স্পটের আলোয় একটা ভাল্লুক পড়ল। ভাল্লুকটা পাহাড় বেয়ে এদিকে আসছিল। পথের বাঁদিকে। নাগেশ্বরোয়া এমন ভাব দেখাল, যেন ভাল্লুকটা স্পট লাইটের বৃত্ত থেকে হারিয়ে গেল ওরই দোষে।

নাগেশ্বরোয়া চাপা গলায় বলল, আপনি আলো যেখানে পড়ে আছে, সেখানে একটা গুলি করুন। লাট্টু সিং-এর লোকেরা আমাদের নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে। আমরা যে শিকারীই এ-কথা ওদের বোঝানো দরকার, নইলে সন্দেহ করবে।

জীপটা স্টার্টে রেখে, রাইফেলটা বাঁ দিক থেকে তুলে নিয়ে আমি গুলি করলাম।

আলোটা একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ফেলে রেখেছিল নাগেশ্বরোয়া। গুলিটা গিয়ে গাছেই লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে নাগেশ্বরোয়া অন্য লোকের মতন গলা করে খুব চেঁচিয়ে বলল, আরে বুদ্ধু, কেয়া কিয়া একদম্ মিস কর্ দিয়া। ইত্না বড়া ভাল্ থা। আপলোগ পাটনাকো আদমী সব এ্যাইসাহি শিকারী হোতা হ্যায়। কই কাম্কা নেহী।

নাগেশ্বরোয়া নিশ্চয় জানত যে, এই নির্জন রাতে অত জোরে জোরে বলা কথাগুলো সামনের পাহাড়ের উপর কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে-থাকা পাহারাদারদের কানে যাবেই।

—ঐখানে দু'এক মিনিট থাকার পরই, নাগেশ্বরোয়া ফিসফিস্ করে বলল, আগে বাড়হাইয়ে গাড়ি।

আমি এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম।

পাহাড়টা নেমে এসেই নাগেশ্বরোয়া বলল, বাঁয়ে ঘুরুন, বাঁয়ে।

বাঁয়ে কোনো রাস্তা ছিলো না। জীপটা ফাঁকা জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিলাম।

ফিসফিস্ করে ও বলল, হেডলাইট্ নেবান।

হেডলাইট নিবোলাম। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় খুব আস্তে আস্তে পাথর বাঁচিয়ে নালা বাঁচিয়ে দাবানলে পুড়ে-যাওয়া জঙ্গলের মধ্যে জীপটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম ফারস্ট্ গীয়ারে।...এঞ্জিনের শব্দ যথাসম্ভব কম করে।

সামনেই এক জায়গায় খুব বড় বড় কতগুলো পাথর ছিল।

নাগেশ্বরোয়া বলল, এর আড়ালে লুকিয়ে রাখুন জীপটাকে, ঘুরিয়ে ওপাশে; যাতে রাস্তা থেকে দেখা না যায়।

যখন এঞ্জিনের স্টার্ট বন্ধ করে ড্যাশ-বোর্ড প্যানেলের লাইটটাও নিভিয়ে দিলাম, তখন হঠাৎ জায়গাটা ও আমাদের কর্তব্যের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমি প্রথম সচেতন হলাম।

আমরা লুটেরা লাট্টু সিং-এর এলাকায় ঢুকে পড়েছি। রাস্তার ওপাশে মাথা-উঁচু পাহাড়টা। আর এদিকে কালো ছোট টিলাটার পাশে লুকোনো জীপের মধ্যে আমি আর নাগেশ্বরোয়া। মাথার উপর ভরা চাঁদ। ন্যাড়া জঙ্গলে সে আলো পিছলে যাচ্ছে। দাবানলে পুড়ে-যাওয়া জঙ্গলের কালো বুকের উপর পত্রহীন ডাল-পালার ছায়া মিশে গেছে। কোনো অমঙ্গলের বার্তা বয়ে খাপু পাখি ডাকছে দূর থেকে একটানা—খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু—।

জীপ থেকে নামলাম আমরা।

স্পট লাইটটা ঐভাবেই লাগানো রইল।

আমার থার্টি-ও-সিক্স ম্যানলিকার রাইফেলটা নিয়ে এসেছিলাম। ওটাও হালকা রাইফেল। নাগেশ্বরোয়ার কাঁধে ঝোলানো থ্রি-ফিফ্টিন রাইফেল আর কোমরে ঝোলানো একটা রেমিংটনের বড় ছুরি।

নাগেশ্বরোয়া ফিস্ফিস্ করে বলল, আপনি শুধু বিপদের সময় আমাকে "কভার" করবেন, তাহলেই হবে। বাকিটা আমি দেখেশুনে করব।

আমরা আস্তে আস্তে শুকনো পাতা বাঁচিয়ে, পাথর বাঁচিয়ে পা-ফেলে ফেলে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। যাতে কোনো-রকম শব্দ না হয়। প্রায় মাঝ বরাবর এসে নাগেশ্বরোয়ার পা একটা আলগা পাথরের উপর পড়ে হঠাৎ হড়কে গেল। রাইফেলের ব্যারেলটার ধাক্কা লাগল পাথরের সঙ্গে। ঐ নির্জনতার মধ্যে সে শব্দে মনে হলো যেন, বোমা পড়ার শব্দ হলো।

কান খাড়া করে আমরা দুজনেই রাইফেল রেডি করে ধরে শুয়ে পড়লাম—যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কায়।

অনেকক্ষণ, প্রায় আধঘণ্টা শুয়ে থাকার পরও যখন কোনো আওয়াজ পেলাম না, তখন আবার আমরা উঠে পড়লাম। আবার সাবধানে পা ফেলে-ফেলে রাইফেল তৈরী রেখে উঠতে লাগলাম পাহাড়ে।

পাহাড়ের উপরে যখন উঠে এলাম, তখন রাত প্রায় দুটো।

ঘামে আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ ভিজে গেছি। জল পিপাসায় জিভ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কিছু করার নেই।

কিছুক্ষণ একটা বড় পাথরের আড়ালে বসলাম আমরা। ওরই মধ্যে নাগেশ্বরোয়া মুখের তামাক থুঃ করে ফেলে বুক পকেট থেকে নতুন তামাক নিয়ে

ঠোঁটের নীচে রাখল। কিছুক্ষণ দম নেবার পর পাথরের আড়াল ছেড়ে ও-পাশে কি দেখা যায় তা দেখার জন্যে সবে আমরা বুকে হেঁটে ওদিকে যাচ্ছি, এমন সময় নাগেশ্বরোয়া আমার কাঁধে হাত রাখল।

কাঁধে হাত রাখতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড শঙ্খচুর সাপ। আমার আর নাগেশ্বরোয়ার মাথা থেকে বড়জোর এক হাত দূরে দিয়ে কতগুলো পাথরের উপরে ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে যাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় সাদাটে পাথরগুলোর উপর দিয়ে সাপটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সাপটার পুরো শরীরটা যখন সরে গেল তারপরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে আমরা উঠে পাহাড়ের চুড়োর এক কোণায় এলাম।

এখান থেকে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছিল। দু'একটা ঘর থেকে তখনও মাদলের আওয়াজ আর পুরুষকণ্ঠের গান শোনা যাচ্ছিল। গরমের সময়, তার উপর চাঁদনী রাত। কোথাওই আগুন জ্বলছিল না কোনো। সবশুদ্ধ গোটা পাঁচেক ঘর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। অন্যান্য ঘরের লোকেরা জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে জানার উপায় ছিল না। লুটেরা লাট্টু কোন্ ঘরে আছে, কিছুই জানা নেই নাগেশ্বরোয়ার। আমার তো নয়ই। নাগেশ্বরোয়া বলল, এটা লুটেরার ডেরা, ওর ক্ষেতি-জমিন বাল-বাচ্চা সব অন্য জায়গায়। এখানে শুধু ডাকাতির জন্যে থাকে। দলের সঙ্গে।

আমরা শুয়ে শুয়ে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছি, ঠিক এমন সময় আমাদের থেকে একটু দূরে বাঁ দিকে নাল-লাগানো জুতোর চটাং-ফটাং আর দেহাতী গলার আওয়াজ শোনা গেল।

তার একটু পরই দেখলাম দু'জন লোক গল্প করতে করতে পাকদণ্ডী পথ দিয়ে এদিকে আসছে। পথটা নীচে ঐ ঘরগুলোর দিকেই চলে গেছে।

দু'জনের মধ্যে একজনের হাতে বন্দুক আর অন্য জনের হাতে বর্শা।

প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে বলল, পাটনাই শিকারীর রাইফেলের নিশানি দেখলি?

দ্বিতীয়জন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, দেখলাম।

তারপর বলল, আমার বড় ঘুম পেয়েছে রে। সারহল পরবের জন্যে একটু বেশী মহুয়া খাওয়া হয়ে গেছে। কখন গিয়ে ঘুমুব তাই ভাবছি।

ওদের যাওয়ার পথটা আমাদের প্রায় সামনে দিয়েই।

নাগেশ্বরোয়া আমার কাঁধ টিপে ইশারা করেই বুকে হেঁটে একেবারে সামনের বড় বড় পাথরগুলোর গায়ে সেঁটে গেল। আমিও ওর পাশে পাশে এগোলাম। রাইফেলের নলটা ধরে কুঁদোটাকে নীচে নিজের পায়ের উপর নামিয়ে রেখে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকল ও।

লোক দুটো এসে গেল। একেবারে

নাগেশ্বরোয়ার সামনে এসে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নাগেশ্বরোয়া বাঘের মতন লাফিয়ে উঠে যে-লোকটা বন্দুক হাতে যাচ্ছিল, তার মাথায় ওর রাই-ফেলের কুঁদো দিয়ে এক প্রচণ্ড বাড়ি মারল।

মারতেই লোকটা একটা "কোঁৎ" আওয়াজ করে পড়ে গেল মাটিতে। বন্দুকটা ছিটকে গেল হাত থেকে।

বর্শাওয়ালা লোকটা নাগেশ্বরোয়ার দিকে বর্শাটা বাগিয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর পেটে আমার রাইফেলের নলটা চেপে ধরলাম। ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, একদম বাত্ চিত্ নেহি।

লোকটা তবু একটা চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার রাই-ফেল তুলে নাগেশ্বরোয়া তার মাথাতেও এক প্রচণ্ড বাড়ি লাগাল।

ঐ লোকটাও পড়ে গেল।

নাগেশ্বরোয়া তাড়াতাড়ি লোক দুটোর মুখ হাঁ-করিয়ে মুঠো করে বালি আর পাথরের টুকরো-টাকরা মুখে পুরে দিল দুজনেরই, যাতে ওরা আওয়াজ না করতে পারে। তারপর ওদের বন্দুকটা আর বর্শাটা নিয়ে পাথরের এপাশে এসে আমার পাশে যেমন বসেছিল, তেমন করে লুকিয়ে বসে কান পেতে রইল।

যে-বন্দুকটা হাতে ছিল লোকটার, সে-বন্দুকটা গাদা বন্দুক নয়। দো-নলা বন্দুক—ঘোড়াওয়ালা। যদিও মুঙ্গেরের তৈরী। বন্দুকটার ব্রীচ খুলে গুলি-গুলো দেখে নিলাম। অন্ধকারে কি গুলি তা বোঝা গেল না, তবে মনে হল এল-জি পোরা আছে।

ততক্ষণে ঘড়িতে প্রায় তিনটে বাজে। আজকাল গরমের সময় সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটায় ভোর হয়ে যায়। নাগে-শ্বরোয়ার প্ল্যান যে কি, তা সে নিজেই জানে। কিন্তু এখানে সেই-ই কম্যাণ্ডার। সে যা বলবে, সে যা ভালো বুঝবে, তাই-ই হবে।

হঠাৎ লোকদুটোর মধ্যে জ্ঞান ফেরার লক্ষণ দেখা গেল। অমনি নাগেশ্বরোয়া উঠে পড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থাতেই ওর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে লোকদুটোর মাথায় আবার কয়েক ঘা লাগাল।

আমি ফিসফিস্ করে বললাম, করছ কি? মরে যাবে যে।

ও বলল, যাতে মরে যায় সে জন্যেই তো করছি। এসব বদমাইস লোকদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

ভাবতেই খারাপ লাগল। যাদের চিনি না, শুনি না, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ব্যক্তিগত বিবাদ নেই, তেমন লোকদের অমন করে ঠাণ্ডা মাথায় মারা যায়? কি করে করছে নাগেশ্বরোয়া?

কিন্তু তখন কালো পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা নাগেশ্বরোয়াকে কোনো বুনো জানোয়ারের মতন দেখাচ্ছে। ওকে মানুষ বলে আর চেনা যাচ্ছে না।

নাগেশ্বরোয়াকে বললাম, চল এবার এগোই।

ও বলল, মাথা খারাপ। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। লুটেরা লাট্টুকে আপনি চেনেন না। ও দিনে-রাতে কখনও ঘুমোয় না। সবসময় অনুচর থাকে আশে-পাশে। তারা এক সেকেণ্ডের মধ্যে আপনার-আমার মাথার খুপ্‌ড়ি উড়িয়ে দেবে।

তবে কি করবে? ভাবিত গলায় ফিস্-ফিস্ করে জিগেস্ করলাম ওকে।

ও বলল, পুবে আলো ফুটুক। তখন লুটেরা প্রাতঃকৃত্য সারতে ঘর থেকে বেরোবেই পাহাড়ে কি জঙ্গলে যাবার জন্যে। যেই বেরোবে, অমনি ওকে গুলি করব। গোলিসে ভুঞ্জ্ দেগা শালে ডাকুকো।

নাগেশ্বরোয়া যা ভালো বোঝে, তাই হবে। আমি তো ওকে সাহায্য করতেই এসেছি মাত্র।

দেখতে দেখতে পুবের আকাশ ফর্সা হতে লাগল। ময়ূর ডাকতে লাগল ক্কেঁয়া ক্কেঁয়া করে। ছাতারের দল ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করতে করতে নীচের নালার মধ্যে শুকনো পাতার মধ্যে নড়তে-চড়তে লাগল। চতুর্দকের পাতা-ঝরা বনে বনে পাখির কল-কাকলীতে প্রাণ জাগল।

এমন সময় নাগেশ্বরোয়া একটা আশ্চর্য কাণ্ড করল।

নাগড়া-জুতোসুদ্ধ পা-ধরে টেনে আনলো একটা অজ্ঞান হয়ে-থাকা লোককে। তারপর তাড়াতাড়ি তার ধুতি আর দেহাতী খদ্দরের পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলল। নিজের জামাকাপড় রেখে ঐ লোকটার পোশাক পরে ফেলল। কোমরে পাঞ্জাবীর নীচে ছুরিটা বেঁধে নিল। তারপর অন্য লোকটার গায়ের চাদরটা খুলে নিয়ে পাগড়ীর মতন বাঁধল মাথায়। যাতে চট করে মুখ না চেনা যায়। যাতে ওর কদমছাঁট দেওয়া পুলিশ মার্কা চুল না দূর থেকে দেখা যায়।

ততক্ষণে এ-পাশ ও-পাশের ঘর থেকে দু'একজন করে লোক বেরোতে শুরু করেছে। সকলেই বেরিয়ে নালার পাশের কুঁয়োতে আসছে সোজা। কুঁয়োতে মুখ হাত ধুচ্ছে, তারপর ঘটিতে জল ভরে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। কুঁয়োর লাটাখাম্বাটা ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর করে উঠছে নামছে।

নাগেশ্বরোয়া বলল, লাল সাব, হামারা লিয়ে দোয়া মাঙ্গিয়েগা খুদাসে। অর্থাৎ আমার জন্যে খোদার আশীর্বাদ প্রার্থনা কোরো।

তারপর বলল, আমাকে যদি কেউ গুলি করতে যায়, মারতে যায় আমার অলক্ষ্যে, আপনি তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবেন এক মুহূর্তও দেরী না করে। আপনার উপর এখন আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। আজ যশোবন্ত দাদার দোস্তের রাইফেলের হাত কেমন, তার পরীক্ষা হবে।

নাগেশ্বরোয়া রাইফেল কাঁধে নিয়ে, নাল-বসানো নাগড়ায় খটাং-খটাং আওয়াজ তুলে ও যেন ওদেরই লোক এমনভাবে পাহাড় বেয়ে ঘরগুলোর দিকে নেমে যেতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওর সাহস দেখে। ও সারহুল পরবের কি একটা গান ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছিল।

আমি পাথরটার পাশে শুয়ে রাই-ফেলটাকে দু'হাতে ভালো করে শুটিং পজিশানে ধরে চতুর্দিক ভালো করে দেখছিলাম। এর আগে কখনও এমন হয়নি যে, আমারই নিশানার উপর এক-জন লোকের জীবন নির্ভর করবে। নিতান্ত প্রয়োজনের আগে গুলি করলে সকলে জেনে যাবে আমাদের অস্তিত্ব। আবার একটু দেরী হলে নাগে-শ্বরোয়াকে বাঁচানো যাবে না। ঠিক সময় বুঝে গুলি করতে হবে।

দেখতে দেখতে নাগেশ্বরোয়া সেই ঘর-গুলোর কাছে পৌঁছে গেল।

আমি সেফ্‌টি-ক্যাচ ঠেলে দিয়ে ব্যাক-সাইট ও ফ্রন্টসাইটে চোখ রেখে ডান হাতের তর্জনী ট্রিগার গাড-এ ছুঁইয়ে রেখে স্থির হয়ে শুয়েছিলাম।

নাগেশ্বরোয়া ঘরগুলোর কাছে পৌঁছে হঠাৎ দিক বদলে কুঁয়োটার দিকে চলে গেল। কুঁয়োটার কাছে গিয়ে বাল্‌তি দিয়ে জল তুলে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে নানারকম ফ্যাঁ-ফোঁ শব্দ করে মুখ ধুতে লাগল। যেন ওটাই ওর বাথরুম।

একটা লোক হাতে একটা ঘটি নিয়ে কুঁয়োর কাছে যাচ্ছিল। প্রায় কুঁয়োর কাছে পৌঁছে গেল লোকটা।

আমি কান-খাড়া রেখে চতুর্দিক দেখতে লাগলাম।

লোকটা কুঁয়োর পাশে আসতেই, নাগেশ্বরোয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। জল ভর্তি বাল্টিটা লোকটার দিকে এগিয়েও দিল। লোকটা যেই নীচু হয়ে ঘটিতে জল ভরতে যাবে অমনি এদিক-ওদিক একবার মুখ ঘুরিয়ে কেউ ওকে দেখছে কি না দেখে নিয়েই নাগেশ্বরোয়া লোকটাকে এক ঝট্‌কায় পাঁজাকোলা

করে তুলে নিয়ে কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিল।

ঘটিটা গড়াতে লাগল। লোকটা গরমের দিনের গভীর পাথুরে কুঁয়োর মধ্যে পড়ার সময় আঁ-আঁ করে চীৎকার করে উঠল।

নাগেশ্বরোয়া অমনি কুঁয়োর মধ্যে মুখ নামিয়ে সেই আঁ-আঁ চীৎকারের সঙ্গে সুরমিলিয়ে একটা দেহাতী গান জুড়ে দিল। তবুও লোকটার ঝপাং করে নীচে পড়ার শব্দটা আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকেও শোনা গেল।

এমন সময় মধ্যের বড় ঘরটার দরজাটা খুলে গেল।

একজন দারুণ লম্বা চওড়া লাল টুকটুকে লোক বেরিয়ে এলো। তার গায়ে ভাগলপুরী সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে মিলের ফিন্‌ফিনে ধুতি। পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতো। লোকটা কিছুক্ষণ কুঁয়োর দিকে চেয়ে রইল।

নাগেশ্বরোয়া তখন গান থামিয়ে কুঁয়ো থেকে জল তুলে ঘটিটাতে ভরছিল।

ঐ লোকটা কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থেকে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

লোকটা ঢুকে যেতেই নাগেশ্বরোয়া এক হাতে ঘটি ধরে ধীরে ধীরে কুঁয়ো ছেড়ে ঐ ঘরটার দিকে এগোতে থাকল।

ও লুটেরা লাট্টুকে দেখেই চিনেছে। আর নাগেশ্বরোয়ার হাবে-ভাবে আমি জানতে পেলাম লুটেরা লাট্টু কোনজন।

ইতিমধ্যে আমার সামনে যে লোকটা শুয়েছিল সে গোঙানির মতন আওয়াজ করতে লাগল। আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তার মুখ ভর্তি বালি আর পাথর ছিল। লোকটার জন্যে আমার কষ্ট হলো, কিন্তু এখন যে-কোনো মুহূর্তে নাগেশ্বরোয়ার জীবন যেতে পারে। সহানুভূতি দেখাবার সময় নেই এখন।

নাগেশ্বরোয়া প্রায় ঐ ঘরটার কাছাকাছি এসেছে. ঠিক এমনি সময় ওর পিছনে একটা খড়ের ঘরের দরজা খুলে

গেল। একটা লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাগেশ্বরোয়ার পিঠ লক্ষ্য করে বন্দুক তুলল।

আমি ফোরসাইট ও ব্যাকসাইটের মধ্যে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী দেখতে পাচ্ছিলাম। অতদূর থেকে সাদা পাঞ্জাবীর বুকের অংশটা ছোট্ট একটা চরকোণা জিনিসের মতন দেখাচ্ছিল। আমি ট্রিগার টানলাম। সেই ভোরের নরম সুর, পাখির ডাক, পাহাড়ে-পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠা সূর্যটা সব যেন রাইফেলের অতর্কিত আওয়াজে চমকে

উঠল। প্রতিধ্বনি উঠল ন্যাড়া পাহাড়ে-পাহাড়ে। আর এ সবের মধ্যে লোকটা বন্দুকটা হাতে করেই ধপ্ করে পড়ে গেল।

আমার রাইফেলের আওয়াজ শুনেই হাতের ঘটি ফেলে দিয়ে নাগেশ্বরোয়া দৌড়ে গেল ঐ মধ্যের বড় ঘরটার দিকে। তারপর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল রাইফেলটা দুহাতে ধরে।

অন্য দিকের একটা ঘর থেকে আর একজন লোক বন্দুক হাতে দৌড়ে আসছিল এ ঘরের দিকে। তার দিকে রাইফেল ঘুরিয়ে সেদিকেও গুলি করতে হলো আমায়। দৌড়নো অবস্থায়ই সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। রাইফেলটা ছিটকে গেল হাত থেকে।

এমন সময় লাট্টু সিং দরজা খুলল। দরজা খুলেই একটা রাইফেল হাতে এক দৌড়ে এসে আমি যেদিকে ছিলাম, সেই পাহাড়ের দিকে মুখ করে একটা বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়াল। দরজার পাশের নাগেশ্বরোয়াকে দেখল না।

ততক্ষণে নাগেশ্বরোয়ার কথা ওরা সবাই ভুলে গেছে। জঙ্গল থেকেও চার পাঁচজন লোক দৌড়ে এলো। তারা মুহূর্তের মধ্যে ঘটি ফেলে বন্দুক হাতে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ওরা সকলেই ভাবল পুলিশ-ফোর্স এসে পাহাড়ের উপর থেকে ওদের উপর গুলি চালাচ্ছে।

নাগেশ্বরোয়া এই ফাঁকে লাট্টু সিং-এর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি এখন একা। ওরা সকলে। আমি পাথরের আড়ালে ভালো করে নিজেকে লুকিয়ে রেখে শুধু মাথা আর কাঁধটা বের করে পর পর এদিকে ওদিকে গুলি করে যেতে লাগলাম। তখন ওরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছুর আড়াল নিয়ে নিয়েছিল। তাই আমি যে একা নই, আমরা যে অনেকে আছি একথা জানাবার জন্যে আমি ম্যাগাজিন খালি করে ফেললাম। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারি আবার ম্যাগাজিন পুরো লোড করে নিলাম।

এমন সময় অতর্কিতে নাগেশ্বরোয়া সেই ঘরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পিছন থেকে লুটেরা লাট্টুকে গুলি করল। লুটেরা লাট্টু পাথরের আড়ালে বসে আমার জায়গা লক্ষ্য করে ওর দামী রাইফেল দিয়ে গুলি করছিল। গুলিগুলো আমার আশেপাশে এসে লাগছিলও। একটা গুলি আমার সামনে শুয়ে-থাকা সেই গোঙানিতোলা হতভাগা লোকটার গায়ে এসে লাগল। লোকটার পা দুটো কেঁপে উঠল একটু। তারপর একেবারে থেমে গেল।

লাট্টুর রাইফেলে টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো থাকলে সে আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেত এবং আমাকে ঠিকই মারতে পারত কিন্তু খালি চোখে উঁচু পাহাড়ের গাছের মধ্যে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকাতে আমাকে সে দেখতে পায়নি। শুধু কোথা থেকে গুলি আসছে সেই আন্দাজেই গুলি চালাচ্ছিল ওরা সকলেই।

লুটেরা লাট্টু নাগেশ্বরোয়ার গুলি খেয়ে ছিটকে উঠেই মাটিতে পড়ল।

দলের লোকদের সকলেই ভাবল যে, আমার গুলিতেই সে মরেছে। তারা প্রবল বিক্রমে মরীয়া হয়ে আমার দিকে গুলি চালাতে লাগল।

যখন নাগেশ্বরোয়া সেই ঘরের মধ্যের অন্ধকারে ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে পটাপট গুলি করে পিছন থেকে ওদের মধ্যে আরও দুজনকে ফেলে দিল, তখন ওরা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। আঁচ করতে পেরে আমার দিক থেকে নজর সরিয়ে সকলে ঘরের দিকে নল ঘোরালো বন্দুকের।

নাগেশ্বরোয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমার মনে হলো নাগেশ্বরোয়াকে আর বাঁচাতে পারলাম না বুঝি। যখনি কোথাও নড়া-চড়া দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি গুলি করছিলাম। কিন্তু তখনও যে তিন-চারজন লোক ছিল তারা খুব সাবধান হয়ে গেছিল। আমি গুলি থামালাম না, পাছে ওরা ভাবে যে আমি বা ওদের কল্পিত আমরা মরে গেছি।

দু'এক মিনিট পরে কি হলো জানি না, ওরা কি ভাবল। সর্দার মরে যাওয়াতে এবং পিছন থেকে গুলি হওয়াতে ওরা বোধ হয় ভাবল ওদের ঘরে ঘরে পুলিশের লোক ঢুকে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা অবশিষ্ট তিন-চারজন লোক বিভিন্ন দিকে দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

নাগেশ্বরোয়া নিশ্চয়ই ওদের পালানো দেখে থাকবে।

ও ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো।

আমি ভাবলাম ও সোজা আমার দিকে আসবে।

কিন্তু লুটেরা লাট্টু যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে ওর মাথা লক্ষ্য করে আর একটা গুলি করেই তারপর আবার দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। ও বোধহয় কোনোরকম চান্স নিতে চায় না। লুটেরা

সর্দ্দি ও কাশিতে
দুলালের
তালমিছরী
প্রস্তুতকারক:
দুলাল চন্দ্র ভড়
৪, দত্তপাড়া লেন · কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৩-৫৬৭৩
THIS WAY
দুলালের
তালমিছরি

লাট্টু যে মরেছেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখতে চায় না।

তারপরই নাগেশ্বরোয়া আবার বেরিয়ে এলো।

তারপর কয়েক পা এসেই আবার সে দাঁড়িয়ে পরে পিছনে দেখল।

কেউ নেই। কেউ নেই। আর কেউ নেই।

লুটেরা নাগেশ্বরোয়ার কাছে হেরে গেছে লুটেরা লাট্টু।

নাগেশ্বরোয়া প্রায় পাহাড়ের মাঝামাঝি পেঁাছে গেছে, ঠিক এমন সময় একটা গুলির শব্দ হলো। গুলিটা কে করল, কোথা থেকে হলো দেখা গেল না। কিন্তু গুলিটা নাগেশ্বরোয়ার পিঠে যে লাগল তার চাপা থপ্‌থপে আওয়াজ আমার কানে এলো।

নাগেশ্বরোয়া পড়ে গেল।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে একজন আহত লোক তার শরীরের পিছনের অংশ টেনে টেনে এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটা রাইফেল।

তাহলে লুটেরা লাট্টু ছাড়া অন্যদেরও রাইফেল ছিল। বন্দুকের গুলি এতদূরে নাগেশ্বরোয়ারা গায়ে লাগতে পারত না।

আমি আমার রাইফেলটা তুলে নিয়ে ভালো করে এইম্ করে ট্রিগার টানলাম। লোকটার মাথাটা ধপাস্ করে মাটিতে পড়ল থুবড়ে। এই একটি গুলি আমি প্রতিহিংসায় করলাম — নাগেশ্বরোয়ার গায়ে যার গুলি এসে বিঁধেছে তাকে মারতে আমার কোনো দুঃখ হলো না। কিন্তু গুলিটা করতে আমার দেরী হয়ে গেল। সে লোকটার গুলি থেকে নাগেশ্বরোয়াকে বাঁচাতে পারলাম না।

আমি দৌড়ে গেলাম নাগেশ্বরোয়ার দিকে।

গিয়ে নাগেশ্বরোয়াকে পিঠে তুলে নিলাম।

নাগেশ্বরোয়ার পেটের ও বুকের মাঝামাঝি গুলিটা লেগেছিল। তবুও কি করে যে ওর তখনও জ্ঞান ছিল আমি ভেবেই পেলাম না।

নাগেশ্বরোয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল, মামলা ফ্যায়সালা হুয়া না?

কোনোরকমে ধরাধরি করে নাগেশ্বরোয়াকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলাম, যত তাড়াতাড়ি পারি। রাইফেল দুটো দু' কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম। পাহাড়ের নীচে পেঁাছেই ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে জল খাওয়ালাম নাগেশ্বরোয়াকে।

নাগেশ্বরোয়া ঢক্‌ঢক্ করে জল খেলো. তারপর আমাকে বললো. লাল সাব মুঝে মুন্নীকে পাস্ লে চলিয়ে। জল্দি লে চলিয়ে। মেরি ওয়াক্ত হো গায়া।

স্টীয়ারিং-এ বসে এত জোরে জীপ চালিয়ে গাড়ুতে এলাম যে. সারাজীবন আমার সে কথা. সে আতঙ্কিত. উদ্বিগ্ন এক ঘণ্টার কথা মনে থাকবে।

নাগেশ্বরোয়ার বাড়ির কাছে যখন এসে পেঁাছেছি তখন পিছন ফিরে ওকে বললাম, তোমার মুন্নীর কাছে এসেছি নাগেশ্বরোয়া।

নাগেশ্বরোয়া কথা বলছিল না। চোখ দুটো বোঁজা ছিল। রক্তে সারা জীপ ভেসে যাচ্ছিল। নাগেশ্বরোয়া তখন তার মুন্নীর কাছ থেকে অনেক-অনেক দূরে চলে গেছিল। যেখান থেকে ফেরে না আর কেউ।

আমার কানে নাগেশ্বরোয়ার কথাগুলো বাজছিল ঃ কোনোক্রমে দিন কাটানো আর বেঁচে থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

সত্যিই হয়ত আছে।

শিবরাম চক্রবর্তী

দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ

'দাদা! অনেকদিন আমরা দেশছাড়া। যাব একটি দেশে?' গোবর্ধন সাধলো দাদাকে।—'দেশের জন্য ভারী মন কেমন করছে আমার।'

'দেশ আবার কোথায় রে?' জবাব দিলেন দাদা : 'যেখানে রয়েছি এখানটা কি আমাদের দেশ না? সারা ভূভারতই তো আমাদের দেশ।'

'তা তো জানি। কিন্তু স্বদেশ বলে একটা কথা নেই? যেখানে জন্মেছি বড়ো হয়েছি খেলাধুলা করেছি সে দেশকে বড় হয়ে ফিরে দেখবার সাধ হয় না একবার? এই ভূভারত তো সবার দেশ। আমার কিসের আপন! আমাদের দেশের জন্য মন কাঁদছে দাদা।'

'সে দেশ কি আর আছেরে? কবেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। সেখানে গিয়ে কাউকেই তুইচিনতে পারবি না! তোকেও কেউ চিনবে না। সব নিশ্চিহ্ন। কি করবি সেখানে গিয়ে? পাত্তা পাবিনে কোথাও।'

'তবু একবারটি যাব। যাইনা দাদা?'

'তবে যা। আর যাচ্ছিস যখন, একটা কাজ সেরে আসিস্ আমার। আমি তো কাজের মানুষ, সময় নেইকো কোথাও যাবার। তুই যখন যাচ্ছিসই,

স্বামিজীর কাছে আমার ঋণটা শোধ করে আসিস্ এই সুযোগে।'

'স্বামিজীর ঋণ? স্বামিজীর কাছে তুমি আবার ধার করলে কবে গো!' অবাক হয় গোবরা।

'আহা, টাকা কড়ির ধার কি আবার ধার নাকি একটা? ওতো টাকা ফিরিয়ে দিলেই তো শোধ হয়ে যায়।' দাদা কন: 'সে-ঋণ নয়রে, এ ঋণ অপরিশোধ্য।'

'শুনি কী ঋণ? তোমার এ-ধার আবার কেমন ধারা?' জানতে চায় গোবরা।

'যাবার আগে জানিয়ে দেব তোকে। তবে এইটুকু কই এখন, সেবারে পা ভেঙে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে পড়ে-ছিলুম না বেশ কিছুদিন? তখন এক স্বামিজী এসে, অযাচিতভাবে, ধর্ম-শিক্ষা দিতেন। কেবল আমাকে না, আমাদের সব রুগীকেই। সেই শিক্ষার ঋণ শুধতে হবে আমায়।'

'এই কথা! তা দেব শুধে। সুদে আসলে। কী করতে হবে বোলো আমায়।'

'বলবো রে বলবো। অঢেল টাকাও দেব সেইজন্যে। অনেক টাকার দায় চাপিয়ে দেব তোর মাথায়।'

গৌহাটি ইস্টিশনে নেমে গোবরা দেখল যে দাদার কথাটাই খাঁটি। তার দেশ কোথায় নিরুদ্দেশ! প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার অব্দি দু দুবার চষে গিয়েও চেনাজানা একজনেরও সে উদ্দেশ পেল না।

এমনকি, স্টেশনটাকেই যেন অচেনা মনে হয়। যে গৌহাটি স্টেশনে উঠে তারা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল তার চেহারাটাই পালটে গেছে। আরো অনেক লম্বা চোড়াই যেন এখন। তবু ওরই মধ্যে একজনকে একটুখানি চেনা চেনা বলে তার ঠাওর হোলো। প্ল্যাটফর্মের একধারে বসে একমনে সে জুতো সেলাই করছিল।

তার কাছে গিয়ে শুধালো—'হারুদা যে! চিনতে পারো আমাকে?'

'এইযে গাবু ভায়া! চিনবো না তোমাকে, সে কি কথা? আমার চোখের ওপর এত বড়োটা হলে? এই সাত সকালে উঠে চলেছো কোথায় শুনি?'

'যাব কি গো? এলাম যে! এই ট্রেনটাতেই এলাম তো!'

'ট্রেনে এলে!' হারু হতবাক্—'গেছলে কোথায় এর মধ্যে গো?'

'কলকাতায়। সেখানেই ছিলুম তো অ্যাদ্দিন! ওমা! তুমি কিছু খবর রাখো না! অবাক করলে হারুদা!

'কলকাতায় ছিলে নাকি অ্যাদ্দিন? কই জানি নে তো কিছু। কেউ বলেনি আমায়। যা দিনকাল, কারু খবর কেউ রাখেনা ভাই! ফুরসৎ কই খবর রাখার—তাই বলো।'

গোবর্ধন সায় দিলো—'যা বলেছো। তা হারুদা, তুমি কি আজকাল ইস্টিশনে এসেও তোমার কাজ করো নাকি?

'না করলে চলে না ভাই! যা দিনকাল পড়েছে না, ঘরে বসে রোজ-গারে কুলায় না। এই, বড়ো বড়ো মেল গাড়িগুলো যাওয়া আসার সময়টায় আসি কেবল। গাড়ি তখন বেশ খানিক-ক্ষণ দাঁড়ায় তো। যাত্রী বাবুরা সেই সময়টায় জুতো পালিশ করিয়ে নেয়, তাড়াহুড়ার মুখে কম মেহনতে বেশি উপায় হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি? আচ্ছা, কলকাতা যাবার আগে আমার জুতোজোড়া মেরামত করতে দিয়ে গেছলাম, বছর সতেরো আগেকার কথা মনে আছে তোমার?'

'এইতো সেদিন! মনে থাকবে না?'

'সারানো হয়েছে নাকি? তুমি বলেছিলে আর দিন দুই বাদ এসে নিয়ে যেতে...এতদিন হয়েছে নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়। এতদিনে সারানো হবে না, বলো কি গো?' হারু আশ্বাস দেয়। 'চলোনা, দিয়ে দিচ্ছি এখনই তোমায় হাতে হাতে।'

ইস্টিশন ছেড়ে বেরুলো দুজনে।

'ইস্টিশনের এ রাস্তাটা তো বড়ো রাস্তাই ছিল জানি, কিন্তু এখন আরো যেন বেশ বড়ো হয়েছে মনে হচ্ছে।' গোবরা বলে।

'শুধু এইটে? অনেক বড়ো বড়ো রাস্তা হয়েছে এই এলাকায়। এই শহরে। সে শহর আর নেইরে ভাই! দুদিন বাদ এলে চেনাই দায়।'

'আরে, এইখেনে কোথায় যেন আমাদের বাড়ি ছিল না?' না দেখে চমকে ওঠে গোবরা 'গেল কোথায় বাড়িটা?'

'বেওয়ারিশ পড়েছিল তো এতদিন। মুন্সিপালটী তোমাদের বাড়িটা আর তার লাগাও আর সব বাড়ির দখল নিয়ে ভেঙেচুরে এই রাস্তাটা চওড়া করেছে।'

'তাহলে এখন উঠবো কোথায় গো?'

'জলে পড়েছো নাকি? আমার বাড়িতেই উঠবে না হয়। তার কী হয়েছে?'

'তোমাদের পরিবারে ক'জনা? আমি আবার বাড়তি বোঝা হবো না তো গিয়ে?'

'সব মিলিয়ে আমরা একান্নজন। একান্নবর্তী পরিবার আমাদের। যেখানে একান্নজনের মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে সেখানে তোমারও ঠাঁই হবে ভাই। আর ক'দিনের জন্যই বা!'

'এবার অবশ্যি দিন কয়েক।' গোবরা জানায়ঃ 'তবে যে কাজের জন্যে এসেছি না, সেটা সমাধা হলে তারপরে দাদাও আসবেন আবার একবারটি। তাঁকেও আসতে হবে। তবে ঐ কয়েকদিনের জন্যেই।'

'তার কী হয়েছে? বললাম না, আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। যাঁহা একান্ন তাঁহা বাঁহান্ন, যাঁহা বাঁহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।'

'তা বটে।' যেতে যেতে ওদের কথা হয়—'তা হারুদা, এই রাস্তারই কোন গলিতে যেন আমিনাবিবিরা থাকত না! তাদের বাড়ির পিছনে বেশ কয়েকটা পেয়ারা গাছ ছিল, খাসা পেয়ারা। ইস্কুলে যাবার পথে পেড়ে খেতুম আমরা।'

'এ তল্লাটে তারা নেইকো আর। এখানকার সব বেচেবুচে শহরের ওধারে গিয়ে তারা বাসা বেঁধেছে এখন।'

'পেয়ারা বেচে সংসার চলত তাদের। ভারী গরিব ছিল তারা...'

'গরিব বলতে! আমিনাবিবির খসম্ সেই পেয়ারা খাঁ মারা গেলে তাকে গোরস্থানে নিয়ে কবর দেবার পয়সা জোটেনি...

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ির পিছনটায় পেয়ারা গাছগুলোর গোড়া-তেই তাকে গোর দেওয়া হয়েছে।... আর, বিধাতার কী লীলা! সেই গোর দেওয়ার থেকেই...সেইখানেই গোড়া! এত যে গরিব ছিল আমিনাবিবি না...।

'দাদা বলছিল সেই কথাই। যাচ্ছিস যখন তখন মনে করে আমিনাবিবিকে যদি কিছু সাহায্য...'

'তা দিতে পারে সে সাহায্য। কিছু কেন, বেশ কিছুই সে দিতে পারে এখন। চাওনা গিয়ে তার কাছে।' হারু বাতলায়।

'তার কাছে গিয়ে চাইব কি? তাকেই কিছু দিতে বলেছে দাদা। দিয়েও দিয়েছে আমার সঙ্গে।'

'তাদের আবার দেবে কি গো? তাদের কি সেদিন আছে আর? বললাম না যে পেয়ারা খাঁর সেই গোর দিতে গিয়ে—সেইখানেই গোড়া! সেই থেকে বরাত ফিরে গেল তাদের। শাবলের ঘায় ঠন করে উঠে মাটি চাপা মোহরের ঘড়া বেরিয়ে পড়ল। সেই থেকেই তারা বড়লোক। শহরের বড়লোকদের পাড়ায় বাড়ি কিনে ছেলেমেয়ে সব নিয়ে সুখে রয়েছে এখন আমিনাবিবি।'

'বাঃ বাঃ! খুব ভালো খুব ভালো!' গোবরা আনন্দে গদগদ। 'কিসের থেকে কি করে কার বরাত ফিরে যায় কেউ বলতে পারে?'

'তা এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে কিরকম বরাত ফিরল তোমাদের শুনি তো?' হারু শুধায়, 'টাকা কামাতেই তো যাওয়া কলকাতায়। তাই না?'

'আমিনাবিবির মতন অমন না হোক, হয়েছে কিছু কিছু।'

গোবরা বলেঃ 'দাদা একটা কারখানা ফেঁদেছে—কাঠ চেরাইয়ের কারখানা... সেখানে যত আসবাব পত্তর বানায়।'

'ভালোই করেছো তোমরা। চাকরি বাকরি বড় একটা মেলেনা ভাই আজকাল। ঘরে ঘরেই আজকাল ছোটখাট কারখানা দেখতে পাবে। এমনকি আমারটাকেই তুমি একটা জুতো সেলাইয়ের কারখানা বলে ধরতে পারো। বললেই হয় কারখানা। বাধা কি?'

'হ্যাঁ, বললে কিছু বেজুত হয় না।' যুতসই জবাব গোবরারঃ 'তবে আমাদের এমন একালে কারখানা নয় গো! কত জনা কাজ করে সেখানে। বিরাট এক শেডের তলায়...।'

'শেড কি?'

'করোগেটের শেড। ছাদ বলেই ধরতে পারো। সবাই আমরা সেখানে এক পরিবারের মতই...অতোলোক—সব! এক শেডের তলায়।'

'আমাদের পরিবারটাই বা কম কিসের! আমি, আমার বৌ, আমার শালী, কাচ্চাবাচ্চারা সব, গোরু বাছুর, ছাগল ভ্যাড়া, খচ্চর, ঘোড়া, কুকুর বেড়াল। হাঁস মুরগি তার ওপর...নেংটি ইঁদুরদের কথা বাদই দিচ্ছি...সব মিলিয়ে পঞ্চাশজনার ওপর। সবাই আমরা এক ছাদের তলায়। একান্নবর্তী পরিবার, বললাম না?'

'এক ছাদের তলায়—তার মানে?'

'মানে, এক ঘরের ভেতরে। একটিই তো ঘর। আর ঘর কই আমাদের?'

'গোরু ভ্যাড়া সব নিয়ে একসঙ্গে থাকো?'

'মিলে মিশে বেশ আছি। নেংটি ইঁদুরদের আমি ধরছি না অবিশ্যি। তারা তেমন মিশুক নয়।'

'আর তোমার কারখানা? জুতো

সেলাইয়ের।'

'বাড়ির উঠোনে। আবার কোথায়?'

যেতে যেতে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ায় গোবর্ধন—মনে পড়েছে। মনে হচ্ছে এইখানে ছিলো আমাদের ইস্কুল বাড়িটা। প্রাইমারি ইস্কুলের...।

'মনে পড়ছে তোমার?'

'পড়বে না। কান ধরে কতোদিন দাঁড়িয়েছিলাম বেঞ্চির উপরে। কোথায় গেল সেই ইস্কুল? গেল কোথায়?'

'ওপর দিয়ে রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে—দেখছ না?'

'তাতো দেখছি। রাস্তাই তো বাড়ি চাপা পড়ে জানতাম, উলটে বাড়িও যে রাস্তা চাপা পড়ে দেখছি এখন।'

বলতে বলতে তারা হারুর আস্তানায় এসে পড়ল। উঠোনে উঠে গোবরা বলল—'এইত তোমার সেই কারখানা হারুদা? এইখেনেই বসি কোণের এই মোড়াটায়। এই কারখানায় বসেই তোমার কান্ড দেখা যাক।'

'কান্ড আর কী দেখবে ভাই! কাজটাজ আজকাল আর তেমন নেই। সেইজনেই তো উপরি উপায়ের· আশায় ইস্টিশনে যাওয়া।'

'আমার জুতো জোড়াটাই নিয়ে এসো দেখা যাক। বানানো হয়ে রয়েছে বললে না? সেইটেই তো প্রকান্ড। তাই দেখি।'

হারু ঘরে ঢুকে আনাচে কানাচে খুঁজে পেতে নিয়ে এলে জোড়াটিকে— 'এই নাও!'

'ওমা!' এযে কিছুই সারাওনি গো। তেমনিই রয়েছে...'

'দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে'খন। তুমিতো দুদিন রয়েছে হে এখন।'

'সেবারও তুমি ওই কথাই বলেছিলে— দুদিনের ভেতর সারিয়ে দেবে। এখনো তোমার মুখে সেই দুদিন?'

'লাগলে ঐ দুদিনই লাগে, বুঝেচ ভাই? তবে ঐ লাগাটাই মুস্কিল। এই আর কি! এত ব্যস্ত কিসের! সুস্থির হয়ে বোসো এখন চা-টা খাও। ভালো করে দেখি তোমায়।'

ভালো করে দেখতে গিয়ে হারুর চোখ ছানাবড়া।

'তোমার মুখটা আগের চেয়ে ঢের চকচকে হয়েছে দেখছি। ইস্নো পাউডার লাগিয়েছ বোধহয়!...তা বেশ তা বেশ!...' মুখের পর তার চুলের চাকচিক্যে নজর পড়েঃ 'উ বাবা! তোমার চুলের বাহারও তো কম নয় হে! কলকাতার হাওয়া লেগে মাথার ভোল পালটে গেছে...' গোবরার শীর্ষস্থানের দৃশ্য অর চোখ কেড়ে নেয়—'বাঃ, দিব্যি টেরি বাগিয়েছো দেখছি। এখানে থাকতে তো কই তোমার টেরি ফেরি দেখিনি কোনোদিন! ও বাবা! গায়ে কী আবার! এতো সিলক্ নয় ভাই, প্রায় সিলকের মতই যদিও...কী বললে, টেরিলিন? নয়া বিলিতি আমদানি? কলকাতার হালের ফ্যাশান এই বুঝি?'

গোবরার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে মাথার থেকে পায়ের পাতায় সে

তলিয়ে দেখে—'অদ্ভুত কাটছাঁটের এ জুতো কোথাকার হে! এতো এখান-কার না—আমার বানানো নয়ত! কী বললে? চীনে বাড়ির জুতো, টেরিটি বাজারে কেনা?'

টেরিলিন টপ্কে মাথার থেকে পায়ের টেরিটি পর্যন্ত বুলিয়ে হারুদার চোখ একেবারে ট্যারাটি!

'বাঃ, ডবোল টেরিটি বাগিয়ে বসেছো দেখছি। বেশ বেশ।' হারু বলেঃ 'আমাদের গাবু যে গাবুরনর হয়ে গেল গো! একেবারে লাট সাহেব।'

এই আলোচনার ফাঁকে একটা মুরগির বাচ্চা কোকর কোঁ করতে করতে কোত্থেকে ছুটে এসেছে...

'তোমার পরিবার ভুক্ত একজন? তাই না হারুদা? একান্নবর্তীর এক?'

'না। ভুক্ত হয়নি এখনো। তবে একান্নবর্তী পরিবারের একজন তা ঠিক। আজ পরিবারভুক্ত হবে।'

'আজ হবে? তার মানে?'

'মানে, তোমার খাতিরে ওকে কেটে খাব আজ আমরা। তাই বলছিলাম।'

'তোমার পরিবারের একজন কমে যাবে তো তাহলে?'

'বাড়লোও তো একজনা। তোমাকে নিয়ে সেই একান্নই রইলো।' হাসতে থাকে হারু।

'আমি আর কদিন এখানে! দাদা তার কাজের যে-বরাত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সেটার ব্যবস্থা করেই চলে যাব এখান থেকে—দু'একদিনের মধ্যেই।'

'ভালো কথা। তোমার দাদার কথা-টাই তো জানা হয়নি এখনো। কি কারণে এখানে তোমার আসা তাই তো এখনো বলোনি ভাই!'

'বলছি শোনো। গোড়ার থেকেই বলি সব। হয়েছিল কি, গত বছর দাদার আমার একটু পদস্খলন হয়েছিল...'

'ওরকম হয়। কারু কারু হয়ে থাকে বুড়ো বয়সে। হলে ভারী মারাত্মক। সহজে জোড়া লাগে না। ভাঙা বুক ভাঙাই থেকে যায়। যাকে বলে গিয়ে ঐ—ভগ্নহৃদয়।'

'না গো, বুক টুক নয়। পড়ে গিয়ে একটা পা ভেঙেছিলেন দাদা। কাছা-কাছি এক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পায়ে প্ল্যাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়েছিলেন দিন কতক।'

'তাই নাকি? তাহলে সে অন্য কথা।'

'সেই অন্য কথাই। সেখানে এক স্বামিজী, ও'দের ঐ মঠেরই, রোজ বিকেলে ধর্ম শিক্ষা দিতে আসতেন রুগীদের। দাদাকেও দিতেন। সেই থেকে দাদা সর্বধর্মসমন্বয় সমন্বয় করে প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন।'

'সর্বধর্মসমন্বয়টা আবার কী ব্যাপার? শুনিনি তো কখনো।' হারুর কাছে কথাটা নতুন ঠ্যাকে।

'মানে হিন্দু মুসলমান পার্শী কৃশ্চান, বৌদ্ধ জৈন সব ধর্মই এক। এমন কিছু করতে হবে যেখানে সবাই এক হয়ে সমান সমান মিলতে মিশতে পারবে—ধর্মকর্ম করতে পারবে এক সাথে। পরমহংসদেবের সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের জন্য দাদার এখন প্রাণ কাতর।'

'কিন্তু এতো দুচারদিনের কর্ম্মো নয় দাদা! তুমি বলছ দুদিন থাকবে এখানে, তাতে কি করে হয়?'

'কলকাতায় আমাদের কাজ না? অঢেল কাজ। দাদা কি পারে একলাটি? দাদার কাছে আমারও দ'কার দরকার যে!'

'তাহলে কী করে হয় ভাই? সমন্বয় বলে কথা, তাও আবার সর্বধর্মের। মন্দির মসজিদ গীর্জা কতো কী বানাতে হবে। কতো কাঠখড় পুড়বে। মিস্ত্রি মজুর খাটবে কতো। কতো ইঞ্জিনীয়ার কন্ট্রাক্টারের দরকার। টাকাও কতো লাগে কে জানে!'

'টাকার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। লাখ টাকার একটা সেলফ চেক কেটে দাদা আমার সঙ্গে দিয়েছে। সেটা আমি তোমার নামে এখানকার কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি না হয়। তারপর আরো যতো লাগে পাঠাবে দাদা। তুমি এই সব মিস্ত্রি মজুর ইঞ্জিনীয়ার কন্ট্রাকটার নিয়ে এর তদারকির ভার নিতে পারবে না?'

'পারব না কেন? এই মুল্লুকের যতো ইঞ্জিনীয়ার কন্ট্রাকটার সব আমার চেনা। তাদের মাথা আমার কেনা না হলেও তাদের পায়ের জুতো আমার থেকেই কেনা। তাদের হাত পা বাঁধা আমার কাছে। আমার কথায় রাজি হবে সবাই। আমার অবসর মত তাদের দিয়ে একাজ আমি ভালোই করতে পারবো। তাছাড়া, পুণ্য কাজও তো বটে।'

'তাহলে তার ব্যবস্থা করো আজকের মধ্যেই। আমি যেন রাতের ট্রেনেই ফিরতে পারি কলকাতায়। এখন ব্যাংকে চলো, তোমার নামে চেকটা জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে দিই গে।'

হারুর নামে লাখ টাকাটা ব্যাংকে দিয়ে সেদিনই গোবরা কলকাতায় ফিরে গেল

সর্বধর্মসমন্বয়-মন্দির বানানোর ভার নিল হারু।

ঠিক হোলো এই এলাকার যে জায়গায় সাপ্তাহিক হাট বসে, দূর দূরান্ত থেকে কেনাবেচা করতে আসে যতো লোক, হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান পার্শী সব্বাই—সেই হাটের মাঝখানেই হবে এই মন্দিরটা।

আগামী রথযাত্রার দিনে দাদা হর্ষবর্ধন এসে সেই সমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন ঠিক রইল।

রথযাত্রা তিথির যথাদিবসে হর্ষবর্ধন ভাইকে নিয়ে যথাস্থানে হাজির। সর্বধর্মসমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন।

'হারুদা, ঐ লাখটাকাতেই তোমার মন্দির ফন্দির গড়া হয়ে গেল সব? লাগলো না আর? লাগবে না আর?'

প্রথম দর্শনেই হর্ষবর্ধন চেক বই খুলে তৎপর।

'না না! আবার কিসের লাগবে! ঐ টাকাতেই হয়ে গেছে সমস্ত। কয়েক হাজার বেঁচে গেছে বরং। যারা ওর দেখা শোনা করবে, চালাবে, ঐ টাকার সুদে, তাদের বেতন বাবদে চলে যাবে। আর কিছু দিতে হবে না তোমাদের।'

'চলো, বাজারে গিয়ে ধর্মস্থানটা দেখে আসি আগে।' হর্ষবর্ধন কনঃ 'আমাকে আবার মন্ত্রিদের মতন দ্বারোদ্ঘাটন করতে হবেতো!'

'মন্ত্রিদের মতই তোমার জন্যেও আমি ফটোগ্রাফার মজুদ রেখেছি তাই। কিছু ভেবোনা ভাই। শহরের সেরা ফটোগ্রাফার।'

বাজারে গিয়ে হর্ষবর্ধন তো হতবাক!

বাজারের মধ্যিখানে বৃত্তাকারে সারি সারি পায়খানা!

'একী! হারুদা, মন্দির কই! আমার সমন্বয় মন্দির? এতো কেবল পায়খানা দেখছি দাদা।'

'প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিবমন্দির। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিঁদুরাই আসবে, মুসলমান ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না তার। মসজিদ গড়লেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউই ঘেঁষবে না অর দরজায়। গির্জা হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্মসমন্বয় আর হয় না। তাছাড়া, পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়ত মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু মুসলমান জৈন পার্শী ফেরেস্তান। কেউ বাকী থাকবে না। বলে দম নেবার জন্য হারু একটুখানি থামে।

'এধারের আধেকজুড়ে ঐ পায়খানাই। আর ওধারে আধেকটাজুড়ে বসিয়েছি এক পাইস হোটেল। হাটে বাজারে যারাই আসে সস্তায় যেন তারা দুমুঠো খেতে পায়......।

'এধারটা পাইখানা, আর ওধারটায় তোমার খানা পাই? এই ব্যাপার?' টিপ্পনি কাটে গোবরা।

'এই দুজায়গাতেই তুমি সব ধার্মিকের মিল পাবে ভাই! আহার করা আর বাহার করা—তাইতেই। সর্বধর্মসমন্বয় এইখানেই। ধর্ম আর কর্ম—দুয়েরই সমন্বয় এখানে। বলো তাই কিনা?'

'যা বলেছো!' বলেই হর্ষবর্ধন মুক্তকচ্ছ হন।

কাছা সামলাতে সামলাতে সামনে যেটা পড়ে সেটার দরজা খুলে সেঁধিয়ে পড়েন শশব্যস্তে।

সারধর্মের দ্বারোদ্ঘাটন হর্ষবর্ধনই করলেন সব প্রথম।

কোনি

মতি নন্দী
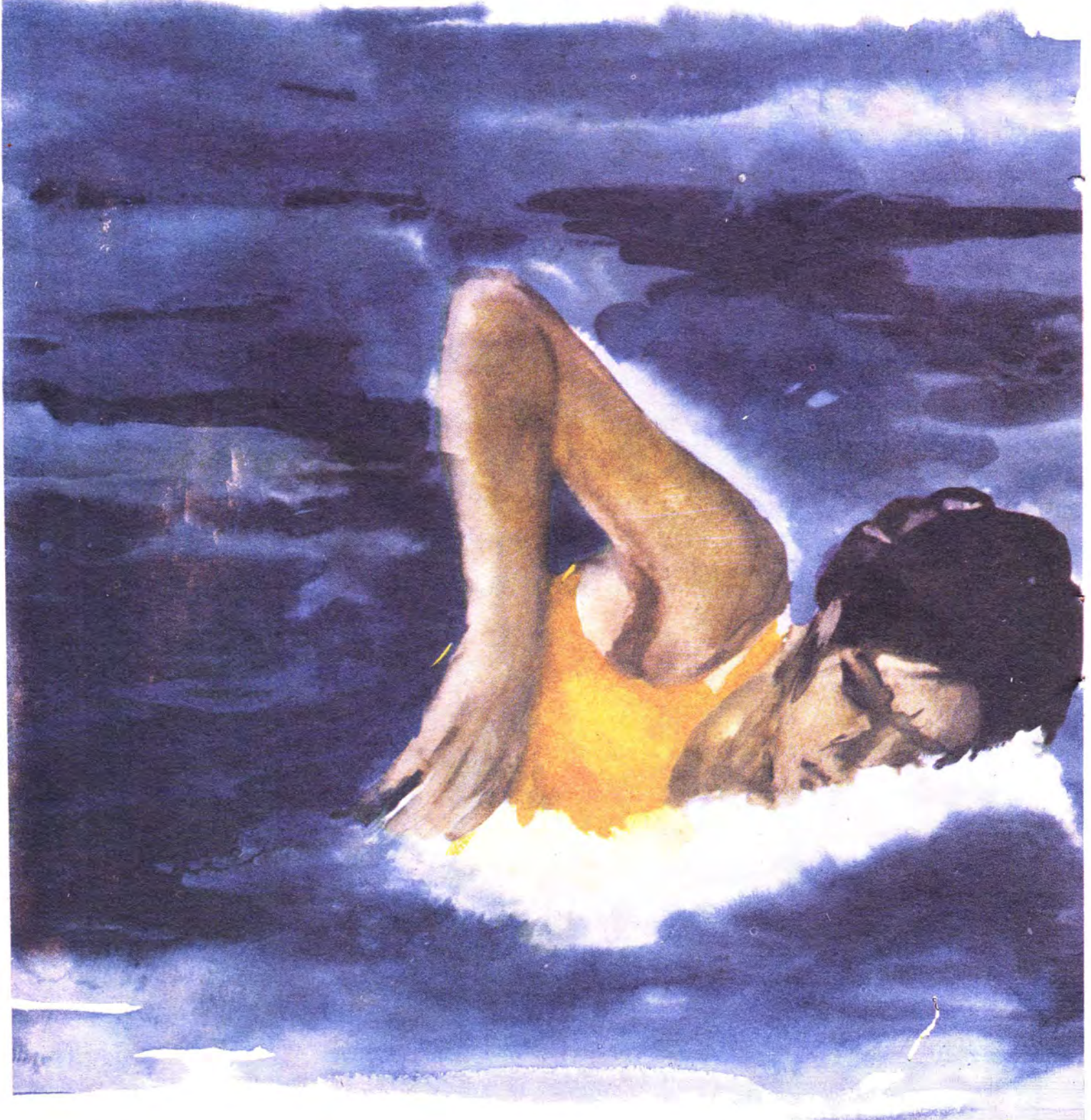
আজ বারুণী। গঙ্গায় আজ কাঁচা আমের ছড়াছড়ি।

ঘাটে থৈ থৈ ভীড়। বয়স্কাদের ভীড়টাই বেশি। সদ্য ওঠা কাঁচা আম মাথার উপর ধরে, ডুব দিয়ে উঠেই ফেলে দিচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে আম। কেউবা দূরে ছুড়ে ফেলছে।

ছোট ছোট দলে ছেলেরা জলে অপেক্ষা করে আছে আম সংগ্রহের জন্য। কেউ গলাজলে দাঁড়িয়ে, কেউবা দূরে ভেসে রয়েছে। আম দেখলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একসঙ্গে দু-তিনজন চীৎকার করতে করতে জল তোলপাড় করে এগিয়ে যায়। যে পায়, প্যাণ্টের পকেটে রেখে দেয়, পকেটটা আমে ভরে গিয়ে ফুলে উঠলে, জল থেকে উঠে ঘাটের কোথাও রেখে আসে। ও আমে হাত দেয়ার সাধ্য কারুর নেই। পরে আমগুলো ওরা বিক্রি করে পথের ধারে বসা বাজারে, অনেক কম দামে।

আজ গঙ্গায় ভাঁটা, জল অনেকটা সরে গেছে ঘাট থেকে। সিঁড়ি এবং তার দুধারে ইঁটবাঁধানো ঢালু পাড় শেষ হয়ে কিছুটা পলিমাটি, তারপর জল। স্নান করে, কাদা মাড়িয়ে বিরক্ত মুখে উঠে আসতে হচ্ছে। তারপর অনেকে যায় ঘাটের মাথায়, ট্রেন লাইনের দিকে মুখ করে বসা বামুনদের কাছে, যারা পয়সা নিয়ে জামাকাপড় জমা রাখে, গায়ে মাথার সর্ষে বা নারকেল তেল দেয় এবং কপালে চন্দনের ছাপ আঁকে। রাস্তার একধারে বসা ভিখারী-দের অনেকে উপেক্ষা করে, কেউ কেউ করে না। দুধারের ছোট ছোট নানান দেবদেবীর দুয়ারে এবং শিবলিঙ্গের মাথায় ঘটি থেকে গঙ্গাজল দিতে দিতে, কাঠের, প্লাস্টিকের, লোহার, খেলনার ও সাংসারিক সামগ্রীর দোকানগুলির দিকে কৌতূহলী চোখ রেখে অধিকাংশই বাড়ির দিকে এগোবে। পথের বাজার থেকে ওল বা থোড় বা কলম্বা লেবু ধরনের কিছু হয়তো কিনলেও কিনতে পারে। তারপর, রোদে তেতে ওঠা রাস্তায় খালি-পা দ্রুত ফেলে বাড়ি পৌঁছবে বিরক্ত মেজাজে।

তেলচিটে একটা ছেঁড়া মাদুরে উপুড় হয়ে বিষ্টুচরণ ধরও ডলাই-মালাই করাতে করাতে বিরক্ত মুখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। বিষ্টু ধর (পাড়ায় বেষ্টাদা) আই. এ. পাশ, অত্যন্ত বনেদী বংশের, খান সাতেক বাড়ি ও বড়বাজারে ঝাড়ন মশলার কারবার এবং সর্বোপরি সাড়ে তিনমণ একটি দেহের মালিক। ওরই সম-বয়সী চল্লিশ বছরের একটি বিশ্বস্ত অস্টিন সর্বত্র ওকে বহন করে।

বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ, হাত পনেরো দূরের একটা লোক। পরনে সাদা লুঙ্গি আর গেরুয়ার পাঞ্জাবি, কাঁধে রঙিন ঝোলা। তার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসছে। বিষ্টু বুঝতে পেরেছে লোকটা হাসছে তার দেহের আয়তন দেখে। এরকম হাসি, বাচ্চা ছেলেরাও হাসে। বিষ্টু তখন দুঃখ পায়, তার ইচ্ছা করে ছিপছিপে হতে।

কিন্তু বিষ্টু বিরক্ত হচ্ছে যেহেতু এই লোকটা মোটেই বাচ্চা নয়। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মেশালে যেমন দেখায়, মাথার কদমছাঁট চুল সেই রঙের। বয়সটা পঞ্চাশের এধারে বা ওধারে বছর পাঁচেকের মধ্যে হতে পারে। লোকটার গায়ের রঙ ধুলোমাখা পোড়ামাটির মত; আর চোখের চাহনি! ধূসর মণিদুটো দেখলে মনে হবে বোধহয় সূর্যের দিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাকিয়ে থেকেই মণির কালো রঙটা ফিকে হয়ে গেছে। চাহনিটা এমন, তার মনের সঙ্গে মেলে না সেইসব ব্যাপারগুলো ব্লোটর্চের মত পুড়িয়ে দিয়ে যেন ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। চোয়ালদুটোকে শক্ত করে ধরে আছে জেদ।

মালিশওলা হাঁটুটা বিষ্টুর কোমরে চেপে ধরে মেরুদণ্ড বরাবর ঘাড় পর্যন্ত দ্রুত ওঠানামা করাতে লাগল পিস্টনের মত। বার দশেক এইভাবে হাঁটু ব্যবহার করে মালিশওলা নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু জোড়া করে বিষ্টুর পিঠে দুহাতে কোদাল চালাল।

এরপর বিষ্টু চিৎ হবার চেষ্টা করল। পারছিল না, মালিশ-

ওলা ঠেলেঠুলে গড়িয়ে দিতেই সে অভীষ্ট লাভ করল। আত্মরক্ষাকারী গামছাটি ঠিকঠাক করে বিষ্টু গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল, "তানপুরো ছাড়।"

মালিশওলা দশ আঙুল দিয়ে বিষ্টুর সারা শরীর ধপাধপ চর্বিগুলো খামচে টেনে টেনে ধরে ছেড়ে দিতে লাগল।

"তবলা বাজা।"

মালিশওলা দশ আঙুল দিয়ে বিষ্টুর সারা শরীর ধপাধপ চাটাতে শুরু করল। চোখ বুঁজে প্রবল আরামে নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে বিষ্টুর মনে হল লোকটা নিশ্চয় এখন ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। বিষ্টু তখন খুবই বিরক্ত বোধ করে বলল "সারেগামা কর।"

মালিশওলা নির্দেশ পেয়েই আঙুলগুলো দিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে লাগল বিষ্টুর সর্বাঙ্গে। এতে সুড়সুড়ি লাগছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় চর্বি থলথল করে কেঁপে উঠতেই বিষ্টু শুনল খুক্‌খুক্ হাসির শব্দ।

চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু বলল, "এতে হাসির কি আছে, য়্যা?"

সেকেন্ড কুড়ি পর বিষ্টু জবাব শুনল, "মাসাজ হচ্ছে না সঙ্গীতচর্চা হচ্ছে।"

"যাই হোক্ না, তাতে আপনার কি?"

"ব্লাডপ্রেশারটা মেপেছেন?"

"আপনার দরকার?"

"ব্লাড শুগার পরীক্ষা করিয়েছেন? কোলেসটেরল লেভেলটাও দেখেছেন কি?"

'কে মশাই আপনি, গায়ে পড়ে এত কথা বলছেন। চান করতে এসেছেন, করে চলে যান।"

"তা যাচ্ছি। তবে আপনার হার্টটা বোধহয় আর বেশিদিন এই গন্ধমাদন টানতে পারবে না।"

"কি বললেন!"

বিষ্টু ধর উঠে বসার জন্য প্রথমে কাত হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটি তুলল। তারপর দুহাতে মেঝেয় চাপ দিয়ে উঠে বসল।

লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে বললঃ

"অবশ্য হাতি হিপোর কখনো করোনারি অ্যাটাক হয়েছে বলে শুনিনি, সুতরাং আমি হয়তো ভুলও বলতে পারি।"

বিষ্টু ধর রাগে কথা বলতে পারছে না, শুধু চোখ দিয়ে কামান দাগতে লাগল। লোকটি পাঞ্জাবী খুলল। লুঙ্গি খুলল। ভিতরে হাফ প্যান্ট।

অবশেষে বিষ্টু ধর কোনক্রমে বলল, "আপনাকে যে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।"

আমার বৌও ঠিক এই কথাই বলে।"

"আপনি একটা ন্যুইসেন্স।"

'আমার ক্লাবের অনেকে তাই বলে।"

"আপনার মত লোককে চাবকে লাল করা উচিত।"

লোকটি আবার ছেলেমানুষের মত পিটপিট করে তাকাল।

"আচ্ছা, আমি যদি আপনার মাথায় চাটি মারি, আপনি দৌড়ে আমায় ধরতে পারবেন?"

কথাগুলো বলেই লোকটি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছোটার ভঙ্গিতে জগিং শুরু করল। অনেকে তাকাল, অনেকে ভাবল পাগল।

বিষ্টু হতভম্ব হয়ে লোকটির জগ করা দেখতে লাগল। হঠাৎ বিষ্টুর পাশ দিয়ে লোকটি ছুটে গেল হাত বাড়িয়ে, বিষ্টু ডুব দেবার মত মাথাটা নিচু করল।

"পারবেন ধরতে? আমার কিন্তু আপনার থেকে অনেক বয়েস।"

জগ্ করতে করতে লোকটি আবার এগিয়ে আসছে। বিষ্টু ধর বুনো মোষের মত তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। তাইতে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে শরীরটাকে দুলিয়ে ডাইনে এবং বামে তিড়িং তিড়িং লাফালাফি শুরু করল। বিষ্টু থাবার মতো দুটো হাত তুলে অপেক্ষা করছে। দৃশ্যটা অনেককে আকৃষ্ট করল।

"আমি রোজ একসারসাইজ করি। আইসোমেট্রিক, ক্যালিসথেনিক, বারবেল, বুঝলেন, রোজ করি। দারুণ খিদে পায়। আপনার পায়?"

বিষ্টু ধর কথা না বলে, শুধু 'ঘোঁৎ' ধরনের একটা শব্দ করল।

"খিদের মুখে যা পাই তাই অমৃতের মত লাগে, এই সুখ আপনার আছে?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই লোকটি জগ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে শেষ ধাপ পর্যন্ত গিয়ে আবার উঠে এল।

তিনবার এইভাবে ওঠানামা করে সে বিষ্টু ধরের পাঁচ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। হাত দুটো নামিয়ে বিষ্টু তখন খানিকটা দিশাহারার মতই লোকটির কান্ড দেখছিল। ওর চোখে এখন রাগের বদলে কৌতূহল। মনে মনে সে ছিপছিপে শরীরটার সঙ্গে নিজের স্থূলত্ব বদলাবদলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

"খাওয়ায় আমার লোভ নেই। ডায়টিং করি।" ভারিক্কি চালে বিষ্টু ধর ঘোষণা করল এবং গলার স্বরে বোঝা গেল এর জন্য সে গর্বিত।

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "কি রকম ডায়টিং!"

"আগে রোজ আধ কিলো ক্ষীর খেতুম এখন তিনশো গ্রাম খাই, জলখাবারে কুড়িটা লুচি খেতুম এখন পনেরোটা, ভাত খাই মেপে আড়াইশো গ্রাম চালের, রাতে রুটি বারোখানা। ঘি খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, গরম ভাতের সঙ্গে চার চামচের একবিন্দুও বেশি নয়। বিকেলে দু গ্লাশ মিছরির সরবৎ আর চারটে কড়াপাক। মাছ-মাংস ছুঁই না, বাড়িতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছে। আর হপ্তায় একদিন ম্যাসাজ করাই এখানে এসে। আমার অত নোলা নেই, বুঝলেন, সংযম কেচ্ছসাধন আমি পারি। হাটের ব্যামো-ফ্যামো আমার হবে না, বংশের কারো হয়নি। বাজি ফেলে সত্তরটা ফুলুরি খেয়ে কলেরায় বাবা মারা গেছে, জ্যাঠা গেছে অম্বলে।"

"এত কেচ্ছসাধন করেন! বাঁচবেন কি করে।"

লোকটি এগিয়ে এসে বিষ্টু ধরের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দিল।

"আ' সুড়সুড়ি লাগে," বিষ্টু হাতটা সরিয়ে দিয়ে ক্ষুন্নস্বরে বলল, "আমার বৌও ওই কথা বলে। সকাল থেকে রাত অবধি গদিতে বসি, সর্ষে, চিনি, ডাল নানান জিনিষের কারবার। এত খাটুনির পর এইটুকু খাদ্য! তারপর এই অপমান।"

"কে করল?"

লোকটি আবার হাত বাড়াতেই বিষ্টু একপা পিছিয়ে বলল, "না, সুড়সুড়ি লাগে।"

"কে অপমান করল?"

"কেন, আপনি হাতি-হিপো বললেন না! জলহস্তির ইংরাজি হিপো তা কি আমি জানি না, আমি কি অশিক্ষিত?"

"না না, আমি আপনাকে অশিক্ষিত তো বলিনি।" লোকটি বিব্রত হয়ে চশমা মুছতে মুছতে বলল, "আপনার ওজনটা খুব বিপজ্জনক হার্টের পক্ষে।"

"বিপজ্জনক মানে?" বিষ্টু ধর তাচ্ছিল্য প্রকাশের চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত স্বর। "আমি কি মরে যেতে পারি!"

"তা পারেন। আর নয়তো কেচ্ছসাধনের কষ্ট করতে করতে, রোগে ভুগে ভুগে বেঁচে থাকবেন কয়েকটা বছর।"

বলেই লোকটি দু হাত তুলে সামনে ঝুঁকে পিঠটা ধনুকের মত বেঁকাল। হাতের আঙুল পায়ে ছুঁইয়ে আবার সিধে হল।

"আপনি আমার থেকে চার হাজার গুণ বড়লোক কিন্তু চার লক্ষ টাকা খরচ করেও আপনি নিজের শরীরটাকে চাকর বানাতে পারবেন না।"

"কি রকম! কি রকম!"

লোকটি তার ডান কনুই শরীরে লাগিয়ে পিস্তল ধরার মত হাতটা সামনে বাড়াল।

"এইবার আমার হাতটা নামান তো।"

অবিশ্বাসভরে বিষ্টু ধর হাতটার দিকে তাকাল। শিরা উপশিরা গাঁট সমেত হাতটাকে শুকনো শিকড়ের মত দেখাচ্ছে।

"নামান্, নামান্।"

ফুলো ফুলো আঙুল দিয়ে বিষ্টু লোকটার কব্জি চেপে ধরে নিচের দিকে চাপ দিল। নড়ল না এক সেন্টিমিটারও। ঠোঁট কামড়ে বিষ্টু জোরে চাপ দিল। হাতটা একই জায়গায় রয়েছে। বিষ্টু এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। কপালে ঘাম ফুটছে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। তাদের চোখে বিস্ময়, লোকটার সাফল্যে না বিষ্টুর ব্যর্থতায় বোঝা যাচ্ছে না। বিষ্টু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে পাতলা হাসি আর চোখ পিটপিটানি দেখতে পেল। হাতটা সে নিচে নামাতে পারছে না। বিষ্টু হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

"কি করে পারলেন!"

"জোর বলতে শুধু গায়ের জোরই বোঝায় না। মনের জোরেই সব হয়। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শরীরের দুর্বলতা ঢাকা দেওয়া যায়। শরীর যতটা করতে পারে ভাবে, তার থেকেও শরীরকে দিয়ে বেশি করাতে পারে ইচ্ছার জোর। সেজন্য শুধু শরীর গড়লেই হয় না, মনকেও গড়তে হয়। শরীরকে হুকুম দিয়ে মন কাজ করাবে। আপনার মন হুকুম করতে জানে না তাই শরীর পারল না।"

বিষ্টু ধর বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে বলল, "ইচ্ছে করে খুব রোগা হয়ে যাই।"

ঠিক এই সময়ই গঙ্গার তীর থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল, "কো ও ও ও...নি ই ই ই। কো ও ও ও...নি ই ই ই"

লোকটি গঙ্গার দিকে তাকাল।

গঙ্গায় একটা আম ভেসে চলেছে ভাঁটার টানে। তিনজন সাঁতরাচ্ছে সেটাকে পাবার জন্য। কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু-তিনটি বছর চোদ্দ-পনেরোর ছেলে জল থাবড়ে হৈচৈ করে ওদের তাতিয়ে তুলছে। সমানে-সমানে ওরা যাচ্ছে। মাথা তিনটে দুধারে নাড়াতে নাড়াতে, কনুই না ভেঙ্গে সোজা হাত বৈঠার মত চালিয়ে ওরা আমটাকে তাড়া করেছে।

হঠাৎ ওদের একজন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করল, অন্য দুজনকে পিছনে ফেলে। তখনই চীৎকার উঠল— "কো ও ও ও...নি ই ই ই। কো ও ও ও...নি ই ই ই।" পিছিয়ে পড়া দুজনও গতি বাড়াল।

আমটা প্রায় প্রথম ছেলেটির মুঠোয় এসে গেছে। হঠাৎ সে

থমকে গেল। হাত ছুঁড়ছে কিন্তু এগোল না। বার দুয়েক তার মাথাটা জলে ডুবল। তারপর সে রাগে চীৎকার করে ঘুরে গিয়ে লাথি ছুঁড়ল।

ততক্ষণে পিছন থেকে একজন ওকে অতিক্রম করে আমটা ধরে ফেলেছে।

"পা টেনে ধরেছিল।" বিষ্টু ধর বলল।

লোকটি হেসে চশমাটা খুলে ঝোলায় রাখল। ঘাটের বাইরের দিকে যেখানে কয়েকজন উড়িয়া ব্রাহ্মণদের একজনের কাছে ঝোলাটা রেখে এসে, লোকটি অতি সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। চশমা ছাড়া, মনে হচ্ছে লোকটি যেন অন্ধ।

জলের কিনারে কাদার উপর তখন মারামারি হচ্ছে, একজনের সঙ্গে দুজনের। কাদা ছিটকোচ্ছে। লোকেরা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে সরে গেল। দু-তিনটি ছেলে ওদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

"ঠিক হ্যায়, চালা, আরো জোরে।"

পা থেকে মাথার চুল কাদায় লেপা কঞ্চির মত সরু চেহারাটা তার লম্বা হাত দুটো এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। অন্য দুজন সেই বিপজ্জনক বৃত্তের বাইরে কুঁজো হয়ে তাক্ খুঁজছে।

"ফাইট, কোনি ফাইট। চালিয়ে যা বক্সিং।"

দু'জনের একজন পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। পড়ে গেল দুজনেই।

"অ্যাই অ্যাই ভাদু, চুল টানবি না কোনির। তাহলে কিন্তু আমরা আর চুপ করে থাকব না।"

কোনির পিঠের ওপর বসা ভাদু, চুল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে কোনির মাথা ধরে, কাদায় মুখটা ঘষে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কোনি পা ছুঁড়ল।

কোমরে চাড় দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। তারপর ঝটকা দিয়ে ভাদুর ডান হাতটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কামড়ে ধরল দুটো আঙুল।

চীৎকার করে ভাদু লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাদুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"খুবলে নোব তোর চোখ, বার কর আম। আমাকে চোবানো! পুঁতে রাখব তোকে এই গঙ্গামাটিতে। হয় আম দিবি নয় চোখ নোব।"

দু'হাতের দশটা আঙুল ঈগলের নখের মত বেঁকিয়ে চিৎ হয়ে পড়া ভাদুর চোখের সামনে কোনি এগিয়ে আসতেই, দু'টি ছেলে ওকে ঠেলে সরিয়ে আনল।

"ছেড়ে দে চণ্ডু, হাত ছাড় কান্তি। শোধ নিয়ে ছাড়ব। আমাকে চোবানো?"

কোনির ঠোঁটের কোণে ফেনা, সামনের দাঁত হিংস্রভাবে বেরিয়ে রয়েছে। হিলহিলে লম্বা দেহটা সামনে-পিছনে দুলছে কেউটের ফণার মত।

"এই ভাদু, ও আম কোনির। বার করে দে। নয়তো সত্যিই চোখ তুলে নেবে কিন্তু!"

ভাদু ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে দেখছিল। শিউরে উঠে বলল, "রক্ত বেরোচ্ছে! দাঁত বসিয়ে গর্ত্তো করে দিয়েছে।"

কোনির হাত ছেড়ে দিয়ে কান্তি এগিয়ে এসে ভাদুর প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। কয়েকটা কাঁচা আম বার করে, বড়টি বেছে নিয়ে কোনির দিকে ছুঁড়ে দিল।

লুফে নিয়েই কোনি কামড় বসাল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত মুখে বলল, "কি টক্ রে বাবা। মা গঙ্গাকে এমন আমও খেতে দেয়!"

আমটা জলে ছুঁড়ে দিয়ে সে মুখ থেকে ছিবড়ে ফেলতে ফেলতে ভাদুর কাছে এল।

"দেখি তো কেমন গর্ত্তো হয়েছে।"

খপ করে ভাদুর হাতটা ধরে সে ভ্রূ কুঁচকে আঙুলটা তুলে দেখল।

"ভাগ্, কিছুছু হয়নি। নাম্ নাম্ জলে নাম্। যেমন কাজ করেছিস তেমনি ফল পেয়েছিস। আমাকে রাগালে কি হয়, এবার বুঝলি তো।"

কয়েকটি ডুব দিয়ে লোকটি কোমড়জলে দাঁড়িয়ে গামছা ঘষছিল পিঠে। কানে এল পাশের এক বৃদ্ধের আপনমনের গজ-গজানি।

"জ্বালিয়ে মারে হতভাগারা। গঙ্গার ঘাটটাকে নোংরা করে রেখেছে হাঘরে হাভাতের দল। মা গঙ্গাকে উচ্ছুগ্‌গো করা আমই রাস্তায় বসে বেচবে। জুটেছে আবার এক মেয়েমন্দানী, বাপ-মাও কিছু বলে না।"

লোকটি আবার ডুব দিতে যাচ্ছিল থেমে গিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল

"মেয়ে মন্দানীটা কে!"

"কে আবার, দেখতে পাননি, চোখ তো একজোড়া রয়েছে।"

লোকটি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। চশমাছাড়া চোখে ঝাপসাভাবে দেখল, ভাদুর হাত ধরে কোনি টানাটানি করছে। কাদামাখা কোনির মধ্য দিয়ে এক একবার একটি মেয়ে ফুটে ফুটে উঠছে যেন। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কাদামাখা চুল মাথায় বসে। প্যান্টে গোঁজা গেঞ্জী শরীরের সঙ্গে লেপটে দ্বিতীয় পরত চামড়া হয়ে আছে। দীর্ঘ সরু দেহ। সরু পা, সরু হাত। লোকটি ঠাওর করতে পারছে না, কোনি ছেলে কি মেয়ে।

দুটো ঢেউ পরপর লোকটিকে ধাক্কা দিল। বিষ্টু ধর জলে নেমেছে।

"আচ্ছা শরীরটাকে চাকর বানানো, সেটা কি ব্যাপার?"

"সোজা ব্যাপার। লোহা চিবিয়ে খেয়ে হুকুম করবেন হজম করো, পাকস্থলী হজম করবে। বলবেন, পাঁচ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে চলো, পা জোড়া অমনি পৌঁছিয়ে দেবে। সখ হল গাছের ডাল ধরে ঝুলবেন, হাত দুটো আপনাকে ঝুলিয়ে রেখে দেবে। এইসব আর কি।"

লোকটি জল থেকে উঠে আলতোভাবে মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়িতে দাঁড়াল। ভিজে গামছাটা নিংড়ে পায়ে লাগা মাটি ধুয়ে গঙ্গার দিকে তাকাল। ঝাপসাভাবে দেখল, পাড়ের কাছে জলে

কিলবিল করছে মানুষ। তার মধ্যে কোনিকে চিনে নেওয়া সম্ভব হল না।

লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরে, ঝোলা কাঁধে, চশমা মুছতে মুছতে লোকটি একবার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল, চশমা চোখে দিয়ে পাড়ের ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল, হঠাৎ নজরে এল গঙ্গার বুকে চারটি কালো ফুটকি। তারা সিকি গঙ্গা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

"কোনি। কো ও ও নি।"

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভিজে গামছাটি পাগড়ির মত মাথায় জড়িয়ে লোকটি বাড়ির পথে রওনা হল।

মিনিট পনেরো পর, সরু গলির মধ্যে একতলা টালির চালের একটি বাড়িতে লোকটি ঢুকল। সদর দরজার পরই মাটির উঠোন। টেনেটুনে একটা ভলিবল কোর্ট তাতে হয়ে যায়। লঙ্কা, পেঁপে গাঁদা, জবা থেকে চালকুমড়ো পর্যন্ত, উঠোনটা নানান গাছে দখল হয়ে আছে। একদিকে টিনের চালের রান্নাঘর ও কলঘর আর একদিকে দালান ও তার পিছনে দুটি ঘর। একতলা বাড়িটি চারদিকের উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে খুব শান্তভাবে যেন উবু হয়ে বসে। উত্তর দিকের বাড়ির মালিক হলধর বর্ধন এই একতলা বাড়িটি কেনার জন্য বারদুয়েক প্রস্তাব করেছে, কিন্তু লোকটি, সংসারে যার স্ত্রী এবং দুটি বিড়াল ছাড়া আর কেউ নেই, বিনীত ভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করে।

বাড়ির কলে জল আসে সামান্য। লোকটির স্ত্রীর নাম লীলাবতী। জল খরচ করাটা লীলাবতীর সখ, বিড়াল পোষার মতই। ফলে লোকটিকে স্নান করার জন্য প্রায়ই রাস্তার টিউবওয়েলটির সাহায্য নিতে হয়। আজ সকাল থেকে টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে না। তাই বহুকাল পর সে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে উঠোনে টানানো তারে ভিজে প্যান্টটা মেলছে, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ঢলঢলে প্যান্ট পরা বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট একজন।

"ক্ষিদ্দা, তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছি, আর বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। দোকান থেকে কে বৌদিকে ডাকতে এসেছিল, 'আসছি' বলে সেইযে গেছে!"

"ভেলো, চটপট একটু চা বানা দেখি।"

"বৌদি যদি এসে পড়ে!"

ক্ষিদ্দা অর্থাৎ ক্ষিতীশ সিংহ কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "তাহলে থাক্ বরং তুই কিজন্যে এসেছিস বল?"

"ক্লাবের আজকের মিটিংয়ে যাবে নাকি?"

"নিশ্চয় যাব, ছেলেরা খাটবে না, ডিসিপ্লিন মানবে না, জলে নেমে শুধু ইয়ারকি ফাজলামো করবে। এসব ছেলেদের ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে বলাটা কি এমন দোষের! একজনও কি ভাবে? আর ক্ষিতীশ সিংগ কি বলল অমনি তাই নিয়ে কাউনসিলের মিটিং ডাকা হল।"

"সেজন্য তো নয়, আসলে হরিচরণদা আর তার গ্রুপটার রাগ আছে তোমার ওপর। ওরাই শ্যামল আর গোবিন্দকে উসকে তোমার এগেনস্টে চার্জ আনিয়েছে।"

"আমি তা জানি। হরিচরণের বহুদিনের ইচ্ছে চিফ্ ট্রেনার হওয়ার। আমাকে বলেওছিল গত বছর। আমি বলেছিলুম, হরি, একটা চ্যাম্পিয়ন শুধু খাওয়াদাওয়া আর ট্রেনিং দিয়েই তৈরী করা যায় না রে। তার মনমেজাজ বুঝে তাকে চালাতে হয়। ট্রেনারকে মনস্তাত্ত্বিক হতে হবে, তার মানে কমন সেন্স প্রয়োগ করতে হবে। গুরুকে শ্রদ্ধেয় হতে হবে শিষ্যের কাছে। কথা, কাজ, উদাহরণ দিয়ে মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বাসনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাকে মোটিভেট করতে হবে। এসব তোর দ্বারা সম্ভব নয়। তুই শুধু চেঁচামেচি গালাগালি করেই খাটাতে চাস, চিফ্ ট্রেনার হওয়া তোর কম্মো নয়।"

"ক্ষিদ্দা, তোমার এই লেকচার দেবার বদ অব্যেসটা ছাড়ো। এককথায় যেখানে কাজ হয়, তুমি সেখানে দশ কথা বলো। হরিচরণদাকে অত কথা বলার কি দরকার ছিল। যাক্‌গে, আজ তুমি মিটিংয়ে যেও না, ওরা ঠিক করেছে তোমাকে অপমান করবে।

"করে করবে।" এই বলে ক্ষিতীশ তার পায়ে মাথা ঘষায় ব্যস্ত বিশুকে কোলে তুলে, চুলকে দিতে লাগল। চোখ বুজে বিশু ঘর্‌র ঘর্‌র শুরু করল।

"তাহলে যাবেই।" নেমে যাওয়া প্যাণ্ট এবং কণ্ঠস্বর হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে তুলে ভেলো বলল

ক্ষিতীশ ঘরের দিকে যেতে যেতে অস্ফুটে বলল, "হুঁ।"

তখনই বাড়িতে ঢুকল লীলাবতী সিংহ। অতি ছোট্টখাট্ট, গৌরবর্ণা এবং গম্ভীর। পায়ে চটি হাতে ছাতা। দুজনের দিকে তাকিয়ে অবশেষে ভেলোকে বলল, "বেলা অনেক হয়েছে, চাট্টি ভাত খেয়ে যেও।"

ভেলোর হঠাৎ যেন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ঘড়ি দেখেই ব্যস্ত হয়ে বলল, "না না বৌদি, ইস্‌স্ বড্ড দেরী হয়ে গেল, বাড়িতে ভাত নিয়ে বসে আছে। আমি এখন যাই। ক্ষিদ্দা তোমার কিন্তু না গেলেই ভাল"

ভেলো চলে যেতেই লীলাবতী প্রশ্ন করল ক্ষিতীশকে। "না গেলেই ভাল মানে?"

"আজ ক্লাবের একটা মিটিং আছে। ও বলছে সেখানে আমাকে নাকি কেউ কেউ অপমান করবে যাতে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে যাই।"

"তাহলে তো ভালই হয়। ক্লাব-ক্লাব করে তো কোনদিন ব্যবসা দেখলে না। আমি মেয়েমানুষ, আমাকেই কিনা দোকান দেখতে হয়। নেহাত ছেলেপুলে নেই তাই। যদি ক্লাব তোমায় তাড়ায় তাহলে আমি বেঁচে যাই।"

লীলাবতী রান্নাঘরে ঢুকল। ক্ষিতীশ বিষণ্ণ চোখে দালানে বসে বিশুর মাথায় আনমনে হাত বোলাতে লাগল। এই সময় খুশি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডন দিয়ে, হাই তুলে ধীরে ধীরে সে চামরের মত কালো লেজটি উঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল ক্ষিতীশের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে।

"কই, এসো।" রান্নাঘর থেকে ডাক এল।

ক্ষিতীশ অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে গিয়ে ভাত খেতে বসল। খাওয়ার আয়োজন সামান্য। রান্না হয় কুকারে। প্রায় সবই সিদ্ধ। এটা খরচ, সময় ও শ্রম সংক্ষেপের জন্য নয়। ক্ষিতীশ বিশ্বাস করে, বাঙালিয়ানা রান্নায় স্বাস্থ্য রাখা চলে না। এতে পেটের বারোটা বাজিয়ে দেয়। সেইজন্যই বাঙালীরা শরীরে তাগদ পায় না, কোন খেলাতেই বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না। খাদ্যপ্রাণ যথাসম্ভব অটুট থাকে সিদ্ধ করে খেলে এবং সর্বাধিক প্রোটিন ও ভিটামিন পাওয়া যায় এমন খাদ্যই খাওয়া উচিত।

প্রথম দিকে লীলাবতী বিদ্রোহী হয়েছিল, সরষেবাটা, শুকনো লঙ্কাবাটা, পাঁচফোড়ন, জিরে, ধনে প্রভৃতি বস্তুগুলি রান্নায় ব্যবহারের সুযোগ হারিয়ে। তুমুল ঝগড়া এবং তিনদিন অনশন সত্যাগ্রহেও কাজ হয়নি। ক্ষিতীশ তার সিদ্ধান্তে গোঁয়ারের মত অটল থাকে। তার এক কথা ঃ 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়।' অবশেষে লীলাবতী সপ্তাহে একদিন সরষে ও লঙ্কা বাটা ব্যবহারের অনুমতি পায়, শুধুমাত্র নিজের খাবারের জন্য। ক্ষিতীশ কখনো যজ্ঞিবাড়ির নিমন্ত্রণে যায় না। ক্লাবের ছেলে-মেয়েদের সে প্রায়ই শোনায় ঃ 'ডাক্তার রায় বলতেন, বিয়ে বাড়ির এক একটা নেমন্তন্ন খাওয়া মানে এক একবছরের আয়ু কমে যাওয়া। বড় খাঁটি কথা বলে গেছেন।'

ক্ষিতীশ কথা না বলে খাওয়া শেষ করল।

ও যে রাগ করেছে লীলাবতী বুঝতে পেরেছে। বলল, "ক্লাব থেকে তাড়াবে কেন? কি দোষ করলে?"

ক্ষিতীশ পাল্টা প্রশ্ন করল, "তুমি এখন আবার দোকানে গেছলে কেন?"

গ্রে স্ট্রিটে ট্রামলাইন ঘেঁষে একফালি ঘরে দোকানটি। নাম 'প্রজাপতি'। আগে নাম ছিল 'সিন্‌হা টেলারিং'। দুটি দর্জিতে জামা-প্যাণ্ট তৈরী করত, আর দেয়াল আলমারিতে ছিল কিছু সিন্থেটিক কাপড়। ক্ষিতীশ তখন দোকান চালাত। দিনে দু-ঘণ্টাও দোকানে বসত না। দুপুর বাদে তাকে সর্বদাই পাওয়া যেত জুপিটার সুইমিং ক্লাবে। তারপর একদিন সে আবিষ্কার করল আলমারির কাপড় অর্ধেকেরও বেশি অদৃশ্য হয়েছে, দোকানের ভাড়া চার মাস বাকি এবং লাভের বদলে লোকসান শুরু হয়েছে।

তখনই লীলাবতী হস্তক্ষেপ করে, দোকানের দায়িত্ব নেয়। টেলারিং ডিপ্লোমা পাওয়া দুটি মহিলাকে নিয়ে সে দোকানটিকে ঢেলে সাজায় নিজের গহনা বাঁধা দিয়ে। নাম দেয় 'প্রজাপতি'। পুরুষদের পোশাক তৈরী বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র মেয়েদের এবং বাচ্চাদের পোশাক তৈরী শুরু করে। দোকানে পুরুষ কর্মচারী নেই এবং চার বছরের মধ্যেই 'প্রজাপতি' ডানা মেলে দিয়েছে। কাউণ্টারে বসার জন্য আর একটি মেয়ে রাখা হয়েছে। আগে তিনদিনে ব্লাউজ তৈরী করে দেওয়া হত, এখন দশদিনের আগে সম্ভব হচ্ছে না। লীলাবতী তার গহণাগুলির অর্ধেকই ফিরিয়ে এনেছে।

"এখন তো আর জায়গায় কুলোয় না, তাই বড় ঘর খুঁজছি। হাতিবাগানের মোড়ে একটা খোঁজ পাওয়া গেছে। আমাদেরই এক খদ্দেরের বাড়ি। বাড়ির গিন্নি এসেছিল মেয়ের ফ্রক করাতে। তাই গেছলুম কথা বলতে।" লীলাবতী এঁটো থালাটা টেনে নিয়ে তাতে ভাত বেড়ে, ডাল মাখতে মাখতে বলল।

ক্ষিতীশের প্রবল আপত্তি ছিল তার খাওয়া থালায় লীলাবতীর ভাত খাওয়ায়। 'আনহাইজীনিক'। এইসব কুসংস্কারেই বাঙালী জাতটা গোল্লায় গেল।' এই বলে ক্ষিতীশ তর্ক শুরু করেছিল। কিন্তু লীলাবতী যখন অতিরিক্ত ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'এটা আমার ব্যাপার, মাথা ঘামিও না।' তখন সে মুহূর্তে বুঝে যায়, আর কথা বাড়ালে তাকেই গোল্লায় যেতে হবে। তবে ক্ষিতীশ তার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। লীলাবতীর খাওয়ার সময় তাই কখনোই সে সামনে থাকে না।

শোবার ঘরের দেয়ালে ক্ষিতীশের বাবা-মা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ এবং ম্যাগাজিন থেকে কেটে বাঁধানো মেডেল গলায় ডন শোলাণ্ডার ও ভিকট্রি স্ট্যাণ্ডে দু'হাত তুলে দাঁড়ানো ডন ফ্রেজারের ছবি, পাশাপাশি টাঙানো। এছাড়া আছে—সাধারণত যা থাকে, খাট, আলমারি, বাক্স, আলনা এবং টুকিটাকি সাংসারিক জিনিষ। পাশের ঘরে বই, ম্যাগাজিন একটা তক্তপোশ এবং তার নীচে ট্রেনিংয়ের জন্য রবারের দড়ি, স্প্রিং, লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এই ঘরে ক্ষিতীশ দুপুরে এক ঘণ্টা ঘুমোয়। পাখা নেই, বিছানা নেই। ওর মতে, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে শুধু শিষ্যকেই নয়, গুরুকেও কঠোর জীবন যাপন করতে হবে। অবশ্য তার কোন শিষ্য নেই।

তক্তপোশে শুয়ে চোখবুজে ক্ষিতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শিষ্য কোথায়?

ঘুম আসার ঠিক আগের মুহূর্তে, ক্ষিতীশের আবছায়া চেতনায় ফুটে উঠল লম্বা দুটো হাত বৈঠার মত গঙ্গার জলে উঠছে আর পড়ছে।

মিলিয়ে গিয়ে নতুন আর একটি ছবি সে দেখল। ফণা তোলা

কেউটের মত হিলহিলে কাদায় লেপা সরু একটা দেহ। লম্বা লম্বা হাত এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। 'ফাইট কোনি ফাইট।'

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ক্ষিতীশ অকারণেই অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "কো ও ও নি।"

সম্ভবত নামটা তার ভাল লেগেছে।

টেবল টেনিস বোরডটায় কাপড় বিছিয়ে টেবল। সেটা ঘিরে সাত জন বসে। তার মধ্যে একটি চেয়ার খালি। ওরা চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ঘরের বাইরে কয়েকটি ছেলে, কার যেন প্রতীক্ষায়।

জুপিটার সুইমিং ক্লাবের নতুন প্রেসিডেণ্ট এবং এম এল এ বিনোদ ভড়, ডানদিকে ঝুঁকে সম্পাদক ধীরেন ঘোষকে বলল, "একটাই অ্যাজেণ্ডা, না আরো আছে?"

ধীরেন ঘোষ তার সরু গলাটি যথাসম্ভব লম্বা করে চশমার নীচের অংশের প্লাস পাওয়ারের মধ্য দিয়ে টেবলে রাখা কাগজের দিকে তাকাল।

মেন আইটেম একটাই, আর যা আছে তা খুবই মাইনর।"

"কোরাম হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ, সবাই হাজির।" ধীরেন ঘোষ এরপর ব্যস্ত হয়ে বলল, "জগু চা-সন্দেশ দিতে বল।"

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাত্র, তখনই দরজাটা খুলে গেল। ক্ষিতীশ সিংহ ঘরের প্রতিটি লোকের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে, প্রেসিডেণ্টের মুখোমুখি খালি চেয়ারটায় বসার আগে সভাকে নমস্কার জানাল।

জগু জিজ্ঞাসু চোখে ধীরেন ঘোষের দিকে তাকাল, মাথা হেলিয়ে ধীরেন ঘোষ বলল, "একটু পরে আনবি।"

"আমার দেরী হয়ে গেল।" ক্ষিতীশ ফিকে হেসে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল।

"না না, মিনিট চারেক মাত্র দেরী হয়েছে।" বিনোদ ভড় ঘড়ি দেখে ধীরেন ঘোষকে বলল, "আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, এখুনি শুরু করছি। বেশিক্ষণ লাগার মত কিছুই নেই, শুধু সুইমারদের চিঠিটা ছাড়া। আর সেটা আগেই সারকুলেট করা হয়েছে, সুতরাং নতুন করে বলার কিছু নেই।"

"হ্যাঁ আছে।"

সবাই ক্ষিতীশের দিকে তাকাল।

"আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই। সেগুলো জানতে চাই।"

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বিনোদ ভড় বলল "ধীরেনবাবু, ওর বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ উঠেছে সেগুলো তাহলে বলুন।"

ধীরেন ঘোষ বিব্রতভাবে হরিচরণ মিত্তিরের দিকে তাকাল, হরিচরণ নড়েচড়ে বসল।

"ক্ষিদ্দা সম্পর্কে অভিযোগ ছেলেদের, মানে সুইমারদের। যারা সাত বছর, আট বছর আমাদের ক্লাবের হয়ে বিভিন্ন কম্পিটিশনে নামছে, মেডেল আনছে। মানে, আমাদের মুখোজ্জ্বল করছে।"

"বাজে কথা।" ক্ষিতীশ গম্ভীর স্বরে বলল, "মেডেল হয়তো আনে কিন্তু মুখোজ্জ্বল করার মত কিছুই করেনি। শ্যামল চার বছর আগে এক মিনিট চার সেকেন্ডে হানড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল টানতো, এখনো তাই টানে। এটা কি মুখোজ্জ্বল করার মত ব্যাপার?"

হরিচরণ কথাগুলো না শোনার ভাণ করে বলতে লাগল, "এইসব সুইমাররাই হচ্ছে ক্লাবের প্রাণ। এদের নিয়েই ক্লাব টি'কে আছে, এগিয়ে চলেছে। এরা উচ্ছল, এরা চঞ্চল। এদের হ্যাণ্ডেল করতে হলে এদের মত হয়ে এদের সঙ্গে মিশতে হবে, বুঝতে হবে, আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।"

"তার মানে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারবে, পড়াশুনো করবে না, ট্রেনিং করবে না—একে উচ্ছলতা বলে মানতে হবে! এদের সঙ্গে তাল রেখে আমাকে আধুনিক হতে হবে, তবেই এদের হ্যাণ্ডেল করা যাবে?"

"কিন্তু ওদের মন মেজাজ বোঝার ক্ষমতা, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ক্ষিদ্দার নেই।"

হরিচরণ সকলের মুখের দিকে তাকাল। তিন চারটি মাথা নড়ে উঠল একসঙ্গে সমর্থন জানিয়ে। ক্ষিতীশের চোখ পিটপিট করতে লাগল পুরু লেন্সের ওধারে।

"ক্ষিদ্দা জুনিয়ার ছেলেদের সামনেই শ্যামলকে তার টাইম আর আমেরিকার ১২ বছরের মেয়েদের টাইমের তুলনা করে অপমান করেছেন; গোবিন্দ এখনো ব্রেস্ট স্ট্রোকে বেঙ্গল রেকর্ড হোল্ড করছে, লাস্ট ইয়ারেও বোমবাই ন্যাশনালে গেছল, তাকে বলেছেন কান ধরে ক্লাব থেকে বার করে দেবে। সুহাস ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে দিন দশেক আসতে পারেনি। তার বাড়িতে গিয়ে ক্ষিদ্দা সুহাসের বাবাকে যা তা কথা বলে এসেছেন। অমিয়া আর বেলা জুপিটার ছেড়ে অ্যাপোলোয় গেছে শুধুই ক্ষিদ্দার জন্য। উনি ওদের চুল কাটতে চেয়েছিলেন। ওদের ড্রেস, ওদের সাজ নিয়ে রোজই খিটখিট করতেন। লাস্ট ইয়ারে আপনারা দেখেছেন, ওই দুটি মেয়ের জন্যই স্টেট মিটে অ্যাপোলো টিম চ্যাম্পিয়নশিপ পায়।"

হরিচরণ থামল। ক্ষিতীশের দিকে এতক্ষণ সে তাকায়নি। দেখল মুচকি মুচকি হাসছে। তাইতে সে অস্বস্তি বোধ করে। ধীরেন ঘোষ, প্রফুল্ল বসাক এবং বদু চাটুজ্যের মুখের দিকে তাকাল।

নস্যির কৌটো বার করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে বদু চাটুজ্জে সিধে হয়ে বসল।

"প্রেসিডেন্ট স্যার, আমার একটা কথা বলার আছে। ট্রেনার যে হবে তার উপর ছেলেদের বা মেয়েদের শ্রদ্ধা থাকা চাই, আস্থা থাকা চাই। সে যেটা বলবে ওরা যেন নিশ্চিন্তে চোখ বুজে সেটা করতে পারে। কিন্তু ক্ষিতীশ ওদের যা বলে সেটা ওরা বিশ্বাসভরে নিতে পারে কি?"

বদু চাটুজ্জে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য কথা থামিয়ে রুমাল বার করল। নাক মুছল গভীর মনোযোগে। রুমাল পকেটে রাখল।

"ক্ষিতীশ নিজে কখনো সাঁতার কাটেনি। কমপিটিশনে কখনো নেমেছে বলে জানি না। ওর কথা ছেলেমেয়েরা কেন গ্রাহ্য করবে?"

"সে কি!" প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড় অবাক হয়ে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। "আপনি সাঁতার জানেন না?"

ক্ষিতীশ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "সাঁতার জানি না বলতে বদু নিশ্চয় মিন করছে, আমি কখনো কোন কমপিটিশনে মেডেল পাইনি। তাই না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাইই বলছি।" ব্যস্ত হয়ে বদু বলল। "কোচের রেপুটেশন থাকা দরকার। নয়তো ছেলেমেয়েরা মানবে কেন? হরিচরণকে ওরা মানে কেন? ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন ছিল, অলিম্পিকেও গেছে। গঙ্গায় ১৩ মাইলের কমপিটিশন পর পর তিনবার জিতেছে।"

"আপনি ওলিম্পিকে গেছলেন!" বিনোদ ভড়ের বিস্মিত ভ্রূ কপাল বেয়ে চুলে গিয়ে ঠেকল। কিঞ্চিৎ গদগদ স্বরে হরিচরণ বলল, "লণ্ডনে ফরটি এইট ওলিম্পিকে আমি দেড় হাজার মিটারে ইণ্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ওয়াটারপোলো টিমেও ছিলুম।"

"কি রেজাল্ট করেছিলেন" প্রেসিডেন্ট ঝুঁকে পড়ল টেবলে।

হরিচরণ দ্রুত সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, "পয়েণ্ট ফাইভ সেকেণ্ডর জন্য ব্রোন্‌জটা মিস করেছি।"

হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করল ক্ষিতীশ। সবাই তার দিকে তাকাল।

কাশি থামিয়ে ক্ষিতীশ বলল "আই অ্যাম সরি। মাঝে মাঝে আমার এরকম হয়।"

প্রেসিডেন্ট বিরক্ত চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে আবার রাখল হরিচরণের মুখে।

"গোল্ড পেয়েছিল আমেরিকার ম্যাকলেন। জল থেকে উঠে আমায় বলেছিল, তুমি পাশে ছিলে তাই এত ভাল চার্জ পেয়েছি।"

"বটে বটে, তা আপনি কি বললেন?"

"আমি আর কি বলব ওকে কনগ্র্যাচুলেট করে বললুম, ইণ্ডিয়াতে যে টাইম করে এসেছি সেটা যদি আজ করতে পারতুম তাহলে......"

হরিচরণ থেমে গেল।

খুক্ খুক্ একটা শব্দ হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বিরক্ত হয়ে বলল, "আবার আপনি কাশছেন? নিশ্চয় আপনার কাশির অসুখ আছে।"

ক্ষিতীশ মুখ নিচু করে ফিসফিসিয়ে বলল. "হরি, গোল্ড না সিলভার, তাহলে কোনটে হতো?"

হরিচরণ উত্তেজিত স্বরে বলল, "মেডেলের কথা তো আমি বলিনি, তুমি হঠাৎ গায়ে পড়ে টিপ্পুনি কাটছ কেন?"

"জেলাসি।"

নস্যির কৌটোয় চাঁটা দিয়ে বদু মন্তব্য করল।

"ক্ষিতীশ বড় ফালতু কথা বলে।" কার্তিক সাহা এতক্ষণে মুখ খুলল। "বরাবর দেখেছি, কখনোই ও হরিকে সহ্য করতে পারে না।"

"জেলাসিই হোক ফেলাসিই হোক। আমাকে পাঁচজনের সামনে বিদ্রূপ করে তুমি কি আনন্দ পাও ক্ষিদ্দা বলো তো?"

ক্ষিতীশ চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে টেবলে রাখল। কঠিন স্বরে বলল, "আমার বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ আছে ধীরেন?"

ধীরেন ঘোষ তাড়াতাড়ি ঝুঁকে কয়েকটা কাগজ উল্টেপাল্টে বলল, 'এই সবই আর কি। অভিযোগ এনেছে সুইমাররা। ওরা

বাইরেই আছে। প্রেসিডেণ্ট যদি বলেন তো ওরা নিজেরাই এখানে এসে বলতে পারে।"

"না, তার দরকার নেই।" ক্ষিতীশ চশমাটা চোখে পরল, "অভিযোগগুলি সত্যি।"

টেবলের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেউ মাথা নাড়ল, কেউ নড়েচড়ে বসল। ওদের ভাবভঙ্গিতে এই কথাটাই ফুটে উঠল—এইবার, তাহলে বাছাধন এইবার কি বলবে?

"আমি জানি ওরা কি বলবে। বলবে আমি জলে নামিনা, আমি খাটতে বলি, না খাটলে গালাগালি করি। আপনারা বলবেন, আমি রেজাল্ট দেখাতে পারিনি তিন-চার বছর, আমার ব্যবহারে সুইমাররা বিদ্রোহ করেছে।"

"এমনকি মারবেও বলেছে।" যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য কথাটা বলেই, ধীরেন ও হরিচরণের ভ্রূকুটি দেখে থতমত হয়ে, "কি কান্ড, এখনো চা দিয়ে গেল না।" বলতে বলতে উঠে বেরিয়ে গেল।

"অভিযোগের জবাব নিশ্চয় আমাকে দিতে হবে।"

প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর হয়ে বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছা। কিছু বলার থাকলে নিশ্চয় আমরা শুনব।"

সারা ঘর উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। চশমাটা আবার টেবলে রেখে ক্ষিতীশ চোখ বুজে।

"এই ক্লাবে আমি প্রথম আসি পঁয়ত্রিশ বছর আগে। ধীরেনও তখন আসে। বছর পাঁচেক পর হরিচরণ। ওদের মত জুপিটারকে আমিও ভালবাসি। আমিও চাই জুপিটারের গৌরব, চাই ভারতের সেরা হয়ে উঠুক। এই গৌরব এনে দেয় সাঁতারুরা, ওয়াটারপোলো প্লেয়াররা, ডাইভাররা। ওদের পারফরমেন্স যত উঠবে, গৌরবও তত বাড়বে। আমার যা কিছু চেষ্টা, তা ওদের উন্নতির জন্যই। এজন্য আমি কঠোর হয়েছি, গালিগালাজও দিয়েছি।"

ক্ষিতীশের বলার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে ঘরটা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল।

"সাঁতারে অবিশ্বাস্য রকমে পৃথিবী এগিয়ে গেছে। আর আমরা? আমাদের এক একটা রেকর্ডের বয়স দশ বছর পনেরো বছর। পঁচিশ বছর হতে চললো শচীন নাগের রেকর্ডের বয়স! কেন এই থমকে থাকা? যেভাবে পৃথিবী এগোচ্ছে, আমাদেরও সেইভাবে এগোতে হবে।"

"এসব এমন কিছু নতুন কথা নয়, আমাদেরও জানা আছে। শুনতে ভালই লাগে।" হরিচরণ ভারিক্কি চালে বলল এবং প্রেসি-ডেণ্টের দিকে তাকাল। "আসল যে জিনিস ফুড, সেটা কই? খাটবে যে খাদ্য কই? তা যখন পাওয়া যাবে না তখন খাটিয়ে খাটিয়ে টি বি রোগ ধরিয়ে দিয়ে লাভ কিছু হবে?"

"ঠিক কথা।"

যজ্ঞেশ্বর টেবল চাপড়ে বলে উঠল।

প্রেসিডেণ্ট এবং ধীরেন ঘোষ মাথা নাড়ল। বদু বড় টিপ নস্যি কৌটো থেকে বার করল।

"বাজে কথা।"

ক্ষিতীশ চাপা এবং দৃঢ়স্বরে বলল।

"আজ পর্যন্ত কেউ টি বি রুগী হয়েছে সাঁতার কেটে, এমন কথা শুনিনি। আসলে এটা অলস ফাঁকিবাজদের, যাদের উচ্চা-কাঙ্খা নেই তাদের অজুহাত। যতটুকু খাদ্য আমরা জোটাতে পারি, সেই অনুপাতে আমরা ট্রেনিং করি না। শ্যামল, গোবিন্দ বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়, সাঁতারের জন্যই চাকরি পেয়েছে। কিন্তু সাঁতারকে তারা এর বিনিময়ে কি দিচ্ছে? এরা অকৃতজ্ঞ। এরা গুছিয়ে রোজ পাঁচটাকাও যদি খাওয়ার জন্য খরচ করে, ডিসিপ্লিনড লাইফ লীড করে, নিয়মিত কঠিন ট্রেনিং করে তাহলে দু'বছরেই এরা এক মিনিটে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল কাটবে, এক-পাঁচে ব্যাক স্ট্রোক কাটবে।"

"তাহলে এদের ট্রেনিং করাতে পারেননি কেন?" ধীরেন বলল।

"ছেলে ফেল করলে দোষটা মাস্টার মশায়েরও।" কার্তিক কনুই দিয়ে বদুকে খোঁচা দিল।

"নিশ্চয়, শুধু ওদের অকৃতজ্ঞ বলে নিজের দোষ খালন করলে কি চলে!"

"না, আমি দোষ স্খালন করতে চাই না। বরং আমি বলতে চাই, এদের দিয়ে আর কিছু হবে না। এদের বয়েস হয়ে গেছে, এদের মনে পচ ধরেছে। এদের পিছনে পরিশ্রম করে লাভ নেই।'

"আমি বিশ্বাস করি না।" হরিচরণের তীব্র স্বরে ক্ষিতীশও বিস্মিত হল।

"কি বিশ্বাস করিস না?"

"এদের দিয়ে এখনো টাইম কমানো যায়। আমি করাতে পারি। আমি পারি এদের খাটাতে। পচ-টচ ধরেছে এসব বাজে কথা।"

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ হরিচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তাহলে তুই দায়িত্ব নে। আমি আজ থেকে চিফ ট্রেনারের পদ ছেড়ে দিলাম। রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেব। আমি কাল থেকে আর আসব না।"

"না না, আসবে না এটা কি কথা।" বদু ব্যস্ত হয়ে উঠল। "এতদিনকার মেম্বার!"

ক্ষিতীশ হাসল ম্লানভাবে, তারপরই চোখদুটো পিট পিট করে উঠল। প্রেসিডেণ্টকে লক্ষ্য করে বলল, "ট্রেনার হতে গেলে নামকরা সাঁতারু হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। পৃথিবীর নামকরা কোচেরা, ট্যালবট, কারলাইল, গ্যালাঘার, হেইন্স, কাউন্সিলম্যান এরা কেউ ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নয়। জলে নেমে এদের কোচ করতে হয় না। এরা সুইমারদের কোচ, নভিসদের নয়। জলের উপর থেকে অনেক ভাল লক্ষ্য করা যায় তাই ডাঙ্গাতেই আমি থাকি।"

"ক্ষিদ্দা তুমি দেখছি ওইসব কোচেদের সঙ্গে নিজেকে এক পংক্তিতে ফেললে।" যজ্ঞেশ্বর কৃত্রিম বিস্ময় চোখে ফোটাল।

"ওরা ওয়ারলড চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তৈরী করছে, ক্ষিতীশ তুমি তো একটা বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নও তৈরী করতে পারনি!" কার্তিক সাহার গলায় বিদ্রূপ মোচড় দিল।

"পারবে পারবে, নিশ্চয় পারবে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আমরা শিগ্গিরিই পাব, তাই না ক্ষিতীশ?" ধীরেন ঘোষ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"চ্যাম্পিয়ন সুইমার তৈরী করা এদেশে সম্ভব নয়।" প্রেসি-ডেণ্ট বিনোদ ভড় এতক্ষণে কথা বলল।

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

"কোন দেশেই সম্ভব নয়। চ্যাম্পিয়নরা জন্মায়, ওদের তৈরী করা যায় না। ওদের খোঁজে থাকতে হয়, লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নিতে হয়।" ক্লান্তস্বরে কথাগুলো বলে ক্ষিতীশ দরজার দিকে এগোল।

"সেই ভাল এবার থেকে তপস্যা শুরু কর ক্ষিদ্দা।"

"ক্ষিতীশ চা-টা খেয়ে যাও।"

"ক্ষিতীশবাবু, ক্লাবে আপনার কিন্তু রেগুলার আসা চাই।"

ঘর থেকে বেরিয়েই ক্ষিতীশ দেখল শ্যামল, গোবিন্দ এবং আরো চার পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল সে, ওরা হঠাৎ কাঠের মতো হয়ে গেল।

"তোদের অনেক বকেছি-ঝকেছি, কটু কথাও বলেছি। আর এসব শুনতে হবে না। আজ থেকে আমি আর এ ক্লাবের ট্রেনার নই। সাঁতারটা মন দিয়ে করিস।"

ক্ষিতীশ মাথা নামিয়ে ধীর পায়ে ক্লাবের বাইরে এসে দাঁড়াল।

কমলদিঘির কালো জলের উপর পার্কের আলোগুলো খড়ির মত দাগ টেনেছে। জুপিটার ক্লাববাড়ির চুড়োয় ঘড়িতে আটটা বাজতে পাঁচ। দিঘিটা আকারে গোল। তাকে ঘিরে ইঁট বাঁধানো রাস্তা। নারী পুরুষ শিশুর ভীড়ে রাস্তাটা গিজগিজ করছে। আলোগুলোর নীচে তাস খেলা চলেছে, অক্‌সন ব্রিজ বা টোয়েণ্টি-নাইন। মাঝে মাঝে দমকা চীৎকার উঠছে তাসের আড্ডা থেকে। বেঞ্চগুলোয় বসার স্থান নেই। ফুলগাছের ঝোপগুলো লোহার বেড়ায় ঘেরা। বেড়ায় ঠেশ দিয়ে যুবকরা গল্প করছে। ঘুগনি

আলুকাবলি, বাদাম, ঝালমুড়ি বা কুলফি মালাইওয়ালারা ব্যবসায়ে ব্যস্ত।

দুটি হাত রেলিংয়ে রেখে ক্ষিতীশ দিঘির অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে। জুপিটারের ঠিক উল্টোদিকেই অ্যাপোলোর ক্লাব-বাড়ি। ডাইভিং বোর্ডের কংক্রিট কাঠামোর থামগুলো অন্ধকারে ব্রহ্মদত্যির পায়ের মত জল থেকে উঠেছে।

"ক্ষিদ্দা।"

চমকে পেছনে তাকাল ক্ষিতীশ।

"ভেলো!"

"কি হল ক্ষিদ্দা?"

"কি আবার হবে, ছেড়ে দিলুম।"

"ভালই করেছ। ঝগড়াঝাটি, গোলমাল হয়নি তো?"

"না।"

ক্ষিতীশ মুখটা আবার জলের দিকে ঘোরাল। হাওয়া বয়ে আসছে জলের উপর দিয়ে। বাতাসে জলের কণা তাতে শ্যাওলা আর ঝাঁঝির আঁশটে গন্ধ। পঁয়ত্রিশ বছর এই গন্ধ শুঁকে আসছে ক্ষিতীশ। তার কাছে এর থেকে সুবাস পৃথিবীতে নেই।

ভেলো পাশে এসে দাঁড়াল।

"ভেলো কি করি বল্‌তো রে। একেবারেই বেকার হয়ে গেলুম।"

"এবার প্রজাপতিকে বরং দেখাশুনো করো। বৌদি একা মেয়েমানুষ অন্যরাও মেয়ে, পুরুষমানুষ একজন থাকা দরকার। কখন কি মুশকিলে ওরা পড়ে যাবে তার ঠিক্ কি।"

"তোর বৌদি মানুষটি ছোট্টখাট্ট, কিন্তু আমার থেকে দশগুণ লম্বা কাজের বেলায়। প্রজাপতিতে দারোয়ানি ছাড়া আমায় দিয়ে আর কোন কাজ হবে না।"

"তাহলে?"

ক্ষিতীশ আবার জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ক্ষিদ্দা, যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।"

ক্ষিতীশ মুখ ফেরাল।

"তুমি অ্যাপোলোয় চলো।"

"না, ওরা জুপিটারের শত্রু। কতকগুলো স্বার্থপর লোভী মুর্খ আমায় দল পাকিয়ে তাড়িয়েছে বলে শত্রুর ঘরে গিয়ে উঠব?"

"কিন্তু ওখানে তুমি জল পাবে, শেখাবার ছেলেমেয়ে পাবে, কাজ চাইছ কাজ পাবে। অপমানের শোধ তোমায় নিতে হবে। শত্রু-মিত্র বাছবিচার করে কি লাভ?"

"হ্যাঁ লাভ আছে। জুপিটারই আমাকে মানুষ করেছে, আমার মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরী করিয়েছে, আমি একটা লক্ষ্য পেয়েছি। জুপিটারের সঙ্গে আমার নাড়ির সম্পর্ক। আমি বেইমানি করতে পারব না। যেখানেই যাই, অ্যাপোলোয় নয়।"

"তাহলে হেদো কিংবা গোলদিঘির কোন ক্লাবে চলো।"

"কোথাও গিয়ে আমি টিঁকতে পারবো নারে।" ক্ষিতীশ হাঁটতে শুরু করল একটু জোরেই।

"চুপচাপ বসে থাকবে?" ভেলো হ্যাঁচকা দিয়ে প্যান্ট টেনে তুলে ক্ষিতীশের পাশাপাশি থাকার জন্য প্রায় ছুটতে শুরু করল।

"আমি এবার সত্যিকারের কাজ করতে চাই। সবাইকে দেখিয়ে দেব একবার। চ্যাম্পিয়ন তৈরী করব আমি। গড়ব আমি মনের মতো করে। একবার, শুধু একবার যদি তেমন কারুর দেখা পাই।"

মাথা নিচু করে ক্ষিতীশ হনহনিয়ে কমলদিঘির গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল। ভেলো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গেটের পাশে দাঁড়ানো আলুকাবলিওলাকে বলল, "জাস্তি ঝাল দিয়ে চার আনার বানাও।"

৪

সকাল আটটা প্রায়।

ক্ষিতীশ বাজার করে ফিরছে। জুপিটারে আর সে যায় না। সকাল-বিকাল এখন তার কোন কাজ নেই। অবশ্য বাজার করাটা তার নিত্যদিনের কাজগুলির অন্যতম। সে বাজারে যায় বাড়ির দিকে বস্তির সরু গলি দিয়ে, ফেরে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনুতে চিলড্রেনস পার্কটাকে ঘুরে অন্য পথ ধরে।

আজ ফেরার পথে দেখল পার্কে খুব ভীড়। বিশ্রাম চালাটায় টেবল চেয়ার পাতা। লাউডস্পীকারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে। হঠাৎ বন্ধ করে ঘোষণা হল—"নেতাজী বালক সঙ্ঘের উদ্যোগে কুড়ি ঘণ্টা অবিরাম ভ্রমণ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কাল রাত আটায়। শেষ হবে আজ বিকেল চারিটায়।"

লাউডস্পীকারে অন্য একটা চাপা গলা শোনা গেলঃ "এই শালা চারিটায় কিরে, বল্ চারি ঘটিকায়। অ্যালাউনস করতে হলে শুদ্ধু করে বলতে হয়।"

"যা লেখা আছে তাইতো পড়ছি।"

"দে দে, আমাকে মাইক দে।"

এরপর অন্য এক কণ্ঠে শোনা গেলঃ "প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে কল্য রাত্রি আট ঘটিকায়, উদ্বোধন করেন, অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মাইতি। প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হইবে অদ্য বৈকাল চারি ঘটিকায়। পুরস্কার বিতরণ করিবেন শ্রদ্ধেয় জননেতা ও আমাদের সঙ্ঘের প্রধান পিষ্টপোষক শ্রীবিষ্টুচরণ ধর মহাশয়। প্রতিযোগিতায় নেমেছিল বাইশজন প্রতিযোগী, আটজন অবসর নিয়েছে ইতিমধ্যে।"

ক্ষিতীশের চোখ আটকে গেছে কঞ্চির মত লম্বা, নিকষ কালো চেহারাটিতে।

গোলাকৃতি পার্কটিকে ঘিরে রেলিং। তার থেকে ছয় হাত ভিতরে সিমেন্টের পথটা বেড় দিয়েছে মধ্যস্থলের ঘাসের জমিকে। প্রতিযোগীরা পথ ধরে হাঁটছে ক্লান্ত, মন্থরগতিতে। অধিকাংশেরই বয়স ১৬—১৭। বৈশাখের ভয়ঙ্কর রোদ মাথায় নিয়ে, তপ্ত সিমেন্টের উপর ওদের সারা দুপুর হাঁটতে হবে।

পরণে ঢিলে ফুল প্যান্ট, ঢলঢলে বুশ শার্ট, পায়ে হাওয়াই চটি। চুলটা ছেলেদের মত হলেও, ঘাড়ের কিনারে পোঁছে গেছে। রাস্তার মাঝ থেকে ক্ষিতীশ রেলিংয়ের ধারে সরে এল।

ক্ষিতীশের চোখ অনুসরণ করতে লাগল শুধু একজনকেই। পার্কের মধ্যে শিশু ও বালকদেরই ভীড়। বয়স্করা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে শুধুমাত্র ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিযোগীদের চোখে রাত্রি জাগরণ, ক্লান্তি আর ক্ষুধার ছাপ। পার্কের চক্কর প্রায় ৭৫ মিটারের। ওদের কেউ কেউ চেনা লোকেদের দেখে শুকনো হাসছে, দু-চারটে কথা বলছে। তিনটি ছেলে পার্কের মধ্যে ঘাসের উপর দিয়ে কোনির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওর সঙ্গে কথা বলল। কোনি হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলছে। চটিজোড়া খুলে পথের পাশে রাখল। পকেট থেকে লজেঞ্চস বার করে ওদের তিনজনকে দিয়ে, একটা মুখে পুরল। হাঁটতে হাঁটতে সে মুখের কাছে হাত তুলে জলপানের ইসারা করতেই নেতাজী বালক সঙ্ঘের একজন ছুটে গিয়ে তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে এল। তিন-চার চক্করের পর আবার সে চটি পরল।

ক্ষিতীশের হুঁশ ফিরল যখন তার প্রতিবেশী অমূল্যবাবু অফিস যাবার পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "কি দেখছেন ক্ষিতীশবাবু, বাঙালীদের ক্রীড়াচর্চা?"

লোকটিকে ক্ষিতীশ একদমই পছন্দ করে না, শুধুই নাটকীয় ঢঙে বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

"কি আর করবে বলুন, আমরা ওদের ক্রীড়াচর্চার জন্যে কিছু ব্যবস্থা তো করে দিইনি। ওরা ওদের মতোই যাহোক ব্যবস্থা করে নিয়েছে।"

কথায় কথা বাড়ে। তাই ক্ষিতীশ আর না দাঁড়িয়ে বাড়িমুখো হল।

সদর দরজা তালাবন্ধ। লীলাবতী বেরিয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় চাবি ক্ষিতীশের কাছে আছে। ঘড়ি দেখে সে জিভ কাটল। প্রায়

পঞ্চাশ মিনিট দেরী হয়েছে অর্থাৎ লীলাবতী এতই রেগেছে যে রান্না না চাপিয়েই বেরিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ রান্নার উদ্যোগ শুরু করল। আনাজ কুটতে বসে বারবার তার ইচ্ছে করল পার্কে গিয়ে কোনিকে দেখতে। এই দ্বিতীয়বার সে ওকে দেখলে।

অবিরাম হাঁটা ব্যাপারটা সে একদমই পছন্দ করে না। এতে বুদ্ধির দরকার হয় না, কলুর বলদের মত শুধু পাক খাওয়া। স্পীড দরকার হয় না, পেশীর জোর লাগে না, পাল্লা দিতে হয় না আর একটা মানুষের সঙ্গে। একে স্পোর্ট বলতে ক্ষিতীশের ভীষণ আপত্তি।

একবার সে গোলদীঘিতে চীৎকার করে তার আপত্তিটা জানিয়েছিল ৯০ ঘণ্টা সাঁতার কেটে বিশ্বরেকর্ড লাভে প্রয়াসী এক সাঁতারুকে। "ওরে বুদ্ধু, এখনো যে একটা ওলিম্পিক মেডেল সাঁতার কেটে আমরা পাইনি আর এসব বুজরুকি দেখিয়ে রেকর্ড করে কি তুই দেশের মান বাড়াবি?"

ক্ষিতীশকে জনা চারেক চেনা লোক টেনে সরিয়ে না দিলে হয়তো সে তখুনি জলে ঝাঁপিয়ে সম্ভাব্য বিশ্ব রেকর্ডটিকে তছ-নছ করে দিত। তবে সে এইটুকু মাত্র মানে এইসব অবিরাম ব্যাপার-গুলোর মধ্য দিয়ে কার কেমন সহ্যশীলতা, কেমন একগুঁয়েমি সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কি লাভ তাতে হয় যদি না সুশৃংখল ট্রেনিং আর টেকনিকের মারফৎ সেগুলো বড় কাজে লাগানো হয়।

অপচয়। ক্ষিতীশ এই সব অপচয় দেখে বিরক্ত বোধ করে। খুব বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু এখন সে ছটফট করছে পার্কে যাবার জন্য। উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখল। হিসেব কষে বার করল, কোনি প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা হাঁটছে। এখনো ছ ঘণ্টা বাকি। ভয়ংকর এই শেষের ছ' ঘণ্টা। টিঁকতে পারবে কি!

কুকারে রান্না চাপিয়ে ক্ষিতীশ দরজায় তালা এঁটে আবার বেরিয়ে পড়ল।

পার্কে দর্শকদের সংখ্যা ক্ষীণ। গাছের ছায়ায় কিছু আর বিশ্রাম চালায় উদ্যোক্তারা। কোনি হাঁটছে, মাথায় ছেঁড়া বেতের টুপি। ক্ষিতীশ গুণে দেখল ওরা তেরোজন। একজন বসে গেছে। পার্কে ঢুকে সে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াল। কোনি যখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কোনির গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চিবুকে, চোখ দুটি বসে গেছে, গালের উঁচু হাড় দুটো আরো উঁচু, ঠোঁটের চামড়া শুকনো। কিন্তু মাথাটি তুলে যেভাবে পাতলা দেহটাকে সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাইতে ক্ষিতীশের মনে হল, আকাশ থেকে আগুন ঝরলেও কোনির চলা থামবে না।

কেন মনে হল, ক্ষিতীশ তা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। শুধু এইটুকুই সে বলবে, একটা লোক নিজের সম্পর্কে কি ভাবে সেটা বোঝা যায় চলার সময় মাথাটা কেমনভাবে রাখে তাই দেখে।

ক্ষিতীশ বাড়ি ফিরল বারোটায়। লীলাবতী কথা বলছিল দোকানের দুটি মেয়ের সঙ্গে। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "হাতিবাগানের ঘর কি হল?"

'অনেক টাকা সেলামি চায়। সম্ভব নয়।"

সে ঘরে ঢুকে গেল। অন্যমনস্কের মত স্নান ও খাওয়া সেরে সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল। তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেড়িয়ে পড়ল।

তেরো থেকে আট, বসে গেছে পাঁচজন। পার্কে এখন বেশ ভীড়। লাউডস্পীকার রেকর্ড বাজানো বন্ধ করে নানাবিধ ঘোষণায় মত্ত। তারই মাঝে প্রতিযোগীদের জানিয়ে দেওয়া হল, আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট বাকি।

কোনি হাঁটছে। ক্ষিতীশ জানতো ও হাঁটবে এবং শেষ করবে। ক্লান্তি ওর পদক্ষেপে ধরা পড়ছে। সকালের সেই তিনটি ছেলে ওর পাশাপাশি ঘাসের উপর দিয়ে চলছে। কোনি দু'একবার ওদের কথা শুনে হাসল। ক্ষিতীশ লক্ষ্য করল ডান পা-টা টেনে টেনে হাঁটছে। অন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে দুটি বছর দশেকের ছেলে, বেশ তাজাই দেখাচ্ছে।

"আমাদের আজকের সভাপতি বরেণ্য জননেতা ও এই সঙ্ঘের হিতৈষী শ্রীযুৎ বিষ্টুচরণ ধর মহাশয় তার শত কাজ ফেলে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। এজন্য আমরা গর্বিত।"

ক্ষিতীশ লাউডস্পীকার থেকে কান সরিয়ে চোখ পাঠাল চালার নীচে। সেখানে টেবলের উপরে ইতিমধ্যে একটি সাদা চাদরের ও তোড়াভরা দুটি ফুলদানির আবির্ভাব ঘটেছে। তার পিছনে বসে আজকের সভাপতি।

আরে, এ তো গঙ্গার ঘাটে দেখা সেই হিপোটা! ক্ষিতীশ অবাক হয়ে গেল।

"আর কুড়ি মিনিট বাকি প্রতিযোগিতা শেষ হতে। তারপরই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।"

লাউডস্পীকারে ফিসফাস আলোচনা শোনা গেল। "বলতে ভুল হয়ে গেছে, পুরস্কার বিতরণের আগে সভাপতি মহাশয় তার ভাষণ দেবেন।"

আটজনেই শেষ করল প্রতিযোগিতা। পার্কে হাজির জনা পঞ্চাশ শিশু, বালক ও দু'চারজন বয়স্ক ভীড় করে দাঁড়াল চালার সামনে। ক্ষিতীশও এগিয়ে গেল।

তার চোখ খুঁজতে খুঁজতে কোনিকে পেল। সিমেন্টের সিঁড়ির ধাপে বসে পা ছড়িয়ে, দু হাতে টিপছে ডান উরু।

"ওরে বাব্বা, আর আমি হাঁটার রেসে নামছি না। দুর্ দুর্, ফাস সেকেন থাড নেই।"

"তোকে তো পই পই বলেছিলুম, নাম দিস্ না। আমি আর ভাদু একবার নেমেই টের পেয়ে গেছলুম, বোগাস ব্যাপার।"

"ক্ষান্তি যে বলেছিল, লোকেরা এসে পিন দিয়ে টাকা আটকে দেয় জামায়, কই দিল না তো!"

"এসব ছোটখাটো কম্পিটিশনে দেয় না।"

"তোকে বলেছে। কোনি যদি ফ্রক পরে নামতো দেখতিস, অন্তত বিশ-পঁচিশ পেয়ে যেত। প্যাণ্ট শার্ট পরলে তো ওকে ছেলে দেখায়।"

"ঘোড়ার ডিম দিত, এখানকার লোকেরাই কঞ্জুস।"

"নারে ঠিকই বলেছে ভাদুটা, আমাকে প্যাণ্ট পরলে ছেলেদের মতই তো দেখায়। এই দ্যাখতো চণ্ডু প্রাইজ ফ্রাইজ কি দেবে, পুরো একদিন বাড়ির বাইরে, মা মেরে ফেলবে যদি কিছু হাতে করে না নিয়ে যাই।"

লাউডস্পীকারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাগুলি শেষ হয়েছে। সভাপতি বিষ্টু ধর বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে।

ক্ষিতীশ হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে কোনিদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি সাঁতার শিখবে?"

মুখটা তুলল সে। কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুলে ভরা মাথা আর পুরু লেনসের পিছনে জ্বলজ্বলে দুটি চোখের দিকে একটু বিরক্তভরেই তাকাল। তারপর আবার সে নিজের পা টিপতে লাগল।

"শিখবে সাঁতার?"

"সাঁতার আমি জানি।"

"না জান না।"

ঝটকা দিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে কোনি আবার মুখ তুলল।

"আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ জানি। আমি দেখেছি তোমায় গঙ্গায়। ও সাঁতার চলবে না। সাঁতার শেখার জিনিষ।"

"যা জানি তাতেই গঙ্গা এপার-ওপার করতে পারি, শেখার আর আবার আছে কি?"

"অনেক কিছু শেখার আছে।"

"আমার দরকার নেই শিখে, যা জানি তাই যথেষ্ট।"

ক্ষিতীশের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কোনি উঠে দাঁড়াল।

চেঁচিয়ে ডাকল, "অ্যাই গোপলা শুনে যা।"

টেবিলে স্তূপীকৃত নানাবিধ প্রাইজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা খালি পা, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে বছর বারোর একটি ছেলে এগিয়ে এল।

"হ্যাঁরে মা কিছু বলেছে?"

"যাও না বাড়িতে, পিটিয়ে তোমার চামড়া তুলে নেবে।"

"দাদা?"

"দাদা আজ কাজে যায়নি, জ্বর হয়েছে। মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তোমাকে নিয়ে। দাদা বলেছে, বেশ করেছে কোনি।"

ক্ষিতীশ ভাবল আর একবার কোনির সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু ততক্ষণে কোনিকে ডেকে নিয়ে গেছে নেতাজী বালক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা। প্রতিযোগীদের হাতে একটি করে খাবারের ঠোঙা দেওয়া হচ্ছে।

"এই যে শরীর, একে চাকর বানাতে হবে।"

ক্ষিতীশ ফিরে তাকাল বক্তৃতাকারীর দিকে। মাইক্রোফোনের পিছনে একটি ধুতি-পাঞ্জাবী পরা চর্বির ঢিপি। ক্ষিতীশ ভীড় কেটে চাতালের দিকে এগোল।

"কি করে তা সম্ভব? আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা আছে কিন্তু পারেন কি আপনি আর্চ করতে, পীকক্ হতে? যদি আপনাকে চাঁটি মেরে পালায় পারবেন কি তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরতে? না পারবেন না, আমি জানি আপনি পারবেন না।"

সভাপতির পিছন থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "একবার পরীক্ষা করে দেখব নাকি?"

বিষ্টু ধর পিছন দিকে তাকাল। ক্ষিতীশকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। মাইকে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় বলল, "সব জায়গায় ইয়ারকি করবেন না।" তারপর হাত সরিয়ে বলতে শুরু করল, "কেন পারবেন না, জানেন কি কারণটা? কারও...ন আপনার শরীর ফিট্ নয়। আর ফিট্‌নেস আসে নিয়মিত ব্যায়াম থেকে।"

বিষ্টু ধর পিছন ফিরে তাকাল। ক্ষিতীশ মাথা হেলিয়ে তারিফ জানাল।

"ব্যায়াম সেইজন্যই সকলের করা দরকার। হাঁটাও একটা ব্যায়াম। তাই নেতাজী বালক সঙ্ঘের তরুণ কর্মীদের, যারা দিনরাত পরিশ্রম করে আজকের এই প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলেছে, তাদের বললাম তোমরা হাঁটার ব্যবস্থা করো আমি আছি তোমাদের সাথী। এটা সমাজসেবার কাজ, আমি থাকব তোমাদের পাশে পাশে।"

"উঁহু, আগে আগে। নেতৃত্ব দিতে হলে সামনে থাকতে হয়।"

বিষ্টু ধর পিছনে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর মাথা হেলাল, "পাশে পাশেই বা বলি কেন, আমি থাকব আগে আগে। সমাজের কল্যাণের জন্য, মানুষকে সুস্থ সবল করার জন্য যখনই সংগঠন গড়ে উঠবে, সবার আগে আমাকে ছুটে আসতেই হবে।"

"ছোটার কথা চেপে যান।" পিছন থেকে ফিসফিস শোনা গেল, "যদি কেউ বলে একটু ছুটে দেখান!"

বিষ্টু ধর ঢোক গিলে বলল, "কিন্তু ছুটেই বা আসব কেন! মানুষ ছোটে কখন? যখন সে ভয় পায়, দিশাহারা হয়। কিন্তু জনগণ সহায় থাকলে আমি ভয় পাব কেন? জনগণই পথ বলে দেবে সুতরাং দিশাহারা হবো কেন? না, আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে আমি ভয় পাব না। সঠিক পথেই আপনাদের সেবা, দেশের ও দশের সেবা করে যেতে পারব। তাই আজ প্রতিযোগীদের এই কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব, শরীরকে ফিট না করলে পরিশ্রম করতে পারবে না। পরিশ্রম না করলে দেশ গড়ে তুলতে পারবে না। তাই আজ যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তোমরা হাঁটা শুরু করলে..."

বিষ্টু ধর পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে লাগল। "এই যে হাঁটা, এ হাঁটা জীবনের পথে..."

বিষ্টু ধর অসহায়ভাবে পিছনে তাকাল।

"ভুলে গেছেন?"

ঘাড় নেড়ে অসহায়ভাবে বিষ্টু ধর ফিসফিস করে বলল, "রবি ঠাকুরের একটা পদ্য লিখে এনেছিলুম, পাচ্ছি না।"

"বলুন, এই যে যাত্রা শুরু হল, ছোট্ট এই পার্কে—"

মাইক্রোফোনে গম্‌গম্ করে উঠল সভাপতির আবেগভরা কণ্ঠ, "এই যে যাত্রা শুরু হল, ছোট্ট এই পার্কে—"

"ধীরে ধীরে তা বৃহত্তর জীবনের দিকে, সুখ সমৃদ্ধিভরা জীবনের দিকে তোমাদের নিয়ে যাক। এই পার্ক পরিক্রমা রূপান্তরিত হোক বিশ্ব পরিক্রমায়, জয় হিন্দ।"

বিষ্টু ধর হুবহু বলে গেল ক্ষিতীশের প্রম্পট্ শুনে। শুধু জয় হিন্দের পর গলা কাঁপিয়ে যোগ করল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

পুরস্কার দেওয়া হল, প্লাস্টিকের কিট ব্যাগ আর তোয়ালে যারা ২০ ঘণ্টা সম্পূর্ণ করেছে। ১৬ ঘণ্টার পর যারা অবসর নিয়েছে তাদের শুধুই ব্যাগ আর ১২ ঘণ্টার পরে যারা তাদের শুধুই তোয়ালে। কোনি পুরস্কার নিয়ে ব্যাগটা উল্টেপাল্টে দেখল। সভাপতিকে নমস্কার জানানোর দরকারও মনে করল না। খাবারের ঠোঙাটা ব্যাগের মধ্যে ভরে সে ভাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, "চ বাড়ি যাই, এটা মাকে দিতে হবে।"

ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনি চলে যাচ্ছে।

ক্ষিতীশ একদৃষ্টে তাকিয়ে। মাথাটা উঁচু, কঞ্চির মত শরীরটা দুলছে। সঙ্গে ওর বন্ধু ভাদু আর চন্ডু। পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্ষিতীশের মনে হল, ওর বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে হতো।

"আপনাকে বেষ্টা দা ডাকছে।"

"কে বেষ্টা দা?" অন্যমনস্ক ক্ষিতীশ বলল।

"আজ যিনি সভাপতি।"

ক্ষিতীশকে দেখেই বিষ্টু ধর একগাল হেসে বলল, "ফিনিশংটা, সবাই বলছে দারুণ হয়েছে।" তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "ইনকিলাব জিন্দাবাদটা অ্যাড্ করলুম, তার কারণ আছে। আমার প্রগ্রেসিভ নেচারটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকর। চলুন চলুন আমার গাড়ি রয়েছে, আপনাকে সব বলছি, আমার বাড়ি চলুন।"

বিষ্টু ধর আগামী সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াবে। তাই এখন থেকেই সে তোড়জোড় শুরু করেছে। পাড়ায় পাড়ায় নানান ব্যাপারে টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করাচ্ছে আর তাতে সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। নির্দলীয় সমাজ সেবক হিসাবে সে ভোট চাইবে।

বিষ্টু ধর গাড়িতে বসে কথাগুলো জানিয়ে দিল।

বাড়ি পৌঁছে বলল, "আপনাকে আমার দরকার।"

"আমাকে!"

"হ্যাঁ, আপনি আমার ইস্পীচ-রাইটার হবেন, বক্তৃতা লিখে দেবেন। অবশ্য এজন্য টাকা দোব। রাজি?"

"আমি তো খেলার ব্যাপার ছাড়া আর তো কিছু জানি না!" ক্ষিতীশ বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে বলল।

"সেইজন্যেই তো আপনাকে চাই। খেলা নিয়েই বক্তৃতা দিতে চাই, আর কিছু নিয়ে নয়। বিনোদ ভড় হচ্ছে সিটিং এম এল এ। খেলার লাইনের লোক। অনেক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমিও খেলার লাইন ধরে ক্যামপেন করব। বিনোদ ভড় স্পোরটস মিনিস্টার হতে চায়।"

সিঙ্গাড়া মুখে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, "ভেবে দেখি।"

রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা।

পঁচিশজন প্রতিযোগী। বাইশটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে।

স্টারটিং পয়েনটে ভীড়। প্রতিযোগীরা তেল মাখায় ব্যস্ত। উদ্যোক্তা ঢাকুরিয়া স্পোর্টস ক্লাবের অনুরোধে ক্ষিতীশ প্রতি-

যোগিতার রেফারী অফ দ্য কোর্স। সাঁতারুদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে নৌকোয়।

স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে একটু এগিয়ে সে আর ভেলো নৌকোয় বসে।

"ক্ষিদ্দা, কে জিতবে বলো তো? সুবীরই মনে হচ্ছে।"

"সুবীরের নামা অন্যায় হয়েছে। এসব কম্পিটিশনে নামীদের থাকা উচিত নয়। ওতো ন্যাশনাল জুনিয়ার রেকর্ড হোল্ড করছে।"

"যা বলেছ। তবে বেশির ভাগই আনকোরা দেখছি।"

ভেলো সারি দিয়ে দাঁড়ানো সাঁতারুদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, "ওই লাল কস্ট্যুমপরা মেয়েটা কে বলতো? কখনো তো দেখিনি!"

এত দূর থেকে ক্ষিতীশ, পুরু লেনসের মধ্য দিয়ে, শাদা টুপি মাথায়, লাল রঙে মোড়া তুষারধবল একটি দেহমাত্র দেখতে পেল।

"কে, তা আমি জানব কি করে!"

"না, এমনিই বলছি। বালিগঞ্জ ক্লাবের ট্রেনার প্রণবেন্দু বিশ্বাসকে দেখলুম কিনা মেয়েটার সঙ্গে। খুব বড়লোক মনে হল। ওই যে সবুজ মোটরটা, ওটায় করে এসে নামল। সঙ্গে বাবা-মাও যেন রয়েছে।"

"তুই বড্ড বেশি দেখিস।"

"না দেখে উপায় আছে, মোমের পুতুলের মত চেহারা। ওর পাশেই দ্যাখো, পোড়ামাটির কেলে পিলসুজের মত একটা। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে দ্যাখো।"

ক্ষিতীশ দেখার চেষ্টা করল। সেকেন্ড কয়েক তাকিয়ে থেকে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা শব্দ, "কোনি!"

ঠিক তখনই স্টার্টারের বন্দুক গর্জে উঠল।

সাঁতারুরা এগিয়ে যাবার পর ক্ষিতীশদের নৌকোটা পিছু নিল।

সুবীর এবং আরো গুটি দশেক ছেলে একঝাঁকে এগিয়ে গেছে। তারপরেও আর এক ঝাঁক। সব শেষে তিনটি মেয়ে ও দুটি বাচ্চা ছেলে।

পাঁচশো মিটার পর্যন্ত এরা পাঁচজন প্রায় একসঙ্গেই ছিল। তারপরই লাল কস্ট্যুম ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

"ক্ষিদ্দা, স্ট্রোক দেখেছ! শরীরটা কেমন ভাসিয়ে রেখেছে!"

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বলল, "মাথাটা ঠিকমত নাড়ানো হচ্ছে না। সেন্ট্রাল পোজিশনে না থাকলে শরীরের ব্যালান্স নষ্ট হয়, স্পীডও কমিয়ে দেয়; শরীরটা রোল করছে বড্ড বেশি। কনুই আরো উঠবে..."

"অ্যাই অ্যাই, অমনি তোমার শুরু হয়ে গেল খুঁত ধরা।"

"খুঁত না ধরলে দোষ সারবে কি করে!"

"ও কি তোমার ছাত্তর?"

"নাইবা হলো।"

সামনের দু ঝাঁকের সাঁতারুদের কেউ কেউ এবার মন্থর হয়ে পিছিয়ে পড়ছে। ক্ষিতীশ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। বাচ্চা ছেলে দুটির সঙ্গে কোনি আসছে বৈঠার মত হাত চালিয়ে, দুধারে মাথা নাড়াতে নাড়াতে। ওদের থেকে অন্তত কুড়ি মিটার সামনে আর একটি মেয়ে, সমান তালে একই গতিতে সাঁতরে চলেছে। লাল কস্ট্যুমের মেয়েটি তার থেকে আরো তিরিশ মিটার সামনে এবং একটি ছেলের থেকে হাত দশেক পিছনে।

"কো ও ও নি ই ই।"

সরোবরের পূর্ব তীর থেকে একটা চীৎকার ভেসে এল।

ক্ষিতীশ আর ভেলো একসঙ্গেই তাকাল, বছর পঁচিশের, শ্যামবর্ণ একটি রুগ্ন যুবক পাড় ঘেঁষে ছুটছে। পরণে ধুতি ও নীল শার্ট। চটিটা হাতে।

"কো ও ও নি ই ই......কো ও ও নি ই ই।"

গলার স্বরটা আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে। পাড়ে ভীড় জমেছে সাঁতার দেখতে। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে ছুটছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাচ্ছে। মুখখানি অসহায়।

"কো ও ও নি ই।"

চীৎকারটা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। ক্ষিতীশ দেখল কোনিকে পিছনে ফেলে বাচ্চা দুটি এগোচ্ছে। লাল কস্ট্যুম দুটি ছেলেকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

পাড়ের রাস্তা ধরে ধীর গতিতে সবুজ রঙের একটা ফিয়াট চলেছে। গাড়ির জানলায় উৎকণ্ঠিত একটি পুরুষ ও একটি মহিলার মুখ। মাঝে মাঝে হর্ন দিচ্ছে।

"কো ও ও নু ই ই।"

নৌকোটা ছপছপ শব্দে দাঁড় ফেলে এগোচ্ছে। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নীলশার্ট পরা যুবকটি দাঁড়িয়ে। ক্রমশ সে ক্ষিতীশের চোখে ছোট হয়ে ঝাপসা হতে শুরু করল। জলের উপর, অনেক পিছনে, দুটি হাতের ওঠানামা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না হাত দুটো। পড়ন্ত রোদে মাঝে মাঝে চিক্‌চিক্ করে উঠছে ছিটকে ওঠা জল। সামনে হৈ চৈ শোনা গেল। প্রথম প্রতিযোগী সাঁতার শেষ করেছে। সম্ভবত সুবীরই।

কোনি জল থেকে উঠছে। সাঁতার শেষ করে অনেকেই তখন চুল পর্যন্ত আঁচড়ে ফেলেছে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ঢাকুরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সারা বছরের কার্যকলাপের বিবরণ পাঠ করে চলেছে একঘেঁয়ে সুরে। কেউ লক্ষ্যই করল না শেষ প্রতিযোগীর সীমায় পৌঁছনোটা।

পাড়ের কাছে কাদা। কোনির পায়ের গোছ কাদায় ডোবা, শরীরটা সামনে ঝোঁকান, পাড়ে উঠতে গিয়ে সেই অবস্থাতেই সে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটি লাল। শস্তার একটা কালো কস্ট্যুম শীর্ণ দেহের সঙ্গে লেপটে। হাঁপাচ্ছে, পিঠের দিকে পাঁজরের হাড়গুলো চামড়ার নিচে বারবার কেঁপে উঠছে। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু; সরু লম্বা হাড় দুটো ঝুলছে কাঁধ থেকে। একটু দূরে নীল শার্ট পরা রুগ্ন যুবকটি দাঁড়িয়ে, মনযোগে লাউড-স্পীকারে কান পাতার ভান করে।

টলতে টলতে কোনি উঠে এল। ওর বয়সীই দুটি ছেলে একটু জোরেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল।

"তবুতো শেষ করেছে।"

"পরের বছরের কম্পিটিশনে প্রথম প্লেস পেতো যদি আর একটু দেরীতে পৌঁছতো।"

কোনি আর একবার তাকাল। নীল শার্টপরা যুবকটির মুখ চড় খাওয়া মানুষের মত অপ্রতিভ, অপমানিত।

"সাঁতার শিখবে?"

চমকে কোনি পিছনে ঘুরল।

সেই লোকটা। কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। পুরু কাঁচের চশমা।

"লাল কস্ট্যুমপরা মেয়েটি সাঁতার শিখেছে তাই তোমাকে হারালো। তুমিও ওকে হারাতে পারবে যদি শেখো।"

হঠাৎ কোনির দু'চোখ জলে ভরে এল। থরথরিয়ে ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল। তারপরই চোয়াল শক্ত হয়ে বসে গেল।

ক্ষিতীশের চাহনির দপ করে ওঠা শুধু ভেলোই লক্ষ্য করল এবং অস্বস্তিভরে সে মাথা নাড়ল।

"ওই যে দাঁড়িয়ে, ও কে?"

"আমার দাদা।"

নিজেকে টানতে টানতে কোনি ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল। ক্ষিতীশ এগিয়ে গেল কোনির দাদাকে লক্ষ্য করে।

"আমি একজন সাঁতারের কোচ। আমার নাম ক্ষিতীশ সিংহ। আমি আপনার বোনকে সাঁতার শেখাতে চাই।"

ক্ষিতীশ কোন ভূমিকা না করে সোজাসুজি কথাগুলো বলল।

"আমার নাম কমল পাল। আমি একসময় সাঁতার কেটেছি অ্যাপোলোয়। তখন আপনাকে আমি দূর থেকে দেখতাম।" কমল তার পাণ্ডুর অসুস্থ চোখ দুটোর ঔজ্জ্বল্য আনার চেষ্টা করল।

তারপর মাথা নাড়িয়ে বলল, "আমরা খুবই গরীব। সাঁতার শেখাবার পয়সা নেই।"

"আমাকে পয়সা দিতে হবে না।"

"তা বলছি না। সাঁতার শিখতে হলে খরচ আছে, খাওয়া-দাওয়ার খরচ। আমি পারিনি সেইজন্য, পয়সা ছিল না খাওয়ার। বাবা প্যাকিং কারখানায় কাজ করত, টি বি-তে মারা গেল। সাঁতার কেটে এসে খিদেয় ছটফট করতুম। স্কুলে ঘুমিয়ে পড়তুম। বাবা মারা যেতে স্কুল ছাড়লুম, সাঁতার ছাড়লুম। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল।"

"কি করেন আপনি?"

"আপনি বললে লজ্জা পাব।"

"বেশ। তুমি কি করো, বাড়িতে আর কে কে আছেন?"

"সাত ভাই-বোন, মা। আমি বড়ো, গত বছর মেজো ভাই ট্রেনের ইলেকট্রিক তারে মারা গেছে, সেজো কাঁচরাপাড়ায় পিসির বাড়িতে থাকে। তারপর কোনি আর দু বোন এক ভাই। আমি রাজাবাজারে একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করি, ওভারটাইম করে শ' দেড়েক টাকা পাই তাতেই সংসার চলে। থাকি শ্যামপুকুরে বস্তিতে।"

কমল হাঁপিয়ে পড়ল এই কটি কথা বলেই। ভিতরে ভিতরে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ না করে সাধারণভাবেই নিজেদের অবস্থার কথা বলল। ওর হাঁপিয়ে ওঠার ধরণটা ক্ষিতীশের ভাল লাগল না। ওর বাবা টি বি-তে মারা গেছে, এটা মনে পড়ে অস্বস্তি বোধ করল।

"নামকরা সাঁতারু হবার সখ আমার ছিল। কোনিটাকে দেখতুম ছোট থেকেই ওর খেলাধুলোয় আগ্রহ। আমার ইচ্ছে করে ওকে কোনো একটা খেলায় দিই। গঙ্গায় সাঁতার কাটে শুনেছি, দেখিনি কখনো। দিনরাত টো টো করে শুনেছি ছেলেদের সঙ্গে। অনেকে অনেক কথা বলে আমাকে। আমি তো বাড়িতে ফিরি শুধু ঘুমোবার জন্য, কে কি করছে কিছুই জানি না। তবু মাথা গরম হয়ে উঠলে দু-চার ঘা লাগাই। এর বেশি ওদের জন্য আমি আর কিছু করতে পারি না। ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাঁতার শেখাবার সামর্থ্য আমার নেই।"

"সে দায়িত্ব আমার।"

"তার মানে?" ভেলো ব্যস্ত হয়ে এতক্ষণে মুখ খুলল। "দায়িত্ব তোমার মানে?"

"মানে বলতে যা বোঝায় তাই।" ক্ষিতীশ বিরক্তি জানিয়ে কমলকে লক্ষ্য করে বলল, "গার্জেনরা সাহায্য না করলে কোন ছেলেমেয়েকে শুধু কোচিং দিয়ে বড় করা যায় না। আমি শুধু বাড়ির সহযোগিতাটুকু চাই। বাদবাকি দায়িত্ব আমার।"

"আপনি দায়িত্ব নেবেন, সে তো ভাগ্যের কথা।" কমলের চোখের পাণ্ডুরতা চকচক করে উঠল। "কিন্তু আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না। টাকা ধার করে কালকেই বারো টাকা দিয়ে ওকে কস্ট্যুম কিনে দিয়েছি। খুবই বাজে জিনিষ। কখনো ওর সাঁতার দেখিনি, এই প্রথম দেখলুম। কথা দিয়েছিল, মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবেই। দেখলেন তো কি হল।"

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল।

ভেলো বলল, "স্ট্রেংথই নেই, আদ্দেকের পর আর টানতে পারছিল না। ওকে এখন খুব খাওয়াতে হবে। তাই না ক্ষিদ্দা?"

"আমরা এখন চলি।"

ক্ষিতীশ পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল দূরে কোনি দাঁড়িয়ে। ফ্রক পরে। কাঁধে প্লাসটিকের ব্যাগ।

"আমার খুবই ইচ্ছে, ও সাঁতার শিখুক, বড় হোক, নাম করুক।" তারপর ইতঃস্তত করে কমল বলল, "আর, যতটুকু পারি টেনেটুনে চালিয়ে খরচ করার চেষ্টা করব।"

প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। নাম ডাকা এবং হাততালির শব্দ লাউডস্পীকারে ভেসে আসছে।

"মেয়েদের মধ্যে প্রথম......"

ক্ষিতীশ তাকিয়ে ভাইবোনের দিকে। প্রাইজ না নিয়ে চলে যাচ্ছে উল্টোদিকের পথ ধরে। ভাঙা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তায় পড়বে। কমল গলে বেরিয়েছে। কোনি কাত হয়ে মাথা নিচু করে। ঝটকা দিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল।

"...বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের হিয়া মিত্র। টাইম—পঁয়ত্রিশ মিনিট আঠারো সেকেন্ড।"

কোনি মাথা নামিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি ক্ষিদ্দা!"

"কি করে বুঝলি।

"ওই পিলসুজমার্কা সিড়িঙ্গে, কেষ্ট তুলসীর মত রঙ, খেতে পরতে পায় না ওকে তুমি সাঁতার শেখাবে, আবার দায়িত্বও নেবে?"

"হ্যাঁ, তা না হলে কি শেখান যায়?"

"দায়িত্ব কথাটার মানে?"

"মানে খাওয়া পরার দায়িত্ব, মানসিক গড়ন, যেটা সবথেকে ইমপর্ট্যান্ট, তাই গড়ে তোলার দায়িত্ব, রেগুলার ট্রেনিং করানোর দায়িত্ব, এইসব আর কি।"

"তা হলে তো ওকে বাড়িতে এনে রাখতে হয়।"

"দরকার হলে রাখতে হবে। এককালে গুরুগৃহে থেকেইতো শিষ্যরা শিখতো। সিস্টেমটা খুব ভালো।"

"সিস্টেমের মধ্যে বৌদির কথাটা মনে রেখেছো তো!"

ক্ষিতীশ রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। থেমে, কান পাতল লাউডস্পীকারে।

"কনকচাঁপা পাল, আন অ্যাটাচড্।...কনকচাঁপা পাল।" তারপর মৃদু ফিসফিস শোনা গেল, "বোধহয় চলে গেছে। থাক্, রেখে দাও।"

ক্ষিতীশ দেখল, সবুজ ফিয়াটের ধারে লাজুক মুখে হিয়া দাঁড়িয়ে। আনন্দ ফেটে পড়ছে ওর দুই গালের টোলে। এক মহিলা বাক্সটা তুলে মেডেলটা দেখছে আর হাসছে। প্রণবেন্দু ওদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে। সুপুরুষ, সুবেশ এক ভদ্রলোককে সে কি একটা বোঝাবার জন্য হাত পাড়ি দিয়ে বাটারফ্লাই স্ট্রোকের ভঙ্গি করল।

"সামনের বছর দেখা যাবে।" নিজেকে উদ্দেশ করে আপন মনে ক্ষিতীশ বলল।

"কিছু বলছ ক্ষিদ্দা?"

ক্ষিতীশ জবাব দিল না।

"শেখাবে যে, জল কোথায়? জুপিটারে তুমি আর ট্রেনার নও। তাহলে মেয়েটাকে কোথায় নামিয়ে শেখাবে? অন্য ক্লাবে তোমায় যেতেই হবে।"

"না, আমি জুপিটারেই ওকে শেখাব। দেখি কে আমায় আটকায়। তার আগে আমাকে রোজগারে নামতে হবেরে ভেলো। এখন আমার টাকা চাই। বিষ্টু ধরের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

ওরা তখন খেতে বসেছে।

হঠাৎ দরজায় ক্ষিতীশকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"তোমাকে দরকার, একটু বাইরে এসো।"

কোনিকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে, সে দরজা থেকে সরে গেল। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সে দেখে নিয়েছে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, ফ্যান এবং সম্ভবত তার মধ্যে কিছু ভাত আছে আর তেঁতুল। পাঁচটি প্রাণী কলাই আর অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে বসে। ঘরে একটা তক্তপোশ। তোষক নেই, শুধু চিটচিটে ছোট কয়েকটা বালিশ। দেয়ালে টাঙানো দড়িতে কিছু ময়লা জামা-প্যান্ট। খোলার চালের এই ঘরে একটি মাত্র জানলা, যার নিচেই থকথকে পাঁকে ভরা নর্দমা।

কোনি কৌতূহলী চোখে বেরিয়ে এল।
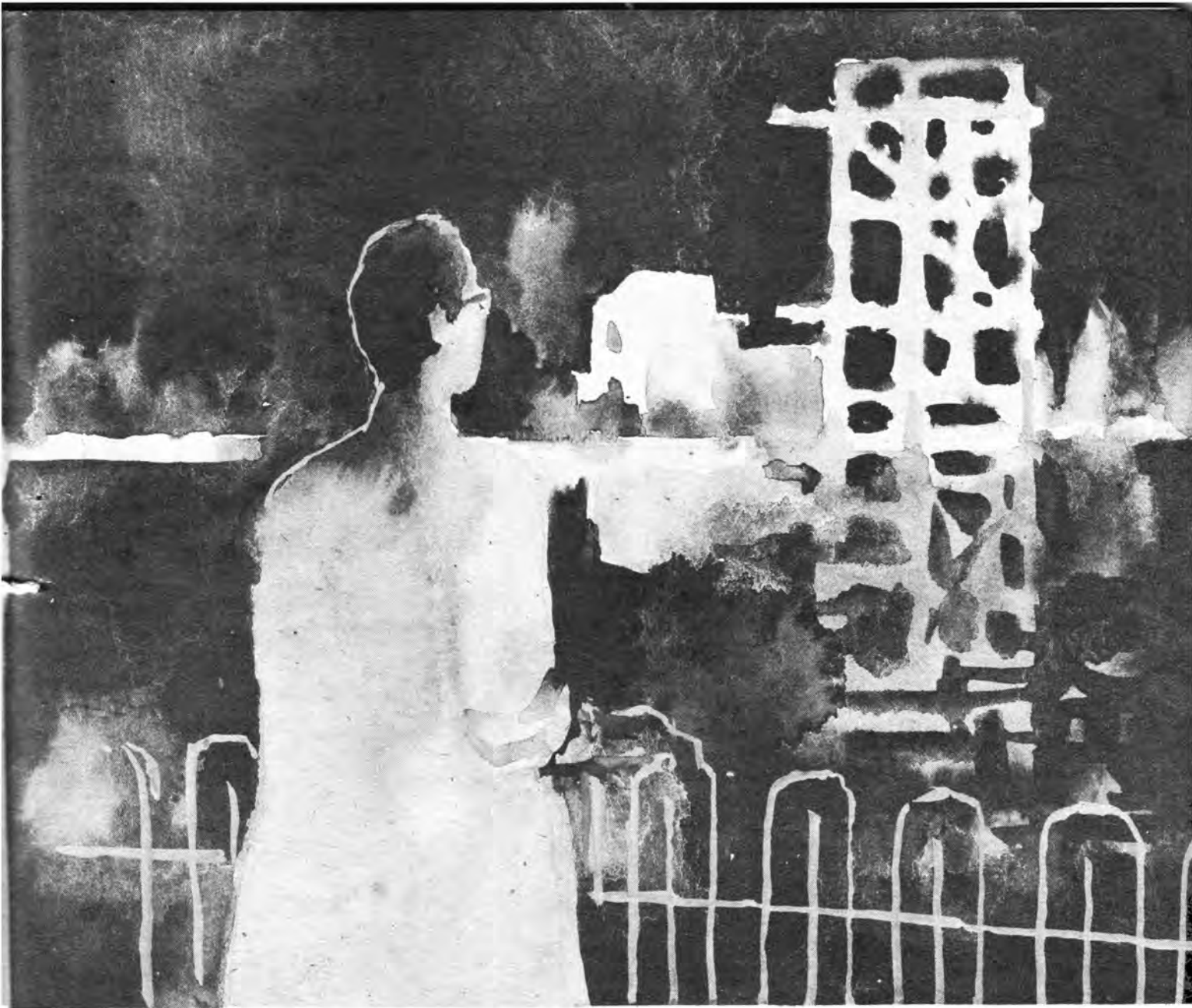
"এই ফর্মটায় সই করে দাও, আর আজ বিকেলে আমার সঙ্গে জুপিটার ক্লাবে যাবে।"

ফর্মটা হাতে নিয়ে কোনি ফাঁপরে পড়ল। "কলম আছে আপনার?"

ক্ষিতীশের কাছে নেই।

"পেন্সিলে লিখলে হবে?"

"না, কালিতে সই করতে হবে।"

কোনি ছুটে গিয়ে কোথা থেকে কলম যোগাড় করে আনল। ক্ষিতীশের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় কলম বাগিয়ে সে জানতে চাইল,

"ইংরিজিতে না বাঙলায়?"

"যা খুশি।"

ধরে ধরে, বিড়বিড়িয়ে বানান করে, কোনি ইংরাজীতেই সই করল। সেটা দেখে ক্ষিতীশ বলল, "কোন্ ক্লাশে পড়ো?"

"ফাইভে।"

"স্কুলে যাও?"

"নাম কেটে দিয়েছে।"

"আজ ঠিক চারটের সময় কমলাদিঘির পশ্চিম দিকের বড়-গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোয়ালে, কস্টুম সব নিয়ে যাবে।"

"তোয়ালে নেই।"

"আমি নিয়ে যাব। তুমি ঠিক সময়ে আসবে।"

ঠিক সময়েই কোনি হাজির ছিল। ক্ষিতীশ ওকে নিয়ে ক্লাবে ঢুকল। অফিস ঘরে হরিচরণ আর প্রফুল্ল বসাক। ক্ষিতীশ ফর্মটা প্রফুল্লর হাতে দিল। সেটা পড়ে প্রফুল্ল বলল, "সুইমার?"

"হ্যাঁ।"

"ট্রায়াল দিতে হবে।"

"তার মানে!" ক্ষিতীশ বিরক্ত হয়েই বলল, "আমি বলছি তাতে হবে না?"

"তা কি করে হয়। ক্লাবের একটা নিয়ম আছে তো। ট্রেনার যদি বলে তবেই সুইমার। যে সে, যাকে তাকে এনে সুইমার বলবে আর জলে নেমে যদি ডুবে যায় তখন আমরাইতো হাঙ্গামায় পড়ব।"

প্রফুল্ল কথাগুলো বলতে বলতে হরিচরণের দিকে তাকাল। জানলার বাইরে তাকিয়ে হরিচরণ তখন মুচকি হাসছে।

"যে সে! আমি তাহলে যে সে?" ক্ষিতীশ বিড়বিড় করল থমথমে স্বরে। কোনি অবাক হয়ে দেখছে দলে দলে ছেলেরা কস্টুম পরে ক্লাব থেকে বেরোচ্ছে। তিন-চারটি মেয়েও আছে তার মধ্যে। বাইরে হৈ চৈ জলের ধারে 'নভিস' ছেলেদের।

"বেশ তাহলে ট্রায়াল নেওয়া হোক্।"

হরিচরণ মুখ ফেরাল এতক্ষণে। কোনিকে আপাদ মস্তক দেখে বলল, "মেয়েটি কে?"

"আমার চেনা মেয়ে। গুড মেটিরিয়াল। স্ট্রোক শেখাতে হবে।"

"গুড মেটিরিয়াল!" হরিচরণ ঠোঁট বেঁকিয়ে শব্দগুলো দুমড়ে মুখ থেকে বার করল। কোনিকে আর একবার দেখে নিয়ে, গম্ভীরস্বরে বলল, "এ ক্লাবের কাউকে স্ট্রোক শেখাতে হলে, শেখাবে ক্লাবেরই ট্রেনাররা। কাল সকালে আসুক। বন্দনা কি টুনু ওর ট্রায়াল নেবে।"

ক্ষিতীশ কয়েক সেকেন্ড হরিচরণ ও প্রফুল্লের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আচ্ছা।"

বেরিয়ে এসে কোনি বলল, "কি হল, ভর্তি করাল না?"

"পরীক্ষা দিতে হবে। কোনি, আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা দিতে হবে।"

কথাটা বুঝতে পারল না কোনি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "দুজনকেই! কেন, আপনি সাঁতার জানেন না?"

"সাঁতার নয়, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অপমান সহ্য করার।"

ক্ষিতীশ জলের ধারের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। দুটি ক্লাবের প্রায় চারশো ছেলে কমলাদিঘিতে দাপাদাপি করছে, কয়েকটি মেয়েও আছে। দুটো ডাইভিং বোর্ডে কয়েকটি ছেলে। তারা জলে লাফাচ্ছে নিছকই লাফাবার জন্য। বিষণ্ণচিত্তে ক্ষিতীশ মাথা নাড়ল। কাজের কাজ কেউই করছে না। সুহাস জলে নামছে। একবার সে তাকাল মাত্র তার দিকে।

হরিচরণ ক্লাব অফিসের জানলা থেকে চেঁচিয়ে বলল, "সুহাস দুটো ফোর হানড্রেড, তারপর, হানড্রেড বাটারফ্লাই, ব্যাক অ্যান্ড ব্রেস্টস্ট্রোক ইচ্, মনে আছে তো?"

সুহাস ঘাড় নাড়ল।

ক্ষিতীশ হাসল। মাত্র এগারোশো মিটার, এই ট্রেনিংয়ে এরা উন্নতি করবে! তবে সুহাসের স্ট্রোক নিখুঁত। ক্ষিতীশ বলল, "কোনি ওইযে ছেলেটা জলে নামল, ওকে লক্ষ্য করো, দেখো কেমনভাবে হাত পাড়ি দেয়।"

কোনি একাগ্র হয়ে তাকিয়ে রইল সুহাসের সাঁতারের দিকে। ক্ষিতীশ এক সময় বলে উঠল, "হাতটা মাথার ঠিক সামনে জলে ঢুকে সামনে চলে যাচ্ছে তারপর নীচে নামছে তারপর টেনে উরু পর্যন্ত আনছে। সব থেকে দরকার স্পীডে হাত চালানো। তারমানে এলোপাথাড়ি গঙ্গায় যেভাবে করো তা নয়। সুন্দরভাবে জলে হাতের ঢোকাটা আর শক্ত কব্জি খুব দরকার। আসল স্পীডটা আসে কাঁধের পিঠের আর হাতের মাসলের শক্তি থেকে। এজন্য তোমায় একসারসাইজ করতে হবে। এই শক্তিটাকে গুছিয়ে কাজ করালে তবেই স্পীড আসবে। মাথাটা কিভাবে রয়েছে দেখেছ? তুমি যেমন এধার ওধার নাড়াও, সেই রকম করছে কি? মুখ জলে ডুবিয়ে কেমন এগোচ্ছে। শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাথাটা, ওই দ্যাখো পাশে ঘোরাল। বেশি মাথা নাড়ালে স্পীড কমে যায়। কাঁধটা জল থেকে উঠে আছে।"

কোনি শুনছে কি শুনছেনা বোঝা গেলনা। সাঁতারুর দিকে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে বলল, "আচ্ছা ওই মেয়েটার নাম কি?"

ক্ষিতীশ একটু হতাশ হয়েই বলল, "জানি না।"

"ওর কস্ট্যুমটা কিসের গেঞ্জির?"

"নাইলনের খুব দামি।"

"খুব সুন্দর রঙটা।"

ক্ষিতীশ কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, "তোমাকে কিনে দেব একটা।"

কোনি ঘুরে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

"যেদিন তুমি ওই রকম স্ট্রোক দিতে শিখবে।" ক্ষিতীশ আঙুল দিয়ে সাঁতরে যাওয়া সুহাসকে দেখাল।

কোনি তীক্ষ্ণ চোখে সুহাসের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "দুদিনে শিখে নেব।"

"ভাল। কাল সকাল ঠিক সাড়ে ছটায় আজ যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, সেখানে দাঁড়াবে। কস্ট্যুম সঙ্গে আনবে। পাশ তুমি করে যাবেই, সেজন্য ভাবছিনা। কিন্তু স্ট্রোক শেখানোর ভার পান্না কি নির্মলের উপর যদি পড়ে তাহলে তো সব মাটি হয়ে যাবে।"

কিন্তু কোনি পাশ করেও ভর্তি হতে পারল না।

সকালে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে পরীক্ষা নেওয়া দেখল। কোনি অনায়াসে দুশো মিটার সাঁতরালো, জলে দুহাত তুলে রইল, ঝাঁপ দিল ডাইভিং বোর্ডের নীচতলা থেকে। বিকেলে অফিস ঘরে প্রফুল্ল তাকে বলল, "সম্ভব নয়, আর মেম্বার নেওয়া যাবেনা, সেক্রেটারির স্ট্রিক্ট অর্ডার। জলে আর হাত-পা ছোঁড়ারও জায়গা নেই এত ভীড়। আজকেইতো দুজনকে রিফিউজ করতে হল।"

"তাহলে কালই সেটা আমাকে বলা হল না কেন?" ক্ষিতীশ রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও সামলে নিল।

"বলার কথাটা মনে ছিল না।"

বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসার মতো ক্ষিতীশ ক্লাব থেকে বেরিয়েই দেখল স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে হরিচরণ দাঁড়িয়ে। কথা বলছে দুটি ছেলের সঙ্গে।

"হরিচরণ," ক্ষিতীশ চীৎকার করে উঠল। "চিফ ট্রেনার হতে চেয়েছিলিস, হয়েছিস। এরপরও এসব কি হচ্ছে?"

হরিচরণ বিরক্তিভরে ফিরে তাকিয়ে বলল, "কি আবার হচ্ছে?"

"আমার মেয়েটাকে ভর্তি করলিনা কেন?"

"প্রফুল্লর কাছে যাও।"

"ওসব ছেঁদো ওজর অনেক শোনা আছে। তবে এই বলে রাখলুম, দেখবি ওই মেয়ে তোদের মুখে চুণকালি দেবে। সেদিন আফশোস করবি।"

"ওই মেয়ে, যাকে কাল এনেছিলে! ভালো, ভালো, তাই দিক। একটা মেয়ে সুইমার বেঙ্গল পাচ্ছে তাহলে!"

"বেঙ্গল নয় ইন্ডিয়া পাবে।" রেলিংয়ে ধরা মুঠোটা শক্ত করে নিজেকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ক্ষিতীশ ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে যেতে লাগল, "ওলিম্পিকের গুল মেরে সুইমার তৈরী করা যায়নারে, ধরা একদিন পড়বিই।"

প্রফুল্ল ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল।

"কি আবোল তাবোল চীৎকার করছ ক্ষিদ্দা।"

"বেশ করছি। কর্পোরেশনের জমিতে আমি দাঁড়িয়ে। তোদের ইতরোমোটা শুধু দেখছি। মেয়েটাকে তোরা ভর্তি করলিনা, ভেবেছিস আর বুঝি ক্লাব নেই। পৃথিবীতে শুধু জুপিটারই একমাত্র ক্লাব।"

"তা হলে যাওনা অন্য ক্লাবে।" হরিচরণ চেঁচিয়ে উঠল। "ওইতো পাশেই একটা ক্লাব রয়েছে।"

"তাই যাব, তাই যাব।"

ক্ষিতীশ হন্হন্ করে এগিয়ে গেল অ্যাপোলোর দিকে। পিছনে জমে যাওয়া ভীড়টাকে উদ্দেশ্য করে প্রফুল্ল বলল, "পাগল মশাই পাগল।"

অ্যাপোলোর গেটে পৌঁছে সম্বিৎ ফিরল ক্ষিতীশের। দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের প্রতি অবাক হয়ে ভাবল, এখানে আমি এলাম কেন? এরা তো জুপিটারের শত্রু। আমি কি নেমকহারাম হলাম।

ক্ষিতীশকে দেখতে পেল অ্যাপোলোর অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নকুল মুখুজ্জে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে এসে বলল, "কি ব্যাপার, ক্ষিতীশ যে! তুই এখানে?"

হঠাৎ ক্ষিতীশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "তোমাদের এখানে জায়গা হবে নকুলদা। জুপিটার আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"যাঃ কি আজেবাজে বকছিস। তোকে তাড়াবে কে?"

"সত্যি বলছি নকুলদা তাড়িয়ে দিয়েছে। আমায় টাকা পয়সা দিতে হবে না। একটা মেয়ে পেয়েছি, তাকে শেখাবার সুযোগটুকু দিও তা হলেই হবে।"

"ভেতরে আয়, আগে সব শুনি।"

"তার আগে বলে রাখি, আমি কিন্তু জুপিটারের লোক, অ্যাপোলো কোনদিনই আমার ক্লাব হবে না।"

"তাহলে তোকে আমরা নোব কেন?"

"আমাকে নয়, মেয়েটাকে নাও। আমি ওকে শেখাব। ও যদি সম্মান আনে তাহলে সেটা হবে অ্যাপোলোর।"

"আচ্ছা আচ্ছা, ভেতরে চল।"

"আগে বলো, আমার শর্তে রাজি। অ্যাপোলোর তুমিই সব, তোমার কথায় ক্লাব ওঠে বসে। তুমি কথা দিলে তবেই ঢুকব।"

নকুল মুখুজ্জে কিছুক্ষণ স্থির চোখে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর জুপিটার থেকে বেরিয়ে আসা মানে আমাদের শত্রুর দুর্গের একটা খিলেন ভেঙ্গে পড়া। অ্যাপোলোর ছাদের নীচে যদি তুই আসিস সেটাই আমাদের ভিকট্রি হবে। আচ্ছা, কথা দিলুম।"

গেট অতিক্রম করার আগে ক্ষিতীশ একবার পিছন ফিরল। কমলাদিঘির জলে ছায়া পড়েছে পশ্চিমের দেবদারু আর রাধাচূড়া গাছের। জুপিটারের বিরাট ঘড়িটার কালো ডায়ালে কাঁটাদুটো আবছা লাগল ক্ষিতীশের পুরু লেন্সে। বুকের মধ্যে প্রচন্ড একটা মোচড় সে অনুভব করল। চিকচিক করে উঠল চোখদুটো।

সেই রাতে ঘুম এলনা ক্ষিতীশের। বারান্দায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রাতটা কাটাল। বারবার একটা কথাই তার মনে পাক দিয়ে ফিরলঃ "আমি কি ঠিক কাজ করলাম? অ্যাপোলোয় যাওয়া কি উচিত হল?"

ভেলো উত্তেজিত হয়ে হাজির হল সকালেই।

"ক্ষিদ্দা তুমি অ্যাপোলোয় জয়েন করেছ? বেশ করেছ। তোমাকে তো সেই কবে বলেছিলুম শত্রু মিত্র বাছ বিচার করে কোন লাভ নেই।"

ক্ষিতীশ চুপ করে রইল।

"জুপিটারকে এবার শায়েস্তা করা দরকার। বুঝলে ক্ষিদ্দা, তুমি শুধু ওই নাড়ির সম্পর্ক-টম্পর্কগুলো একটু ভুলে যাও..."

"ভেলো।"

ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত। পুরু লেনস ভেঙ্গে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসবে। ভেলো একপা পিছিয়ে গেল।

"আর একটি কথা যদি বলেছিস তো—"

ভেলো বিড়বিড় করে বলল, "আমার ভুল হয়ে গেছে। আমায় মাপ করো ক্ষিদ্দা।"

৭

"না না না, কতবার বলব কনুইটা অতটা ভাঙ্গবেনা...... হাতটা অমন তক্তার মতো লাফিয়ে উঠল কেন? উহুঁ উহুঁ... হলনা, বাঁ হাতটা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ কাঁধটাও এগোচ্ছে আর ডান কাঁধটা পিছিয়ে যাচ্ছে, এতে স্কোয়ার শোল্ডার পোজিশানটা যে ভেঙ্গে যাচ্ছে...নে নে, আবার কর্......ওকি! জলের বাইরে হাত নিয়ে যাবার সময় শরীরের পাশের দিকটা বেঁকে তেউড়ে শুঁয়োপোকা চলার মতো হয়ে যাচ্ছে যে!...... দ্যাখ্ আমাকে দ্যাখ। তোর কনুইটা কেন বাঁক খাচ্ছেনা বোঝার চেষ্টা কর্...এইভাবে, এই এই রকম। আর হাতের আঙুল জল টানবার সময় ফাঁক করবি না। জলের ওপর থাবড়ে থাবড়ে হাত ফেলিস দেখেছি, ওভাবে নয়। পরিষ্কারভাবে সোঁত করে ঢুকে যাবে। আগে আঙুল তারপর কব্জি থেকে পুরো হাতটা। আর নিঃশ্বাস নেওয়াটা ভাল করে বুঝেনে। যদি ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিঃশ্বাস নিস তাহলে বাঁ হাতটার কব্জি যখন জলে ঢুকছে তখন মাথা ঘোরাবি। মাথা নিচু রাখার জন্য থুতনিটা বুকের দিকে টেনে রাখবি। মাথার লাইন এধার ওধার হবে না। ডান হাতটা যখন উঠবে তার তলা দিয়ে উঁকি দেবে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে। আর ডান হাত যেই জলে ঢুকছে সেই সঙ্গে তোর মুখও আবার জলে ডুবছে।...যা যা আবার কর্। দুহপ্তা হয়ে গেল এখনো একটা জিনিসও ঠিক মতো করতে পারলি না।"

জলের ধারে সিমেন্ট বাঁধানো সরু পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ সমানে বক্‌বক্ করে চলেছে। কোনি পাড়ের ধারে খানিকটা সাঁতরায় আর থেমে থেমে ওর দিকে তাকায়। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে এই ব্যাপার চলেছে। এখন সাড়ে আটটা।

"আর পাচ্ছি না ক্ষিদ্দা।"

"কেন! বলেছিলি দুদিনেই সুহাসের মতো স্ট্রোক শিখে নিবি। দুদিন ছেড়ে তো সতেরো দিন হয়ে গেল।"

জলের মধ্যে দাঁড় সাঁতার কাটতে কাটতে কোনি চাপা রাগ নিয়ে বলল, "করছিতো আমি। আপনি খালি হচ্ছে না হচ্ছে না বলেই যাচ্ছেন।"

"না হলে কি বলব, হচ্ছে?"

"হচ্ছেই তো।"

"কিচ্ছু হয়নি। যা বলছি আবার কর্।"

"আমার ভাল লাগছে না।"

কোনি পাড়ের দিকে এগিয়ে এল। ক্ষিতীশ কি করবে ভেবে না পেয়ে বলল, "স্ট্রোক শিখলে কিন্তু নাইলন কস্ট্যুম দেবো।"

"দরকার নেই আমার।"

বাঁধানো পাড়ে দুহাতের ভরে কোনি জল থেকে উঠে এল। ক্ষিতীশ বুঝতে পেরেছে ওকে খাটাতে হলে জোর জবরদস্তিতে কাজ হবে না। কিছু একটা প্রাপ্তিযোগ না থাকলে ওকে উৎসাহিত করা যাবে না।

"উঠে পড়লি যে, ক্ষিদে পেয়েছে?"

কোনি কথা বলল না। এগিয়ে গেল রেলিংয়ের গেট লক্ষ্য করে।

"ক্ষিদেতো পাবেই। ভাবছি দুটো ডিম, দুটো কলা দুটো টোস্টের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়।"

কোনি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্ষিতীশ মনে মনে হিসেব করে দেখল, প্রায় একটাকার ধাক্কা।

"আজ থেকে?"

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল। কোনি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, "আমি কিন্তু বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাব।"

ক্ষিতীশ একটু কৌতূহলী হয়েই বলল, "বাড়িতে কেন!"

"এমনিই। বাইরে আমি খাব না।"

"তাহলে আরো একঘণ্টা জলে থাকতে হবে।"

ক্ষিতীশ কথাটা বলেই মনে মনে ব্যথিত হল। লোভ দেখিয়ে ক্ষুধায় অবসন্ন কোনিকে আরো পরিশ্রম করানো অমানুষিক কাজ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সাধ্যের বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবেই, নয়তো কিছুতেই সাধ্যটাকে বাড়ানো যাবে না। খাটুক, আরো আরো খাটুক। যন্ত্রণায় ঝিমঝিম করবে শরীর, টলবে, লুটিয়ে পড়তে চাইবে যন্ত্রণার পাঁচিলের সামনে। আর তখন জেনেশুনেই চ্যালেঞ্জ দিতে হবে ওই পাঁচিলটাকে। এজন্য চরিত্র চাই, গোঁয়ার রোখ্ চাই।..."নাম্ নাম্, দাঁড়িয়ে আছিস কেন। দুটো ডিম, দুটো কলা, দুটো মাখন টোস্ট।" যন্ত্রণা কি জিনিষ সেটা শেখ্। যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় না হলে, তাকে ব্যবহার করতে না শিখলে, লড়াই করে তাকে হারাতে না পারলে কোন দিনই তুই উঠতে

পারবি না।......"ঠিক আছে ঠিক আছে, কনুই অতটা উঠবে না। মুখ ডুবিয়ে।" যন্ত্রণা আর সময় তোর অপোনেন্ট। ও দুটোকে আলাদা করা যায়না। যন্ত্রণাকে হারালে সময়কেও হারাতে পারবি। সময়কে হারালে পারবি যন্ত্রণাকে হারাতে।

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ মনে মনে কোনির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে। কমলাদিঘিতে এখন সাঁতার কাটছে একমাত্র কোনি। মাঝখানের চওড়া ঘাটে তিনচারজন বাইরের লোক স্নান করছে। বাসন ধুচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। জুপিটার এবং অ্যাপোলোর নম্বর লেখা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মগুলো পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশ মিটারের ব্যবধানে। সেগুলো এখন জনশূন্য। শুধু জুপিটারের স্প্রীং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিয়ে যাচ্ছে গোটাচারেক উট্‌কো বাচ্চা ছেলে। জুপিটারের ক্লাবের বারান্দায় বেঞ্চে বসে দুটি লোক তেলেভাজা খেতে খেতে গল্প করছে আর হাসাহাসি করছে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে।

অ্যাপোলো ক্লাবের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অমিয়া আর বেলা। কোনির সাঁতার দেখতে তারা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াল। অমিয়া দিন সাতেক পর আজ জলে নেমেছিল। কলেজের পরীক্ষার জন্য এখন সে ব্যস্ত। অমিয়া না থাকলে বেলা নাকি ট্রেনিংয়ে যত্ন পায়না। দুজনে আজ আধ মাইল করে সাঁতরেছে।

"কেরে মেয়েটা?" অমিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"ক্ষিদ্দার আবিষ্কার।" বেলা চোখ পাকিয়ে বলল, "শুনিসনি, হরিচরণদা কি বলছিল সেদিন? ক্ষিদ্দা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে জুপিটারকে ডাউন দেবে ওই মেয়েটাকে দিয়ে।"

"সেকিরে, ওতো এখনো হাতের টান দিতেই শেখেনি। সামনের বছরই আমি কিন্তু জুপিটারে ফিরে যাব। যেখানে ক্ষিদ্দা আছে সেখানে আমি নেই। পাঁচজনের সামনে ট্যাঁকোস ট্যাঁকোস করে কথা শোনাবে ও আমার সহ্য হয় না।"

"আমিও তাহলে যাব।"

দুজনে আর একবার কোনির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তখন অমিয়া হেসে বলল, "কম্পিটিশনে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা ধোয়া জল খাবে।"

প্রায় পৌনে দশটা। বাজার নিয়ে ফিরতে আজ দেরি হবেই। ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে হাঁটছে, পিছনে কোনি। একটা মোটর ফুটপাথ ঘেঁষে ক্ষিতীশের পাশে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল বিষ্টু ধরের মুখ।

"ও/ ক্ষিতীশবাবু আপনাকেই খুঁজছি যে। যে ইস্পিচটা লিখে দিলেন সেটা কেমন যেন ঠিক বাগে আনতে পাচ্ছিনা একটু ডিসকাসন করলে ভাল হতো। আজকেই তো বিকেলে সভা।"

"কিন্তু আমার যে এখুনি বাজার করে বাড়ি পেঁছিতে হবে।"

"গাড়িতে উঠুন। বাজার সেরে গাড়িতেই পেঁাছে দিয়ে, ডিসকাসটা করে ফেলব।"

বিষ্টু ধর মোটরের দরজা খুলে দিল। ব্যস্ত হয়ে ক্ষিতীশ গাড়িতে উঠছে তখন জামায় টান পড়ল।

"খাবারের কি হবে।"

"ওহ্ তোর ডিম-কলা।" ক্ষিতীশ বিব্রত হয়ে, কি বলবে ভেবে পেল না।

"আমাকে বরং পয়সাটা দিয়ে দিন, কিনে নোব।"

কথা না বলে ক্ষিতীশ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কোনির হাতে দিয়ে বলল, "বিকেলে ঠিক সময়ে আসিস।"

গাড়ি চলতে শুরু করলে বিষ্টু ধর জিজ্ঞাসা করল, "কে মেয়েটা?"

"আমার ভবিষ্যৎ।" ক্ষিতীশ হেসে বলল।

লীলাবতী যথারীতি তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ রান্নার উদ্যোগ না করে বিষ্টু ধরকে নিয়ে বারান্দায় বসল। বিশু আর খুশি এগিয়ে এল ক্ষিতীশকে দেখে। বিষ্টু কুঁকড়ে গিয়ে বলল, "ও দুটোকে সরান। দেখলে গা সিরসির করে।"

বেড়াল দুটিকে ক্ষিতীশ ছোট্ট ধমক দিতেই ওরা বারান্দা থেকে নেমে গেল।

"দারুণ ট্রেনিং তো!"

"ওদের ভালবাসি তাই কথা শোনে। ভালবাসলে সবকিছু করিয়ে নেওয়া যায়, মানুষকে দিয়েও।"

"তার মানে মানুষ আর জানোয়ারকে একই লাইনে ফেলছেন।"

"তা কেন। জানোয়ার দেখলে মানুষের গা সিরসির করে, কিন্তু মানুষ দেখলে জানোয়ারের করে কিনা আমি জানি না।"

"অই অই, অমনি ত্যারাব্যাঁকা কথা শুরু হয়ে গেল।" বলতে বলতে বিষ্টু ধর পকেট থেকে বক্তৃতা লেখা কাগজটা বার করল। "আমি দাগ দিয়ে রেখেছি জায়গাগুলো। রাস্তায় রবারের বল ফাইনাল, চিফ গেস্ট বিনোদ ভড়। বুঝলেন না, ওর দলের ছেলেরা থাকবে। ফস্ করে যদি কিছু প্রশ্ন করে বসে আর যদি জবাব দিতে না পারি তাহলে আওয়াজ খাবো, বেইজ্জত হবো।"

ক্ষিতীশ কাগজটা মন দিয়ে পড়ে বলল, "হুঁ, কি জানতে চান?"

"ওইযে লিখেছেন, 'ট্যালেন্ট ঈশ্বরের দান। সেটা ফুটিয়ে তোলা যায় কিন্তু তার বদলী হিসাবে কোনকিছুই সে জায়গায় বসানো যায়না। যার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, সেটা যদি সে ব্যবহার না করে তাহলে তাকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করতে-হবে।' কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে বহু ট্যালেন্ট-ওলা লোক আছে যারা শুধু খাওয়া-পরার ধান্দাতেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব আগে মানুষের দরকার বেঁচে থাকা, এটা তো মানেন?"

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল।

"রাশিয়া-টাশিয়ায় বড় বড় খেলোয়াড়দের খাওয়াপরার চিন্তা করতে হয় না। গভরমেন তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে, স্টেটই তাদের সব কিছু দেয়। সেই রকম আমাদের দেশেও গভরমেনকে দেখা উচিত যাতে প্লেয়াররা খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এসব কথা একটু বলা দরকার, বুঝলেন না পাবলিক এখন লেফটিস্ট ধরনের তো।"

"কিন্তু ভারত বা বাংলা তো কম্যুনিস্ট দেশ নয়, এখানে গণতন্ত্র। এখানে প্লেয়ারকে সব কিছুরই জন্য লড়তে হবে। গণতন্ত্রে এই স্বাধীনতাটা আছে—লড়াইয়ের স্বাধীনতা।"

"আপনি কি সব কিছুরই, মানে খাওয়া-পরার জন্যও জানোয়ারের মতো কামড়াকামড়ি করে বাঁচতে চান?"

"মানুষ হিসেবে নিশ্চয় চাইনা কিন্তু সুইমিং কোচ হিসেবে, হ্যাঁ চাই। আরামে সব জিনিষ পাওয়া যায়না, বুঝলেন, আপনার পাবলিককে বলবেন একটা সুইমারকে খেটে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উঠতে হবে। পড়ুন পড়ুন লেখাটা পড়ুন তো।"

ক্ষিতীশ উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি শুরু করল। বিষ্টু ধর ভীরুচোখে ক্ষিতীশের দিকে এবং বিশু-খুশির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল—"বিরাট বিরাট খেলোয়াড়ের গৌরবের ছটায় আলোকিত হয় তার দেশ। যদি প্রশ্ন করি, অস্ট্রেলিয়ার কথা উঠলে সব আগে কাদের নাম আপনার মনে ভেসে উঠবে? নিশ্চয় ডন ব্র্যাডম্যান, ডন ফ্রেজার, কেন রোজ-ওয়ালের নাম। যদি বলি ব্রাজিলের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি? পারবেন কেউ বলতে? কিন্তু পেলের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। ইথিওপিয়া ছোট্ট দেশ, গরীব দেশ অখ্যাত দেশ। কিন্তু বিকিলা যখন দৌড়ল, দেশটা বিখ্যাত হয়ে গেল।"

বিষ্টু ধর দম নেবার জন্য থামল। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে পড়ে

একমনে শুনছিল। বলল, "কিন্তু শুধু মেডেল ধোয়া জল খেয়ে আপনার কি আমার চলবেনা। মেডেল তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একটা দেশ বা জাতের কাছে মেডেলের দাম অনেক, হিরোর দাম অনেক। দেশের ছেলে মেয়েদের কাছে একজন হিরো, সে সাঁতারুই হোক আর সেনাপতিই হোক আদর্শ-স্থাপন করে। তবু ওদের মধ্যে তফাৎ আছে, বড় সাঁতারু জীবনের প্রাণের প্রতীক, সেনাপতি মৃত্যুর ধ্বংসের। সাঁতারু অনেক বড় সেনাপতির থেকে। যুদ্ধজয়ী সেনাপতি সমীহ পায় আবার ঘৃণাও পায়। কিন্তু বিরাট সাঁতারু সারা পৃথিবীকে প্রেরণা দেয়।"

"আপনি খালি সাঁতারু সাঁতারু বলছেন কেন, ফুটবলার ক্রিকেটার এদের নাম করুন। বাঙালিরা যা ভালবাসে মিটিংয়ে তাইতো বলব।"

"যা খুশি বলুন কিছু যায় আসে না। শুধু বলবেন, যারা আমাদের জন্য প্রাণ নিয়ে আসে আমরা তাদের অবহেলা করি। ভুলে যাই তাদের খাদ্য দরকার, মাথার উপর ছাদ দরকার, খড়ের চালা যদি হয় তাও। আমরাই বাধ্য করি তাদের উঞ্ছবৃত্তি করতে। আমরাই তাদের শেখাই চালাকি করতে মিথ্যে বলতে।...এইসব বলার পর আপনার লাইনের কথাবার্তায় চলে আসবেন। খুব কড়া কড়া কথায় গভরমেন্টকে এক হাত নেবেন।"

"তাহলে একটু গুছিয়ে লিখে দিন। আমার যেন কেমন তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।"

ক্ষিতীশ ভ্রূকুটি করে তাকাল। বিষ্টু ধর তাড়াতাড়ি বলল, "এজন্য নিশ্চয়ই ফি দোব।"

"ফি চাইনা, একটা চাকরি চাই। যেকোনো চাকরি, অন্তত শ'দেড়েক টাকার।"

"চাকরি!" বিষ্টু ধর অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "কোথায় পাব?"

"আপনার তো ব্যবসা আছে। আমার এখন নিয়মিত টাকার দরকার। এইভাবে, বক্তৃতা তো সারা জীবন লেখা যাবে না।"

"আচ্ছা আমি দেখব'খন।"

আধঘণ্টার মধ্যেই ক্ষিতীশ লিখে দিল। বিষ্টু ধর চলে যাবার পর রান্না চাপিয়ে দিল। উঠোনের দেয়ালে গাঁথা, বড় হুকে রবারের দুটো দড়ির প্রান্ত আংটায় বেঁধে আটকাবার কাজে লেগে পড়ল। রবার দুটোর অপর প্রান্তে দুটো হাতল। এই রবার পুলি টেনে ব্যায়াম করবে কোনি। কাজটা শেষ করে সে ছোট পাশ বালিশের মতো চটের থোলে সের দশেক বালি ভরতে শুরু করল। ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামের সময়, এই ওজন ঘাড়ে নিয়ে কোনিকে ব্যায়াম করতে হবে।

লীলাবতী বাড়িতে ঢুকে ক্ষিতীশের কাজ দেখে অবাক হয়ে বলল, "এগুলো আবার যে বার করলে, ব্যাপার কি?"

"কোনির জন্য।"

"কে কোনি!"

"একটা মেয়ে। ওকে তৈরী করব, মেয়েটার মধ্যে জিনিষ আছে। একেবারে আকাঁড়া মাটি, গড়তে পারলে দারুণ সুইমার হবে। তোমাকে এনে দেখাব। ভীষণ গরীব।"

লীলাবতী ঘরে ঢুকে গেল। ক্ষিতীশ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "ভীষণ গরীব, খেতে পায়না। ভাবছি এখানেই ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করব।"

ঘরের মধ্যে থেকে লীলাবতীর শুকনো কঠিনস্বর ভেসে এল. "ঘরটা নেওয়াই ঠিক্ করলুম। ওরা সবাই রাজি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা সেলামি দিতে। এখন টেনেটুনে চলতে হবে, বাজে খরচ একদম বন্ধ।"

ক্ষিতীশ আর কথা বাড়াল না। বিকেলে অ্যাপোলোয় গিয়ে দেখল কোনি আসেনি। পরদিন সকালে কোনি এল আধঘণ্টা দেরীতে। ক্ষিতীশ রেগে তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কোনি বলল, "খাবারের বদলে বরং আমাকে রোজ একটা করে টাকা দেবেন।"

ক্ষিতীশের রাগটা মুহূর্তে অবাক হয়ে গেল।

"তার মানে? রোজ একটা করে টাকা দিতে হবে আমাকে তুই সাঁতার শিখবি বলে? এটা কি আমার পিতৃদায়?"

"অতো খাটাবেন আর খেতে দেবেন না?"

কোনির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষিতীশ হেসে ফেলল, কোনিও হাসল। দুজনের মধ্যে নিঃশব্দে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

"তুই একটা আস্ত শয়তান। আমাকে চিনে ফেলেছিস দেখছি। দাঁড়া, তোকে আগে সাঁতারের মজাটা পাইয়ে দি তারপর দেখব জলে নামিস কি নামিসনা। এখন আমি তোকে খাটাচ্ছি, তখন তুই খাটার জন্য পাগল হয়ে উঠবি।"

কোনি কথাগুলো শুনল মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে। ক্ষিতীশ সেটা লক্ষ্য করে আবার বলল, "লেকে একমাইল সাঁতারে যে মেয়েটার কাছে হেরেছিস তার নাম হিয়া মিত্র। নামটা মনে রাখিস।"

কোনির চোখদুটো সরু হয়ে এল। মুখ ঘুরিয়ে সে কস্ট্যুমের কাঁধের পটি ঠিক করতে লাগল।

"মনে রাখিস অমিয়া বলেছে তোকে পা ধোয়া জল খাওয়াবে।"

কোনি ঘুরে দাঁড়াল। শীর্ণ দেহটা ঝুঁকিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, "কস্ট্যুম সাতদিনে আমি আদায় করব। কিন্তু লাল রঙের আমি পরব না, আমার রঙ কালো।"

অমিয়া আর বেলা পঞ্চাশ মিটার কোর্সে কিকিং বোর্ড নিয়ে প্র্যাকটিস করছে। কোনি পাড়ের কাছাকাছি। ক্ষিতীশ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। দুচোখে শুধু অনুমোদন আর কণ্ঠে বিড়বিড়ঃ 'হারামজাদী কোথাকার, আমাকে নিয়ে এতদিন রসিকতা হচ্ছিল! দাঁড়া, তোর ওষুধ আমি পেয়েছি—হিয়া মিত্তির।'

"ক্ষিতীশ চলছে কেমন?"

"ভাল। আপনার?"

নকুল মুখুজ্জে রেলিংয়ে দুহাত রেখে শুকনো গলায় বলল, "তুই কি কিছুই খবর রাখিসনা! বি এ এস এ-র সিলেকশন কমিটি থেকে আমাকে আউট করে দিয়েছে। এ সবই জুপিটারের ধীরেনের কারসাজি। এদিকে অ্যাপোলোর আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। দু-একটা টাকাওলা লোক যোগাড় করে দিতে পারিস, প্রেসিডেন্ট করে রাখব।"

ক্ষিতীশের হঠাৎ মনে পড়ল বিষ্টু ধরকে। বলল, "চেষ্টা করব। কিন্তু নকুলদা বি এস এ থেকে আউট হয়েছ বলে দুঃখ পাচ্ছ কেন! একটা ক্লাব ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের থেকে। ক্লাবই সুইমার তৈরী করে, ওরা করে মোড়লি।"

"কিন্তু মোড়লদের দলাদলি ঝগড়া প্রতিপত্তির লোভ সুইমারের জীবন শেষ করে দিতে পারে।" নকুল মুখুজ্জে হেসে উঠে বলল, "জেনে রাখ্ এবার অ্যাপোলোর কেউ বেঙ্গল টিমে আসছে না, শুধু ওই দুটো মেয়ে ছাড়া।" আঙুল দিয়ে সে অমিয়া আর বেলাকে দেখাল। "ওরা, জেনে রাখ, সামনের বছরই জুপিটারে ফিরে যাচ্ছে।"

নকুল মুখুজ্জে চলে যাবার পর ক্ষিতীশ আবার কোনির দিকে মন দিল।

"হাঁটু ভেঙ্গে পায়ের পাড়ি...হাঁটু ভেঙ্গে। বলে দিয়েছি না, পা যখন পিছনে ঠেলবি তখন হাঁটু ভাঙবে, ওঠার সময় সোজা থাকবে।"

এই পর্যন্ত চীৎকার করে বলেই তার মনে হল, অমিয়া বা বেলা শুনে নিয়ে যদি এইভাবে কিকিং শুরু করে! তারপরই ভাবল, এখন আর ওদের পক্ষে আদ্যিকালের সিজার-কিক্ ছেড়ে এই শক্ত কিকিংয়ে আসা সম্ভব নয়। তা হলেও, শুনে নিয়ে ওরা হরিচরণকে বলে দিতে পারে। হরিটা অন্যদের এইভাবে শেখাবে হয়তো।

হাত নেড়ে ক্ষিতীশ ডাকল কোনিকে। পাড়ের কাছাকাছি আসতেই ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "যা বলেছিলুম হচ্ছে না কেন? গোড়ালিটা টান্‌টান্ থাকবে...এই রকম পিছন দিকে টান করে ঠেলে রাখবি। আর কিক্ করার সময় যতটা না নিচের দিকে, তার থেকে পিছন দিকেই পায়ের ধাক্কা বেশি দিতে হবে। এইভাবে শোলান্ডার সাঁতার কেটে চারটে গোল্ড জিতেছে টোকিওয়।......আবার কর্......সিক্স্ বিট্, এক চক্কর হাত পাড়ি আর সেই সঙ্গে ছটা করে পা মারবি......করে যা, করে যা।"

ট্রেনিং শেষে ফেরার পথে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, "তোর দাদার খবর কিরে, আসতে বলিস একদিন। দেখে যাক কেমন তুই শিখছিস।"

কোনি জবাব দিল না। ক্ষিতীশ লক্ষ্য করল ওর মুখটা কেমন যেন করুণ আর গম্ভীর হয়ে উঠল।

"দাদার অসুখ হয়েছে। দুদিন কাজে যায়নি।"

"তাহলেতো দেখতে যেতে হয়। আচ্ছা পরে একদিন দেখতে যাব। আর শোন্, আজ বিকেলে তোর ওজনটা নোবো। এবার থেকে একসারসাইজ শুরু করতে হবে। খাওয়াও বাড়াতে হবে।

ট্রেনিং চার্ট, ডায়াট চার্ট আমি তৈরী করেছি। ভিটামিন কি কি লাগবে সেটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব। হেমো-গ্লোবিন লেভেল যদি পারি তো টেস্ট করাব।"

ক্ষিতীশ কথা বলতে বলতে বাজারের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা টাকা কোনির হাতে দিয়ে বাজারের দিকে এগোচ্ছে, কোনি ডাকল।

"ক্ষিদ্দা, আর দুটো টাকা দেবেন? তাহলে দুদিন আর আমায় দিতে হবে না।"

"টাকা? কিসের জন্য?" ভ্রূ কুঞ্চিত হল ক্ষিতীশের।

"চাল কিনব। দাদা তো কাজে যেতে পারছে না।"

কোনি চুপ করে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে রইল।

প্রশ্ন না করে ক্ষিতীশ আরো দুটি টাকা দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝেও গেল, প্রতিদিন ডিম-কলা খাওয়ার জন্য যে টাকা দিয়েছে সেটা কিসে ব্যয় হয়।

ঘন্টাখানেক পরই ক্ষিতীশ হাজির হল কোনিদের ঘরের দরজায়। তক্তপোশে ময়লা ছেঁড়া কাঁথার উপর কমল শুয়ে। একদৃষ্টে জানলার বাইরে তাকিয়ে। সব ছোট ভাইটি আর মা উনুনে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির সামনে বসে। ঘরে আর কেউ নেই। ক্ষিতীশ গলা খাঁকারি দিতে কমল তাকাল, অবাক হল এবং উঠে বসতে গিয়ে দুর্বলতার জন্য টলে পড়ল।

"আসুন। একটু আগেই কোনি বলছিল আপনি একদিন আসবেন। কি আর দেখবেন আমায়।" কমল চট করে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দেখার আর কিছু নেই। আমি ফিনিশ হয়েই গেছি।"

ক্ষিতীশ তক্তপোশের ধার ঘেঁষে বসল।

"কি হয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা?"

মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে কমল মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আপনি কিন্তু বেশিক্ষণ বসবেন না। ছোঁয়াচে রোগটা।"

"ওষুধ খাচ্ছেন?"

কমল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "কোনির দ্বারা কিছু হবে কি? ও আমাকে রোজ বলে কি কি শিখল। খুব রোখা মেয়ে। যদি বলে করব, তাহলে করবেই। ওকে দিয়ে যদি করাতে পারেন, ওর একটা ভবিষ্যৎ যদি গড়ে দিতে পারেন।"

"হবে। প্রথম প্রথম একটু চঞ্চল ছটফটে থাকে, মন বসলে আমার মনে হয় ও কিছু একটা পারবে।"

"একটা ভাইকে চায়ের দোকানের কাজে দিয়েছি, পনেরো টাকা মাইনে। কোনিকে একটা সুতোর কারখানায় লাগিয়ে দোব ভাবছি। কথাবার্তা বলেছি ষাট টাকা দেবে। কিন্তু ওর সাঁতার তাহলে আর হবে না।"

কোনি ঘরে ঢুকল। ক্ষিতীশকে দেখে অবাকই হল। দাদার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে কমলের মাথায় হাত রাখল।

"আমি চাইনা কোনি সাঁতার বন্ধ করুক। আমার নিজের খুব ইচ্ছে হতো বড় সাঁতারু হব, অলিম্পিকে যাব। আমার দ্বারা কিছুই হল না, এখন যদি কোনি পারে। আপনি বলছেন, ওর হবে?"

ক্ষিতীশ গম্ভীরস্বরে বলল, "যদি খাটে, যদি ইচ্ছে থাকে।"

"কিরে, শুনলিতো।" কমল মুখ উঁচু করে তাকাল। "ইচ্ছে থাকলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ইন্ডিয়া রেকর্ড ভাঙ্গতে হবে তোকে। তারপর এশিয়ান, তারপর অলিম্পিক। পারবি না?"

কমলের স্বর অদ্ভুত করুণ একটা আবেদনের মতো শোনাল। কোনির মুখে ধীরে ধীরে অস্বস্তি তারপর চাপা ভয় ফুটে উঠল। ঘরের মধ্যে তখন কেউ কথা বলছে না। হাঁড়িতে ভাত ফোটার শব্দটা শুধু সেই মুহূর্তে একমাত্র জীবন্ত ব্যাপার।

কমল আবার বলল, "পারবি না?"

কোনি আস্তে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে দিল।

৮

ক্ষিতীশ সারা সকাল অ্যাপোলোয় অপেক্ষা করেছে, কোনি আজো আসেনি। গত দু সপ্তাহে একবেলাও সে কামাই করেনি। ক্ষিতীশ ভয়ে রয়েছে, এই বুঝি কস্টুম দাবী করে বসে। এখনো সে সমানে বলে যাচ্ছে, "হয়নি হয়নি, ইঞ্চিখানেকের বেশি জল থেকে হাত উঠবে না।......অতটা পাশের দিকে হাত যাচ্ছে কেন......ওকি, দুটো হাত ঠিকমতো সমানে চলছেনা কেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ মাথা নাড়ে। আর ভাবে কস্টুম আজই কিনতে হবে দেখছি। কখনো কখনো সে জলে নেমে সাঁতার কেটে স্ট্রোক দেখিয়ে দেয়। ওদের পাশ দিয়েই অন্যরা সাঁতার কেটে যায়, বেলা গড়িয়ে যায়, কমলাদিঘির জল জনশূন্য হয়ে আসে। কোনি যখন বিরক্ত হয়ে ওঠে, ক্ষিতীশ বলে, "দাদার কাছে তো খুব ঘাড় নেড়েছিলিস! ভিকট্রি স্ট্যান্ডে ওঠা খুব সহজ ব্যাপার ভেবেছিস! রেকর্ড করাটা গঙ্গায় আম কুড়োনো নয়, বুঝলি?" ফেরার পথে গল্প করেছে পৃথিবীর বড় বড় সাঁতারুর, তাদের আন্তরিকতার, নিষ্ঠার, পরিশ্রমের।

অপেক্ষা করে অবশেষে ক্ষিতীশ বেরিয়ে পড়ল অ্যাপোলো থেকে। বিষ্টু ধরের বাড়ি পৌঁছল মিনিট দশেকের মধ্যে। তাকে দেখেই বিষ্টু ব্যস্ত হয়ে বলল, "এই একটু আগে দর্জিপাড়া বয়েজ লাইব্রেরির লোকেরা এসেছিল ওদের অ্যানুয়াল সোশ্যালে চিফ গেস্ট করার জন্য। প্রেসিডেন্ট হবে কে জানেন...বিনোদ ভড়। আমি রাজি হয়ে গেছি। ওখানে দারুণ একটা ইস্পিচে ওকে ডাউন দিতে হবে। বুঝলেন, ক্ল্যাপ ওকে পেতে দোব না।"

বিষ্টু ধরের উত্তেজিত মুখ দেখে ক্ষিতীশ চটপট মতলব ভেঁজে নিয়ে বলল, "শুধু একটা বক্তৃতায় ডাউন দিয়ে কি লাভ হবে। লোকে কিছুদিন মনে রেখেতো ভুলে যাবে। তার থেকে এমন একটা কিছু দরকার, যাতে বিনোদ ভড় রেগুলার ডাউন খায়।"

"কি রকম?" বিষ্টু কৌতূহল দেখাল। "রেগুলার ডাউন কিভাবে সম্ভব!"

"ভাবতে হয়েছে, তিনদিন ধরে ভেবেছি।" ক্ষিতীশ নিজেকে গুরুত্ব দেবার জন্য গলার স্বর ভারিক্কি করে তুলল। "ভেবে দেখলুম বিনোদ ভড় যে যে অর্গানাইজেশনে আছে, তার পাল্টাগুলোয় ঢুকতে হবে। ও যদি ড্রামা ক্লাবে থাকে আপনাকেও ড্রামা ক্লাবে ঢুকতে হবে। ও যদি কোন হরিসভার পৃষ্ঠপোষক হয়, আপনাকেও একটা হরিসভায় ঘাঁটি করতে হবে। ও যদি কোন সুইমিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়....."

"আছে।" বিষ্টু ধর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "জুপিটারের প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড়।"

ক্ষিতীশ মাথা হেলিয়ে বলল, "আপনাকে জুপিটারের রাইভাল ক্লাবে ঢুকতে হবে।"

"সেটাতো অ্যাপোলো। কিন্তু ঢুকব কি করে?" বিষ্টু ধর বিমর্ষ গলায় বলল। "পারেন একটা কিছু করে দিতে?"

"চেষ্টা করতে হবে। আজও আমি নকুল মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলেছি। সাত হাজারের কম রাজি হচ্ছে না।"

"সাত হাজার! মানে?"

"মানে, প্রেসিডেন্ট হতে গেলে ডোনেশন তো দিতে হবে। অমনি অমনি কি আর হওয়া যায়। বিনোদ ভড়ও তলায় তলায় চেষ্টা করছে ওর দাদাকে অ্যাপোলোয় ঢোকাবার জন্য। পাঁচ হাজার পর্যন্ত অফার করেছে।"

"কিন্তু সাত হাজার! কমসম করা যায় না?"

"কতো কমাবেন? পাঁচ হাজার অফারতো পেয়েই গেছে।

বিনোদ ভড় এম এল এ, মন্ত্রী হবারও চান্স খুব, ওকেতো সবাই হাতে রাখতে চাইবে। আপনি যদি বেশি টাকা না দেন তাহলে ওদের লাভটা কি হবে বলুন?"

"তাতো বটেই।" বিষ্টু ধর চিন্তিত হয়ে পেটে হাত বুলোতে লাগল।

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করে আবার বলল, "দেরী করলে চলবে না। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে হবে। বিনোদের পার্টি উঠে পড়ে লেগেছে।"

"বেশ সাত হাজারই দোব। কিন্তু......"

বিষ্টু ধরের কথা শেষ হবার আগেই চাকর ঘরে ঢুকে জানাল, একজন 'মাইজি' দেখা করতে এসেছে।

এরপর ক্ষিতীশকে অবাক করে ঘরে ঢুকল লীলাবতী। ক্ষিতীশকে এখানে দেখে সেও অবাক। তবে কোন কথা বলল না।

"টাকাটা এনেছি।" লীলাবতী তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে বিষ্টু ধরকে বলল।

ব্যস্ত হয়ে বিষ্টু বলল, "পাশের ঘরে আসুন, আপনার রসিদ-টসিদ সব রেডি করা আছে।"

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরই বিষ্টু একা ঘরে ফিরে এল। ক্ষিতীশ তখন কৌতূহলে ফেটে পড়ার মতো অবস্থায়।

"কি ব্যাপার, কিসের টাকা?"

"ওই একটা ঘর ভাড়া নেওয়ার ব্যাপার। হাতিবাগানে আমার একটা বাড়িতে, এরা দোকান করবে, টেলারিং শপ। তাই কিছু টাকা দিয়ে গেল।"

"পাঁচ হাজার টাকা।"

বিষ্টু ধর চমকে উঠল। "কি করে জানলেন!"

"টাকাটা যার কাছ থেকে নিলেন, সে আমার স্ত্রী। ওর কাছ থেকে সেলামি নেওয়া মানে আমার কাছ থেকেই নেওয়া।"

বিষ্টু ধর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ক্ষিতীশের গম্ভীর মুখ দেখে। তোতলা স্বরে বলল, "আমি তো তা জানতাম-না।"

"আমিও জানতাম না আপনিই বাড়িওলা। যাইহোক এবার আমরা দুজনেই জানলাম। জানার পর, আপনি কি টাকাটা এখন নেবেন?"

বিষ্টু আরো তোতলা হয়ে গেল। "ইয়ে, এটাতো ব্যবসার ব্যাপার......আমাকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।"

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল। "চলি। বিনোদ ভড় কোর্টে বেরিয়ে গেছে। নয় রাত্তিরেই দেখা করব ওর সঙ্গে।"

"না না প্লিজ যাবেন না।"

"হাজার দুয়েক টাকা ডোনেশন আর একশো টাকা একটা নাইলনের কি বেলনের কস্ট্যুম কেনার জন্য, যদি দিতে পারেন তা হলে গ্যারান্টি দিচ্ছি অ্যাপোলোর প্রেসিডেন্ট করে দেবই। তবে এই সেলামির টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে। তাছাড়া বক্তৃতাও আমি আর লিখে দিতে পারব না।"

বিষ্টু ধর চূর্ণ বিচূর্ণ। কথা বলার আর ক্ষমতা নেই। দুটি চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। শুধু মাথাটি নেড়ে বলল, "গাছে অনেক দূর উঠে গেছি। মই কেড়ে নিলে নামতে পারব না।"

বিষ্টু ধর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল নিয়ে ফিরে, সেটা ক্ষিতীশের হাতে দিয়ে বলল, "উনি আপনার স্ত্রী হন্ তো?"

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি।"

বিষ্টু জিভ কেটে কান মললে। ক্ষিতীশ আর অপেক্ষা করল না। বেরিয়ে আসছে তখন শুনল বিষ্টু কাতর কণ্ঠে বলছে, "আমার বক্তৃতাটার কি হবে।"

"দোব দোব, লিখে দোব।"

বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশ নোটের বাণ্ডিলটা নিজের বাক্সে রেখে দিয়ে ভাবতে শুরু করল, এবার কি করবে! টাকাগুলো লীলাবতীকে ফেরৎ দিতেই হবে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু আদায়ও করে নিতে হবে। এবং তা করতে হবে কোনিরই জন্য।

লীলাবতী বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে তুমি কি করছিলে।"

"মাঝে মাঝে যাই বুদ্ধি পরামর্শ দিতে। তুমি কেন গেছলে?"

"ওর কাছ থেকেই তো ঘর নিয়েছি। সেলামির টাকাটা দিতে গেছলুম।"

ক্ষিতীশ হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আগে যদি আমায় বলতে তাহলে টাকাটা দিতে হতো না। আমি বারণ করলে বিষ্টু ধরের সাধ্যি নেই টাকা নেবার, তবে বললে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবে।"

"দ্যাখোনা একবার বলে, অনেকগুলো টাকা। দেবার সময় গা করকর করছিল।" লীলাবতী ব্যগ্র হয়ে বলল।

"কিন্তু কোনিকে যে ওর বাড়িতেই খাওয়ার ব্যবস্থা করব ভাবছিলাম। এরপর কি অতোগুলো টাকা ফেরৎ দেবার কথা বলা যায়! মেয়েটাকে যে খাটাব, তার জন্য কিছুতো করতে হবে! দাও গামছাটা চান করে আসি।"

বিকেলে লীলাবতী অন্যমূর্তি ধরে বলল, "পরের মেয়ের জন্যতো খুব মাথা ব্যথা। আর আমি যে এত কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করালাম, তিলতিল করে টাকা জমিয়ে ব্যবসাটা বড় করার চেষ্টা করছি, তাতে একটু সাহায্যও কি করবে না।"

ক্ষিতীশ বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বলে গেল, "আচ্ছা দেখছি।"

অ্যাপোলোয় সারা বিকেল অপেক্ষা করল ক্ষিতীশ, কোনি এল না। নকুল মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা হল।

"প্রেসিডেন্ট পেয়েছি, কত টাকা ডোনেশন চাও নকুলদা?"

নকুল একটু হকচকিয়ে বলল, "কত টাকা মানে? এখন বটুবাবু পাঁচশো দিচ্ছে, তাও টিপে টিপে দেয়।"

"ঠিক আছে। আমি দু'হাজারী ধরেছি।"

ক্ষিতীশ তারিয়ে তারিয়ে নকুল মুখুজ্জের অবস্থাটা লক্ষ্য করার পর বিষ্টু ধর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে বলল, "কিছু ভেব না তুমি, টাকা এসে যাবে। তবে আমার ওই মেয়েটাকে পুরো ট্রেনিং ফেসিলিটি দিতে হবে কিন্তু।"

নকুল মুখুজ্জে একগাল হেসে মাথাটা হেলিয়ে বলল, "নিশ্চয়।"

অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ ভাবল, মেয়েটা কেন আজ এল না, একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। বড্ড ফাঁকিবাজ। কিছুর একটা লোভ না দেখালে খাটতেই চায় না। তবে একটা দুর্বলতা আছে সেটা ওর অপমানবোধ। ক্ষিতীশের প্রায়ই মনে পড়ে, প্রাইজ না নিয়ে লেক থেকে কোনির চলে আসা আর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার বিজয়ীর নামটি শোনার সেই ভঙ্গিটি। দাদার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে থাকা মেয়েটি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল।

বস্তির মধ্যে আলো নেই। ক্ষিতীশ একটু অসুবিধায় পড়ল ঘরটা খুঁজে বার করতে। অবশেষে একটা বাচ্চা ছেলে তাকে দেখিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে কুপি জ্বলছে। কোনির ছোট ভাই দুটো মেঝেয় ঘুমিয়ে। তক্তপোশে সম্ভবত ওর মা শুয়ে। ক্ষিতীশ ডাকল, "কোনি।"

ঘর থেকে নিঃশব্দে কোনি বেরিয়ে এল।

"ব্যাপার কি তোর! আজ যাসনি কেন? এভাবে কামাই দিলে, আর তাহলে যেতে হবে না। তোর দাদাকে আমি জানিয়ে দেব, হবে টবে না কিছু তোর দ্বারা।" বিরক্তস্বরে ক্ষিতীশ বেশ জোরেই কথাগুলো বলল।

কোনি কথা না বলে একইভাবে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ক্ষিতীশের পিছন থেকে খনখনে স্বরে কে বলে উঠল, "কেমন লোকগা তুমি, কাল রাতে মেয়েটার দাদা মরে গেল

আর তুমি এখন তাকে ধমকাতে নেগেছ?"

ক্ষিতীশ প্রথমে বুঝতে পারেনি সে কি শুনল। পিছনে তাকিয়ে বলল, "কে মরে গেছে?"

"জাননা দেখছি! কাল বিকেল থেকে মুখে অক্ত উঠল, ভলকে ভলকে, রাত্তিরেই কাবার। কোনির দাদা গো!"

ক্ষিতীশ বার দুয়েক কেঁপে উঠল এবং শুনল কোনি খুব ক্লান্ত এবং শান্ত স্বরে বলছে, "ক্ষিদ্দা এবার আমরা কি খাব?"

রাগে চীৎকার করে উঠল ক্ষিতীশঃ "পারতে হবে, পারতেই হবে। কোন কথা শুনব না।"

পায়ের কাছে পড়ে থাকা ঢিলটা তুলে সে কোনির দিকে ছুঁড়ে মারল।

"পায়ে পড়ি ক্ষিদ্দা, আর আমি পারছি না।"

"মাথা ফাটিয়ে দোব তোর......মরে যা তুই, মরে যা, মরে যা।" ক্ষিতীশ ঢিল খুঁজে পেল না। এধার ওধার তাকিয়ে মালির ঘরের গায়ে দাঁড় করানো সরু বাঁশটাকে দেখতে পেল।

"ক্ষিদ্দা আমি আর পারব না।"

ক্ষিতীশ রেলিং টপকে ছুটে গিয়ে বাঁশটা আনল। কোনি পাড়ের কাছে এগিয়ে এসেছে। ক্ষিতীশ দুহাতে বাঁশটা তুলে জলে আঘাত করল। কোনির মুখের হাত তিনেক সামনে বাঁশটা পড়ল। আবার সে বাঁশটা দুহাতে উঁচু করে আবার জলে আঘাত করল।

"মাথা ভেঙ্গে দেব। জল থেকে উঠবি তো মরে যাবি। এখনো দুশো মিটার বাকি।"

কোনি জল থেকে ওঠার জন্য পশ্চিমের স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে এগোতেই ক্ষিতীশ বাঁশটা তুলে পাড় ধরে ছুটল। কোনি থমকে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের কিনার ধরে উঁকি দিতে লাগল। ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্মে উঠতে পারছে না, কেননা পাড় থেকে সেটা অন্তত বারো হাত দূরে এবং মাঝে কোন সেতু নেই।

"ক্ষিদ্দা ক্ষিদ্দা, আমায় এবেলা ছেড়ে দাও। ওবেলা আমি পুষিয়ে দোব।" কোনি ফোঁপাচ্ছে।
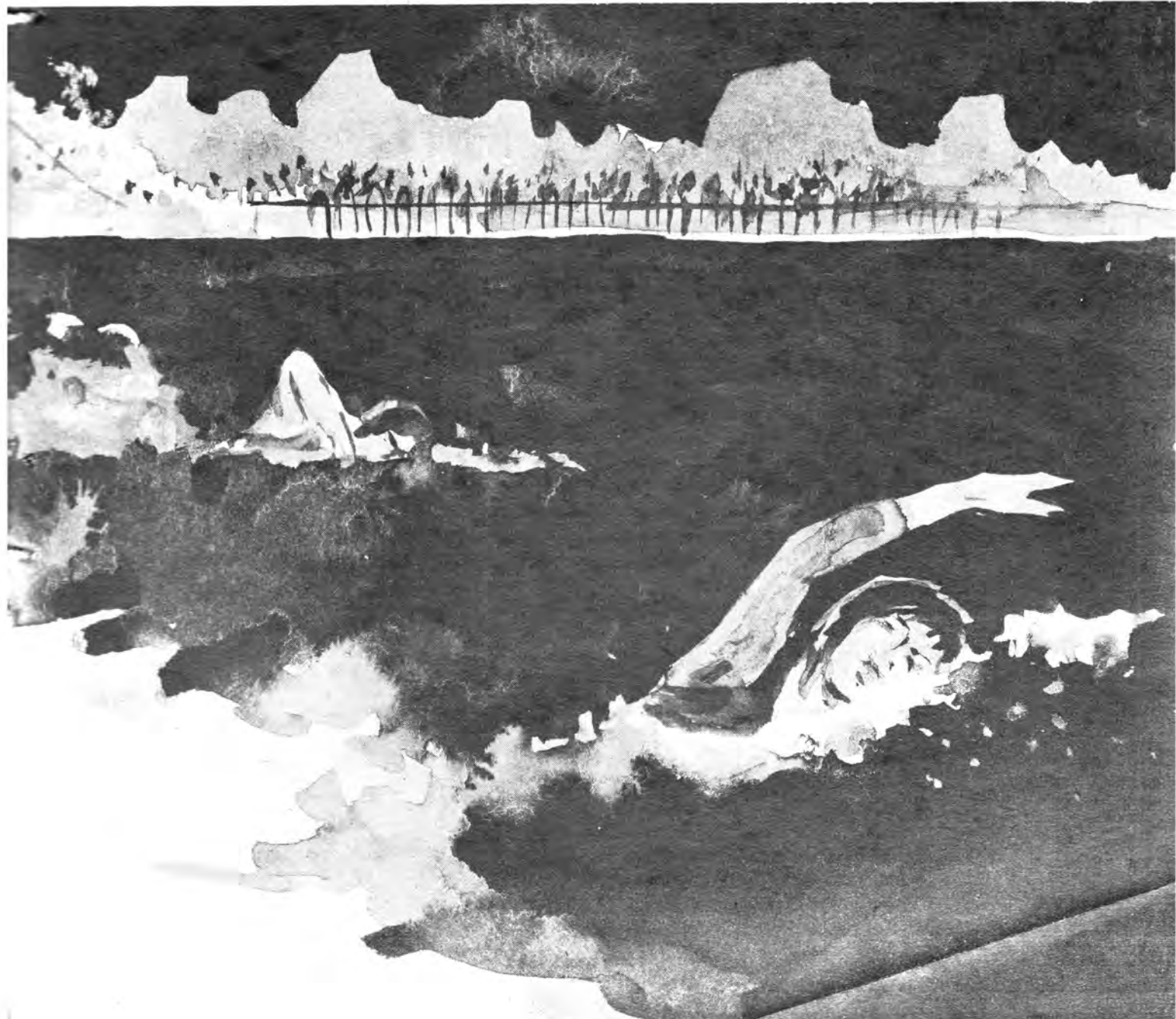
"কোন কথা আমি শুনতে চাইনা। আমার রুটিন অনুযায়ী কাজ চাই। যতক্ষণ না কাজ পাচ্ছি আজ তোকে উঠতে দোব না।"

প্ল্যাটফর্ম ধরা দুহাতের মধ্যে মুখটা গুঁজে কোনি কাঁদছে। ক্ষিতীশ পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে। সকাল নটা বেজে গেছে। কমলাদিঘির জলে আর কেউ নেই এখন। বেঞ্চগুলোয় অনেকেই বসে, কমলাদিঘির ভিতরের পথ দিয়ে পথিকের আনাগোনা। তাদের অনেকে কৌতূহলে তাকাচ্ছে ক্ষিতীশের দিকে। কেউ কেউ দাঁড়িয়েও পড়ছে।

কোনি সাঁতরাচ্ছে। পশ্চিম থেকে পুবের প্ল্যাটফর্মের দিকে। ক্ষিতীশও বাঁশ হাতে পাড় ধরে পুবদিকে হাঁটছে। বিশ্বাস নেই, হয়তো ওপারে পৌঁছেই কোনি জল থেকে উঠে পড়তে পারে।

ওর ক্লান্ত হাত দুটো যেন কেউ জল থেকে টেনে তুলে আবার নামিয়ে রাখছে। মুখ ফিরিয়ে হাঁ করে বাতাস গিলছে। তখন চোখ দুটো দেখাচ্ছে যেন ঘুমে আচ্ছন্ন। গলায় ঝোলান স্টপ ওয়াচটা মুঠো ধরে ক্ষিতীশ বিড়বিড় করে আপন মনে বকে যাচ্ছেঃ জানিরে জানি কষ্ট হচ্ছে, হাত-পা খুলে খুলে পড়ছে, কলজে ফেটে যাচ্ছে। যাক্ যাক্ তুই যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যা। তুই জানিস ক্ষিদে যখন থাবা মারে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় তখন কেমন লাগে। তুই পারবি বুঝতে যন্ত্রণা কি জিনিস। ফাইট কোনি ফাইট......মার খেয়ে খেয়ে ইস্পাত হয়ে উঠতে হবে। যন্ত্রণাকে বোঝ্, ওটাকে কাজে লাগাতে শেখ্, ওটাকে হারিয়ে দে।......কাম অন কোনি, জোর লাগা, আরো জোরে......ট্রেনিং করে করে নিজেকে বাড়াতে হবে কোনি। যন্ত্রণাকে তুই বল্, 'দেখে নেব আমাকে কাঁদাতে পারিস কিনা, আমাকে ভয় দেখাতে পারিস কিনা', বলে যা কোনি 'ক্ষিদ্দা তোমাকে খুন করব। তুমি শয়তান। ছিঁড়ে খাবো তোমাকে।' কমলাদিঘিকে টগবগ করে ফুটিয়ে তোল তোর রাগে। মানুষের ক্ষমতার সীমা নেইরে, ওরা পাগলা বলছে, বলুক। মুর্খ মুর্খের দল সব। ঘণ্টাখানেক আরামে হাত-পা ছুঁড়িয়ে ওরা চ্যাম্পিয়ন বানাবার স্বপ্ন দেখে।......ট্রেনিং ট্রেনিং,......আরো পঞ্চাশ মিটার এখনো যেতে হবে, শরীরটাকে যন্ত্রণায় ঘষে ঘষে শানিয়ে তোল্। দেখবি কি অবাক তোকে করে দেবে ওই শরীর, যা অসম্ভব ভাবছিস তাকে সম্ভব করে দেবে। সোনার মেডেল-ফেডেল কিছু নয়রে, ওগুলো এক একটা চাকতি মাত্র। ওগুলোর মধ্যে যে কথাগুলো ঢুকে আছে সেটাই আসল—মানুষ পারে, সব পারে।

কোনি সাঁতার শেষ করে দু হাতে প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁপাচ্ছে মাথা নিচু করে। একবার সে মাথা ঘুরিয়ে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। দুচোখে ঘৃণা আর আক্রোশ। ক্ষিতীশ সেটা লক্ষ্য করল। বাঁশটা যথাস্থানে রেখে সে ক্লাবে ঢুকে একটা মোটা খাতা খুলে বসল। এটা কোনির লগ-বুক। প্রতিবেলার ট্রেনিং-য়ে কাজের ও সময়ের হিসাব ছাড়াও খাওয়ার, ওজনের, নাড়ির স্পন্দনের, রক্তের হেমোগ্লোবিনস্তর পরীক্ষার, আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেটের তালিকাও এতে লেখা আছে।

লগ-বুকে লিখতে লিখতে ক্ষিতীশ দেখল কোনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ক্লাব থেকে। প্রতিদিন বেরোবার আগে একবার 'যাচ্ছি' বলে যায়। আজ বলল না। ক্লাব থেকে কোনি যায় ক্ষিতীশের বাড়ি। সেখানেই ওর খাওয়া। ঠিক দশটায় তাকে 'প্রজাপতি'-র রোলার-শাটারের তালা খুলতে হয়। দোকান ঝাঁট দিয়ে, কাউন্টার মুছে, কুঁজোয় জল তুলে, তাকে ফাইফরমাশ খাটতে হয়। দুপুরে আবার আসে ভাত খেতে। তখন ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে, পনেরো মিনিট ব্যায়াম করে অ্যাপোলোয় যেতে হয়। সাঁতার থেকে আবার প্রজাপতিতে। দোকান বন্ধ করে সে লীলাবতীর সঙ্গে ফেরে। রাত্রে খেয়ে ফিরে যায় বস্তিতে মা ও ভাইয়েদের কাছে। কোনি মাইনে পায় চল্লিশ টাকা।

আজ কোনির দেরী হয়ে গেছে। ক্ষিতীশের বাড়ি না গিয়ে, সে প্রায় ছুটতে ছুটতে প্রজাপতিতে এল। লীলাবতী নিজেই দোকান খুলেছে। পাশের ফোটগ্রাফি দোকানের ছেলেটি ভারী শাটারটা তুলে দিয়ে গেছে। লীলাবতী ওকে দেখেই রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল, "বেরিয়ে যাও। তোমায় আর দরকার নেই।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কোনির মুখ। মুখ নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। এই সময় খদ্দের আসায় লীলাবতী আর কিছু বলল না। কোনি একে একে তার কাজগুলো করে গেল। ক্লান্তিতে এবং খিদেয় তখন সে ঝাপসা দেখছে, পা টলছে। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে কিন্তু দোকানে বসার মতো জায়গাও তার জন্য নেই। একবার সে ভয়ে ভয়ে লীলাবতীকে বলল, "বৌদি একটু বাড়ি যাব?"

বিরাট একটা মোটা খাতার উপর ঝুঁকে ফ্রকের মাপ লিখতে লিখতে লীলাবতী কড়া স্বরে বলল, "না।"

কোনি সরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। কাজটা থেকে বরখাস্ত হলে চল্লিশটা টাকা থেকে তাদের সংসার বঞ্চিত হবে।

ওদিকে ক্ষিতীশ বড় একটা থলি হাতে অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে তখন একটার পর একটা দর্জির দোকান ঘুরছে কাপড়ের ছাঁট কেনার জন্য। তিনটি লণ্ড্রির সঙ্গে তার বন্দোবস্ত হয়েছে। মার্কা দেওয়া নম্বর টুকরো কাপড়ে লিখে জামা-কাপড়ে বেঁধে কাচতে পাঠাবার জন্য লণ্ড্রিগুলোর দরকার হয় এই ছাঁট। ছাঁট থেকে সমান মাপে কাপড় টুকরো করে কেটে ক্ষিতীশকে বিক্রি করতে হয়। ওরা দৈনিক প্রায় তিন কিলো কেনে। ক্ষিতীশ টাকা ছয়-সাত লাভ করে।

দুপুর প্রায় একটা নাগাদ ক্ষিতীশ ছাঁট ভর্তি থলি নিয়ে কোনিদের ঘরের দরজায় হাজির হল। কোনির মা বেরিয়ে আসতেই সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "কাল রাতে কোনি কখন ঘুমিয়েছিল?"

"কেন, রোজ যেমন সময়ে ঘুমোয়।" জড়োসড়ো হয়ে কোনির মা বলল।

"ঠিক বলছ?" ক্ষিতীশ তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। "আজ এতো তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ল কেন তাহলে? দ্যাখো মেয়ে, আমার কাছে কিছু লুকোলে কিন্তু ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ঠিক করে বলো, কখন কোনি ঘুমিয়েছে।"

"না বাবা, আপনার কাছে মিছে বলব না। কাল রাতে কোনি যাত্রা শুনতে গেছল। রাত একটা নাগাদ ফিরে শুয়েছে।"

"হুঁ।" থলিটা এগিয়ে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, "এগুলো কেটে রেখো আজই, কাল সকালে কোনির হাত দিয়ে ক্লাবে পাঠিও।"

পাঁচটা টাকা কোনির মার হাতে দিয়ে, ফেরার আগে ক্ষিতীশ বিষণ্ন স্বরে বলল, "ছোট মেয়ে, ওরতো সখ্ হবেই। কিন্তু ওর ভালর জন্যই তোমাকে কড়া হতে হবে। যে কোন খেলা ধুলোই সাধনার জিনিষ। সিদ্ধিলাভ করতে হলে সন্ন্যাসীর মতোই জীবন যাপন করতে হয়। বহু ছোটখাট ব্যাপার আছে সাধনার পক্ষে যা ক্ষতিকর। যাত্রা নিশ্চয় দেখবে, কিন্তু এখন, এই ট্রেনিংয়ের সময় বিশ্রাম নষ্ট করে নয়। এগুলো তোমায় বুঝতে হবে।"

বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশ দেখল লীলাবতী অপেক্ষা করছে। তখুনি সে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে খুবই সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কোনি খেয়েছে?"

লীলাবতী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ওকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না, ঝিমোয় শুধু। বসতে দিই না, দাঁড়িয়েই আজ ঘুমোচ্ছিল।"

"আজ ওকে খুব খাটিয়েছি।"

"তাতে আমার কি লাভ। পাঁচ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে অন্যদিক থেকে সেটা নিয়ে নিচ্ছ।"

"ওর খাওয়ার জন্য তো মাসে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।"

"রোজ দুধ ডিম মধু, মাসে পঞ্চাশ টাকায় কি হয়!"

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। ঘরে এসে দেখে কোনি মেঝেয় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বালিশের বদলে দুটি হাত জড়ো করে মাথার নিচে রাখা। ক্ষিতীশ ওর পাশে বসে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই কোনি নড়ে উঠে আরো গুটিসুটি হয়ে সরে এল ক্ষিতীশের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বলল। ক্ষিতীশ ঝুঁকে পড়ল শোনার জন্য।

"দাদা?"

"হ্যাঁ।"

একটা পাতলা হাসি কোনির মুখে চারিয়ে গেল। "আমায় কুমীর দেখাবে বলেছিলে।"

"দেখাব, চিড়িয়াখানায় তোকে নিয়ে যাব।" ফিসফিস করে ক্ষিতীশ বলল। "আরো অনেক জায়গায় আমরা যাব বেলুড় মঠ, ব্যান্ডেল চার্চ, ডায়মন্ড হারবার, জাদুঘর অনেক অনেক জায়গায়, তারপর তুই যাবি দিল্লি, বোমবাই, মাদ্রাজ, তারপর যাবি আরো দূরে টোকিও, লন্ডন, বারলিন, মস্কো, নিউইয়র্ক।"

ঘুমের মধ্যেই কোনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ক্ষিদ্দা আমাকে কষ্ট দেয় দাদা। আমি ঠিক মেডেল এনে দোব তোমায়।"

কোনি মুখে হাসি নিয়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল। ক্ষিতীশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "তোকে আরো কষ্ট দেবরে, আরো দোব।"

রবিবার প্রজাপতি বন্ধ থাকে। সেদিন কোনির ট্রেনিংয়েও ছুটি। ক্ষিতীশের কাঁধে ঝুলছে থলি। তাতে আছে, কাগজের মোড়কে রুটি আলু ছেঁচকি গুড় সিদ্ধডিম কলা।

ওরা দুজন বাড়ি থেকে দশটায় বেরিয়েছে। চিড়িয়াখানায় ঘন্টা তিনেক ঘুরে পুকুরধারে ঘাসে বসেছে। ক্ষিতীশ খাবারের মোড়ক দুটো বার করে বলল, "জল খাওয়াটাই মুশকিল হবে। ওয়াটার বটলটা আনলে হতো।"

ওদের থেকে কিছু দূরে, স্কুল ইউনিফর্ম পরা জনা তিরিশ মেয়ে হৈচৈ করে হাজির হল। সঙ্গে চারজন টিচার। দুজন দরোয়ান খাবারের ঝুড়ি বয়ে আনল। ওরা গোল হয়ে খেতে বসেছে। কোনি কৌতূহলভরে মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। আর রুটি চিবোচ্ছে।

"ক্ষিদ্দা ওদের কাছে জল আছে। চাইব?"

"কি করে বুঝলি?"

"ওই তো বড় ড্রামটা থেকে জল দিচ্ছে।"

"দ্যাখ তাহলে।"

কোনি এগিয়ে গেল ড্রামের কাছে দাঁড়ান টিচারের দিকে। ক্ষিতীশ দেখল, কোনি তাকে কিছু বলতেই, তিনি কোনিকে আপাদমস্তক দেখে মুখ ফিরিয়ে কি একটা জবাব দিলেন। তাইতে কোনি অপ্রতিভ হয়ে ফিরে এল।

"দিলনা তো।"

কোনির মুখটা থমথমে। শুধু বলল, "বড় লোকদের মেয়েদের স্কুল।"

"তাই দিল না বুঝি!" ক্ষিতীশ কৌতুকের সুরে বলল।

"বড় লোকরা গরীবদের ঘেন্না করে।"

ক্ষিতীশ এবার একটু অবাক হল। এইসব ধারণা এইটুকু কোনির মাথায় ঢুকল কি করে!

"তোকে কে বলল বড় লোকরা গরীবদের ঘেন্না করে?"

"আমি জানি। দাদা আমায় বলেছিল, টাকা থাকলে সবাই খাতির করে।"

"চল্, জল খেয়ে আসি কল থেকে।"

ওরা দু-চার পা এগিয়েছে তখনই একটি মেয়ে "শুনুন, শুনুন" বলতে বলতে ছুটে এল। হাতে জলভরা প্লাস্টিকের দুটি গ্লাস।

ওরা ঘুরে দাঁড়াল। এবং দুজনেই চিনতে পারল জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি হিয়া মিত্র।

"আপনারা জল চেয়েছিলেন না? আমাদের মিস নন্দী বড্ড কড়া মেজাজের। ওর ব্যবহারের জন্য মাপ চাইছি।"

হিয়া জলভরা একটা গ্লাস এগিয়ে ধরল কোনির সামনে। কোনি তখন অদ্ভুত আচরণ করে বসল। ধাঁ করে সে গ্লাসে আঘাত করল হাত দিয়ে। গ্লাসটা হিয়ার হাত থেকে ছিটকে ঘাসে পড়ল। হতভম্ব শুধু হিয়াই নয়, ক্ষিতীশও।

"চাইনা তোমাদের জল। আমাদের কলের জলই ভাল।"

কোনি হন হন করে একাই এগিয়ে গেল। ক্ষিতীশ অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আমি মাপ চাইছি এবার তোমার কাছে।"

হিয়া ব্যথিত মুখে বলল, "এই গ্লাসের জলটা তাহলে আপনি খান।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।"

কোনিকে দারুণ বকবে ভেবেছিল ক্ষিতীশ। কিন্তু সে কিছুই বলেনি। হিয়াই যে কোনির ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী এটা ক্ষিতীশ বুঝে গেছে। বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবে চারদিন সে গেছে নিছকই পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার ভান করে। হিয়ার ট্রেনিং সে দেখেছে। তাই নয়, পকেটে হাত ঢুকিয়ে লুকিয়ে স্টপ ওয়াচে হিয়ার পুরো দমে সাঁতারের সময় নিয়েছে। ক্ষিতীশের মনে হয়েছে, হিয়ার প্রতি কোনির হিংস্র আক্রোশটা ভোঁতা করে দেওয়া ঠিক হবে না। এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক। এটাই ওকে উত্তেজিত করে বোমার মতো ফাটিয়ে দেবে আসল সময়ে।

ক্ষিতীশ তাই বকুনি দেওয়ার বদলে বলেছিল, "হিয়া তখন আমাকে কি বলল জানিস? বলল, মেয়েটা আমার কাছে মার খেয়েছে তাই জ্বলে পুড়ে মরছে।"

এরপর ক্ষিতীশ লক্ষ্য করল, কোনি জল থেকে উঠতে দেরী করছে।

দুর্গা পুজোর আগেই ক্লাবগুলোর প্রতিযোগিতা একটার পর একটা হয়ে গেল। ক্ষিতীশ একটিতেও কোনিকে নামায়নি, এমনকি অ্যাপোলোর প্রতিযোগিতাতেও নয়। যদিও এখন তার সময় অমিয়ার সময়ের প্রায় সমান তবু ক্ষিতীশের ধারণা এখনো তার প্রকাশের উপযুক্ত সময় আসেনি। হিয়ার সময় এখন কত, সেটা না জানা পর্যন্ত কোনিকে সে বার করতে চায়না। এখন অনেকেই জেনে গেছে ক্ষিতীশ একজন সাঁতারু তৈরী করছে। বালিগঞ্জ ক্লাবে সে গেলেই প্রণবেন্দুর নির্দেশে হিয়া এমনভাবে সাঁতার কাটে কিংবা জল থেকে উঠে পড়ে, যার ফলে ক্ষিতীশ ওর সময় নিতে পারে না। হিয়াও কোন প্রতিযোগিতায় নামেনি। তাইতে ক্ষিতীশ কিছুটা ভাবনায় পড়ল। প্রত্যেক ক্লাবের এমনকি স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের ভিকট্রি স্ট্যান্ডেও অমিয়া আর বেলাকে উঠতে দেখা গেল।

একদিন খবরের কাগজে একটা খবর দেখে ক্ষিতীশ কেটে রেখে দিল। বোমবাইয়ে মহারাষ্ট্র স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে রমা যোশি নামে একটি মেয়ে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সময় করেছে এক মিনিট ১২ সেকেন্ড। এক-কুড়ির উপরে সময় করাই ভারতীয় মেয়েদের রেওয়াজ, সেখানে এক-বারো! ক্ষিতীশ এরপর কোনির ট্রেনিং আরো কঠিন করে তুলল।

এবার জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ দিল্লীতে। পুজোর পর বাংলা দল রওনা হয়ে গেল। অমিয়া মেয়েদের দলের অধিনায়িকা। বাংলার মেয়েরা একটি সোনা, দুটি রুপো, দুটি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরল। সোনাটি অমিয়ার, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে। রমা যোশি একাই ছয়টি সোনা জিতল চারটি ব্যক্তিগত রেকর্ড করে।

শীত এসে গেছে। কমলাদিঘির জলও কমে গেছে। সোয়েটার পরা লোকেরা এখন সেখানে বেড়ায়। কেউ আর জলে নামে না। কিন্তু অব্যাহত কোনির দুবেলা জলে নামা। আপত্তি করেছিল অনেকেই। ক্ষিতীশ জবাবে শুধু বলেছে, "যদি পারে তাহলে নামবেনা কেন? সারা বছরই ট্রেনিংয়ে থাকা দরকার। প্র্যাকটিশ চাই, প্র্যাকটিশ। মুভমেন্টগুলো যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক হয়ে আসে। তা না হলে স্পীড বাড়ান যাবে না। এদেশে মাত্র ছমাস সাঁতার হয়, তাইতো এই শোচনীয় দশা।"

কোনিকে বাকি তিনটি স্ট্রোকও ক্ষিতীশ ইতিমধ্যে শিখিয়ে দিয়েছে। ফ্রি স্টাইল, বাটার ফ্লাই, ব্যাক এবং ব্রেস্ট এই চার রকমের স্ট্রোক মিলিয়ে কোনি এখন দিনে দু মাইল, হাড় ভাঙ্গা সাঁতার কাটে। কঞ্চির মতো শরীরটার ওজন বেড়ে হয়েছে ৫০ কেজি।

বছর ঘুরে নতুন বছর এল।

একদিন ভেলো, প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়ানো ক্ষিতীশকে বলল, "ক্ষিদ্দা, এ বছর ওকে কম্পিটিশনে নামাবে তো?"

ক্ষিতীশ তখন কোনির দুটো পায়ের গোছ বাঁধছিল রবারের দড়ি দিয়ে। পা বাঁধা অবস্থায় শুধু মাত্র হাতের পাড়িতে ওকে 'পুল' করতে হবে। ক্ষিতীশ অন্যমনস্কের মতো বলল, "সিজন শুরু হয়ে গেছে।" "সিজন কি তোমার জন্য বসে থাকবে নাকি। কর্পোরেশনতো অনেকদিন কমলাদিঘিতে জল ছেড়েছে, হুঁশ নেই—"

ভেলো কথা থামিয়ে ফেলল। ক্ষিতীশ হাত তুলে রয়েছে। কোনি স্টার্টিং পজিশ্যনে।

"অন ইওর মার্ক......গেট সেট......" ক্ষিতীশ হাতটা নামাল। কোনি ঝাঁপাবার সঙ্গে সঙ্গে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে বলল, "কি বলছিলিস?"

"হরিচরণরা ভয় পেয়ে গেছে।"

ভেলোর ধারে কাছে কেউ নেই, তবু সে এধার ওধার তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "অমিয়া বেলা জুপিটারে আবার চলে এসেছে তো, সে খবর রাখো কি? ওদের ট্রেনিং চার্ট তৈরী করছে হরিচরণ। অমিয়া বলছে অতো ট্রেনিং লোড নিতে পারবো না। তাই নিয়ে হরির সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছে। হরি বলেছে, যদি ক্ষিদ্দার মেয়েটার হাতে মার না খেতে চাস তো হার্ড ট্রেনিং আরম্ভ কর্।"

"করেও কোন লাভ নেই। কোনি এখন যে টাইম করছে, অমিয়ার পক্ষে সেখানে পৌঁছন সম্ভব হবে না।"

"তা হলে এবার ওকে জুপিটারের চ্যাম্পিয়নশিপে নামিয়ে, অমিয়াকে মার খাওয়াও। মনে আছে কি বলে অপমান করেছিল!"

জলে কোনির দিকে চোখ রেখে ক্ষিতীশ জবাব দিতে ভুলে গেল। ভেলো ধড়মড়িয়ে বলল, "যা বলতে এসেছিলুম সেটাই বলা হয়নি। আর একটা দরজির দোকান ঠিক করেছি। দিনে প্রায় হাপ কেজি মাল হয়। ওরা তোমার জন্য রেখে দেবে, তুমি কালই যেও। এই নাও ঠিকানাটা।"

ভেলো চলে যাবার পর ক্ষিতীশ স্টার্টিং ব্লকের উপর বসে ওর কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল। তখনই দেখল ধীরেন ঘোষ আর বদু চাটুজ্জে কমলাদিঘির পশ্চিম গেট দিয়ে ঢুকে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

"ক্ষিদ্দা দেখছি উঠে পড়ে লেগেছে। কদ্দুর হল?"

ক্ষিতীশ যথাসম্ভব নিরাসক্ত হবার চেষ্টা করে ধীরেনকে বলল, "কিসের কদ্দুর!"

"এই তোমার চ্যাম্পিয়ন তৈরী করার। এবার দিল্লীতে দেখলুম বোমবাইয়ের রমা যোশিকে। অসাধারণ, ফ্যান্টাস্টিক। ইণ্ডিয়ায় এ রকম মেয়ে সুইমার কখনো হয়নি।"

"হ্যাঁ, ভালোই টাইম করেছে।" ক্ষিতীশ নিষ্প্রাণস্বরে বলল।

"তোমার এই গঙ্গা থেকে কুড়োনো মেয়েটা কেমন টাইম করছে?" বদু চাটুজ্যে নস্যির ডিবেটা রেলিংয়ে ঠুকে ঢাকনিটা খুলতে খুলতে বলল, "ডন ফ্রেজারের টাইম ধরে ফেলেছে?"

"আর একটু বাকি আছে। কাল পরশুই ধরে ফেলবে।" ক্ষিতীশের চোখ জোড়া মিটমিট করে উঠল।

কোনি তখন কিকিং বোর্ড ধরে স্প্রিন্ট করে যাচ্ছে। বদু চাটুজ্যে সেদিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাট্টা করলে আমার সঙ্গে।"

"ঠাট্টা! জলে নেমে এক বছরেই ডনের টাইম ধরে ফেলেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সিরিয়াস কথার পর কি ঠাট্টা চলে? আগে অমিয়াকে বিট্ করুক তারপর বড় বড় ব্যাপার ভাবা যাবে।"

"তা বটে।" ধীরেন ঘোষ বিজ্ঞের মতো বলল। "তবে অমিয়াকে বিট্ করা আর সম্ভব হ'ল না। এইটেই ওর লাস্ট সিজন। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, বিয়ের পরই চলে যাবে ক্যানাডায়।"

ক্ষিতীশ সচকিত হয়ে উঠল। কোনি যদি অমিয়াকে না হারায়, তাহলে বিরাট একটা অপূর্ণতা ক্ষিতীশের জীবনে যেন রয়ে যাবে। চিরকাল যেন তাকে অতৃপ্ত থেকে যেতে হবে।

"তাহলে কোনিকে এবার তো নামিয়ে জানতে হয় বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নের থেকে কত পিছনে রয়েছে।"

"না না, তা করতে যেও না।" বদু চাটুজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। "সবে শুরু করছে। বাচ্চা মেয়ে এখুনি বড় রকমের মার খেয়ে গেলে সেটব্যাক হবে। তাতে ওর ক্ষতিই হবে।"

"হোক্। তবুতো পরে বলতে পারবে, অমিয়ার পা ধোয়া জল খেয়েছি।"

সেই দিনই নকুল মুখুজ্জেকে ক্ষিতীশ জানাল, এবার জুপিটারের কম্পিটিশনে কোনির এন্ট্রি অবশ্যই যেন দেওয়া হয়।

ক্ষিতীশ এবার আরো সতর্ক আরো হিসেবী, আরো কঠিন হল কোনির ট্রেনিং সম্পর্কে। তীক্ষ্ন নজরে রাখল কোনির হাব-ভাব, শোয়া, খাওয়া এবং বিশ্রামের। প্রতিমাসে একবার রক্তে হেমোগ্লোবিনের মাত্রা পরীক্ষা করে পরিশ্রমের ভার বাড়িয়ে যেতে লাগল। অ্যাপোলোর ছেলেদের সঙ্গে এখন তাকে প্রতি-যোগিতা করিয়ে সময় নেয়। ক্ষিতীশ একদিন কাগজে বড় অক্ষরে লাল কালিতে '৭০' লিখে ক্লাবের বারান্দায় দেয়ালে সেঁটে দিল। কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে সে হেসে বলল, "অত বছর আমায় বাঁচতে হবে কিনা, সেটা যাতে মনে থাকে তাই চোখের সামনে রাখলাম রোজ দেখার জন্য।"

আসলে ওটা হচ্ছে ৭০ সেকেণ্ড। সময়টা কোনির চোখে প্রতিদিন ভাসিয়ে রাখার জন্য সে শুধু ক্লাবেই নয়, বাড়িতেও দেয়ালে লিখে রেখেছে। রমা যোশি এখন লক্ষ্যের পাত্রী। এক মিনিট ১০ সেকেণ্ডে কোনিকে এই বছরই সাঁতরাতে হবে।

"অসম্ভব বলে কিছুই নেইরে।" কোনিকে রাত্রে খাওয়ার পর বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় ক্ষিতীশ বলে "বুঝলি, আমাদের শত্রু হচ্ছে সময়। এই ঘড়িটা।"

ক্ষিতীশ পকেট থেকে স্টপ ওয়াচটা বার করে কোনির চোখের সামনে ধরে। কোনি সেটা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে থাকে। বারবার চাবি টিপে দেখে কাঁটাটা থরথরিয়ে কেমন এগোচ্ছে।

"ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের দিকে এগোতে হলে, ছোটখাট রেকর্ড-গুলো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগোতে হবে।"

"ক্ষিদ্দা, অমিয়াদির রেকর্ড কবে ভাঙ্গবো?"

ঘড়িটা কানে লাগিয়ে কোনি হঠাৎ প্রশ্নটা করল। হেসে ক্ষিতীশ বলল, "কেন!"

"আজ দোকানে এসেছিল ব্লাউজ করাতে। আমাকে সকলের সামনে বলল, তুই এখানে ঝিয়ের কাজ করিস? জানো ক্ষিদ্দা, আমার খুব লজ্জা করল। আমার হাতের লেখাটা এতো খারাপ, নইলে কাউন্টারের ওধারে খাতায় মাপ লেখার কাজ তাহলে পেতুম। তুমি বৌদিকে একটু বলবে? আমি রোজ তাহলে হাতের লেখা প্র্যাকটিস করব।"

"বলব।" ক্ষিতীশ মৃদু স্বরে বলল। "লজ্জা কখনো পুরোটা জিততে পারবি না। কাউন্টারের ওধারে বসলে খানিকটা জেতা হবে। ক্ষমতা দিয়ে জিততে হয়। তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে। যখন তোর ক্ষমতা খানিকটাও বাড়াতে পারবি, শুধু তোর কেন তখন আমারও মান তাতে বাড়বে, মানুষের মান বাড়বে।"

"মানুষেরও!" কোনি হকচকিয়ে বলল।

ক্ষিতীশ ওর পিঠে চাপড় দিয়ে ঝুঁকে ভারী গলায় বলল, "হ্যাঁ মানুষেরও। মানুষ শব্দের থেকে জোরে আকাশে উড়েছে, দশ সেকেণ্ডের কমে ডাঙায় একশো মিটার ছুটেছে, জলে মেয়েরা একমিনিটের বাধা ভেঙেছে। স্বপ্নেও ভাবা যায়নি এমন সব পদ্ধতি লেবরেটরিতে, অপারেশন টেবলে মানুষ শিখেছে এই শরীরের আয়ু বাড়াতে। একদিন আসবে যখন আলোর গতিকে মানুষ হার মানাবে, ইচ্ছামত বয়সটা বাড়াবে। এই যে রেকর্ড ভেঙে মানুষ জলে, স্থলে, আকাশে এগোচ্ছে, এ সবই মানুষের মুক্তির চেষ্টা, এই ঘড়িটার হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। একদিন সব ঘড়ি ভেঙে চুরমার করে দেবে মানুষ, সময়কে হারিয়ে দেবে মানুষ——"

"ক্ষিদ্দা কাঁধে লাগছে।" কোনি অস্ফুটে কাতরে উঠল। কোনির কাঁধে উত্তেজিত আঙুলগুলো চেপে বসে গেছে। ক্ষিতীশ লজ্জা পেয়ে হাতটা নামিয়ে নিল।

"অনেক সময় আবোল তাবোল বকি। তুই এসব কথা বুঝতে পারিস?"

কোনি মাথা নাড়ল। ক্ষিতীশ যেন তাতে নিশ্চিন্ত হল, এমন স্বরে বলল, "তোর পক্ষে এসব শক্ত কথা। তবে আরো বড়ো হ, বুঝতে পারবি।"

"ক্ষিদ্দা তুমি কিন্তু বললে না, আমার টাইম অমিয়াদির রেকর্ডের থেকে কত পেছনে।"

"বলব বলব, একেবারে কম্পিটিশনেই দেখিয়ে দেব ব্যাটাদের কে কার পায়ের জল খায়।"

এর তিনমাস পরই ক্ষিতীশ অ্যাপোলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, "বদমাইসি, এসব হচ্ছে ধীরেনের বদমাইসি। কোনির এন্ট্রি নেবে না কেন? অ্যাপোলোর সঙ্গে ঝগড়া, তাই বলে সুইমারদের ওপর ঝাল ঝাড়বে! প্রোটেস্ট করো, ইনজাংশন দাও......যা খুশি ইচ্ছে মতো করবে, এটা কি মগের মুল্লুক!"

নকুল মুখুজ্জে আর বিষ্টু ধর এবং আরো অনেকে সেখানে বসে। ক্ষিতীশ পায়চারি করছিল। থমকে জুপিটার ক্লাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কোথায় নেমে গেছে। অপদার্থরা ক্লাবটাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে। এখন ভয়ে ইতরোমো শুরু করেছে। ভেবেছে এইভাবে ক্ষিতীশ সিংগীকে আটকাবে।"

ফিসফিস করে বিষ্টু ধর বলল, "এসব বিনোদ ভড়ের পরামর্শে হয়েছে। পাবলিককে এটা জানানো উচিত। প্রেস কনফারেন্স ডাকবো আমি।"

নকুল মুখুজ্জে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

"এন্ট্রি রিফিউজ করার অধিকার ক্লাবের আছে। ওরা বলেছে ডেট পেরিয়ে গেছে, তাই নেবে না। লাস্ট ডেট কবে সেটাতো ওরা বলে দেয়নি, সুতরাং আইনের ফাঁক রেখেছে। প্রোটেস্ট, ইনজাংশন কিছুই চলবে না।"

"এটা মরালিটির ব্যাপার।" ক্ষিতীশ অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের বুকে চাপড় দিল। "এটা খেলার, এটা সাহসের, এটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার।"

নকুল মুখুজ্জের ঠোঁট বিদ্রূপে মুচড়ে উঠল। বিষ্টু ধর উত্তেজিত হয়ে বলল, "তাহলে একটা ডিমনস্ট্রেশন করলে কেমন হয়। বিক্ষোভ প্রতিবাদ জুপিটারের সামনে, বিনোদ ভড়ের বাড়ির সামনে? একটা মিছিলও যদি পাড়ায় পাড়ায়—"

"ওতে অনেক ঝামেলা।" নকুল ঠান্ডা স্বরে বিষ্টু ধরকে মিইয়ে দিল। "জুপিটারেরই পাবলিসিটি হবে, ওদের ইজ্জৎ একটুও তাতে কমবে না। আপনার ইলেকশন পর্যন্ত লোকে এসব মনেও রাখবে না। তার থেকে বরং অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে। ক্ষিতীশ, তুই কি নিশ্চিত যে, কোনি এখন অমিয়াকে হারাতে পারে?"

"নিশ্চয়।" ক্ষিতীশ বলল দাঁতে দাঁত চেপে।

১১

"কম্পিটিটরস ফর দ্য লেডিজ হাণ্ড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট, প্লিজ কাম টু দিয়ার স্টার্টিং ব্লক্‌স।"

জুপিটার সুইমিং ক্লাবের কম্পিটিশন প্রতিবছরই এই রকম জাঁকালোভাবে হয়। কমলদিঘির অর্ধাংশের চারটে গেট বন্ধ করে, জুপিটারের যেটুকু অংশ টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। কাঠের গ্যালারি তৈরী করা হয় দিঘির তিন-চতুর্থাংশ ঘিরে। সাঁতার শুরু হয় যেদিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে তার পিছনে তিন সারি বিশিষ্ট অতিথিদের চেয়ার এবং তার পিছনেও গ্যালারি। প্ল্যাটফর্মের একধারে টেবিল। সেখানে মাইক্রোফোন নিয়ে ঘোষক আর জনা পাঁচেক টাইম রেকর্ডার। বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে, কয়েকটা স্যুভেনির হাতে ধীরেন ঘোষ বিশিষ্ট অতিথিদের তদারকিতে ব্যস্ত। কম্পিটিশনের চিফ রেফারি হরিচরণ।

ভিড়ে আজ ফেটে পড়ছে কমলদিঘি। গ্যালারি ভেঙে কয়েকজন মাটিতে পড়েছে, একজনের হাত ভেঙেছে। রেলিংয়ের ভিতরে পাড় ঘিরে লোক দাঁড়িয়ে। দুটি ছেলে ভিড়ের ধাক্কায় জলে পড়েছিল। অবশ্য তারা সাঁতার জানে। ডাইভিং বোর্ডে উঠেছে বহু ছেলে। জুপিটারের এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ টিনের বেড়ার পরেই অ্যাপোলোর এলাকায়, রেলিং ঘিরে হাজার দুয়েক মানুষ। তারা দূর থেকেই প্রতিযোগিতা দেখবে।

প্রতিযোগিতার আজ শেষ দিন। দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয়েছে। ছেলেদের এবং ছোট মেয়েদের তিনটি বিষয়ের ফাইনাল হয়ে যাবার পর ঘোষণা শোনা গেলঃ "কম্পিটিটরস ফর দ্য লেডিজ হানড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট, প্লিজ। উইল কম্পিটিটরস কাম টু দিয়ার পোজিশনস। দিস ইজ সেকেন্ড কল......"

কমলদিঘির অ্যাপোলোর অংশে এতক্ষণ একজন, পাড়ের কাছে মন্থরভাবে সাঁতার কাটছিল। অ্যাপোলোর স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মটা জুপিটারেরই পঞ্চাশ মিটার পাশে। সেখানে চুপচাপ বসে চোখে পুরু কাঁচের চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল একটি লোক। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। আজ কমলদিঘির আনাচে কানাচে সর্বত্রই লোক, সকলের চোখ জুপিটারের এলাকার দিকে।

ঘোষণা শেষ হতেই ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

"কোনি।" শান্ত নরম গলায় সে ডাকল। জল থেকে কোনি প্ল্যাটফর্মে উঠে এল। রেলিংয়ের ভীড়ের চোখ এদিকে ফিরল।

জুপিটারের প্ল্যাটফর্মে সাঁতারুরা এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয়াকে দেখা গেল হেসে কথা বলছে অতিথিদের মধ্যে বসা এক বৃদ্ধার সঙ্গে। অত্যন্ত ঢিলেঢালা নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। বেলা জলে নেমে মিনিট দুয়েক হাত ছুঁড়ে উঠে এল। এখন তোয়ালে দিয়ে জল মোছায় ব্যস্ত। অন্য ছয়টি মেয়ে কিঞ্চিৎ নার্ভাস। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করেই মুখ শুকিয়ে ফেলছে।

হরিচরণ উত্তেজিতভাবে ধীরেন ঘোষের কানে ফিসফিসিয়ে কি বলল। ধীরেন ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাপোলোর প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। সেটা লক্ষ্য করে অমিয়াও তাকাল। পাঁচ নম্বর ব্লকের পিছনে দাঁড়ান কালো কস্টুম পরা মেয়েটিকে চিনতে তার অসুবিধা হল না। কোনির পাশে ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ। সারা কমলদিঘি হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে এবার একটা কিছু ব্যাপার হতে চলেছে। চোখগুলো অ্যাপোলোর দিকে নিবদ্ধ হচ্ছে।

হরিচরণ কিছু একটা অমিয়াকে বলতেই অমিয়া কাঁধ

ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল। অ্যাপোলো ক্লাবের বারান্দা থেকে বিষ্টু ধরের চীৎকার ভেসে এলঃ "ডাউন দিতেই হবে, কোনি।"

"অন ইওর মার্ক।" স্টার্টারের চীৎকার শোনা গেল। এয়ার রাইফেলের নলটা আকাশ মুখো তোলা। জুপিটারের ব্লকের উপর আটটি মেয়ে উঠল। অ্যাপোলোর পাঁচ নম্বর ব্লকে উঠেছে কোনি। সারা কমলাদিঘি ঘিরে ভেসে উঠল মর্মর শব্দ।

ওরা ব্লকের কিনারে পায়ের আঙুলগুলো আঁকড়ে রেখে হাঁটু ভেঙে, কাঁধ ঝুঁকিয়েছে। দুহাত পাখির ডানার মতো পিছনে যেন এখনি উড়বে।

"গেট......সেট......"

অমিয়া ও কোনি ছাড়া বাকি মেয়েরা ঝপঝপ জলে পড়ল। এয়ার রাইফেলের ক্যাপ ফোটেনি। কমলাদিঘি ঘিরে বিদ্রূপ ও আক্ষেপ এক চক্কর ঘুরে গেল। অমিয়া আড়চোখে কোনির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

নতুন ক্যাপ লাগান হয়েছে।

"অন ইওর মার্ক।"

মেয়েরা আবার ব্লকের উপর উঠল।

"গেট......সেট......।"

এয়ার রাইফেলে 'ফটাশ' শব্দ হল।

এক সঙ্গে নয়টি মেয়ে জলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কমলাদিঘির উপর গড়িয়ে পড়ল চাপা একটা গর্জন। দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়েছে ফুটবল মাঠের মতো। তাদের চোখ ডাইনে-বামে ৫০ মিটার যাতায়াত করছে আগুয়ান দুটি সাঁতারুকে লক্ষ্য করতে করতে।

তিরিশ মিটার পর্যন্ত কোনি আর অমিয়া সমান রেখায়। বাকিরা ৭/৮ মিটার পিছনে। এরপর অমিয়া একটু একটু করে এগোতে শুরু করল।

"কোও ও নিই।" অ্যাপোলোর দিকে ভীড়ের মধ্যে থেকে কে চীৎকার করে উঠল। "কোও ও নিইই।"

"গো, অমিয়া গো।" জুপিটার থেকে চীৎকার শোনা গেল।

ক্ষিতীশ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কোনির দিকে তাকিয়ে। মুখে ভাবান্তর নেই।

অমিয়া দু হাত এগিয়ে গেছে। বেলা তার পিছনে প্রায় আট মিটার দূরত্বটা সমানে রেখে চলেছে। বাকিদের দিকে কেউ তাকাচ্ছেই না।

অমিয়া সবার আগে ৫০ মিটার বোর্ড ছুঁয়েছে। ঘুরে গিয়ে সে কোনিকে অতিক্রম করার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কোনি যেন থমকে গেল। তারপরই বোর্ড ছুঁয়ে ঘুরেই টর্পেডোর মতো ছিটকে এল।

রোগতপ্ত মানুষের মতো কমলাদিঘি ভুল বকতে শুরু করেছে।

"কোও ও নিইই।"

"এটা ছেলে না মেয়ে, মশাই!"

"মেয়ে মেয়ে, আমাদের ক্লাবের মেয়ে—কোনি।"

"পারবে না। এক বডি পেছনে পড়ে গেছে। কেন যে ক্ষিদ্দা এমন হাস্যকর ব্যাপার করলো।"

৬০ মিটার। অমিয়া এগিয়ে চলেছে।

৬৫ মিটার। কোনি উঠছে।

৭০ মিটার। কোনি সমান রেখায় অমিয়ার সঙ্গে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য অমিয়া ঘনঘন হাঁ করছে। পায়ের পাড়ি এলোমেলো হয়ে এসেছে। হাতদুটো উঠছে-পড়ছে যেন নিয়ম রক্ষার জন্য। জলের গভীরে ডুবিয়ে টেনে কোমরের পিছন পর্যন্ত আনার জোরটুকু আর নেই। অমিয়া নিভে আসছে।

"কাম অন অমিয়া, কাম অন বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন।"

"ফাইট কোনি, ফাইট।"

হঠাৎ কমলাদিঘি ঘিরে বিরাট একটা চীৎকার হাউইয়ের মতো আকাশে উঠল। কোনি পিছনে ফেলেছে অমিয়াকে। ওর ছিপছিপে শরীরটার মধ্যে দিনে দিনে সঞ্চিত যন্ত্রণায় ঠাসা শক্তির ভাণ্ডারটিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। ছন্দোবদ্ধ ওঠা নামা করে চলেছে দুটি হাত, তার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে পা দুটি। ওর দু পাশে ইংরাজি 'ভি' অক্ষরের মতো ঢেউয়ের রেখা ছড়িয়ে পড়ছে। পায়ের আঘাতে বিরামহীন স্ফীত জলতরঙ্গ ওকে অনুসরণ করছে।

মসৃণ, স্বচ্ছন্দ কিন্তু হিংস্র ভঙ্গিতে কোনি নিজেকে টেনে বার করে নিয়ে গেল। ফিনিশিং বোর্ডে হাত লাগিয়েই সে উদ্বিগ্ন ব্যগ্র চোখে পাশে মুখ ফেরাল। তখনো অমিয়া পৌঁছয়নি। 'উইইই' শব্দে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে কোনি চীৎ হয়ে বোর্ডে ধাক্কা দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আনন্দে।

"তিন বডি, ক্লিয়ার তিন বডিতে মেরেছে।"

"কোওওন্নিঃ...কোওওন্নিঃ...কোওওন্নিঃ।" ভীড়ের মধ্যে তিনটি ছেলে তালে তালে সুর করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কোনি হাত নাড়ল তাদের উদ্দেশে।

"কি রকম ডাউন খাওয়াল দেখলে! জুপিটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারই শোধ নিল।"

"অনেকদিন এমন মজা পাইনি কিন্তু!"

হঠাৎ সব আলোচনা, উত্তেজনা থমকে গিয়ে এবার দ্বিগুণ জোরে হৈ হৈ করে উঠল। হাততালি পড়ছে, শিস উঠছে একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। অ্যাপোলোর স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে এতক্ষণ ধরে প্রস্তরবৎ, ভাবলেশহীন ক্ষিতীশ এখন তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে।

"কোথায় হরিচরণ, মুখখানা একবার দেখা।" লাফাতে লাফাতে ক্ষিতীশ চীৎকার করে চলল। "ওলিম্পিকের গুল মেরে কি আর সুইমার তৈরী করা যায় রে পাঁটা? বুদ্ধি চাই, খাটুনি চাই, নিষ্ঠা চাই......গবেট গবেট গবেট সব।"

ব্যস্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর ভেলো উঠে এসে ক্ষিতীশকে জড়িয়ে ধরল। "হচ্ছে কি ক্ষিদ্দা, এত লোকের সামনে, তোমার কি মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি! চলো চলো ক্লাবে চলো। বিষ্টু ধর ওদিকে একসাইটমেন্টে সেন্সলেশ হয়ে পড়েছিল। অ্যাই কোনি উঠে আয়।"

ক্লাবের বারান্দায় বেঞ্চে শুয়েছিল বিষ্টু ধর। ক্ষিতীশকে দেখে ওঠার চেষ্টা করতেই দুজন তাকে সাহায্য করল।

"দশ কেজি রসগোল্লা আনতে পাঠিয়েছি।" ক্ষীণস্বরে বিষ্টু ধর বলল। "ব্যান্ড পার্টি আনাবো। কোনিকে সারা নর্থ ক্যালকাটা ঘোরাব।"

"খবরদার ও কাজটি করবেন না। তাহলে হাজার পাঁচেক ভোট কমে যাবে।"

বিষ্টু ধর ফ্যালফ্যাল করে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে থেকে, অস্ফুটে আপন মনে বলল, "কিন্তু আমার যে জেনুয়িন আনন্দ হচ্ছে।"

ক্ষিতীশ কোনিকে ডেকে গম্ভীর মুখে বলল, "টার্নিংয়ে ভুল হল কেন?"

"তখন কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। অমিয়াদি টার্ন নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, টাম্বল টার্নের কথা আর মনেই এল না।"

"আসলে নিজের ওপর তখন ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলিস। মনে এলে সময় আরো কম্‌ তো।"

"আমার সময় কত হল ক্ষিদ্দা?"

বুক পকেট থেকে ঘড়ি বার করে তাকিয়েই ক্ষিতীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং ক্রমশ মুখটা অপ্রতিভ হয়ে উঠল।

"ভুলে গেছিরে! ফিনিশের সময় এমন একসাইটমেন্ট চারদিকে......তবে বেঙ্গল রেকর্ড নিশ্চয় আজ ভেঙেছিস। ইস্‌স্‌ সময়টা যদি রাখতুম।"

"ক্ষিন্দা আমায় যে এখন প্রজাপতিতে যেতে হবে, দেরী হলে বৌদি রাগ করবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ দেরী করিসনি আর।" ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে বলল। কিন্তু কোনি ইতস্তত করছে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল?"

"কানে কানে বলব।"

ক্ষিতীশ নিচু করল মাথাটা।

"রসোগোল্লা আনতে পাঠিয়েছে না।"

"তাইতো! নিশ্চয় ভেলোটা আনতে গেছে। তাহলে আজ আর তোর বরাতে রসগোল্লা নেই।"

"কে বল্লে নেই।" বিষ্টু ধর গর্জন করে উঠল। "ব্যাণ্ড-পার্টি ঘোরান গেল না, রসোগোল্লার হাঁড়িটাই তার বদলে প্রজাপতি ঘুরে আসবে।"

"তাহলে তোর বৌদির রাগ জল হয়ে যাবে।"

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশের প্রতি লীলাবতীর প্রথম বাক্যটিই হলঃ "ভতলোকের সামনে এই বুড়ো বয়সে ধেই ধেই করে নাচছিলে কেন? লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। সবার সামনে অসভ্যতা, দোকানের মেয়েরাও দেখল তো।"

ফিসফিস করে কোনি ক্ষিতীশকে বলল, "বৌদিকে আমি বলেছিলুম আজকের সাঁতারের কথাটা, নইলে ছুটি পেতুম না যে।" তারপর হেসে বলল, "বৌদি আমার মাপ নিয়েছে, একটা ফ্রক করে দেবে।" তারপর লাজুক স্বরে বলল, "বৌদি বলেছে, ইণ্ডিয়া রেকর্ড করলে সিল্কের শাড়ি দেবে।"

কোনিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, "কি মনে হচ্ছিলরে তোর যখন সাঁতরাচ্ছিলিস।"

কোনি অনেকক্ষণ চুপ করে হাঁটল, তারপর স্বপ্নের ঘোরে যেন কথা বলছে, এমনভাবে বলল, "জানো ক্ষিন্দা, রোজ যখন প্র্যাকটিস করি, তখন জলের মধ্যে নিচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখও এগিয়ে চলেছে। বড্ড ভয় করে তখন।"

"মুখটা কেমন দেখতে রে?"

"দাদার মতন। আজও ছিল আমার সঙ্গে।"

১২

অবশেষে কোনি বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল।

এবারের জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপস হচ্ছে মাদ্রাজে। বি এ এস এ নির্বাচন সভায় ধীরেন ঘোষ, বদু চাটুজ্জেরা প্রবল বিরোধিতা করেছিল অ্যাপোলোর কাউকে দলে নেওয়ায়। তাই নয়, জুপিটারের কম্পিটিশনে অ্যাপোলোর তরফ থেকে "অমার্জনীয় অখেলোয়াড়ি আচরণ করার জন্য ওই ক্লাবকে সাসপেণ্ড করা হোক।

জুপিটার দলে ভারি ছিল, তাদের প্রস্তাব গৃহীতও হচ্ছিল। এমন সময় আচমকা বালিগঞ্জ ক্লাবের প্রণবেন্দু বিশ্বাস অর্থাৎ হিয়ার কোচ প্রস্তাব দিল, "অ্যাপোলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হোক ভবিষ্যতে এই ধরণের আচরণ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" প্রণবেন্দু তারপর বলল, "বেঙ্গলের স্বার্থেই কনকচাঁপা পালকে টিমে রাখতে হবে।"

তুমুল হৈচৈ পড়ে গেল প্রণবেন্দুর এই কথায়। অ্যাপোলোর কেন প্রতিনিধি সভায় নেই। ওরা ভেবেছিল প্রস্তাবটা বিনা বাধায় পাশ হয়ে যাবে। কেউ ভাবতেই পারেনি হিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ নিয়ে প্রণবেন্দুই কিনা লড়াই শুরু করবে। ধীরেন ঘোষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে কি হল, সেটতো তুমি নিজেই দেখেছ।"

"হ্যাঁ দেখেছি।" প্রণবেন্দু স্থির চোখে ধীরেনের পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, "কি হয়েছিল আমি দেখেছি।" শুধু প্রণবেন্দু নয়, আরো অনেকেই দেখেছে।

কোনির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমিয়ার সঙ্গে নয়, হয়েছিল হিয়ার সঙ্গে। ব্রেস্ট স্ট্রোকের ১০০ মিটারে ছিল কোনি, অমিয়া, হিয়া। চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম রেফারি ছিল ধীরেন ঘোষ। স্ট্রোক জাজদের মধ্যে ছিল হরিচরণ, ইনস্পেক্টর অফ টার্নস এবং টাইম কীপারদের মধ্যে কার্তিক সাহা, বদু চাটুজ্জে, যজ্ঞেশ্বর ভটচাজ ছাড়াও জুপিটারের গোষ্ঠিভুক্ত কয়েকটি ক্লাবের লোকেরা ছিল।

একই সঙ্গে কোনি আর হিয়া ৫০ মিটার থেকে টার্ন নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ নাড়তে শুরু করে। রেফারী ধীরেন ঘোষ ছুটে গিয়ে ফ্ল্যাগ দেখাবার কারণটা জেনে, বলল, "কনকচাঁপা পাল ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। টার্ন করেই আণ্ডার ওয়াটার ডাবল-কিক নিয়েছে।"

শুনে অবাক হয়ে গেল ক্ষিতীশ। শুধু বলল, "এরকম ভুল করার কথাতো নয়।"

হিয়া প্রথম এবং তার থেকে ৬ মিটার পিছনে কোনি, ৭ মিটার পিছনে অমিয়া সাঁতার শেষ করে। কোনিকে ২০০ মিটারে নামতে দেয়নি ক্ষিতীশ। ব্রেস্ট স্ট্রোকে পায়ের উপর অত্যধিক খাটুনি পড়ে, অথচ তার পরেই রয়েছে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট। কোনি মূলতঃ ফ্রি স্টাইলার। কিন্তু এতেও কোনি পারল না। সাঁতার শেষ করে ফিনিশিং বোর্ড ছুঁয়েই সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল অমিয়া হাত ছোঁয়াল। কোনি একগাল হেসে মুখ তুলে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। ঘড়িটা উঁচু করে ধরে গ্যালারি থেকে ক্ষিতীশ হাত নাড়ল। ঘোষণায় শোনা গেল অমিয়া প্রথম হয়েছে।

ক্ষিতীশ প্রথমে থ হয়ে গেল, তারপর ধীরেনের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "এসব কি হচ্ছে?"

"কি আবার হবে!" ধীরেন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষিতীশ ওর হাত টেনে ধরল।

"আমিও টাইম রাখছি। কোনি আগে টাচ করেছে, ওর টাইম—"

"তোমার জাপানী ঘড়ির টাইম, তোমার কাছেই রাখ।"

নকুল মুখুজ্জে প্রতিবাদ জানাল জুরি অফ অ্যাপীলের কাছে। প্রতিবাদ নাকচ হয়ে গেল। পনেরো মিনিট পরেই ছিল ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি। কোনি বাটার ফ্লাইয়ে হিয়া এবং অমিয়ার কাছে পিছিয়ে পড়ল, ব্যাক স্ট্রোকে অমিয়াকে ধরে ফেলে টার্ন নিতেই দেখা গেল যজ্ঞেশ্বর ভটচাজ লাল ফ্ল্যাগ তুলে রয়েছে।

"ব্যাপার কি!" ক্ষিতীশ গ্যালারি থেকে নেমে এল। "ধীরেন জোচ্চুরির একটা সীমা আছে। জগু তো আগে থেকেই ফ্ল্যাগ তুলেছিল।"

"কে বলল আগে থেকে। তোমার মেয়েটা ফলটি টার্ন নিয়েছে তারপর ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে। শেখাও শেখাও, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো শেখাও। জুপিটারকে অপদস্থ করা ছাড়া আর কিছুতো শেখাওনি।" ধীরেন উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বকের মতো গলাটা লম্বা করে বলতে লাগল, "আইনটাও শিখো ব্যাকস্ট্রোকে টার্ন নেবার জন্য বোর্ডে হাত ছোঁয়াবার আগে নরম্যাল পজিশন অন দি ব্যাক থাকতে হবে। কনকচাঁপা ঘুরে গিয়ে হাত ছুঁইয়েছে, নরম্যাল পজিশনে থেকে ছোঁয়ায়নি। যাও যাও, গিয়ে বোসো এখন।"

হিয়ার কাছে অমিয়া হেরে গেল এক সেকেণ্ডের তফাতে। কোনি আড়ষ্ট হয়ে গেল দুবার বাতিল হয়ে এবং প্রথম হয়েও দ্বিতীয় হয়ে যাওয়ায়। বাড়ি ফেরার সময় ক্ষিতীশ বাসে সারা পথ গজরাল এবং অবশেষে বলল, "কাল হানড্রেড মিটার, দেখি ধীরেনরা কি করে তোকে আটকায়।"

কিন্তু আটকাবার যে অনেক পন্থা আছে ক্ষিতীশ তা ভেবে দেখেনি।

পরদিন স্টার্টিং ব্লকে যখন প্রতিযোগীরা এসে দাঁড়াল, ক্ষিতীশ একটু অবাকই হল। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা সেরা তাদের মাঝখানে রাখা হয়,—৩, ৪, ৫, নম্বর লেনে। হিয়া ৩ নম্বরে, কোনি ৪ নম্বরে, অমিয়া ৬ নম্বরে আর তাদের মাঝে জুপিটারের ইলা ৫ নম্বর লেনে। হিটে কোনক্রমে তৃতীয় হয়ে ইলা ফাইনালে উঠেছে। দু বছর আগে প্রি-ইউ পরীক্ষায় টোকার সময় ধরা পড়ে ইলা গার্ডকে কামড়ে দিয়েছিল।

ক্ষিতীশ এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরেনের দিকে। একজন ভলান্টিয়ার তাকে আটকে দিয়ে বলল, "প্ল্যাটফর্মে কম্পিটিটাররা আর অফিসিয়ালরা ছাড়া কেউ যেতে পারবে না।"

ফিরে এসে ক্ষিতীশ ঘাড় হাতে নিয়ে বসল। শুরু থেকেই প্রচণ্ড রেস। অমিয়া বদ্ধপরিকর চ্যাম্পিয়নশিপ বজায় রেখে সাঁতার থেকে বিদায় নিতে। হিয়া মসৃণ ছন্দোবদ্ধ এবং দ্রুত-তালে নিখুঁত ভঙ্গিতে ভেসে যাচ্ছে। কোনি যেন তাড়া খাওয়া ব্যস্ত উদ্বিগ্ন জলকন্যা। জল তোলপাড় করে সে যেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে। বাকিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ওই তিনজনের পিছনে অন্তত ২০ মিটারের মধ্যে থাকতে। ইলার ব্যস্ততাটা একটু কম, সে বারবার মুখ তুলে তাকাচ্ছে আর ক্রমশই সরে যাচ্ছে কোনির লেনের দিকে।

বোর্ড ছুঁয়ে সবার আগে টার্ন নিল কোনি। তারপর অমিয়া। ব্রেস্ট স্ট্রোকাররা ভাল ফ্রি স্টাইলার হয়না—হিয়া প্রায় দু মিটার পিছিয়ে পড়েছে। বাকিরা তখনো ৪০ মিটারেও পৌঁছয়নি। টার্ন নিয়ে কোনি সবে মাত্র দু-তিনটি স্ট্রোক দিয়েছে, তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

ইলা ঢুকে পড়েছে কোনির লেনে। দুজনে মুখোমুখি সংঘর্ষ! "উঃ" বলে কোনি চেঁচিয়ে উঠল একবার, দেখা গেল ওরা জড়াজড়ি অবস্থায় এবং হাঁকপাক করে সে যেন নিজেকে ভাসাবার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেন্ড এভাবেই কাটল। ততক্ষণে অমিয়া এবং হিয়া ওদের অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে ইলার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইউ ডিসকোয়ালিফায়েড।" ইলা আবার নিজের লেনে সরে গিয়ে চীৎ সাঁতার কেটে স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

কোনি শুধু একবার সামনে তাকিয়ে দেখল। তারপরই বড় হাঁ করে অনেকখানি বাতাস বুকে ভরে নিয়ে তাড়া করল সামনের দুজনকে। অনেক দেরী হয়ে গেছে, তবু শেষ চেষ্টা। এঞ্জিনের পিস্টনের মতো ওঠা নামা করছে দুটো হাত, পায়ের কাছে টগবগিয়ে ফুটছে জল।

"কাম অন পল, কাম অন।" দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছে আর কেউ নয়, কোনির বাবা। গ্যালারির হতভম্ব ভাবটা তাতে যেন ভেঙ্গে খান্‌খান্ হয়ে পড়ল।

"জোরে জোরে, আরো জোরে!" শুধু এই চীৎকার ধাপে ধাপে উঠে অবশেষে আক্ষেপে ভেঙ্গে পড়ল। কোনি পারল না। অমিয়া তার খেতাব রক্ষা করল। দ্বিতীয় হল হিয়া। কোনি তৃতীয় হল বেলার সঙ্গে।

তারপর আর একটি ব্যাপার ঘটল। ধীরেন জলের ধারে ঝুঁকে এক গাল হেসে অমিয়াকে কিছু বলছিল, সেই সময় ভিড় ঠেলে ছুটে এসে ক্ষিতীশ তার পিছনে লাথি কষাল। ধীরেন উল্টে গিয়ে জলে পড়ল। তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটি ছেলে ক্ষিতীশকে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে। তখন শোনা গেল চীৎকার করে সে বলে যাচ্ছে, "পারবি না, এভাবে পারবি না।......"

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোনির তোয়ালে দিয়ে ক্ষিতীশ মুখ মুছল। ঠোঁটের কষ বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছে। কোনির কপাল ফুলে উঠেছে। একটা পানের দোকান দেখে ক্ষিতীশ বরফ কেনার জন্য দাঁড়াল। ঠিক তখনই ওর পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হিয়ার বাবা নেমে এল।

"সরি মিস্টার সিন্‌হা। এমন ডার্টি ব্যাপার এখানে হবে আমি জানতাম না। হিয়া, তার মা, আমরা কেউই খুশি হতে পারছি না। এভাবে মেডেল জেতায় কোন আনন্দ নেই।"

ভদ্রলোক কোনির পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "দুঃখ কোরোনা। জোরে সাঁতার কাটার দরকারটা আজ তুমি অনুভব করতে পেরেছ, তুমি লাকি। তোমার লাস্ট ফরটি মিটারস আমি ভুলব না।"

ক্ষিতীশ প্রথমে বিভ্রান্ত তারপর অভিভূত হয়ে গেল। গাড়ির জানলা দিয়ে হিয়া এবং তার মা দেখছে। ক্ষিতীশ এগিয়ে এসে হিয়ার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, "বড়ো হও মা।" তারপর ইতস্তত করে বলল, "সেদিন কোনিকে আমি খুব বকেছি।"

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির ছেঁড়া বুক পকেটটা টান মেরে ক্ষিতীশ খুলে ফেলল।

"তোর বৌদিকে এসব কিছু বলিসনি।"

প্রণবেন্দু ঘরের সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "কি হয়েছিল, আমরা জানি। সেকথা এখন আলোচনা করে লাভ নেই। বাংলার মানসম্মানের কথাই এখন আমাদের ভাবতে হবে, টিমটা যাতে সেরা হয় তার জন্য তুচ্ছ দলাদলি ভুলে যেতে হবে। মহারাষ্ট্রই আমাদের মেয়েদের একমাত্র রাইভ্যাল। ওদের রমা যোশির সঙ্গে ফ্রিস্টাইলে পাল্লা দেবার

মতো কেউ নেই, একমাত্র কনকচাঁপা পাল ছাড়া। ফ্রিস্টাইলের তিনটে ইনডিভিজুয়াল, আর একটা রিলে, এই চারটের মধ্যে অন্তত দুটোতে, একশো আর দুশোয় কনকচাঁপার সিক্সটি পারসেন্ট চান্স আছে।"

"কিসে বুঝলে যে, আছে?" একজন জানতে চাইল।

"শুধু ওর সেদিনের, ফিনিশ করা দেখেই বুঝেছি। যেরকম রোখা, জেদী সাঁতার ও দেখাল তাতে স্প্রিন্ট ইভেন্টে ওর সমকক্ষ এখন বাংলায় কেউ নেই। আমি ওর ট্রেনিংয়ের খবর রাখি, দু-তিনবার দেখেও এসেছি, জোর দিয়েই বলছি মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে নিতে হলে এই মেয়েটিকে চাই।"

"শুধু ফ্রি স্টাইল জিতেই আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব?" ধীরেন ঘোষ তাচ্ছিল্যভরে বলল এবং অন্যান্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো হাসল। কিন্তু তাকে সায় দিয়ে কেউ মাথা নাড়ল না এবার।

"হিয়ার কাছ থেকে আমি তিনটে গোল্ড আশা করছি। দুটো ব্রেস্টস্ট্রোকে একটা ব্যাকস্ট্রোকে। মেডলিতেও ফিফটি-ফিফটি চান্স আছে। এছাড়াও অঞ্জু, পুষ্পিতা, বেলা, অমিয়া পয়েন্ট আনবে। এ বছর আমরা লেডিজ চ্যাম্পিয়ন হতে পারি।"

"কিন্তু কনকচাঁপা পাল এ বছর কোন ক্লাব টিমে নামেনি, স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে দুটোতে ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে আর একটায় প্রথম দুটো প্লেসের মধ্যে আসতে পারেনি, বাকিগুলোয় আর নামেনি। ওর টাইমিং কি, আমরা তা জানি না। সুতরাং কি করে ওকে সিলেক্ট করা যায়!" ধীরেন ঘোষ টেবলে ঘুঁষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল।

কয়েক সেকেন্ড সভা ঘর নিস্তব্ধ রইল। সবশেষে ধীর শান্ত গলায় প্রণবেন্দু বলল, "তাহলে বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের সুইমারদের বাদ দিয়েই আপনাদের টিম করতে হবে। আমার মেয়েদের আমি উইথড্র করে নিচ্ছি।"

"তা কি করে হয়!" সভায় গুঞ্জন উঠল। একজন বলল, "কনকচাঁপা পালকে সিলেকশন দিলে ক্ষতিই বা কি! যাবে তো নিজের টাকায়।"

এরপর শুরু হল তর্কাতর্কি। সেটা পৌঁছল চীৎকারে। এক সময় ধীরেন রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, "প্রণবেন্দু ব্ল্যাকমেল করে অ্যাপোলোর সুইমার টিমে ঢোকাতে চায়। এতে ওর কি যে স্বার্থ আছে বুঝছি না।"

প্রণবেন্দু জবাব দিল, "রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোন স্বার্থ নেই।"

কোনি মাদ্রাজ যাওয়ার মনোনয়ন অবশেষে পেল। বাংলার ম্যানেজার হয়েছে ধীরেন ঘোষ। মেয়েদের বিভাগে ম্যানেজার বেলেঘাটা সুইমিং ক্লাবের প্রণতি ভাদুড়ি এবং কোচ হরিচরণ

মিত্র। মাদ্রাজ মেলে ওরা সন্ধ্যায় রওনা হবে। ক্ষিতীশ এসেছে ট্রেনে কোনিকে তুলে দিতে। আর এসেছে কান্তি, চন্ডু, ভাদু। কোনির ভাই গোপাল।

কামরায় জানলার ধারে বসেছে কোনি। জানলা থেকে দূরে সবার থেকে একটু তফাতে প্ল্যাটফর্মে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে। কোনি কথা বলছে কান্তিদের সঙ্গে। ধীরেন ঘোষ হাঁক ডাক করে তদারকিতে ব্যস্ত। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে এখনো নাকি কয়েকজন পৌঁছয়নি।

কোনির মুখে চাপা ভয়। কলকাতার বাইরে সে কখনো যায়নি। সাড়ে চোদ্দশ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৩৫ ঘন্টা ট্রেনে বাস। কামরার আর এক কোণে জুপিটারের অমিয়া আর বেলা। ওরা অভ্যস্ত। এটা ওদের পঞ্চম ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। হিয়া বাবা-মার সঙ্গে দু-দিন পর প্লেনে যাবে।

কোনি কথা বলছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ক্ষিতীশের দিকে। তখন চোখ সরিয়ে নিচ্ছে ক্ষিতীশ।

"মাদ্রাজ একেবারে সমুদ্রের ওপর। তবে নামিসনি যেন। গঙ্গা আর সমুদ্রে অনেক তফাৎ। সমুদ্রের তলায় কারেন্ট আছে।" ভাদু সাবধান করে দিল।

"কোনি মুশকিলে পড়বি খাবার নিয়ে। ইডলিধোসা যা জিনিস, খেলেই মালুম পাবি। বাঙালিদের পেটে ওসব ঠিক সহ্য হবে না। ওখানে পৌঁছেই খোঁজ করবি বাঙালি হোটেল-ফোটেল কোথায় আছে।" কান্তি পরামর্শ দিল।

"না রে, আমাদের সঙ্গে রান্নার জিনিষপত্তর, ঠাকুর সব যাচ্ছে।"

"তোর ভয় কচ্ছে?" ভাদু জিজ্ঞাসা করল।

কোনি ছলছল চোখে তাকাল।

"আরে ধেৎ, তোর থেকেও কতো ছোট ছোট মেয়ে ওয়ার্ল্ড ঘুরছে একা। আর তুই তো অ্যাতোগুলো লোকের সঙ্গে যাচ্ছিস। ঘাবড়াসনি।" চন্ডু হাত ধরল কোনির।

ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা পড়ল। ক্ষিতীশ কথা বলছিল একজনের সঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে দেখল। কোনি তার দিকে তাকিয়ে, দুগাল বেয়ে জল পড়ছে।

"ক্ষিদ্দা।" কোনি ধরা গলায় ডাকল।

ক্ষিতীশ না শোনার ভান করল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

"আমার ভয় করছে ক্ষিদ্দা।"

ট্রেনের সঙ্গে হাঁটছে কান্তিরা। মুখ কাত করে কোনি জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল ক্ষিতীশকে, দেখতে পেল না।

ঘন্টা দুয়েক পর খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন থামল। কৌতূহলে কোনি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ পাশ থেকে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল ক্ষিতীশ।

"ক্ষিদ্দা!" কোনির চীৎকারে শুধু কামরারই নয়, প্ল্যাটফর্মেরও অনেকে ফিরে তাকাল।

"মনে আছে, ঠিক দশটায় ঘুমোবি।"

"না" অবাধ্য গোঁয়ারের মতো কোনি ঘনঘন মাথা দোলাল। টপ টপ করে চোখ থেকে জল ঝরছে। "আমি কিচু শুনবো না, করবোও না। তুমি যাবে, এটা আমার কাছে লুকিয়েছিলে কেন?"

একজন টিকিট চেকারকে এগিয়ে আসতে দেখে ক্ষিতীশ আড়ষ্ট হয়ে গেল। লোকটি তার পিছন দিয়ে চলে যাবার পর, কোন্ কামরায় ওঠে, সেদিকে আড়চোখে নজর রাখতে রাখতে সে বলল, "যাচ্ছি কে বলল, এখান থেকেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব।"

"ইস্‌স্।" কোনি দু হাতে আঁকড়ে ধরল ক্ষিতীশের পাঞ্জাবির হাতা। "যাওতো দেখি।"

"কেন আমি যাব! তুই কি কখনো আমার কথা ভাবিস?"

"ভাবি কি না ভাবি, তুমি তা জানো?"

"জানিইতো। জলে ডাইভ দিয়ে পড়ার পরই তো আমাকে ভুলে যাস।"

টিকিট চেকারটি আবার আসছে। কোনি উত্তর দেবার আগেই ক্ষিতীশ, "কাল সকালে বহরমপুরে আসব।" এই বলেই সরে গেল।

কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হরিচরণ একজনকে বলল, "আপদটা দেখছি সঙ্গে চলেছে।"

কিন্তু সকালে ক্ষিতীশকে দেখা গেল না। রাত্রেই চেকারের হাতে ধরা পড়ে সে তখন রেল পুলিশের হেফাজতে।

ঘরের একধারে এককোনে খাটে কোনি শুয়েছিল, রঙ ওঠা শতরঞ্চি আর বালিশ, গায়ে দেবার সুতির চাদর, মাথার কাছে টেবলে ক্যাম্বিসের ছোট ব্যাগ। তাতে আছে গোটা দুয়েক ফ্রক আর, ওর সব থেকে মূল্যবান সম্পত্তি কস্টুমটা। টেবলে মাজন ব্রাশ আর অর্ধেক দাঁত পড়ে যাওয়া একটা চিরুণী। খাটের নীচে চটি।

দুই বাহুতে চোখ ঢেকে কোনি শুয়ে, তখন মেয়েরা ফিরল। ওরা মাদ্রাজ শহর দেখতে, বাজার করতে বেরিয়েছিল। কোনি যায়নি। হাতে মাত্র পনেরোটি টাকা, তাই নিয়ে বাজার করা যায় না। শহর দেখার ইচ্ছাও নেই। ওর সঙ্গে কেউ কথা বলে না, হাবে ভাবে মেয়েরা বুঝিয়ে দেয় সে ওদের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কোনিও এড়িয়ে চলে ওদের।

আজ সকালে বেরোবার সময়, বেলা হঠাৎ বলে, "প্রণতিদি আমাদের সঙ্গে কোনি যাবে না?"

"না, বলছে তো শরীর খারাপ জ্বর-জ্বর লাগছে।"

খাটে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল কোনি।

"তা হলে ঘরে কি, ও একা থাকবে! কাল আমার ক্রিমের কৌটোয় খাবলা দেওয়া দেখেছি।"

"ওম্মা, বেলাদি আমারও যে পেস্টের টিউবটা অনেকখানি খালি। ভয়ে আমি বলিনি, কি জানি বাবা কে কি মনে করবে!"

"ঘরে তালা দিয়ে যাওয়া উচিত প্রণতিদি।"

"তা হলে কোনি কোথায় থাকবে।" প্রণতি ভাদুড়ির কড়া স্বরে ওরা চুপ করে গেছল।

লজ্জায় আর ভয়ে খাটের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে কোনি শুয়েছিল। থেকে থেকে চাপা একটা অভিমান গুমরে উঠছিল বুকের মধ্যে। ক্ষিদ্দা তাহলে সত্যি সত্যিই ট্রেন থেকে কলকাতায় ফিরে গেল। যদি এখানে সঙ্গে আসত তাহলে কষ্ট অনেক কমে যেত। অনেকের সঙ্গেই তো বাবা-মা এসেছে। ক্ষিদ্দা তাহলে এলনা কেন।

হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল হিয়া। ওর বাবা-মা হোটেলে রয়েছে। তারা সকালে এসে হিয়াকে নিয়ে বেরিয়েছিল। ঘরে কাউকে না দেখে হিয়া প্রথমে থমকে যায়। তারপর কোনিকে দেখতে পেয়ে বলল, "বাবার বন্ধু মিস্টার স্বারুপানির বাড়িতে আমি যাচ্ছি, প্রণতিদিকে বলে দিও। ঘন্টা দুই পরে ফিরব।"

ঘরের আর একদিকে হিয়ার খাট। সেখানে তার বিরাট সুটকেশে অজস্র রকমের জিনিষ। ইংরাজি কমিকস, আর ট্রানজিস্টর রেডিও বিছানায়, খাটের নীচে তিন রকমের জুতো আর চকোলেটের মোড়ক ছড়ান। হিয়া চটপট ফ্রক বদল করে চুলে ব্রাশ বোলাল। হাত ব্যাগটার মধ্যে একটা চকোলেটের বার দেখতে পেয়ে আধখানা মুখে ঢুকিয়ে বাকিটুকু ভেঙ্গে কোনির দিকে ছুঁড়ে দিল।

টুকরোটা এসে পড়ল কোনির বুকের কাছে। সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সে হিয়ার দিকে। হিয়ার গায়ে লাগল।

একটু অবাক হয়ে হিয়া প্রশ্ন করল, "খাওনা তুমি?"

"দিলেই খেতে হবে নাকি।" কোনি শুকনো স্বরে বলল
চকোলেট টুকরোটা কুড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে হিয়া বলল, "বুঝেছি কেন খাবে না।"

"কি বুঝেছ?" স্প্রিংয়ের মতো কোনি ছিটকে উঠে বসল।

"যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি। তুমি কমপ্লেক্সে ভুগছ, অযথা আমার ওপর রেগে আছ।"

হিয়া কথা বলতে বলতে বেলার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রিমের কৌটোটা খুলে আঙুল ডুবিয়ে খানিকটা ক্রীম তুলে গালে লাগল। "বাবা বলছিলেন, রমা যোশি গত বারের মতো ছটা গোল্ড এবার পাবে না যদি তুমি, স্টেট মীটে যেভাবে হানড্রেড ফিনিশ করেছিলে সেইভাবে কাটতে পারো। কিন্তু আমি বলছি তুমি তা পারবে না।"

হিয়া আর একটু ক্রিম তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে থমকে গেল। কোনির কাছে এসে, ওর মুখে সেটুকু লাগিয়ে দিয়েই হেসে উঠল সে এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, "অত হিংসে ভাল নয়।"

কোনিকে বিভ্রান্ত করল হিয়ার এই কথাটা। আপন মনে সে বলল, 'বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে। বড়লোকমি দেখিয়ে চকলেট দেওয়া...কে চায় তোর ভিক্ষে' নিজের জিনিষ অন্যকে দিতে হিয়া কার্পণ্য করে না, পরের জিনিষ নেওয়াতেও কুণ্ঠা নেই। মুখে ক্রিমটুকু অন্যমনস্কের মতো বুলিয়ে নিয়ে কোনি আবার বলল, 'এসব হচ্ছে বড়লোকি চাল্। লোককে দেখানো আপন-পর জ্ঞান আমার নেই, বুঝিনা যেন কিছু!'

ঘরে ঢুকল হরিচরণ।

"অঃ তুই একা রয়েছিস, ওরা গেল কোথায়? কি ঝামেলা দ্যাখতো, তোর নাম চারটে ইভেন্টে পাঠান হয়েছিল, অথচ কোনটাতেই নাম দেখছি না। নিশ্চয় গোলমাল হয়েছে কোথাও। খোঁজ নিয়ে দেখবখন। অমিয়া ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিসতো।"

যেমন বেগে এসেছিল তেমনিভাবেই হরিচরণ বেরিয়ে গেল। আর থ হয়ে রইল কোনি। এতদূরে এসে চ্যাম্পিয়নশিপে সে নামতে পারবে না। আর কিছু সে ভাবতে পারল না। আস্তে আস্তে একটা কান্না তার সারা শরীরটাকে ঝাঁকাতে শুরু করল। ফাঁকা, বিরাট ঘরটা একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল মৃদু চাপা করুণ একটা স্বরে। আর তার মধ্যে একটা শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে—"ক্ষিদ্দা, ক্ষিদ্দা।"

মেয়েরা ফিরল তর্ক করতে করতে। এবারের ওলিম্পিককে মেক্সিকো না মেক্সিকো সিটি ওলিম্পিক কোনটে বলা সঠিক হবে। ওরা লক্ষ্যই করল না কোনিকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকারে সবাই সচকিত হয়ে বেলার দিকে তাকাল। হাতে খোলা ক্রিমের কৌটো, বেলা ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠল, "আমার ক্রিম! আবার কে নিয়েছে এখান থেকে। কে নিয়েছে, আমি আজ বার করবই, বেরিয়ে যাবার সময় যা ছিল, এখন তার থেকে কমে গেছে।"

কে বলল, "ঘরে তো কোনি ছাড়া আর কেউ ছিল না।"

অমিয়া হঠাৎ বলল, "দ্যাখতো কোনির ব্যাগটা, সরিয়ে-ফরিয়ে রেখেছে কিনা।"

বেলা ছুটে গিয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা খুলে উপুড় করল। সামান্য জিনিষ কটা মেঝেয় পড়ল। কোনি বিস্ফারিত চোখে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে। কথা বলার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে, এই ঘটনার আকস্মিকতায়। বেলা পা দিয়ে কোনির কস্ট্যুমটা সরাতেই, "আহ্" বলে সে নিচু হল কস্ট্যুমটা তোলার জন্য। বেলা সেই মুহূর্তে ওর চুলটা মুঠোয় টেনে মুখ উঁচু করে ধরল।

"কি মেখেছিস, অ্যাঁ, কি মাখা রয়েছে তোর মুখে।" আবিষ্কারের উত্তেজনায় বেলার দম বন্ধ হয়ে এল।

মেয়েরা এগিয়ে এল কোনিকে ঘিরে। অমিয়া একটা আঙুল দিয়ে কোনির গাল ঘষে, আঙুলটা নাকের কাছে ধরে বিচারকের মতো গম্ভীর স্বরে রায় দিল, "ক্রিম।"

"আমার ক্রিম।" বেলা চীৎকার করে উঠল।

তারপর ওরা সবাই সদ্য আবিষ্কৃত একটি দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকা নাবিকদের মতো কোনিকে দেখতে লাগল। কোনি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে। মুখের বিস্ময়ভাব কাটেনি তখনো, অসহায় চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে, কিছু বলার জন্য তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু বলতে পারছে না।

"কোনি বোধহয় ফরসা হতে চায়।" একজন মন্তব্য করল।

"বাব্বা, আমি যা ভয়ে ভয়ে ছিলুম, বেলাদি বোধহয় আমাকেই চোর সন্দেহ করছে।"

"আমার পেস্টও তাহলে কে কমিয়েছে এবার বোঝা গেল।"

কোনি এতক্ষণে কথা বলল, "হিয়া ক্রিম বার করে আমার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কখনো ক্রিম মাখি না।"

"কি বললি? হিয়া?" বেলা ঠাশ করে কোনিকে চড় মারল। "হিয়ার নামে অপবাদ দিচ্ছিস? জানিস ও কতো বড়লোক। তোর মতো দশটা মেয়েকে ও ঝি রাখতে পারে। শেষকালে কিনা হিয়াকেই চোর বানাচ্ছিস!"

"সত্যি বলছি বেলাদি। আমায় বিশ্বাস করো। হিয়া এসেছিল, আবার বেরিয়ে গেল ওর বাবার বন্ধুর বাড়িতে। চকলেটের আধখানা আমায় দিল আর তোমার ক্রিমের কৌটো থেকে ক্রিম নিয়ে নিজে মাখল আর আমাকেও মাখিয়ে দিল।"

"গপ্পো লেখ্, কোনি তুই মস্তো লেখক হবি।" বেলার ধীরস্বরে বিদ্রূপ চাবকে উঠল।

"তাহলে তো একটা দ্বিতীয় ভাগ আগে কিনে দিতে হবে।" অমিয়া তার খাটে শুয়ে মিটমিট হেসে বলল।

"আমি সত্যি বলছি।" কোনির স্বর দুমড়ে মুচড়ে গেল কান্নায়। "তোমরা বিশ্বাস করো। হিয়া এলে ওকে জিজ্ঞাসা কোরে দেখো।"

ওরা আর বেশি কথা বলল না। নিজেদের মধ্যে হাসা-হাসি, ফিসফাস করল কিছুক্ষণ। কোনি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে কাঠের মতো বসে। প্রণতি ভাদুড়ি আর ধীরেন ঘোষ ঘরে ঢুকল। ওরা যেভাবে কোনির দিকে তাকাল তাতে বোঝা যায় ব্যাপারটা ওদের কানে ইতিমধ্যে কেউ পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

"হিয়া না আসা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।" প্রণতি ভাদুড়ি ঘরের সবাইকে লক্ষ্য করে বলল। "যাও, খেয়ে রেস্ট নাও।"

"অমিয়া কাল সকালে তোর ফোর আর টু হানড্রেড হীট। যোশি ছাড়া আর কেউ তোর কম্পিটিটার নেই। তা হলেও হীটে টাইম ভাল করতে হবে। বেলা শুনে রাখ্, যোশি পড়েছে তোর গ্রুপে। চেষ্টা করবি, পাঞ্জাবের কাউর বলে একটা মেয়ে শুনলুম ভাল টাইম করে এসেছে।"

ধীরেন ঘোষ প্রত্যেককে নির্দেশ দিতে দিতে শেষকালে কোনির দিকে তাকাল। "তোর নাম যে কেন বাদ গেল বুঝছি না। বলছে তো পাঠানোই নাকি হয়নি। সব বাজে কথা, নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন এইসব বলছে। আমি অবশ্য প্রোটেস্ট করেছি, দেখি কি হয়। তবে প্র্যাকটিসে ঢিলে দিলে চলবে না, ওটা রেগুলার করতেই হবে।... মন খারাপ করিসনি, ন্যাশানাল তো বছর বছরই হয়, সামনের বছর আবার আসবি।"

মেয়েরা খাওয়া সেরে এসে বিছানায় শুয়েছে, এমন সময় হিয়া ফিরল। কোনি না খেয়েই শুয়েছিল, হিয়াকে দেখা মাত্র উঠে বসে চেঁচিয়ে বলল, "এইতো হিয়া এসেছে।"

বেলা হাত ধরে হিয়াকে নিজের বিছানায় বসিয়ে বলল, "আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে। কোনি তোমাকে চোর বলেছে।"

"হোয়াট!" ঝটকা দিয়ে হিয়া উঠে দাঁড়াল দু চোখে আগুন

নিয়ে।

"বোসো বোসো, আগে আমার কথাটা শুনে নাও।" বেলা হাত ধরে টেনে হিয়াকে বসাল আবার।

"আমি জানি আমার প্রতি ও জেলাস। কিন্তু এমন নোংরা অপবাদ দেবে ভাবিনি।"

"আমরাও ভেবেছি নাকি। ক্রিম চুরি করে মুখে মেখে ধরা পড়ে গিয়ে বলেছে তুমি নাকি মাখিয়ে দিয়েছ। এমন বোকার মতো মিথ্যে কথা কেউ বলে!"

হিয়া থতমত হয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগটা মাথা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে যে ধাক্কাটা দিচ্ছে তা সামলে উঠে সে বলল, "ক্রিমতো আমিই ওর মুখে লাগিয়ে দিয়েছি।"

"য়্যা!"

"হ্যাঁ, তোমার কৌটোটা থেকে আমি মাখলাম, কোনির মুখেও লাগিয়ে দিলাম। কি করব বলো, তোমার পারমিশন নেবার সময় তখন ছিল না। কালও মেখেছিলাম।"

হিয়া ব্যাপারটা সেখানেই শেষ করে দিয়ে, পোষাক বদলাতে ব্যস্ত হল। সারা ঘর চুপ। আড়চোখে পরস্পরকে দেখে নিয়ে অনেকেই ঘুমের ভান করল। কোনি একদৃষ্টে হিয়ার দিকে তাকিয়ে। মনে মনে সে বলল, 'তোমার খেয়াল খুশির জন্য আজ আমি চড় খেয়েছি, খারাপ কথা শুনেছি।'

বেলা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেছল। এখন তার রাগটা পড়ল হিয়ার উপর। বিরক্ত স্বরে সে বলল, "পরের জিনিষ না বলে ব্যবহারটা খুব অন্যায়। তোমার নয় অনেক টাকা আছে, আমার ওই একটুখানি ক্রিম থেকে যদি সবাই মাখে......"

"আচ্ছা আচ্ছা, নয় তোমায় একটা কিনে দেব, হয়েছে তো।" হিয়া হেসে অপরাধীর মতো মুখ করে হাত জোড় করল। ঠিক সেই সময়ই কোনি ছুটে এসে ওকে চড় মারল।

হিয়া গালে হাত দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। বিছানায় মুহূর্তে সবাই উঠে বসেছে। কোনি ধীর পায়ে নিজের খাটে ফিরে এসে বসল।

"এটা তোমার পাওনা ছিল। বেলাদিকে জিজ্ঞাসা করো, জানতে পারবে। তোমার জন্যই আমি আজ চড় খেয়েছি চোর বদনাম পেয়েছি।" কোনি একটু থেমে আবার বলল, "তোমাকে আমি একটুও হিংসে করি না। আমি বস্তির মেয়ে, লেখাপড়াও জানিনা, তোমার সঙ্গে পারব কেন। তবে একবার কখনো যদি জলে পাই......" দাঁতে দাঁত চেপে বাকি কথাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ায় কিছু শোনা গেল না।

১৪

চিপকে সমুদ্রতীরে সুইমিং পুল।

কোনি আগে কখনো পুল দেখেনি। যন্ত্রের সাহায্যে অবিরাম পরিশোধিত স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে পুলের তলদেশ দেখা যায়। একটা পিন পড়ে থাকলেও নজরে আসে। কোনি শুনেছে কলকাতায় সাহেবদের ক্লাবে এমন পুল আছে।

তিনদিকে কাজুবাদাম গাছের ডাল দিয়ে তৈরী হয়েছে গ্যালারি, মাথায় নারকেল পাতার ছাউনি। পাশেই ডাইভিং পুল। পুলের জলে প্রথম নেমে কোনি অস্বস্তি বোধ করেছিল। জলের সঙ্গে পরিচয়ের অনুভব পেতে অবশ্য তার বেশি সময় লাগেনি। হাতে স্টপ ওয়াচ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে নেই অথচ সে সাঁতার কাটছে, কোনি গত একবছর আর তা ভাবতে পারে না। কিন্তু মাদ্রাজে সে, অভ্যাস মতো জলে নামার আগে পিঠে পরিচিত একটা হাতের স্পর্শ না পেয়ে মুষড়ে পড়ল। কি ট্রেনিং সে করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। কেউ কিছু বলছে না, দেখিয়েও দিচ্ছে না। হিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত প্রণবেন্দু। হরিচরণের অধিকাংশ নির্দেশ অমিয়ার জন্য। তবু কোনি মোটামুটি জোরে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, কয়েকটা ২৫ মিটার স্প্রিন্ট, আবার ৪০০ মিটার, মিনিট পাঁচেক টার্ন ও স্টার্ট তারপর ২০০ মিটার মেডলি।

স্টার্টিং ব্লকে বসে কস্টুম পরা একটি মেয়ে ওদের ট্রেনিং দেখছিল। কোনি জল থেকে উঠে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি হাসল।

"হোয়াটস ইওর নেম?"

"মাই নেম ইজ কনকচাঁপা পাল।"

"ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল স্টাইল।"

কোনি এবার ফাঁপরে পড়ল। ইংরাজীতে জবাব দেওয়ার দায় এড়াবার জন্য সে শুধু হাসল। মেয়েটি আঙুল তুলে হিয়াকে দেখিয়ে বলল, "ইজ শী এ ফ্রিস্টাইলার?"

"কেয়া বোল্‌তা?"

"উও ফ্রি স্টাইলার হায়?"

"হাম হ্যায়। ও হ্যায় ব্রেস্ট স্ট্রোক্‌কা, মেডলিকা। তোমার স্ট্রোক কেয়া?"

মেয়েটি হেসে বলল, "রমা যোশি।"

কোনি এবার ভাল করে তাকাল। শ্যামলা মাজা রঙ, দোহারা গড়ন। চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতোই দেখতে। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল '৭০' সংখ্যাটা। কোনি দ্রুত ড্রেসিং রুমের দিকে পা চালাল।

বাংলাকে প্রথম গোল্ড এনে দিল হিয়া। পাঁচটির বেশি মেয়ে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতার কাটার জন্য, তাই হিট করার দরকার হয়নি। হিয়া ৩মি ৩২সে সময় নিল।

প্রতিযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারিতে বসেছিল কোনি। দেখল ভিকট্রি স্ট্যান্ডে হিয়া উঠল আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে। ওর গলায় মাদ্রাজের এক মন্ত্রী মেডেল ঝুলিয়ে দিল। ব্যান্ড বাজল। আর তার বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। পুলের ওধারে বসেছে হিয়ার বাবা-মা। ছুটে গেল হিয়া। বাবা জড়িয়ে ধরে চুমু দিল। হিয়াকে কোলে টেনে নিল মা। হিয়া তোয়ালের ক্লোকটা গায়ে দিয়ে এধারে এল।

"দেখি দেখি মেডেলটা।"

হিয়াকে ঘিরে ধরল মেয়েরা।

"কনগ্র্যাটস হিয়া।"

"থ্যাংকয়ু।"

"দারুণ ফিনিশ করেছে। আমি তো ভাবলুম গুজরাট যেরকম নেক অ্যান্ড নেক যাচ্ছে, টারনিংয়ে যদি হিয়া ওকে না মারতে পারে তাহলে বোধহয়——"

"আমার শুধু ওই একবারই তখন ভয় হয়েছিল। টারনিংটা আমার এত খারাপ।"

"মাইশোরের মেয়েটাকে দেখেছিস কেমন যেন আগাগোড়াই মুখ তুলে রইল।"

কোনি তফাতেই বসে রইল। হিয়া বারকয়েক গ্যালারিতে চোখ বোলাবার সময় কোনির মুখের দিকে তাকিয়েছিল মাত্র। মেয়েদের একটিই ফাইনাল ছিল, বাকিগুলি ফ্রি স্টাইলের হিট। অমিয়া ফ্রি স্টাইলের তিনটিতেই ফাইনালে উঠেছে, বেলা ২০০ মিটারে এবং হিয়া ১০০ মিটারে। কথা ছিল হিয়া ২০০ ও ৪০০ মিটারেও নামবে কিন্তু প্রণবেন্দু শেষ মুহূর্তে ওর নাম প্রত্যাহার করিয়ে নেয় এই যুক্তিতে যে, ওর অন্য ইভেন্টগুলো, যাতে ওর গোল্ড পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে, সেগুলোর ক্ষতি হবে।

তর্ক তুলেছিল হরিচরণ, "কি এমন ক্ষতি হবে? দুটো ব্রোঞ্জতো শিওর আসতো, তার মানে বেঙ্গলের দুটো পয়েন্ট। এবার চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বেঙ্গলের খুব ভাল চান্স রয়েছে। প্রণবেন্দু তুমি শুধু হিয়ার কথাই ভাবছ, বেঙ্গলের কথাটা

ভাবছ না।”

শোনা মাত্র প্রণবেন্দু দপ্ করে উঠেছিল। “বেঙ্গলের কথা আমি ভাবিনা, শুধু আপনারাই ভাবেন! তাহলে মেয়েটা ওখানে বসে আছে কেন?” প্রণবেন্দু আঙুলটা গ্যালারিতে বসা কোনির দিকে তুলে বলল, “ও থাকলে বেঙ্গল শিওর চ্যাম্পিয়নশিপ পেত কিন্তু আপনারা ক্ষিতীশ সিঙ্গিকে জব্দ করার জন্য ওকে ভিক্টিমাইজ করলেন। আর এখন এসে বাংলার জন্য কাঁদুনি গাইছেন? এবার আমি দেখব আপনার মেয়েরা কি করে, কতো পয়েন্ট আনে।”

কোনি জানত না তাকে কেন্দ্র করে দুটো দল পাকিয়ে উঠে ঝগড়া শুরু করেছে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইনাল, বিকালে ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইয়ের। অমিয়া আর বেলা পুল থেকে ফিরে এসেই বিছানায়। ধীরেন ঘোষ বিস্কুট আর কমলা লেবু এক হাতে, অন্য হাতে মধু ভর্তি শিশি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

“কাল সকালের জন্য। দুধ দুজনের জন্য দু গ্লাস রেডি করে রেখো প্রণতি। ঠিক আটটায় পুলে পৌঁছনো চাই। এখন একদম রেস্ট, সাতটার মধ্যে খেয়ে নিয়েই ঘুম।”

যথাসাধ্য নির্দেশ দিয়ে ধীরেন ঘোষ ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল।

“তোমাদের একটা কথাই বলব, প্রথম গোল্ড বাংলা আজ এনেছে। শুভ জয়যাত্রায় আমরা বেরিয়েছি, শেষ গোল্ডও আমাদের, আমরা চ্যাম্পিয়ন হবোই। মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বাঙালী তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ফিরবে......ফিরবেই। একটা গোল্ড পেয়েছি, বাকি অন্যটাও আমরা নোব। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না।”

পরদিন দুটি ইভেন্টের দুটিতেই প্রথম হল রমা যোশি। ২০০ মিটারে অমিয়া ব্রোঞ্জ পেল। রুপো নিল মহারাষ্ট্রেরই নতুন মেয়ে সাধনা দেশপাণ্ডে। বেলা পঞ্চম স্থান পেল। চৌংকরের গোল্ড মেডেল থাকলে সেটা পেত হরিচরণ। অমিয়া যথাসাধ্য করেছে কিন্তু গত বছরের থেকে তার সময় ৬ সেকেণ্ড কম হল।

গম্ভীর মুখে অমিয়া জল থেকে উঠে গেল। বেলা ফুঁপিয়ে উঠল কয়েকবার। হিয়া এগিয়ে এসে যোশিকে অভিনন্দন জানাল। এরপর ঘোষণা, ভিকট্রি স্ট্যাণ্ডে গলায় মেডেল পরা, বাজনার বাজনা। কোনি উদাস চোখে সব কিছু দেখল মাত্র।

বিকেলে মেয়েরা দল বেঁধে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেল। কোনি পুলেই রয়ে গেল। বাটার ফ্লাইয়ে রমার ধারে কাছে কেউ আসতে পারল না। বাংলার কোন মেয়ে ফাইনালে নেই। দিল্লি আর গুজরাত বাকি মেডেল দুটি নিল। কোনি নিরুৎসুক চোখে সব কিছু দেখল।

শুক্রবার সকালে সোনা জিতল হিয়া আর রুপো পুষ্পিতা ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে। ব্রোঞ্জ গুজরাটের। চ্যাম্পিয়নশিপের মুখোমুখি বাংলার ১৪ ও মহারাষ্ট্রের ১৬ পয়েন্ট, হিয়া ও রমার দুটি করে সোনা। চাপা একটা উত্তেজনা বাংলার ক্যাম্পে মৃদু কম্পন তুলল। কোনি কোন কথায় যোগ দিল না।

দুপুরে খেতে বসার আগে ধীরেন ঘোষ এসে বলে গেল, “বাংলা আবার উঠবে সাঁতারে নিজের জায়গায়,” ডান হাতের তর্জনী মাথার উপর তুলে গলা কাঁপিয়ে বলল, “উঠছে।”

হিয়ার ট্রানজিস্টরে রক মিউজিক বাজছিল। প্রণতি ভাদুড়ি রেডিওটা বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে ধমক দিল, “শোনো, শোনো। ইনসপিরেশন পাবে তা হলে।”

“নেক অ্যাণ্ড নেক ফাইট, এখন সমান সমান চলেছে কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাবই।”

রমা যোশি বিকেলে অমিয়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ১৫০ মিটারে টার্ন নিয়েই এবং অমিয়া যখন শেষবার টার্ন নিচ্ছে তখন সে ৪০০ মিটার শেষ করল। যেন ১০০ মিটারে প্রতিযোগিতা করছে, এমন বেহিসাবীভাবে অমিয়া শুরু করেছিল। সওয়াশো মিটার পর্যন্ত রমা পিছিয়ে ছিল প্রায় ১০ মিটার। তারপরই অমিয়া মন্থর হতে শুরু করে। রমা তার সমান গতিতে কোন হেরফের না ঘটিয়ে তিনশো মিটারের পর গতি বাড়াল এবং শেষ ৫০ মিটার একা সাঁতরে এল। পাঞ্জাবের মঞ্জিত কাউর ব্রোঞ্জ নিল।

অমিয়া সকলের আগেই ট্যাক্সি করে একা ক্যাম্পে ফিরে আসে। শনিবার সকালে হিয়ার দুটি হিট, মেডলি এবং ব্যাক স্ট্রোকের। সব মেয়ের চোখ এখন হিয়ার দিকে। গম্ভীর হয়ে গেছে সে। ধীরেন ঘোষ আজ আর বক্তৃতা দিল না। মাথা নেড়ে বলল, “অমিয়ার মতো ভেটারেনের কাছ থেকে এমন ব্যাডলি জাজড রেস কেউ আশা করেনি। আমরা চার পয়েন্টে পিছিয়ে পড়লুম।”

“হরিচরণদা যদি অমিয়াদিকে একটু বলেও দিত!” বেলা ক্ষীণস্বরে বলল।

“যাকগে যা হবার হয়েছে। এখন অনেক কিছু হিয়ার উপর নির্ভর করছে। কাল সকালে দুটো হিট, রাতে মেডলির ফাইনাল। তোমরা ওকে কনসেনট্রেট করতে দাও।”

ধীরেন ঘোষ চলে যাবার পর সবাই হিয়ার দিকে তাকাল একমাত্র কোনি ছাড়া।

হিয়া শনিবার সকালের দুটো হিট থেকে অনায়াসেই ফাইনালে উঠল। ব্যাক স্ট্রোকে রমা যোশি নেই। কিন্তু মেডলির দ্বিতীয় হিট থেকে রমা ফাইনালে উঠল হিয়ার সময়কে দুই সেকেণ্ড ম্লান করে। ঘোষণায় রমার সময় শোনা মাত্র হিয়া পুল ছেড়ে চলে গেল বাবা-মার সঙ্গে।

মেয়েরা ফিসফাস কথা বলছে। খাটে উপুড় হয়ে রেডিওয় হিন্দি গান শুনছে হিয়া। গত চারদিন কোনির সঙ্গে কারুর বাক্যালাপই হয়নি। অমিয়া কখনো বিছানায় শুচ্ছে, উঠে এসে জানলায় দাঁড়াচ্ছে, টেবলের এটা ওটা নাড়ছে। প্রণতি ভাদুড়ি তার খাটে শুয়ে কমিকস পড়ছে।

“অমিয়াদি শুয়ে পড়ো।”

অমিয়া বিরক্তমুখে বেলার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। “ভীষণ মাথা ধরেছে। তখন থেকে রেডিওটা জ্বালাচ্ছে। হিয়া ওটা বন্ধ করো।”

হিয়া রেডিও বন্ধ করার উদ্যোগ দেখালনা।

“বলছি, রেডিও বন্ধ করো।”

হিয়া একটু জোর করে দিল রেডিওর শব্দ। অমিয়া চীৎকার করে উঠল, “বন্ধ করবে কি করবে না, আমার ভাল লাগছে না।”

“রেডিও শুনতে আমার ভাল লাগছে।” হিয়া শুকনো গলায় বলল, “আপনি চেঁচাবেন না।”

কি ঔদ্ধত্য! অমিয়া অবাক হয়ে ঘরের সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউই তার দিকে তাকিয়ে নেই, এমনকি বেলাও গভীর মনোযোগে রহস্য কাহিনী পাঠে ব্যস্ত। এতদিন বাংলার মেয়ে সাঁতারু মহলে সে সম্রাজ্ঞীর মতো বিরাজ করেছে। এই মুহূর্তে সে বুঝল তার মাথা থেকে মুকুট তুলে নিয়েছে হিয়া। এবার ওকে মধ্যমণি করেই ওরা ঘুরবে, ওদের প্রশংসা, মনোযোগ এবার থেকে পাবে হিয়া। তার দিন ফুরিয়ে গেছে। বিছানায় এসে বসল অমিয়া। দিন কি সত্যিই ফুরিয়ে গেছে! কাল আছে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ৪×১০০ রিলে। দেখা যাক্ সত্যিই আমি ফুরিয়ে গেছি কি না, অমিয়া ভাবল, কাল আমাকে দেখাতেই হবে।

কিছু পরে প্রণতি ভাদুড়ি উঠে এসে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। হিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় পুলের হাজার হাজার ওয়াটের আলোয় স্টার্টিং
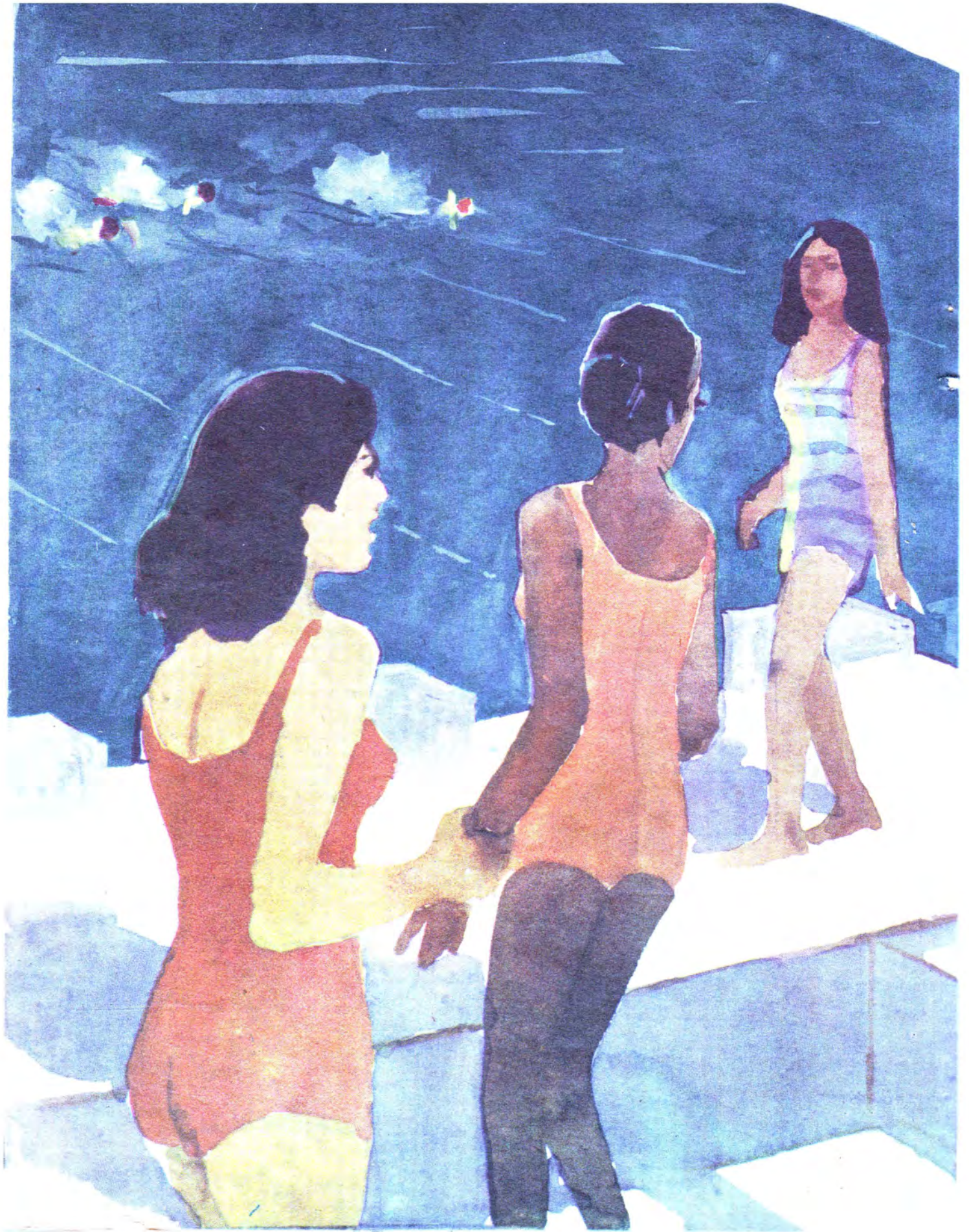
বুকের উপর হিয়ার লাল কস্ট্যুম একটি স্থির শিখার মতো অপেক্ষা করছে। তার পাশে রমা যোশি, তার পাশে গুজরাটের আমি পারেখ। স্টার্টারের বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে জ্বলে উঠল হিয়া।

বাটার ফ্লাইয়ে রমার তুল্য ভারতে কেউ নেই। প্রায় দশ মিটারে সে হিয়াকে পিছনে ফেলে গেল শুশুকের মতো ঢেউ খেলানো গতিতে। বোর্ড ছুঁয়েই ব্যাক স্ট্রোক। হঠাৎ গ্যালারী উদগ্রীব হয়ে উঠল। হিয়া এবার ব্যবধান কমাচ্ছে।

"গো হিয়া, গো"

"কাম অন রমা।"

গ্যালারী তোল পাড় হতে শুরু করল পুলের জলের মতোই। ব্যাক স্ট্রোকের শেষে রমা তখনো প্রায় চার মিটার এগিয়ে। এবার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং হিয়া জানে এইবারই তাকে বড় ব্যবধান তৈরী করতে হবে। এর পরই ফ্রি স্টাইল এবং রমার সঙ্গে এখানে সে পারবে না।

প্রচণ্ডভাবে হিয়ার দুটো হাতের সঙ্গে তাল দিয়ে পা দুটো জলে ধাক্কা দিতে শুরু করল। রমার সঙ্গে পাশাপাশি এসে গেল পুলের মাঝামাঝি এবং এই প্রথম সে রমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। পাশে মুখ ফিরিয়ে হিয়াকে দেখতে দেখতে রমাও জোর বাড়াল।

গ্যালারীতে প্রলাপ চীৎকার শুরু হয়েছে। বাংলার মেয়েরা একসঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে যাচ্ছে 'হিয়া, হিয়া।' শুধু অমিয়া ক্লান্ত ভঙ্গিতে অনুত্তেজিত বসে কোনির পাশে, মুখে পাতলা একটা হাসি নিয়ে। আপন মনেই সে বলল, "হিয়া জিতবে।"

এবং হিয়া জিতল।

ফ্রি স্টাইল শুরু করেছিল হিয়া চার মিটার এগিয়ে থেকে। সেই ব্যবধান থেকে রমা অর্ধেকটা কেড়ে নিল সাঁতার শেষের তিরিশ মিটার বাকি থাকতেই। এবার শুরু হয় দুজনের মধ্যে বাঁচা-মরার লড়াই। ইনচি-ইনচি করে রমা এগিয়ে আসতে থাকে। ফিনিশিং বোর্ডে টাইম কীপাররা ঘড়ি হাতে ঝুঁকে অপেক্ষা করছে। গ্যালারীতে লোকেরা সরে আসছে ফিনিশ দেখার জন্য।

হিয়ার হাত বোর্ড ছোঁয়ার আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই রমার হাত পৌঁছল।

"বলেছিলুম।" অমিয়া আবার আপন মনে বলল।

কে জিতেছে জানার জন্য ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল এবং মেয়েরা যখন হিয়াকে জড়িয়ে নিজেদের চোখের জল তার গালে মাখিয়ে দিচ্ছিল তখন একমাত্র কোনিই দেখতে পেল অমিয়ার চোখের কোণে জল।

বাংলা এখনো দু পয়েন্টে পিছিয়ে। হিয়া ও রমার সোনা তিনটি করে। ধীরেন ঘোষ উত্তেজিত হয়ে রাত্রে খাবার আগে মেয়েদের বলে গেল, "কাল সকালে আর একটা গোল্ড পাচ্ছে হিয়া। বেঙ্গল এগিয়ে যাবে।"

"ধীরেনদা ভুলে যাবেন না, তারপরও দুটো ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট আছে।" অমিয়া ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে আন মনে বলল, "রমা যোশি ইণ্ডিয়া রেকর্ড হোল্ড করছে।"

রবিবার সকালে অমিয়া পুলে গেল না। মেয়েরা চীৎকার করতে করতে যখন ঘরে ঢুকল, সে তখন একমনে চিঠি লিখছিল। মুখ না তুলেই বলল, "হিয়ার তাহলে চারটে গোল্ড হল।"

"অমিয়াদি দারুণ ব্যাপার, অঞ্জু একটুর জন্য ব্রোঞ্জ মিস করল।"

"অমিয়াদি, যোশিকে বিট করতে পারবে না?"

"অমিয়াদি সবাই বলছে এখন তোমার ওপরই চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ভর করছে। বাংলা-মহারাষ্ট্র এখন সমান পয়েন্ট।"

কোনির চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। সে তখন একটা সেফটিপিন দিয়ে সেটাকে ব্যবহার যোগ্য করার চেষ্টায় ব্যস্ত। এইসব উত্তেজনা তাকে স্পর্শ করছে না।

অমিয়া লেখা বন্ধ করে বলল, "চেষ্টা করব।"

জাতীয় সাঁতারের আজ শেষ দিন। সন্ধ্যায় ছ'টি মাত্র অনুষ্ঠান। প্রথমটিই মেয়েদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইনাল। আটজন প্রতিযোগীর মাঝের লেনগুলিতে রমা, অমিয়া, হিয়া। আজ গ্যালারী উপচে পড়ছে। কোনি খালি পায়ে বসে। সেফটিপিনে চটিটাকে চলার যোগ্য করা যায়নি।

অমিয়া বন্দুকের শব্দের আগেই জলে পড়ল। দ্বিতীয়বার ফলস-স্টার্ট নিল মহারাষ্ট্রের সাধনা দেশপাণ্ডে এবং হিয়া। এরপর একসঙ্গেই আটজন জলে পড়ল বন্দুকের শব্দে। তিরিশ মিটারে দেখা গেল দুজন এগিয়েছে বাকিদের থেকে—রমা ও অমিয়া। তারপরই প্রচণ্ডভাবে নিজেকে বিস্ফারিত করে অমিয়া পিছনে ফেলল রমাকে। টার্ন নিয়েই সে রমার থেকে এক মিটার এগিয়ে গেছে। রমার কিছুটা পিছনে হিয়া তার পাশেই সাধনা। হরিচরণ চীৎকার করতে করতে কুঁজো হয়ে পড়েছে।

একটা অস্ফুট কাতরানি শোনা গেল। অমিয়া জলে ভাসছে আর ছটফট করছে পেট চেপে ধরে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত।

"ক্র্যাম্প, ক্র্যাম্প ধরেছে।"

জলে লাফিয়ে পড়ল দুজন। ছুটে গেল বাংলার অফিসিয়ালরা। হরিচরণ কপালে হাত দিয়ে বসল। রমা যোশি তখন ফিনিশিং বোর্ড ছুঁয়েছে। তার পিছনে হিয়া এবং সাধনা।

মহারাষ্ট্র তিন পয়েন্টে এগিয়েছে। শেষ ইভেন্ট ৪×১০০ মিটার রীলেতে সোনা জিতে ১০ পয়েন্ট আনতে না পারলে বাংলার চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। এখন হিয়া ও রমা, দুজনেরই চারটি সোনা। পয়েন্টে দুজনেই সমান হয়ে ব্যক্তিগত যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রীলের পয়েন্ট টিম পাবে কিন্তু ব্যক্তিগত সোনা পাওয়ায় কে এগিয়ে যাবে, সেটাও নির্ভর করছে এই ইভেন্টের উপর।

আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ অনুষ্ঠান মেয়েদের ৪×১০০ রীলে শুরু হবে। ছেলেদের ফাইনাল এইমাত্র শেষ হল।

অমিয়া মেডিক্যাল রুমের টেবলে শুয়ে। ঘরের বাইরে ধীরেন ঘোষ বিষণ্নকণ্ঠে বলল, "এত কাছে এসে ভরাডুবি হল। বাংলা তাহলে চ্যাম্পিয়নশিপটা পেল না। ভাগ্য, ভাগ্য!"

হরিচরণ থমথমে মুখে বলল, "অমিয়া তো নামতে পারবে [illegible] রীলে টিমটা কি হবে? আর ক'মিনিট মাত্র সময় [illegible]য়া, পুষ্পিতা, বেলা......ফোর্থ মেয়ে কে হবে?"

"রিজার্ভে আছে অঞ্জু আর—" ধীরেন ঘোষ থেমে গেল। হরিচরণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে।

প্রণবেন্দু এবং আরো তিন চারজন ব্যস্ত উত্তেজিত হয়ে হাজির হল।

"একি, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে। রীলে টিমের কি হবে, আর যে সময় নেই।" প্রণবেন্দু বলল।

"সেইটেই তো ভাবছি।"

"ভাবাভাবির কিছু নেই, কনকচাঁপা পালকে নামান, অমিয়ার জায়গায়।" একজন রুক্ষস্বরে বলল।

"কিন্তু—"

"কিন্তু ফিন্তু কিছু নেই ধীরেনদা। বেঙ্গলের এখনো একটা আউটসাইড চান্স আছে ওকে নামালে। অঞ্জু একদমই পারবে না।"

"আপনারা বসে বসে ভাবুন তাহলে, আমরাই ব্যবস্থা করছি।"

প্রণবেন্দু প্রায় ছুটেই চলে গেল। ধীরেন ঘোষ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আচমকা ঘুম ভাঙ্গা মানুষের মতো অনুসরণ করল প্রণবেন্দুকে। হরিচরণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কোনি যথারীতি গ্যালারীতে বসে। বাংলার মেয়েরা শুকনো মুখে অনিশ্চিত স্বরে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে। পুরুষদের মেডলি রীলে ফাইনাল এবার শুরু হবে। প্রতিযোগীরা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে আসছে।

"কোনি, কোনি।"

হাত নেড়ে প্রণবেন্দু এবং আরো কয়েকজন ডাকছে। কোনি বুঝতে পারল না, তাকেই ওরা ডাকল কিনা।

"কোনি, তাড়াতাড়ি, কুইক।"

অবাক হয়ে কোনি তখনো বসে। ধীরেন ঘোষ হাত নাড়ছে তার দিকে।

"কোনি আর সময় নেই, তোমার নামতে হবে রীলেতে। অমিয়াদির জায়গায়।" হিয়া গ্যালারীতে উঠে এসে ওর হাত ধরল।

শিরশির করে উঠল কোনির শরীর।

"আমি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। কস্ট্যুম পরে নাও।"

"না আমি নামব না।" কোনি হাত সরিয়ে নিল।

"বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না।"

"না পারুক, আমি নামব না।"

"তুমি বেঙ্গলকে ভালবাস না?"

"না বাসিনা।" কোনি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। বুকের থেকে উঠে আসা একদলা অভিমান ওর কণ্ঠে আটকে গেল। "ভালবাসতে হয় তুমি বাসো। আমি গরীব, আমাকে দেখতে খারাপ, লেখা পড়া জানি না, কত কথা শুনলুম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। জোচ্চুরি করে আমাকে বসিয়ে রেখে এখন ঠেকায় পড়ে এসেছ আমার কাছে—"

হিয়া ঝুঁকে কোনির দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দাঁত চেপে চাপা স্বরে বলল, "আমি আসিনি। বেঙ্গলের হয়েই তোমাকে ডাকতে এসেছি।"

"না। এসেছ নিজের জন্য। তুমি নিজের জন্য আর একটা গোল্ড চাও, রমা যোশিকে—" কোনি থেমে গেল।

চড় মারার জন্য হিয়ার হাতটা উঠেছে। কোনিও হাত তুলেছে। ছোরার মতো চারটে চোখের প্রচণ্ড সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ল। ধীরস্বরে হিয়া বলল, "কোনি তুমি আনস্পোর্টিং।"

"কি বললে?" ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো কোনি উঠে দাঁড়াল। "আমি কস্ট্যুম আনিনি।"

"আমার একস্ট্রা আছে।"

অ্যামপ্লিফায়ারে ঘোষণা হচ্ছে, এবার শেষ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। মেয়েদের টিম চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারিত হবে এই রীলে সাঁতারেই। একে একে টিমের নাম পড়া হচ্ছে। পুলের প্রধান ফটকে এই সময় একটা হৈ চৈ উঠল। একটা পাগলা মতো লোক তীরের মতো দৌড়ে পুলিস ও ভলান্টিয়ারদের ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাকে তাড়া করেছে দু-তিনজন। প্রতিযোগীরা জলে নেমে শরীর ভিজিয়ে উঠে এসেছে। এখন তোয়ালেতে গা মোছায় ব্যস্ত। হিয়ার হাত থেকে তোয়ালেটা টেনে নিল কোনি।

"অন ইওর মার্ক।" স্টার্টারের গলা শোনা যেতেই সারা পুলে ঝপ্ করে স্তব্ধতা নেমে এল। ব্লকের উপর উঠেছে সাধনা, মঞ্জিত, হিয়া, এবং আরো দুটি মেয়ে। পাঁচটির বেশি টিম হয়নি।

"গেট......সেট......"

নিখুঁতভাবে জলে পড়ল হিয়া ও সাধনা। পুলের গ্যালারীতে মর্মরধ্বনি ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করল যখন হিয়া আগাগোড়া সাধনাকে পিছনে রেখে পুষ্পিতাকে তিন মিটার আগুয়ান থাকার সুবিধা দিল।

কিন্তু পুষ্পিতা এই সুবিধাটা ৫০ মিটারের বেশি ধরে রাখতে পারল না। মহারাষ্ট্রের লিন্ডা ডিসুজা তাকে অবহেলায় দুই লেংথে পিছনে ফেলল। ব্লকের উপর দাঁড়িয়ে উৎকন্ঠিত বেলা দেখল তার পাশের লেনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহারাষ্ট্র।

ব্লকের পিছনে দাঁড়ানো হিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, "বেলাদি অল আউট,...বেলাদি লড়ে যাও।"

বেলা লড়ে গেল। সাধ্যের থেকেও নিজেকে বাড়িয়ে বেলা সাঁতার দিল। যেকোনো দিন, যেকোনো সময় দীপ্তি কারমারকার অন্তত চার লেংথে বেলাকে পিছনে ফেলবে। কিন্তু আজ বেলারই দিন। দীপ্তি দু লেংথের ব্যবধানটা এক ইনচিও বাড়াতে পারল না। বেলা যে এই ফারাকটা বজায় রাখতে পারবে, বাংলার কেউ আশা করেনি।

হিয়া হাতটা চেপে ধরেছে কোনির। একটা মোটর এঞ্জিন স্টার্ট নেবার চেষ্টায় থরথর করে উঠেই আবার থেমে যাচ্ছে এমনভাবে কোনির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একদৃষ্টে সে জলে বেলার দিকে তাকিয়ে। স্টার্টিং ব্লকে ওঠার জন্য সে যখন পা তুলতে যাবে—

"কো ও ও নিইইই।"

পা-টা নেমে এল।

"কোও ও ও নিইইই।"

তিন দিকের গ্যালারি সাঁতার থেকে একবার চোখ ফেরাল। গ্যালারির নীচে পুলের পাশে দু-তিনটি ভলান্টিয়ারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, ময়লা পাঞ্জাবি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পুরু লেন্সের চশমা পরা একটি লোক।

"ফাইট, কোনি ফাইট।"

বক্সিংয়ের ভঙ্গিতে দুটো হাত চালাচ্ছে, "ফাইট, কোওওনিই।"

একটা আট সিলিন্ডার এঞ্জিনে হঠাৎ যেন স্পার্ক প্লাগ থেকে বিস্ফোরণের বার্তা পৌঁছেছে। প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল কোনি। চমকে হাতটা টেনে নিল হিয়া।

"ক্ষিদ্দা!"

হিয়া ঠেলা দিয়ে বলল, "কোনি ওঠো, কুইক্।"

ব্লকে উঠতে উঠতে কোনি বলল, "ক্ষিদ্দা এসেছে।"

রমা যোশি জলে পড়ল। তিন সেকেন্ড পর কোনি।

পুলে যদি জলের বদলে মাটি থাকত তাহলে বলা যেত একটা কালো প্যান্থার শিকার তাড়া করেছে। কোনির শিকার টাইমকীপারদের হাতের ঘড়ি।

তিরিশ মিটার পর থেকেই দর্শকরা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তারা নিশ্বাস ফেল্বার সময়টুকু দিতেও ভুলে গেল। গলায় স্বর নেই। পলক পড়ছে না। গ্যালারির বহু লোক নেমে এসে পুলের ধারে দাঁড়িয়েছে। ভলান্টিয়াররাও।

জলকণায় তৈরী একটা আচ্ছাদনের ঘেরাটোপের মধ্যে কোনি যেন অশরীরী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। টার্নিংয়ের পরই দেখা গেল সে রমা যোশির পাশে। বিপদ এসে গেছে, এটা বুঝতে পেরেছে যোশি। জোর দিল সে। কোনি তবুও পাশে। আরো চল্লিশ মিটার পাশাপাশি রইল ওরা।

এরপরই অবরুদ্ধ উত্তেজনা ফেটে পড়ল পুলের চারধারে। কোনি প্রায় এক হাত এগিয়ে এসেছে। আর দশ মিটার বাকি। রমা বুকে বাতাস ভরে জলের উপর যেন লাফিয়ে উঠল হাতের প্রচন্ড টানে।

চারিদিকে অন্ধকার, কোনি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা তার শরীরকে কামড়ে ধরেছে। সেটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে বারবার নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার থেকে বেরোবার জন্য দাপাদাপি করছে তার শরীর। একটা শেষ চেষ্টা তাকে মরিয়া করে তুলল।

"কো ও ও নি ই ই।"

দীর্ঘ সুরেলা ধ্বনি জলের উপর দিয়ে ভেসে কোনির শরীরে মৃদু মৃদু আঘাত দিল। শিশু যেমন হাত বাড়িয়ে, দীর্ঘ অদর্শনের পর, মাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইভাবে তার হাত সে বাড়াল এবং বোর্ড স্পর্শ করল। রমা যোশির আগেই।

হিয়া আর বেলার হাত ধরে কোনি জল থেকে উঠেই টলে পড়ছিল, ধীরেন ঘোষ জড়িয়ে ধরল। ছুটে আসছে বাংলার মেয়েরা। রমা যোশির ক্লান্ত হাত কোনির পিঠে চাপড় দিয়ে গেল। কোনি চোখ বন্ধ করে হাঁফাচ্ছে। ওকে ঘিরে একটা ভীড় বৃত্ত রচনা করেছে। অভিনন্দন আর আদরে সে ডুবে যাচ্ছে।

এরপর ভিকট্রি স্ট্যান্ডে। একে একে গলায় মেডেল পরা, ব্যান্ড বাজনা। গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে কোনি পুলের-ধার দিয়ে ফিরতে ফিরতে থমকে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ পিটপিট করে তাকিয়ে। মুখে দশ-বারো দিনের দাড়ি। শরীরটা আরো শীর্ণ হয়ে গেছে।

"কোথায় ছিলে?"

"বল্ তো কোথায় ছিলুম!"

কোনির ঠোঁট দুটি থরথর কেঁপে উঠল। জলে ভরে আসছে দুচোখ। মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

"মুখ্যুরা তোর টাইমটা রাখেনি, রাখলে দেখতে পেত...... কি পেত বল্ তো?"

কোনি কথাগুলোকে অগ্রাহ্য করে রেগে উঠল। "কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি? খালি বল্ তো আর বল্ তো!"

"কোথায় ছিলুম জানিস্, ওইখানে।" কুঁজো হয়ে ক্ষিতীশ ডানহাতের তর্জনীটা তুলে পুলের জলের দিকে দেখাল। "ওই জলের নিচে লুকিয়ে ছিলুম আর বলছিলুম—সব পারে, মানুষ সব পারে...ফাইট কোনি ফাইট।"

"মিথ্যুক মিথ্যুক।" কোনি ছুটে এসে ক্ষিতীশের বুকে দুমদুম ঘুঁষি মারতে শুরু করল। "কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু শুনিনি। যন্ত্রণায় তখন আমি মরে যাচ্ছিলুম।"

"ওইটেই তো আমি রে, যন্ত্রণাটাই তো আমি।"

বলতে বলতে ক্ষিতীশ হা হা শব্দে দরাজ গলায় হেসে উঠল। তখন অনেকেই তাদের দিকে তাকাল এবং দেখল পাগলাটে একটা লোকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাচ্ছে, যে মেয়েটি এইমাত্র আশ্চর্য সাঁতার দিল আর তার মাথায় টপটপ জল ঝরে পড়ছে।

YOU.
Manly • Masculine • Mod
Like the trouser you're wearing.
Made from the wild, way-out range of
Dinesh Woollen & 'Terene'/Wool Suitings.
dinesh
Available at our select showrooms
and other leading stores.
everest/817d/SDM

মুড়ি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

গোটের রুজরুজু বিশাল আমলকি গাছ। তার পাশেই পোড়ো ইঁটের পাঁজা। বেশি পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। পাঁজার গর্তে গর্তে বেজির বাড়বাড়ন্ত সংসার। পায়ের শব্দে যেতে-যেতে মুখ তুলে থমকে তাকায়; এক মুহূর্ত। তারপর যেদিকে যাবার একটু দৌড়ে যায়।

দেয়ালের গায়ে কতকালের শ্যাওলা, ফার্ণ। সরু পথ থেকে ডেঙো মেরে ভেতরের গাছগাছালি নজরে পড়ে। যুঁই ফুলের গাছ, পাহাড়ি চাঁপা, কাগজ ফুলের লতা—কতো কী? নাম না জানা হরেক গাছ আর এক-লাইন ঘাস ফুল। ভেতরে ঢুকতেই কাছারি বাড়ি, দুর্গাদালান। দালানে হাঁড়িকাঠ পোঁতা। সিঁদুরে ছয়লাপ। নিত্য পুজো টিমটিমে। ষষ্ঠীর দিন থেকে চারদিন জমজমাট। বলি হয়। জমিদার বাড়ির ফর্সা, পাঞ্জাবি গায়ে ছেলেপুলেরা, বড়োরা কলকাতা থেকে আসে। কেউ কাঁসর বাজায়, কেউ পেটা ঘড়ি। কেউ দোলায় চামর, কেউ ধুনুচির ওপর পাখা দেয়। আশ্চর্য সুগন্ধে ভরে যায় দুর্গামণ্ডপ। অষ্ট-ধাতুর স্থায়ী মাতৃমূর্তি তখন ভীষণ উজ্জ্বল, আয়ত চোখ দুটি থেকে স্নেহ ঝড়ে পড়ে। প্রতিধ্বনি ছোট থেকে বড়ো হয়। গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গাদালান ভরে যায় গ্রামের ছেলেমেয়ের খুশিতে। বলি হয় আখ, চালকুমড়ো আর নিখুঁত কালো পাঁঠা। ভোগ যায় বাড়ি বাড়ি। পাঁঠার নিরামিষ ঝোল অর্থাৎ তাতে পেঁয়াজ

পড়বে না, রসুন পড়বে না। রান্না হবে সরল তরল।

এই পুরনো জমিদারবাড়ি আরো একবার ঘুম থেকে জাগে, তখন বাসন্তী পুজো। কিন্তু সে জাগায় বিস্ময় ছোটো। সে জাগার কথা আজ আর সুদর্শনের তেমন করে মনে নেই। সুদর্শনের কথা উঠলে, তার মনে পড়লো—সুদর্শন পোকার কথা। প্রায় মাদি ডেয়ো পিঁপড়ের মতন চেহারা। একটু মোটা, একটু বা শাদা ফোঁটায় ভর্তি পিঠ। প্রকৃতি অলস। ওড়ে না, হাঁটে। গাঁয়ের মেয়েরা জানে—ঐ পোকা দেখা মানেই—হয় স্বামী শহর বিদেশ থেকে ফিরবে, নয়তো আসবে মনি অরডারের টাকা। ফলে, এর নাম টাকা-পোকাও। মাঝখানে টাকা-পোকা রেখে আঙুল দিয়ে মাটির ওপর তিন তিনটে গণ্ডি কাটা আর প্রণাম করা। অন্তরে যে কথা আসছে, তাও মনে মনে শুনিয়ে দেওয়া চাই।

তারপর চলে পিওনের জন্যে প্রতীক্ষা। গাঁয়ে পিওন ঢুকলেই, বাচ্চাদের দৌড় করানো।

দ্যাখ তো আমাদের কিছু এয়েচে কিনা?

সুদর্শনরা খুব গরিব। শরিকানি বাড়ির এককোণে পড়ে থাকে। ওর বাবা শহরের এক মিষ্টি দোকানের কারিগর। মাসে দুমাসে শহর থেকে এলে, তাঁর সঙ্গে কিছু টাকা আসে, আসে বহু রকমারি মিষ্টি। কোনোটা একটু বেশি পুরনো, ভাঙ্গাচোরা, কিছু খুবই টাটকা। যেটা যখন যেভাবে সরাতে পেরেছেন তিনি, সেইভাবে জমিয়েছেন। টিনের কৌটোয় থাকতো বলে, তাদের অনেকগুলোয় বেশ টিনের গন্ধবাস। সুদর্শন একা আর কতো খাবে? পাড়ায় বিলোতো। পাড়াগাঁয়ে ওসব ধসা-পচা টিনের বাস কেউ গায়ে মাখতো না। গাল ভরে খেতো। অমিরতি, সিমলের কড়া পাক, বোঁদে আরো কতো কী। বোঁদের নানা রঙে সুদর্শন ভারি আহ্লাদ পায়। টুকে টুকে খায়। একটা দুটো করে দানা গালে পোরে আর চোখ বুজে দাঁতে কাটে। রস অবশ্য মরে চিনি! তাতে কী?

আর বাবা আনে টিনের ফুল-তোলা সুটকেশ। কাঁসা, পেতল, ভরনের থালাবাটি। বেদানা, আপেল, মনাক্কা, আলুবখরা। বাবা খুব ভালো। বাবা সুদর্শনকে ভারি ভালো-বাসে। এক ছেলে—দ্বিতীয় পক্ষে। প্রথম পক্ষে কেউ নেই। প্রথম পক্ষও অনেককাল গত। তারপরই সুদর্শনের মা এবং বছর দশেক পরে সুদর্শন। সংসারধর্ম, পাপপুণ্য, ভালো মন্দ—সবই তাকে কেন্দ্র করে। হবেই তো? এ আর বেশি কথা কী? মার সঙ্গে সুদর্শন একাই থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। কমলালেবুর খোসা শুকুতে থাকে জানলায়, পানের সঙ্গে তাই তিনি টুকরো করে খান। বাবার অনেকগুলো পিকদানি আছে। ছোট বড়ো মাঝারি। ওঁর হাঁপানির টানের সময়, তাতে গয়ের ফেলেন। মা পিচ ফেলেন যেখানে-সেখানে। জালের জাল্না মাঝে-মধ্যে বুজে এসেছে। ক্রস-ওয়ার্ডের ছকের মতন। সুদর্শন ক্রস-ওয়ার্ড চেষ্টা করে, পারে না। ওর মাষ্টারমশাই অনেক লাইন মেলান। তাঁর থেকে এটা পেয়েছে সে। উনি বলেছেন, এতে ইংরিজি স্টক অব ওয়ার্ড বাড়বে। সুদর্শন ক্রমে-ধীরে বড়ো হচ্ছে। ইস্কুলে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হয়েছে গত বছর। একটু বেশি বয়েসেই ইস্কুলে গেলো সে। এতদিন অল্পসল্প পড়তো বাড়িতে। আর না দিলে নয়—কেমন বেটো হয়ে যাচ্ছিলো। এই মাঠঘাট বনবাদাড়ে রাত্রিদিন ঘুরছে। এই গুলি খেলছে, এই দাড়িয়াবান্ধা, এই কপাটি, তো ঐ ক্যাম্বিসের বলে লাথ। এভাবে কোনো গরিব ঘরের ছেলের চলে না। চলা উচিতও না। সেজন্যেই ইস্কুল। সেজন্যে ধরা-বাঁধা ছকে ওকে ফেলার চেষ্টা!

ভারি পেটরোগা সুদর্শন, সেই এক টুকরো বয়েস থেকেই। তাই থানকুনির ঝোল আর কাঁচকলা থোড় আর গাঁদালের লম্বা জল। কী বিচ্ছিরি গন্ধ এই গাঁদালের—রাঁধার সময় বাড়ি টেঁকা যায় না। খাবার সময় অবিশ্যি কোনো গন্ধবাস নেই। ঐ যা রক্ষে। নয়তো মরে যেতো সুদর্শন। ইতি-মধ্যেই কালমেঘ, আনারসের কোঁক ছেঁচা খেতে-খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে। বাতাসার ওপর পেঁপের রস। গেঁড়ির ঝোল আর রক্তে সিঙ্গি। এসব খেতে-খেতে জিব এলে গেছে তার। আর কুমারেশ। যতো শিশি খেয়েছে, তা যদি এককাট্টা করা যেতো, তাতে কুমারেশের একটা ছোটখাট টিলা-ঢিবি হয়ে যেতো।

ঠিক দুক্কুরবেলা তালগুঁড়ির ঘাটে বসে পুঁটলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার দিন কাবার। একতাল গোবর ছুঁড়ে চার। কেঁচো আর পিঁপড়ের ডিমের টোপ। কখনো কখনো কুচো চিংড়ির কাটা টোপ। দারুণ মাছ খেতো। পুঁটি, ট্যাংরা, কই-এর কথাই নেই। মাঝে মধ্যে উঠতো ন্যাদোস, বেলে, ল্যাটা। রুই মিরগেলের বাচ্চাও নেহাৎ কম উঠতো না। মীন রাশ কিনা! তাই, মাছের সঙ্গে অদ্ভুত যোগাযোগ ছিলো সুদর্শনের। আর একটা কাজ করতো সে। কলসী মালসা ফুটো করে গলার কাছে বাসুনা বেঁধে-জড়িয়ে, শামুক ছেঁচে তার ভেতরে দিয়ে, জলে বুড়িয়ে দেওয়া। সন্ধে নাগাদ এই কম্ম করে, ভোর হতে-না-হতেই জল থেকে তুলে ফেলা। ভেতরটা খরখরিয়ে ওঠে। গা ছমছম করে তার। কিন্তু, ও জিনিস তো মা তাকে দেবে না। আর দিলেও হালকা ঝোল। ভালো লাগে? ওঁরা খাবেন ঝাল। রগরগে কষা। আর আমার বেলায় ঐ কুচ্ছিত জলের ঢেউ! ঘেন্না করে। আর ধরবে না, কচু। বয়ে গেছে। পরের পেট-পুজোর জন্যে সে খামোকা খেটে মরবে কেন? এক হিসেবে মা-ও তো পর। পেট তো আলাদা, না কি? তোমরাই বলো।

কচু পাতার কোষে ফটিক জল। রোদ্দুর পড়লে সলোমনের মণি। বিষ্টি হয়ে গেলে একধরনের ভাপ বেরোয় মাটি থেকে। বাঁশবনে ডাহুক আর হাঁড়িচাঁচা। সোঁদা গন্ধ নাকে এসে ঝামরে পড়ে। রঙিন চকুরাবকুরা শামুক একেবারে কলা গাছের ডেক-লোয়। শুঁড় বের করছে। পাতার ওপর ওর হাঁটার দাগ—আটার মতন সুতোর ছাপ। জলে ধুয়ে যাচ্ছে। জলের টুপটাপ শব্দে ছাঁচতলা ভরে যাচ্ছে। কাগজের নৌকো তৈরি করে জলে ভাসাচ্ছে সুদর্শন। ছাঁচে জল পড়ে গর্ত-গর্ত। জলের রঙ হুঁকোর জলের মতন। পল পচে পড়ছে তো? উঠোনের কোণে একরাশ স্বর্গফুল ফুটেছে। মানে, ব্যাঙের ছাতা, অর্থাৎ ছত্রাক। ডুমো ডুমো নরম শাদা আর ছাই-রঙা বল্টু গাঁথা রয়েছে যেন। গাঁয়ের দিকে এর নাম কোঁড়ক। খেতে একেবারে মাংসের মতন। ভাজা খেতে পারো, তরকারি করে খেতেও পারো। কিছু চিংড়িমাছে দিলে, কিছু মাংসের সুপে। চমৎকার লাগে। তবে, মা বোধহয় দেবে না। পেটের দোষ বড্ড বেড়েছে এসব খেলে ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে পড়বে—ডাক্তার নাকি এ-ই বলেছে। ছাইয়ের ডাক্তার। খেতে না করেছে, না কচু। ওষুধ তো খাচ্ছি-ই, তাহলে আর অত্যাচার করতে অসুবিধে কী?

কোনো কোনো জায়গায় হঠাৎ সুদর্শনের গা কেমন ছমছম করতে থাকে। একবার না, প্রতিবারই। ফি-বারই মনে হয়, এখানে যেন কিছু

একটা আছে। কী আছে? সঠিক জানা যায় না। তবে আছে। তারই ফলে—ঐ কিছু থাকার কথা। আসলে জায়গাটা নির্জন, ভাঙাচোরা, অন্ধকার। গুয়ের শ্বাসরোধী ভ্যাপ্‌সা গন্ধ থমকে আছে। শব্দ আছে—কীসের শব্দ বোঝা যাচ্ছে না। ঐ রকম জায়গায় পৌঁছুলে সুদর্শন প্রায় চোখ বন্ধ করে একছুটে অঞ্চলটা পার হয়ে যায়। গ্রামের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি ভয়ংকর ভয় দেখানোর জায়গা আছে, যা সুদর্শন একা সামাল দিতে পারে না। তাছাড়া, সে ভয়হীন, ডানপিটে। রাতভিত নেই, শ্মশান-মশান নেই—কুছপরোয়া নেই।

ঠিক ঐরকম—আমলকিতলা দিয়ে এগিয়ে গেলে, বাঁহাতি ইঁটের পাঁজা রেখে বরাবর জলে গেলে জমিদারবাবুদের যে শানপুকুর—তার জল গোটা গ্রাম খায়। তার মাছ সুদর্শন একবার দেখেছিলো—সে মাছ, না মাছের ছায়া! মুণ্ডুটা এ্যাত্তো বড়ো, গায়ে একফোঁটা গত্তি নেই, কাঁকালসার। অমন ভয়ংকর চেহারার মাছ সুদর্শন কখনো দ্যাখেনি। ওর নাম ভূতে-পাওয়া মাছ, শাঁকচুন্নি পেত্নীর নজর আছে ঐ পুকুরের মাছে। ও মাছ মানুষকে ভয় দেখায়।

সুদর্শন ওর মাকে বলেছিলো, মা, শানপুকুরের জল আর এনো না।

কেন রে? সব্বাই খায়! অমন জল!

বলছি এনো না, ব্যস। ও পুকুরে পেত্নীর দিষ্টি আছে।

কী যে সব ছাইপাঁশ বলিস? তোর মাথার ঠিক নেই নাকি?

তাহলে এনো, কিন্তু, আমি ও জল ছোঁব না। তারপর সুদর্শন ওর মাকে ব্যাপারটা খুলে বলে।

হতে পারে রে। ও বাড়িতে তো কম লোক মরেনি। অশান্তি নিয়ে যে অনেকেই মরেছে! তারা মানুষের কাছাকাছি থাকতে চায়। পারলে একটু ভয় দেখায়, একটু অনিষ্ট করে। তুই আর ওদিকে যাস না। কী দরকার?

তুলোবুড়ির বাড়ি সুদর্শনদের বাড়ির কাছে। প্রথমে বাগেদের বাড়ি। তারপর ধম্মঠাকুর। তারপর বিশ্বাস-বাড়ি—ভিটে সমস্তই ব্রহ্মডাঙা হয়ে আছে। অতঃপর তুলোবুড়ির বাড়ি। বুড়ি পৈতে তৈরি করে আর বেচে। তিনকুলে কেউ নেই। বয়েস? বয়েসের গাছপাথর নেই। সরু তারকাটার গায়ে মাটির কেমনধারা নাড়ু বানায়। সেই নাড়ু ভরে গেঁথে তকলি। সেই তকলিতে শাদা কাপাস তুলে বাঁ হাতের দু আঙুলে আলতোভাবে ধরে ডানহাতের দু আঙুলে তকলি বনবন ঘোরায়। ভেজা তুলো থেকে সরু সুতো তকলিতে জড়াতে থাকে। সেখান থেকে পৈতে। এক পয়সায় একটা, খুব সরু দুটো তিন পয়সা।

বাবার জন্যে মা কিনে কিনে রাখে। বামুনপাড়ার সবাই কেনে। সবাই ভালোবাসে তুলোবুড়িকে। মাটির বাড়ি। মাটির দাবা। ঝকঝকে তকতকে করে রাখে বুড়ি। সামনে উঠোনে কাপাসের জঙ্গল। তাতে থোকা থোকা বাসন্তী কাপাস ফুল। কান ফেটে বকের মতো বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। এই-ই বুড়ির মজুত ভাণ্ডার। সেখান থেকেই তার রুজিরোজগার। সব কিছু।

কাগাপাড়ায় গাজিদের বাড়ি। বড়োলোক গাজিদের শুধু সেজ গাজিই দেশে থাকে। তাঁর নাতি আক্কাজ। আক্কাজ পড়ে সুদর্শনের সঙ্গে স্কুলে। প্রথম দিনে আক্কাজ আর সে পাশাপাশি বসেছিলো—গোটা স্কুল জীবনই তারা পাশাপাশি বসে এসেছে। একজন প্রথম, তো অন্য দ্বিতীয়। এতেও বন্ধুত্ব অটুট। একদিন না দেখা হলে চলতো না। টিম তৈরি হলো। সেভেন বুলেটস। তার নন-প্লেয়িং ক্যাপটেন বেশিরভাগ সময় সুদর্শন। আসল ক্যাপটেন আক্কাজ। সেনটার ফরওয়ার্ড খেলে। তাকে রোখা খুব কঠিন। এছাড়া আছে শক্ত সিংহ ব্যাক। তিনজন ফরওয়ারড। দুই হাফ। একজন গোলি, ব্যাক একজন। মোট সাতজনের এই সেভেন বুলেটস, বাস্তবিকই, অজেয় টিম হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। দখ্‌নো এলাকার কোথায় না খেলতে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা টুরনামেন্টে এনট্রি করা হচ্ছে। কোথায় রক্তাখাঁর মাঠ, কোথায় সূর্যিপুরের বড়োদোলের মাঠ, কোথায় জয়নগর, মথুরোপুর, সরষে, রায়দীঘি। সর্বত্র। তাছাড়াও স্কুলের খেলা তো আছেই। স্কুলে আক্কাজ একজন অবশ্য প্লেয়ার। অসুবিধের মধ্যে ওর হাইট। অনেক সময় বলে ঠিক মতন মাথা পায় না। তাতেও ওকে রোখা দায়। যেন তেন প্রকারেণ গোল ও করবেই। ভিজে মাঠে ও আরো মারাত্মক।

সেই আক্কাজ, বলা নেই কওয়া নেই—বিদ্রোহ করে বসলো।

না, তোমার দলে আমার আর খেলা হবে না।

কেন? আকাশ থেকে পড়লো সুদর্শন।

অসুবিধে আছে।

কী অসুবিধে আক্কাজ?

আমাদের একটা আলাদা দল হচ্ছে—সেভেন মুসলিমস। তাতে আমিই ক্যাপটেন।

এখানে তো তুমিই ক্যাপটেন আক্কাজ!

তবুও।

সুদর্শনের সেদিনের মানসিক অবস্থা কহতব্য নয়। বাড়ি ফিরে চুপচাপ দাবায় বসলো বইপত্তর নিয়ে।

কী রে? শরীর খারাপ নাকি?

না।

তাহলে?

কী তাহলে! প্রতিদিনই খেলতে হবে?

আজ না তোদের কোথায় ম্যাচ ছিলো, বলেছিলি?

হ্যাঁ, ক্যানসেল হয়ে গেছে।

মা তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সুদর্শন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঝরঝর করে কেঁদে ফ্যালে। মায়ের কাপড়ের একটা অদ্ভুত মা-মা গন্ধ ওকে শান্তি দেয়।

আমি আর খেলাধুলো করবো না মা। ওটা বড়োলোকদের শখ।

করবি না, করবি না। এখন চুপ কর।

ভোরবেলা হাঁটতে হতো পাক্কা দেড় ক্রোশ। কাগাপাড়া ছাড়িয়ে দুর্গাপুর, দুর্গাপুর ছাড়িয়েও আরো খানিকটা গেলে ঈশেন পণ্ডিতের বাসা। মাথার চুল কোঁকড়ানো, কাকের বাসার মতন আলুথালু। এক ঢাল উঁচু চুল। চোখা নাক, রোগা পাতলা শরীরে কণ্ঠস্বর ভারি তীক্ষ্ন। নস্যি নেন মুহুর্মুহু। কাপড়ের ওপর নিমে পরনে। স্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিত। প্রসপেকটাসে ও'র নামের পাশে লেখাঃ রেড আপটু আই এ। আরেক মাস্টারমশাই-এর নামের পাশে লেখা থাকতোঃ প্লাক্‌ড ফর ম্যাট্রিক। হেড-মাস্টারমশাই-এর এম এ বি টির পর লেখা থাকতোঃ ডিপ ইন স্পোকেন ইংলিশ। পরে জানা গিয়েছিল—ডিপ মানে ডিপ্লোমা।

সেই ঈশেন পণ্ডিতের কাছে প্রাইভেট পড়তে যেতো সুদর্শন। সে যেতো, আক্কাজ যেতো, যেতো শক্ত সিংহ। পণ্ডিতমশাই ওদের কাছ থেকে কী নিতো জানা যায় না, তবে সুদর্শনের কাছ থেকে নিতো মাসে দশ টাকা। তাই যথেষ্ট বেশি। সুদর্শন থাকতোও বেশিক্ষণ। পণ্ডিতমশাই ওকে একটু অন্য চোখে দেখতেন। বলতেন, তোকে জেলায় দাঁড়াতে হবে। পারবি তো?

দেখি স্যার।

দেখি আবার কী? কনফিডেন্‌স্‌ না থাকলে আমার কাছে আসিস না, দূর হয়ে যা।

আপনি কি 40 পেরিয়েছেন?

তাহলে এখন থেকেই—
নিজের পেনশানের ব্যবস্থা নিজে করুন

অবসর নেবার পর অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে আমাদের এই প্রকল্পটি রচনা। ধরুন আগামী সাত বছর পর্যন্ত আপনি যদি প্রতি মাসে ডাকঘরে 100 টাকা করে জমিয়ে যান (পঞ্চম পর্যায়ের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট চেয়ে নেবেন), তাহলে 1981 সালের শুরু থেকে সাত বছর পর্যন্ত, প্রতি মাসে, আপনি 198 টাকা করে ফেরত পাবেন।

1981 সালের পর থেকে সুবিধা আরও বেশি—

এই প্রকল্প পরের সাত বছরের জন্যেও চালু রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে আরও 2 টাকা করে জমা দিন এবং নতুন সার্টিফিকেট কিনুন। 1988 সাল থেকে শুরু করে সাত বছর পর্যন্ত আপনি প্রতি মাসে 396 টাকা করে পাবেন।

গোড়ায় মাসে মাসে যে 100 টাকা করে সঞ্চয় করেছিলেন তা প্রায় চার গুণ বেড়ে যাবে।

এই প্রকল্পের জন্য বয়সের কোন ধরাকাট নেই। এতে নারী-পুরুষ সকলেই যোগ দিতে পারেন। তাছাড়া 100 টাকাই এর সীমা নয়। আপনি মাসে মাসে 200, 300 কি 500 টাকা করেও সঞ্চয় করতে পারেন। এতে আপনার লাভই বেশি।

যা সঞ্চয় করছেন		যা ফেরৎ পাবেন
প্রথম 7-বছর	দ্বিতীয় 7 বছর	তৃতীয় 7-বছর
100 টাকা প্রতি মাসে	2 টাকা প্রতি মাসে	396 টাকা প্রতি মাসে

**আপনার ডাকঘরে
কিংবা
জাতীয় সঞ্চয় কমিশনার, নাগপুর-এ খোঁজ নিন**

davp 74/192

ও'র ছেলে বারিদও থাকতো সময়-সময়ে। স্কুলে বারিদ এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো বলে একটু ডাঁট। ওর বোন রমার কোনো ডাঁট ছিলো না। রমা নিচুতে পড়তো এক ক্লাস, তাই হয়তো ডাঁট-ফাঁট দেখানোর কথা তার না। বরং সবাই চলে গেলে পণ্ডিতমশায়ের কাছে যখন সুদর্শন একা, তখন রমা একবাটি মুড়ি নিয়ে এসে বলতো, মা পাঠালো।

পণ্ডিত বলতেন না কিছু। খাতার ভুল দেখতে ঝুঁকে পড়তেন। সেই ফাঁকে রমা এক টুকরো পেঁয়াজ তুলতো কোঁচড়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে, তারপর চট করে ফেলে দিয়ে বলতো, এ্যাঁ এ্যাঁ......মনে করো এ বি সি একটি ত্রিভুজ—এ্যাঁ এ্যাঁ

রমা ন-হাতি লাল ডুরে পরতো। নাকে নাকছাবি। ছোট্ট এক টুকরো মুখ। মাগুর মাছের মাথার মতন তেলতেলো। একটু ঝগড়ুটে ছিলো মেয়েটা। ঘাড়ের ওপর জ্বলন্ত কালো তিল ছিলো দু দুটো। একদিন সুদর্শন দ্যাখে।

তোমার ঘাড়ে তিল। তুমি ঝগড়া করো নাকি?

তাই বাটি বাটি মুড়ি দিই? কাল দেবো'খন। খেয়ো।

প্রমাদ গনে সুদর্শন। সত্যিই ভীষণ খিদে পায় ওর প্রতিদিন। অতোখানি হাঁটা। তাছাড়া ভোরে তো সেই ফাঁপা মুড়ি খেয়ে আসা। সেই কখন! কাগাপাড়া পর্যন্ত পৌঁছুতেই পেটের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে। একটা ফাঁকা বাতাস বুকের দিকে ঠেলে ওঠে। গিয়েই এক ঘটি জল চায় সুদর্শন।

কাল একটু তেল ছড়িয়ে দিও রমা।

নিশ্চয়ই। কোথায় ছড়াবো?

কেন, মুড়িতে?

মুড়ি তোমায় আর দিচ্চেটা কে?

কেন, মাসিমা?

আচ্ছা, খেয়ো।

সেদিন রমা আর পড়তে এলো না। এলো না আক্কাজ। শক্ত এলো।

কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো সুদর্শনের। কারণটা ঠিক বুঝতে পারলো না। ফাঁকা। অথচ কেনই বা ফাঁকা হবে?

শেষ পর্যন্ত মুড়িও এলো না। এলো না রমা। তেল ছিটিয়ে দেবার কথা মনে পড়ে গেলো ওর। একটা দিন তেল দিতে পারতো। আর দিতে হতো না। মুখ ফুটে বললো, তবু রমা—!

ঈশেন পণ্ডিত বললেন, সুদর্শন, তুমি আসচে হপ্তাটা এসো না। শক্তকে বলতে ভুলে গেলাম। তুমি বলে দিও। আক্কাজকে বলেছি। রমার বিয়ে। খুব ভালো পাত্তর পেয়ে গেলুম হঠাৎ। গৌরীদানের মতন দেখালেও, এই বয়েসেই বিয়ে হওয়া উচিত মেয়েদের। তাছাড়া, জানিস তো ওর মাথায় কিছু নেই। মেলা পড়াশুনো করে করবেটা কি? গ্যাটম্যাট করে চাকরিতে তো আর যাচ্ছে না? কী বলিস?

সুদর্শন আবার একবার ভাবলো, বড্ড গরিব ওরা। একবাটি করে মুড়ি পাচ্ছিলো—তাও কপালে সইলো না।

দরজা দিয়ে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাগানের দেয়ালের কাছে ফিস-ফিসানি, এই শোন্, এই শেষ—একমুঠো মুড়ি নিয়ে যা, পালা। আমার বিয়ে, জানিস তো?

জানি।

কর তোরা বোকার মতন পড়াশুনো। আমি ফ্রী।

তারপরই হি হি করে হাসতে-হাসতে রমা গাছপালার মধ্যে হাওয়া। ওদিন আসিস কিন্তু, নইলে রাগ করবো। আসিস আসিস আসিস—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মজার রাজা

ক্রিকেট এক মহাভারত। তার কথা অমৃত-সমান। সে-কথা কখনো পুরোনো হয় না, বিস্বাদ ঠেকে না। সে সব সময়েই নতুন, সব সময়েই বর্তমান। ক্রিকেট-কথার ইতি নেই। সে এক যুগের বাউন্ডারি পেরিয়ে আরেক যুগের মাঠে দিব্যি ঢুকে পড়ে। সে-কথা কখনো প'চে যায় না, তামাদি হয় না।

হাউ!

এমন ফিটফাট ধোপদস্ত খেলা ক্রিকেট, এমন শালীন-সুন্দর, সম্ভ্রান্ত-কুলীন—তার মধ্যে ঐ জঙ্গুলে রাক্ষুসে আওয়াজটা যেন কেমন বেমানান। এ আওয়াজ দু-একজন তোলে না, কখনো-কখনো মাঠের এগারোজন খেলোয়াড়ই সমস্বরে হুঙ্কার ছাড়ে।

'হাউ' তো নিশ্চিন্ত কোনো জয়ধ্বনি নয়—শুধু একটা জিজ্ঞাসা।

এখন আম্পায়ার কী উত্তর দেয়! আঙুল তোলে, না, ঘাড় দোলায়।

আঙুলে হ্যাঁ, ঘাড়ে না। আঙুল তুললে আউট, চলে যাও—ঘাড় দোলালে নট কিছু, খেলে যাও।

আউট হয়ে যাবার পর আর বিপক্ষীয়দের আক্রোশ নেই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা ঠাট্টা-টিটকিরিও নেই। তুমি আউট হয়েছ তুমি মাথা হেঁট করে ঘরে ফিরে যাও। আমরা তোমার জন্যে দুঃখিত। বলা যায় না আমরাও কেউ-কেউ তোমারই পথের পথিক হতে পারি। ক্রিকেট পরের দুঃখে বা অসাফল্যে সুখী হতে শেখায় না। বরং একটা সেঞ্চুরি করতে পারো তো আমরাও ক্ল্যাপ দি। পরের জয়ে আনন্দিত হবার শিক্ষা ক্রিকেট ছাড়া আর কে দেয়?

শার্টে ট্রাউজার্সে অনেক সাজগোজ সেরে জুৎসই ব্যাট বেছে নিয়ে নামল দুই ব্যাটসম্যান। এক নম্বর দাঁড়াল বোলারের মুখোমুখি। আম্পায়ারের থেকে নিশানার পাঠ বা গার্ডস নিলে, চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল রণক্ষেত্র কী রকম সাজিয়েছে প্রতিপক্ষ—কোন রন্ধ্রে কোন শনি—কোন ফাঁক দিয়ে বা বল গলানো সহজ হবে। তটস্থ হয়ে দাঁড়াল তন্ময় হয়ে। যোগীর যেমন আসন আছে, ব্যাটসম্যানেরও তেমনি ভঙ্গি আছে—দাঁড়াবার ভঙ্গি। নিষ্কম্প, নিশ্চল, নির্নিমেষ।

দৌড় মেপে বল করল বোলার।

সঙ্গে-সঙ্গেই চিৎকার উঠলঃ হাউ!

সঙ্গে-সঙ্গেই আম্পায়ারের আঙুল উঠল শূন্যে।

আর করব না, স্যার। এবার ছেড়ে দিন, স্যার। এবার থেকে খুব সাবধান হব স্যার, আর ধরা পড়ব না। আমার ব্যাটে দু গো

রান আছে, স্যার। বিশ্বাস করুন, গরিবকে আরেকটা চান্স দিন—

কোনো অনুনয়-বিনয় শুনবে না, না কোনো,কাকুতি-মিনতি। না কোনো বাদ-প্রতিবাদ।

আমি বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, স্যার। আমার কী বা বয়েস! কতো আমার আশা কতো সম্ভাবনা! আমাকে এখুনি সংসার থেকে নিয়ে যাবেন? ফিনিশ করে দেবেন? সমস্ত ভবিষ্যৎ মুছে দেবেন এক আঁচড়ে?

অমোঘ নিয়তি করুণা দেখায় না। কান্না শোনেনা। আঙুল তুলেছে কী, অবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করো। বাকবিতণ্ডা বৃথা। যে যায় সে ফেরে না।

কেমন লাগে প্রথম বলেই গোল্লা করে আউট হয়ে গেলে?

ইংলণ্ডের পিটার মে অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়ালের বলে শূন্য করে আউট হয়ে গেল। তার সাজগোজে ত্রুটি ছিল না, না বা ভঙ্গির নৈপুণ্যে, কিন্তু নিয়তিকে কে ঠেকাবে? নিয়তিকে ঠেকাতে পারলে তো বলটাকেই ঠেকানো যেতো। গ্লাভস-এ লেগে বেমক্কা ক্যাচ উঠে গেল—কতো ক্যাচ তো মাটিতে পড়ে যায়, এটা পড়ল না, জমে রইল শত্রুর হাতে।

অবধারিতকে নস্যাৎ করে দিতে পারে ক্রিকেটের মতন এমন আর আছে কে? নইলে গুনে-গুনে ৯৯ রান করে এক রানের জন্যে সেঞ্চুরি করতে পারে না? কচু কাটতে-কাটতে ডাকাত হয় আর এতক্ষণ ধরে এতো মারতে-মারতেও শতমারী হতে পারল না! দেশে-দেশে কতো ব্যাটসম্যান ৯৯ করে আউট হয়ে গেছে। নিরানব্বুই করা মানে এক রান করতে না-পারা। এক রান করতে না-পারার মানেই শূন্য করা। তার মানে ৯৯ যা, শূন্যও তাই।

কেমন লাগে নিরানব্বুইয়ে আউট হয়ে গেলে?

পিটার মে-র আউটে সত্তর হাজার দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ল। মাথা নিচু করে প্যাভিলিয়নে ফিরে চলল মে। গেট দিয়ে ঢোকবার জন্যে যখন সে চোখ চাইল, দেখল কখন সে গেট ছাড়িয়ে কুড়ি গজ দূরে বেড়ার কাছটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। লজ্জাই তাকে টেনে এনেছে এতদূর, হতাশার পথ বুঝি এমনি ছন্নছাড়া। তখন সম্বিত ফিরতেই পিছু হটল মে। তখন আবার আরেক দমক হাসি। আগে ছিল হট্ট-হাস্য, এবার অট্টহাস্য। আগের হাসি ছিল আক্রোশ, এখনকার হাসি উপহাস।

এল-বি আউটে কোনো ব্যাটসম্যানই কি আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় মনে-মনে? কিংবা কখনো-কখনো স্লিপের ক্যাচে? এমনি মামলাতেও যে পক্ষ হারে সে কি হাকিমের বিচারকে ন্যায্য বলে?

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

পিটার মে

কিন্তু উপায় নেই, আম্পায়ারের রায় মেনে নেব এই অলিখিত শর্তেই খেলতে নেমেছি। মুখ ফুটে কিছু না বলতে পারলেও অনেকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। কেউ খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন দেবতাদের কাছে নালিশ জানায়—বিচারটা একবার দ্যাখো। কেউ ব্যাট দিয়ে মাঠ ঠোকে, কেউ বা ফিরে যাবার পদক্ষেপগুলিকে অতিমাত্রায় মন্থর করে, কেউ বা যেতে-যেতে ফিরে-ফিরে তাকায়—যেন ভুল বুঝতে পেরে আম্পায়ার তাকে ফের ব্যাট করতে ডাকবে।

আম্পায়ারের বিচারে বিন্দুতম ভ্রূকুঞ্চনও অশোভন—ইট ইজ নট ক্রিকেট। আম্পায়ার ভুল করতে পারে কিন্তু তুমি ক্রিকেটার, তুমি ভুল কোরো না। অশ্রদ্ধা ক্রিকেট নয়।

অম্লানমুখে শুধু নয় প্রসন্নমুখে আম্পায়ারের আঙুল মেনে পত্রপাঠ নিষ্ক্রান্ত হবার দলের মধ্যে আছে অনেকেই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ওরেল, ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট, নীলহার্ভে, হাটন আর মে। একটা হাহাকারের মতো বোল্ড আউট হয়ে যাওয়া বা প্রকাশ্যে উঁচু বলে কট আউট হয়ে যাওয়ার মধ্যে মানামানির কিছু নেই—সেটা তো প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের বস্তু, কিন্তু যেটা চোখে দেখেও ঠিক ঠাহর হচ্ছে না, যেটা প্রায় সন্দেহের কিনারে, কতকটা বা কুয়াশায় ঢাকা, সেখানে আম্পায়ারের আঙুলকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মধ্যে বাহাদুরি আছে। একটুও গয়ংগচ্ছ ভাব নয়, গড়িমসি নয়, অস্ফুট একটুও হতাশার আভাস দেওয়া নয়, ত্বরিতে বীরের মতো প্রস্থান।

এ শুধু তারাই পারে যারা ক্রিকেটের মহান আদর্শকে শিরোধার্য করতে পেরেছে। তারাই পারে যারা সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে সমান সম্ভ্রান্ত। ক্রিকেট যদি কিছু সত্যি শেখাতে চায় তা হচ্ছে এই সম্ভ্রান্ততা।

জীবনে প্রথম টেস্টে ব্যারিংটনও গোল্লা। টেন্টব্রিজে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা—কেন্ ব্যারিংটন পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান। থার্ড উইকেটে পিটার মে আর ডেনিস কম্পটন খেলছে—কেউ আউট হচ্ছে না—আর প্যাড পরে সেই কখন থেকে বসে আছে কেন্—কখন ডাক পড়ে তার ঠিক কী। কী কষ্ট এই প্যাড পরে বসে থাকা—ডাকের প্রতীক্ষা করা। জুটি ভেঙে যাবার পর পরের ব্যাটসম্যান আস্তে-সুস্থে সাজগোজ সেরে গদাইলস্কর চালে নামবে এটা বরদাস্ত করবার নয়। আউট হবার সঙ্গে-সঙ্গে দু মিনিটের মধ্যে পরের খেলোয়াড়কে নেমে পড়তে হবে, তাই আগে থেকে তার সুসজ্জিত হয়ে বসে থাকা। এও এক শিক্ষা ক্রিকেটের। সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকো, সজাগ হয়ে থাকো—এমন যেন না হয় যে ডাক এসেছিল তুমি পৌঁছুতে পারোনি। চোখ খুলে রাখো কখন আলো আসবে তা কে জানে।

খেলা শেষ হতে আধঘন্টা বাকি, তখন যদি জুটি ভাঙে, নম্বর অনুসারেই যদি যেতে হয়, সেটা ব্যারিংটনের পক্ষে খুব সুখের হবে না। শেষ হয়ে আসা দিনের ম্লান আলোয় খেলার চেয়ে দিনের প্রথম চোখ-চাওয়ার টাটকা আলোয় খেলা শুরু করার অনেক শান্তি, অনেক জেল্লা—বিশেষত জীবনের প্রথম টেস্টে।

এখন জুটি ভাঙলে মে তোমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে না, কেন্। ডাকবে কোনো ঠুকুর-সিংকে, অর্থাৎ এমন একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে যে ঠুক-ঠুক করে বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারবে। সেই সম্ভাবনায় দলের আরো কয়েকজন ব্যাটসম্যান প্যাড পরে সেজে রইল। বলা যায় না কাকে স্টোন-ওয়াল করতে ডাকা হয়।

ঘর করেছে অথচ দুয়ার নেই—তাকেই বলে স্টোন-ওয়াল করা। দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে প্রতিরোধ করা। রান আহরণ করা নয়, সময় হরণ করাই উদ্দেশ্য।

বলতে-বলতেই কম্পটন আউট হয়ে গেল। পিটার মে ক্যাপটেন, সে অন্য কোনো ইঙ্গিত পাঠাল না। সুতরাং নম্বরওয়ারি ব্যারিংটনকেই নামতে হল।

দিনের খেলা শেষ হতে বেশি বাকি নেই, তবু যতটুকু সময় থাক, ব্যাট করতে মাঠে নেমে একটাও রান করবে না, বউনি হবে না, ব্যারিংটনের অসহ্য মনে হল। তবে কেমন সে টেস্ট-খেলোয়াড়!

এডি-ফুলার বল করছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বলটাও ছেড়ে দিল কেন্—চতুর্থ বলে প্রায় অজ্ঞান্তেই খোঁচা দিয়ে বসল। এই রে—মন ডাক দিল, কবর খোঁড়া হয়ে গেল বোধহয়। যা ভয় করেছিল, উইকেট-কিপারের হাতে বল। সঙ্গে-সঙ্গেই হাউ, সঙ্গে সঙ্গেই আম্পায়ারের আঙুল।

গোল্লা মাথায় করে হেটমুণ্ডে ফিরে যাচ্ছে ব্যারিংটন

কিন্তু মনে হচ্ছে প্যাভিলিয়ন বুঝি এক মাইলের পথ। পা ফেলছে ঠিকই কিন্তু পথের শেষ কোথায়?

নিরালায় একা হতে চাইছে কেন্। কিন্তু তারও কি জো আছে? দলের লোকেরা সান্ত্বনা দিতে আসে। সান্ত্বনার স্পর্শেই চোখে জল এসে পড়ে। একে পরাজয়ের লজ্জা, তায় চোখের জলের লজ্জা।

'তাতে কী, হাটনও প্রথম টেস্টে শূন্য করেছিল।'

সেটা কি একটা সান্ত্বনা? অন্যের অকৃতকার্যতায় কি আমার অকর্মণ্যতা খণ্ডে যাবে?

পুরুষকার কী করবে যদি দৈব না প্রসন্ন হয়? আর পুরুষকার যদি না থাকে তবে দৈবই বা প্রসন্ন হয় কী ক'রে?

কর্, পাবি—এই তো কৃপার সার কথা। ক'রে পাওয়াই তো কৃপা।

নিউজিল্যাণ্ডে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শূন্য নিয়ে শুরু করল হাটন। দ্বিতীয় ইনিংসে এক। প্রায় চশমা পেতে-পেতে বেঁচে গেল। দুই ইনিংসে শূন্য করাই চশমা পাওয়া। আরো মজার কথা, প্রথম আবির্ভাবে ইয়র্কশায়রের হয়ে খেলতে নেমে সেই লাড্ডু।

আজ ফকির কাল আমির। আজ ঠনঠন কাল এক-টন। টন মানে সেঞ্চুরি। পরের বছরই হাটন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করলে। শুধু তাই নয়, প্রায় সাড়ে তেরো ঘণ্টা ব্যাট করে ৩৬৪ করে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করে বসল। আজকের নগণ্য কালকের মূর্ধন্য।

কিন্তু আবার এমনি মজা, আজকের ইতিহাস কালকের ফুটনোট। সেই রেকর্ড ভেঙে দিল সোবার্স ৩৬৫ ক'রে।

ফার্স্ট ক্লাশ ক্রিকেটে পর-পর একশোটা ইনিংস খেলে একবারও শূন্য করেনি এমন লোকও আছে পৃথিবীতে। সে হচ্ছে নিউ সাউথ ওয়েলসের মরিস। কিন্তু কী আশ্চর্য, ১০১-তম ইনিংসে মরিস গোল্লা করে বসল। আর, নিয়তির পরিহাস, সেটাই তার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। অতএব ফার্স্ট টেস্টে মরিসও শূন্য।

শূন্য ছাড়া পূণ্য কই? পার্সি ডেভিস প্রথম নেমেছে কাউন্টি ম্যাচে। খুব ফলাও করে ইস্তাহার জারি হয়েছে ঘরের ছেলে দারুণ খেলছে, ব্যাটে সে ভেলকি না দেখায় তো কী বলেছি! এসেক্সের ফার্স্ট বোলার রীড বল করল। প্রথম বলই ডেভিসের বাঁ হাতের আঙুল থেঁতলে দিল। দ্বিতীয় বল লাগল এসে হার্টের নিচে। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডেভিস। অনেক কষ্টে সামলে মুখ তুলে দাঁড়াতেই তৃতীয় বল ডেভিসের বাঁ উরুতে থাবা বসাল। চতুর্থ বল আছড়ে পড়ল ডান হাতের উপর। পঞ্চম বল কোথা দিয়ে কোথায় গেল—আঁধার দেখল ডেভিস। ষষ্ঠ বল ছোবল মারল প্যাডে। হাউ! উঠল হুল্লোড়। আম্পায়ার আঙুল তুলে দিল।

একেই বলে দংশে দংশে আউট হওয়া।

সারে-র বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নেমেছে মিলবার্ণ। ওজন সতেরো স্টোন। এগিয়ে গিয়ে তাগড়া মার মারতে গিয়ে তার প্যান্ট ছিঁড়ে গেল। একবার ওভাল টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার ল্যাংলির প্যান্ট ছিঁড়ে যায়—কীথ মিলার একটি সেফটিপিন দিয়ে বাঁচায় ল্যাংলিকে। কিন্তু মিলবার্ণের লজ্জা হরণ করা একটি সেফটিপিনের সাধ্য নয়, তাই মিলবার্ণকে দু হাতে প্যান্ট চেপে ধরে নিষ্ক্রান্ত হতে হল। ব্যাট ফেলে মাঠ ছেড়ে চলে যাবার দৃশ্য ভারি করুণ। সে তো আউট হবার সামিল।

স্টান ডসন ব্যাট করছে, তার ট্রাউজার্সের হিপ-পকেটে দেশলায়ের বাক্স। বল করছে পেস-বোলার ড্যানি লং। একটা জ্বলন্ত বল এসে পড়ল সেই দেশলায়ের বাক্সের পর। আর যায় কোথা! ডসনের ট্রাউজার্সে আগুন ধরে গেল। হাতের থাবড়ায় আগুন নেভাবার চেষ্টায় ডসন ক্রিজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। পলকে উইকেট-কিপার তাকে স্টাম্প আউট করে দিল।
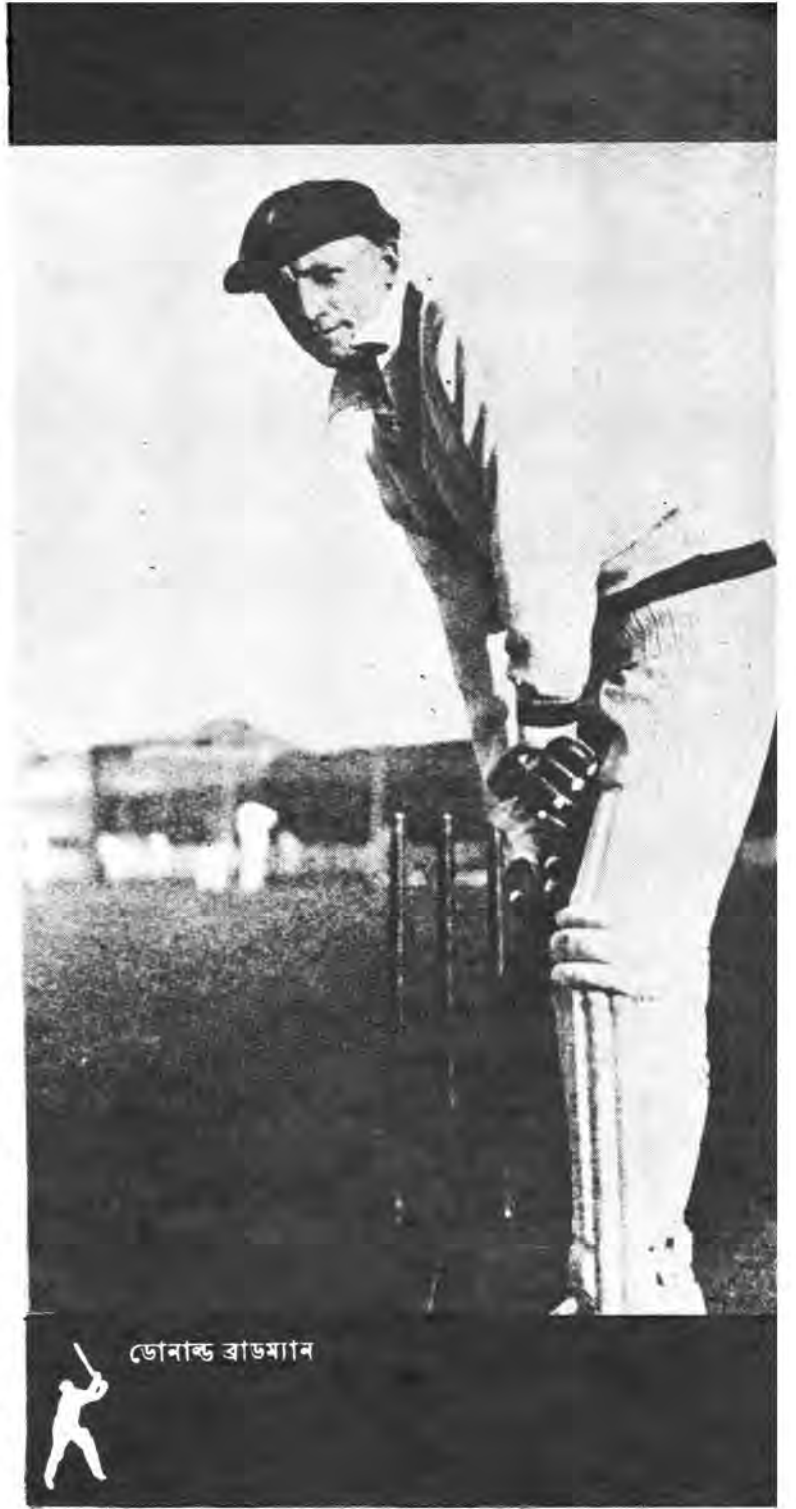
ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

পরে অবশ্য আম্পায়ার ডসনকে 'রিকল' করেছিল, কিন্তু একটা চার-এর বেশি মার আর সে জমাতে পারল না। আগুন একবার নিভে গেলে আর কি জ্বলে?

তেমনি মিলবার্ণকেও ফেরত আনা উচিত। ছেঁড়া প্যান্ট বদ্লে একটা আস্ত-মস্ত নতুন প্যান্ট পরে আসতে আর কতক্ষণ!

খেলা কতক্ষণ স্থগিত থাকলই বা—কী অমন আসে-যায়? একবার কলকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচে প্রকৃতির ডাকে আম্পায়াররা মাঠ-ত্যাগ করেছিল না? আগের রাত্রে ডিনারে ক' প্লেট চিংড়ি উড়িয়েছিল তার ঠিক আছে?

কিন্তু পিটার মে-কে 'রিকল' করা হল না কেন? তার মারে বল স্কাই হয়েছে, সহজ মোলায়েম ক্যাচ—ফিল্ডার নিঃসন্দেহে ধরে ফেলবে। তাই ব্যাটের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে যাত্রা করল মে। কিন্তু, ও গড, ফিল্ডার ক্যাচটা ফেলে দিয়েছে মাটিতে। কিন্তু তক্ষুনি বলটা তুলে নিয়ে সে উইকেটে ছুঁড়ে দিয়েছে। মে তখন ক্রিজে নেই, বেরিয়ে গিয়েছে অনেকটা। বল উইকেটে লাগতেই চেঁচিয়ে উঠেছে ফিল্ডারঃ হাউ।

আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছে। রান-আউট।

মে রান করল কোথায়? সে তো ভুল করে ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছিল প্যাভিলিয়ন।

তুমি যাও কেন? বলটা 'ডেড' হল কিনা তো দেখবে না?

কিন্তু এই ক'দিন আগে কালীচরণের বেলায় কী হল?

চারটি ভারতীয় নামের খেলোয়াড় আছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। এক, রামদীন বা রামাধীন, দুই, কানাই বা কানহাই আর তিন, চরণ সিং আর চার এই কালীচরণ।

বল 'ডেড' হবার আগেই দিনের খেলা শেষ হলো ভেবে কালীচরণ ছুটল প্যাভিলিয়নের দিকে। বল ছুঁড়ে তার প্রান্তের উইকেট ভেঙে দিয়ে আম্পায়ারকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ হাউ? আম্পায়ার সরাসরি আঙুল তুলে দিয়ে জানালঃ রান আউট।

তারপর দর্শকদের সে কী সরোষ আস্ফালন! সিদ্ধান্ত বদলাও—কালীচরণ রান নেবার জন্যে ছোটেনি, খেলা শেষ হয়েছে মনে করে সে ঘরমুখো হয়ে ছুটেছে। সিদ্ধান্ত না বদলাবে তো বোতল ছুঁড়ব বলে রাখছি।

সিদ্ধান্ত বদলাল আম্পায়ার। পরদিন ব্যাট হাতে নামল কালীচরণ।

এ ঘটনায় সুকুমার রায়ের ছড়া মনে পড়ে না?

ওরে ও কালীচরণ
তোমার কি নেই রে মরণ
কোন সাহসে লোক খেপিয়ে
আম্পায়ারের কান মলাও?

প্রথম খেলায় শূন্য অনেকেই করে কিন্তু শেষ খেলায় শূন্য করতে পারে ক' জন? জীবনের শেষ শূন্যও কখনো-কখনো ইতিহাস হয়ে যায়।

সেই ইতিহাস-স্রষ্টাও ব্র্যাডম্যান।

ফার্স্ট ক্লাশ ম্যাচে সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করেছে ব্র্যাডম্যান। তার টেস্টে মোট রান ৬৯৯৬, আর চার রান করতে পারলে তার টেস্ট এভারেজ নিটোল একশোতে গিয়ে দাঁড়ায়। শেষ টেস্ট খেলতে নেমেছে সে ওভ্যালে, ১৯৪৮ সালে। বল করছে কৃতান্ততাকিঙ্কর লারউড নয়, নিরীহ এরিক হোলিস।

কিন্তু এই হোলিসের দ্বিতীয় বলে বোলড হলো ব্র্যাডম্যান। ব্যাট হাঁকড়ে যে নাকি বোলারদের 'খুন' করে, যার হাতে ওটা নাকি ব্যাট নয়, একটা ধারালো কুড়ুল, আর যার থেকে রান হয় না, হয় শত্রুর রক্তপাত, সেই কিনা দ্বিতীয় বলে, একটা নিরীহ গুগলিতেই আউট হয়ে গেল। সে শূন্য কার আশা ভঙ্গ তা কে জানে কিন্তু সে ইতিহাসের সম্পদ হয়ে রইল। অল্প স্বল্প রান বা নিতান্ত একটা সেঞ্চুরি করলেও ব্র্যাডম্যান ব্র্যাডম্যানই থাকত। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে সে অন্তত একবার 'স্যাড ম্যান' হয়ে গেল। তার এই ম্লানতাই তাকে রাখল চিরোজ্জ্বল ক'রে।

যেমন বার্ন্স উজ্জ্বল হয়ে রইল তার ইচ্ছামৃত্যুতে।

সিডনিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলছে অস্ট্রেলিয়া। পঞ্চম উইকেটে ব্র্যাডম্যান আর বার্ন্স চারশো পাঁচ রান তুলে দিল। ২৩৪-এর মাথায় আউট হলো ব্র্যাডম্যান। ঠিক দু মিনিট পর বার্ন্স ইচ্ছে করে আউট হলো যাতে তারও রান-সংখ্যাটা সকলের মনে অক্ষয় হয়ে থাকে, কেননা তখন তারও ব্যক্তিগত রান ২৩৪—বার্ন্স ব্র্যাডম্যানের সমান। অন্য স্কোরে কে আর

লেন হাটন

মনে রাখত বার্ন্সকে?

ব্র্যাডম্যানের ওষুধ যেমন লারউড, হাটনের ওষুধ তেমনি বার্ন্স।

অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে হাটনই সব চেয়ে শক্ত গ্রন্থি। কিছুতেই আউট হয় না। যা বল দাও, মেরে উড়িয়ে দেয় আর মারের লাবণ্য কী! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু চোখ জুড়োলে কী হবে, অন্তরের দগ্ধানি যে যায় না।

কী করে তাকে তাড়াতাড়ি আউট করা যায় ভাবতে বসল ব্র্যাডম্যান—অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন। কী ভাবে বল দিলে কী রকম ভুল করতে পারে, কী রকম খোঁচা মারলে কোথায় বল যেতে পারে, কিছুরই হদিস করতে পারল না। শেষে ডাকল বার্ন্সকে। বললে, তুমি অন-এর দিকে হাটনের ঠিক নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করো। হাটনের অভিনিবেশকে নষ্ট করে দাও।

হাটনের ব্যাট থেকে হ্যান্ডসেকিং দূরত্বে দাঁড়াল বার্ন্স।

অঘটঘটন হলো। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে মোটে কুড়ি আর তেরো করে আউট হলো হাটন। আর, তার ফলে, পরের টেস্টে সে কাটা পড়ল।

ডবলিউ উডফুল

পরের খেলায় হাটন নেই, এল কম্পটন। কম্পটন আরেক ওস্তাদ।

কম্পটন এক কিম্বদন্তী। তার নেট-প্র্যাকটিসের দরকার হয় না। তবু একবার মন করে সে নেটে নামল। একজনের থেকে ব্যাট ধার ক'রে বললে, ভয় নেই, তোমার ব্যাটের ধারগুলিতে কোনো জখম হবে না। দুদ্দাড় ব্যাট চালাল কম্পটন। পরে দেখা গেল ব্যাটের গায়ে একটাই শুধু গোল দাগ। তার মানে যে রকমই বল হোক, কম্পটন ব্যাটের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতেই তাকে আঘাত করেছে। এ যেন এক ধ্যান এক জ্ঞান—এক ছাড়া দুই নেই। আরো কথা—জনতা বুঝে তার রানের ঘনতা। তাই ব্যাঙ্ক-হলিডেতেই কম্পটনের সব চেয়ে বেশি রান, কেননা সেদিনই বেশি ভিড়।

নো-বল পেয়েছে কম্পটন। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ—প্রচন্ড হুক করতে গিয়ে কম্পটন নিজের কপালই ঠুকে দিল। গোটা কয়েক স্টিচ করিয়ে এসে দেখল ইংল্যান্ড-এর তখন পাঁচ উইকেট পড়ে গিয়েছে। আমারও মাথায় পাঁচটা স্টিচ—ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায়ই নামল কম্পটন। আর ফিরল না—১০৫ নট-আউট থেকে গেল।

কম্পটন আর পলার্ড ব্যাট করছে। বার্ন্স শুনল কম্পটন পলার্ডকে বলছে, তুমি ঠেকা দাও আমি হাঁকড়াই। তুমি স্টোন-ওয়াল করো আমি হারিকেন চালাই।

পলার্ড বোলার, হাত-খোলা ব্যাটসম্যান নয়। তবু যথারীতি তার সামনে এসে দাঁড়াল বার্ন্স। অসহ্য লাগল পলার্ডের। সে তো বোলার, ঢাল-তলোয়ার-ছাড়া নিধিরাম সর্দার, তার আবার ঝুঁকি কী, মনের সুখে হাত ঘোরাল পলার্ড। লাগ তো লাগ, একেবারে বার্ন্সের বুকের পাঁজরায়। বার্ন্স ধরাশায়ী। যখন স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছে মাঠ থেকে, বার্ন্সের মনে হলো পাঁজরা তো ঝাঁঝরা হয়েছেই, তার ক্রিকেটই এবার ভরাডুবি।

ডাক্তার বললে, তোমার পাঁজরা বেজায় মোটা, ভাঙেনি একটাও।

পরদিন বার্ন্স আবার নামল মাঠে, ফিল্ড করতে। কিন্তু পা টলছে, পড়ে গেল মাটিতে। ব্যাটিং-এর সময় ব্র্যাডম্যানকে বললে, 'যদি দরকার হয় তবে ব্যাট করব।'

দরকার হলো। শরীরের ঐ অবস্থা, ব্যাট নিয়ে নামল বার্ন্স। আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে একটা রান করল। রান শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল মুখ থুবড়ে।

দশ দিন পরেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। আবার নামল পঞ্চম টেস্টে। ফিল্ডিং করতে গিয়ে আবার সেই ব্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবারের নৈকট্য আরো ভয়ঙ্কর।

১৯৪৮-এ খেলা থেকে অবসর নিয়ে ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট-বোর্ডের সর্বেসর্বা হয়ে বসল। সাউথ অ্যাফ্রিকার সফরে, কে জানে কী কারণে মিলার আর বার্ন্স বাদ পড়ল। জনসাধারণের প্রতিবাদে মিলারকে পরে নেওয়া হলেও বার্ন্স ঠাঁই পেল না। যে এল চ'ষে, সে থাক ব'সে।

পরের বছর রানের ফোয়ারা ছোটাল বার্ন্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসছে অস্ট্রেলিয়ায়, এবার নিশ্চয় নিতে হয় বার্ন্সকে। বার্ন্স 12th man বা দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত হলো।

বার্ন্স তার প্রতিশোধ নিল। বিরতির সময় মাঠে যখন সে ড্রিংকস আনছে, তখন দেখা গেল তার ট্রেতে মেয়েদের আয়না-চিরুনি আর প্রসাধনের সামগ্রী। এতে ক'রে সে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকে ব্যঙ্গ করল। এটা, আর যাই হোক, ক্রিকেট নয়। ক্রিকেটের আরেক নাম এটিকেট। বাংলা কথায় সমীচীন, সুশোভন—ভদ্র, মার্জিত, শিষ্টাচারসম্মত।

আর ঐ ঘটনাতেই বার্ন্সের ক্রিকেটের যবনিকাপাত হলো।

বডি-লাইন বোলিং কি ক্রিকেট? সে তো ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ্য করে বল ছোঁড়া। আজ্ঞে না। ইংল্যান্ড বললে, এ হচ্ছে ফাস্ট লেগ-থিওরি বোলিং। এ হচ্ছে শর্ট পিচে বল দিয়ে ব্যাটসম্যানকে হুক করার সুযোগ দেওয়া। বল হুক করতে গিয়ে ব্যাটসম্যান যদি হুক্‌ড্‌ হয় তা হলে সেটা তার আনাড়িপনা।

অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে এ নিয়ে। ইংল্যান্ড বলে, ক্রিকেট, অস্ট্রেলিয়া বলে, খুন। এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি।

পরে একটা আপোষ হয়েছে। মাঝে-মধ্যে দু-একটা বাম্পার-বিমার বাউন্সার বা বুলডোজার বল দিতে পারো, ক্রমান্বয়ে দিয়ে ব্যাটসম্যানকে বিপন্ন করতে পারো না।

লারউডের বল উডফুলকে পেড়ে ফেলেছে। উডফুল ব্যাট ফেলে যন্ত্রণায় পড়েছে হুমড়ি খেয়ে—ইংল্যান্ডের ক্যাপটেন জার্ডিন অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন ব্র্যাডম্যানকে শুনিয়ে জোরে বললে, ওয়েল বোলড হ্যারল্ড।

এই মন্তব্যটা অ-ক্রিকেট।

কিন্তু এখন টেস্ট-ক্রিকেট তো আর ক্রিকেট নয়, দস্তুরমতো যুদ্ধ। হারবো না, যে করে হোক জিতবো, শুধু এই মনোভাব। তিন-চারশো-ওয়ালা ব্র্যাডম্যান যদি ক্রিকেট হয়, তবে বাম্পার-

ওয়াল লারউডও ক্রিকেট। ব্র্যাডম্যানের জন্যেই তো লারউড। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। যেমন ভানু তেমনি হনু।

বডি-লাইনের বিরুদ্ধে সেদিন অস্ট্রেলিয়ার কতো তম্বি। সেই অস্ট্রেলিয়াই পরে সেই বডি-লাইনই চালু করলে লিন্ডওয়াল আর মিলারের হাতে।

তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রাগ। এ কি ক্রিকেট না, ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়ি? তখন ইংল্যান্ড যা বলেছিল তাই সাফাই গাইল অস্ট্রেলিয়াঃ শর্ট পিচের ফাস্ট বল লাফিয়ে উঠবে তা আর বিচিত্র কী। হুক করো। লেগের দিকে টেনে মেরে বাউন্ডারি পার করে দাও। যদি না পারো তো কার দোষ?

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বললে, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। আমরাও তৈরি করেছি বোমারু বোলার—হল আর ওয়াটসন, গিলক্রিস্ট আর গ্রিফিথ।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্টে ইংল্যান্ডের হাটন আর কম্পটন দুজনেই দারুণ মার খেল। হাটন বুকে মিলারের বলে আর কম্পটন মুখে, লিন্ডওয়ালের বলে। এ হচ্ছে লারউডের বদলা। লারউড অস্ট্রেলিয়ার বানসফোর্ডকে এগারোটা কালশিরে উপহার দিয়েছিল— তার কিঞ্চিৎ এখন ফিরিয়ে নাও।

মার খেয়ে হার মানল ইংল্যান্ড। লারউডের টেস্টের আয়ু মোটে এক বছর, ইংল্যান্ড তখন ট্রুম্যানকে খাড়া করল। নাম হলো 'ফায়ারি' বা আগুনে ট্রুম্যান।

কিন্তু যে যাই বলুক, দুর্ধর্ষতম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গো কতোজনকে যে জখম করেছে তার হিসেব নেই। চরম আঘাত ভারতবর্ষের উপর। বারবাডোসের টেস্টে গ্রিফিথের উচ্চণ্ড মার খেয়ে আমাদের কন্ট্রাকটারের জীবনসংশয়। হাসপাতালে দু-দুটো মেজর অপারেশানের পর সে বাঁচল বটে কিন্তু তার ক্রিকেট বাঁচল না।

হলের বল আবার কাউড্রের হাত ভাঙল। ভাঙল গ্রাউটের চোয়াল। এদিকে গ্রিফিথ মারল ওনিলকে। আর লককে এমন মারলে যে হাত থেকে ছিটকে গিয়ে ব্যাটটা পড়ল ঠিক উইকেটের উপর। মারও খেল, ব্যাটও খোয়াল।

এ কি ক্রিকেট?

কেন নয়? বোলার কি শুধু তোমাকে তোলা-তোলা বল দেবে যাতে তুমি ছক্কার পর ছক্কা মারতে পারো? পিটিয়ে-পিটিয়ে ছাতু করে দেবে তারই জন্যে সে বল করবে? সে তোমাকে ঠকাবে না, ধাঁধায় ফেলবে না, চোখে ফোটাবে না সর্ষে ফুল? বলকে বুলেট করে ছুঁড়বে না তোমার দিকে?

নিশ্চয়ই ছুঁড়বে। সোবার্স বলছে, সমস্ত কিছুরই উত্তর আমার হাতে, আমার ব্যাটে। ব্যাটকে জব্দ করবার জন্যে যেমন বল তেমনি বলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যেই ব্যাট। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আমি জানি কোন্ বল আমি হুক করবো, কোন্‌টা বা পুল করবো, কোন্‌টাতে বা ডাক করবো মাথা নামিয়ে। ভয় করলে চলবে কেন? মার দিতে এসেছি, দু এক ঘা মার খেলে আপত্তি কী। আমি তো নিরস্ত্র নই, আমার হাতে ব্যাট আছে, আমিই তো সমস্ত মাঠের প্রভু, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

বাপ জাহাজের খালাসী, তাও মরেছে জলে ডুবে, বারবাডোসের গরিব পাড়ায় মায়ের সঙ্গে থাকে সোবার্স। খালি পায়ে রাস্তায় ন্যাকড়ার বলে ক্রিকেট খেলে। পুলিশ-মাঠের সামনে সেই রাস্তা—পুলিশ-ইনস্পেকটর তার খেলার ভঙ্গি দেখে আকৃষ্ট হলো। ছেলেটা শুধু ব্যাটই করে না, বলও করে। বলের ভঙ্গিও সাবলীল।

সোবার্সের বয়স তখন মোটে বারো, তাকে বিউগল বাজাবার কাজে পুলিশ-বিভাগে নিযুক্ত করা হলো। সোবার্সের ব্যাটই বিউগল, চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম সে নামল ম্যাচে। পুলিশ বনাম এম্পায়ার—এম্পায়ারের ক্যাপটেন বিখ্যাত খেলোয়াড় এভারটন উইকস। পুলিশ-দলে সাত নম্বর ব্যাটধারী সোবার্স।

দ্বিতীয় নতুন বল সবে নেওয়া হয়েছে, সোবার্স ফাস্ট বোলার উইলিয়ামসের সম্মুখীন হলো। উইকেট-কিপারকে কী ইঙ্গিত করল উইলিয়ামস, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারল না সোবার্স। উইলিয়ামস বাউন্সার ছাড়ল। বল এসে লাগল সোবার্সের চোয়ালে। ঘুরে পড়ে গেল সোবার্স। তাকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখান থেকে হাসপাতাল।

প্রথম বলেই এই অভ্যর্থনা! এটা কি আঘাত না আশীর্বাদ?

দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে সোবার্সের মনে হলো সে আর বালক নেই, রাতারাতি সে প্রকাণ্ড মানুষ হয়ে উঠেছে, আর তার হাতে প্রকাণ্ড ব্যাট, আর সে ব্যাট যেন অনেক বেশি লম্বা, অনেক বেশি চওড়া—সমস্ত বল তার আয়ত্তের মধ্যে। এই দৈত্যাকায় ব্যাট দিয়েই সে বিশ্বজয় করবে।

সোবার্স বিশ্বজয় করেছে। টেস্ট ক্রিকেটে তারই সর্বোচ্চ স্কোর ৩৬৫।

গ্যারি সোবার্স

শুধু তাই? শুধু ব্যাটেই নাকি, বলে সে ওস্তাদ নয়? ফাস্ট মিডিয়ম স্লো—তিন রকম বলেই সে ধুরন্ধর। টেস্ট-ম্যাচে চার হাজারের উপর রান করেছে আর উইকেট নিয়েছে প্রায় একশো।

খালি মাথায় ব্যাট করে সোবার্স, অর্থাৎ তার মাথায় টুপি থাকে না। সে এমনিতেই সোবার, তার মাথা ঠান্ডা রাখবার জন্যে টুপির দরকার নেই। নইলে টুপিতে কী হলো সোলোমনের?

তাগড়া মারে বেনোর বল হাঁকড়াল সোলোমন আর তার মাথার টুপি খসে পড়ল স্টাম্পের উপর। বেলও খসে পড়ল সঙ্গে- সঙ্গে। হাউ? সঙ্গে-সঙ্গে আম্পায়ারের আঙুলও উঠে গেল। সোলোমন আউট—বোলড আউট। আউট করল টুপি কিন্তু উইকেট পেল বেনো। বেনোর কৃতিত্ব কোথায়? হিট-উইকেট হলে না হয় তার বাহাদুরি ছিল, কিন্তু এ তো হ্যাট-উইকেট!

কিন্তু হাটনের টুপি কী করল? সেও খসে পড়ল স্টাম্পের উপর. কিন্তু কী আশ্চর্য, বেল পড়ল না। খেলা হচ্ছে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, বল দিচ্ছে লিন্ডওয়াল। লিন্ডওয়ালের উড়ন-তুবড়ি বল হাটনের টুপিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। টুপিটা শুধু মাথাই বাঁচায়নি, ব্যাটও বাঁচিয়েছে। স্টাম্পে পড়েও বেল খসায়নি। হাটন আনন্দে টুপিটা বুকে চেপে ধরল, মাথায় করে রাখল। আর সেই ম্যাচেই তার সর্বোচ্চ রান তিনশো চৌষট্টি।

ডেনিস কম্পটন

সেই থেকে ঐ টুপি হাটনের পয়া। তার 'চার্ম', তার 'ম্যাস্কট'—তার রক্ষাকবচ।

এমন বৈজ্ঞানিক খেলা, কিন্তু প্রায় সকলেই কপাল মানে, কপাল খন্ডাবার জন্যে একেকটা কুসংস্কার ধ'রে থাকে। হাটনের যেমন টুপি, ম্যাকে-র তেমনি বুট, বেনোর তেমনি শার্ট।

ম্যাকে-র বুট ছিঁড়ে গিয়েছে তবু সে তা বদলাবে না। মুচিকে হাত লাগাতে দেবে না মেরামত করতে। ঐ ছেঁড়া বুটই তার পয়মন্ত। দড়ি দিয়ে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নেবে বুট দুটো, তবু অন্য বুটে পা গলাবে না। বুট বদলেছে কী, সব ভুট হয়ে গিয়েছে।

তেমনি বেনোর আছে একটি ছেঁড়া শার্ট। কিছুতেই সে সেটা গায়ের থেকে খুলবে না, সেটা প'রে খেললেই তার সুফল। ময়লা হয়ে গেলেও সেটা ধোপা-বাড়িতে পাঠায় না, নিজেই সাবান-কাচা করে রাখে। ছিঁড়ে গেলে জায়গাটা স্ত্রী সযত্নে সেলাই করে দেয়।

সেবার মাঠে বৃষ্টি নামতেই সবাই ফিরে গেল প্যাভিলিয়নে। আর-আরদের সঙ্গে বেনোও ভিজল। আর-আররা শার্ট-প্যান্ট বদলালো—বেনো প্যান্ট বদলালেও শার্ট বদলালো না। চেষ্টা করল হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে। যখন ফের মাঠে নামছে, বন্ধুরা বললে, শার্ট দস্তুরমতো ভেজা। তাই সই। বেনো বললে, শার্ট পালটালে ভাগ্যও পালটে যাবে।

কারু পকেটে পয়া কোনো মুদ্রা বা আংটি থাকে, কারু বা মায়ের ফটো, কারু বা অন্য কোনো পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন। হল-এর গলায় থাকে চেন-বাঁধা সোনার একটি ক্রুশ। সে মাঝে-মাঝে ক্রুশটাকে স্পর্শ করে, কখনো-কখনো মুখের কাছে এনে অস্ফুটে কথা কয়, প্রার্থনা করে—এ বলে যেন আউট হয় দেখো।

ইংল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান রেভারেন্ড শেপার্ডকে বল করছে হল। গলায় ঝোলানো ক্রুশকে স্পর্শ করে নিয়ে যথারীতি সে বল ছুঁড়েছে, কিন্তু কী বিপদ, বল ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ক্রুশ ছিটকে পড়েছে তার নিজেরই চোখের উপর। কোথায় ব্যাটসম্যান ঘায়েল হবে, তা নয়, স্বয়ং হলই অন্ধ যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে পড়ল।

শেপার্ড বললে, ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি রেভারেন্ড, তাই ক্রুশ আমাকে খাতির করল। বলল, রেভারেন্ডকে অমনতরো বাম্পার দিও না।

দুর্দান্ত বলের মুখে কেউ সরাসরি হরি-নাম স্মরণ করে। কর্নেল নাইডু তো কালী-কালী বলতো। খোঁজ নাও, প্রত্যেকেই কেমন একটু প্রার্থনাভিমুখী হয়। বুঝতে পারে শুধু কর্মের মধ্যেই ফল নেই—নইলে ৯৯ করে পঙ্কজ রায় আর জয়সীমা আর একটা রান করতে পারল না। আর এভারটন উইকসকে নব্বুইয়ে রান আউট করে দিল আমাদের পি সেন?

লর্ডস মাঠে ১৯৬৩-র দ্বিতীয় টেস্টে শেষ ওভার বল দিচ্ছে হল। চতুর্থ বলে শ্যাকলটন রান আউট হয়ে গেল। এ্যালেনের সঙ্গে শেষ উইকেটে জুটস এসে কাউড্রে। তার ডান হাতে ব্যাট, বাঁ হাতে প্ল্যাস্টার।

ওভারের আর মাত্র দুটি বল বাকি। ছ রান করতে পারলে ইংল্যান্ড জেতে আর এই শেষ উইকেটটা নিয়ে নিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ার জয়-জয়কার।

পঞ্চম বলটা ঠেকাল এ্যালেন, রান হল না। গলায় ঝোলানো

ক্রুশকে গোপনে স্পর্শ করল হল, আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করল মনে-মনে। সব ভালো যার শেষ ভালো। বল করল হল। কী আশ্চর্য, এ্যালেন সোজা ব্যাটে সহজেই বল ঠেকিয়ে দিল। আউট হলো না।

হলের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনলো না? বেচারা ঈশ্বর কী ক'রে শোনে—এদিকে এ্যালেনও যে ডাকছে তাকে, বাঁচাতে বলছে।

চাষী বলছে, ভগবান, বৃষ্টি দাও, মাঠে হাল নামাই। আবার বুড়ি বলছে, ভগবান, রোদ দাও, বড়ি ক'টি শুকিয়ে ফেলি। ভগবান তখন রোদ দেয়, না, বৃষ্টি দেয়!

হল ব্যাটেও বেপরোয়া। 'হিট আউট অর গেট আউট' এই হল তার মূলমন্ত্র। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। মেলবোর্ণ টেস্টে ডেভিডসন হলকে একটা স্লো বল দিয়ে বসল। বলিষ্ঠ ব্যাট হাঁকড়াল হল। নির্ঘাৎ ছয়। মাঠের কোন্ দিক যে বলটা স্কাই হ'ল হল ঠাহর পাচ্ছে না। কিন্তু নব্বুই হাজার দর্শক হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল কেন? হলের চমক ভাঙল—এ কী, সে ছ ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা একটা মহাকায় মানুষ, তার হাতে কিনা হ্যাণ্ডেল-সহ ব্যাটের আদ্ধেকটা ধরা—বাকি ব্যাট গেল কোথা? 'গালি'-তে বাকিটা লুফে নিয়েছে বেনো—আম্পায়ারকে বলছে, হলকে ক্যাচ-আউট করেছি। সবাই হাসছে, আম্পায়ারও হাসছে। ভাগ্যিস বলটা কেউ ধরেনি।

প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছে হল, ব্যাট বদলাতে। নর্ম্যান ওনিল বললে, ভাঙা ব্যাটের নিচের দিকটা কেউ যেন দেখতে না পায়। ওতে আমার ট্রেডমার্ক মারা, ওটা ধরা পড়লে আমার ব্যাট-তৈরির ব্যবসা মারা পড়বে।

১৯৫৮-র বম্বে টেস্টে গোলাম গার্ডের বল মারতে গিয়ে সোবার্সের গোটা ব্যাটটাই উড়ে গেল কিন্তু গোলাম ব্যাট না ধরে বলটাই লুফে নিল দু হাতে। সোবার্স ব্যাট কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে চলল প্যাভিলিয়ন।

ক বছর পর ঐ বম্বেতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে জয়সীমার ব্যাট ফসকাল। ব্যাটটা খাড়া উঠল মাথার উপর। স্ট্যাম্পের উপর না পড়ে, জয়সীমা নিজেই লুফতে চাইল। কিন্তু স্ট্যাম্পের বাইরে উইকেট-কিপার জারমান ব্যাট ধরে ফেলে ক্যাচ-আউটের অ্যাপিল করলে। ব্যাট লুফলে কি ক্যাচ-আউট হয়?

হল শুধু ব্যাটই ভাঙল না, গ্রাউটের চোয়াল ভেঙে দিল।

অস্ট্রেলিয়ায় কুইন্সল্যাণ্ডের হয়ে খেলছে হল, কুইন্সল্যাণ্ডের উইকেট-কিপার গ্রাউট। গ্রাউটের সঙ্গে হলের বেজায় দোস্তি। টেস্টে হ'লই বা না পরস্পরের প্রতিপক্ষ কিন্তু যতক্ষণ তারা এক টিমের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে খেলছে ততক্ষণ তাদের প্রগাঢ় বন্ধুতা হতে দোষ কী। যখন যেমন তখন তেমন।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার আগে একটা ড্রেস-রিহার্সেল খেলা হচ্ছিল। হল বল করছিল গ্রাউটকে। বন্ধু মানুষ, একটু রয়ে-সয়ে বল করু, তা নয়, হলের সব বলেই দুর্দান্ততার হল-মার্ক। একটা বল কী রকম বেকায়দায় লাফিয়ে উঠে গ্রাউটের মুখের উপর থাবা বসাল। ব্যস, ঘুরে পড়ল গ্রাউট, চালান হল হাসপাতাল।

চোয়ালে প্ল্যাস্টার-করা গ্রাউট শুয়ে আছে কেবিনে। হল এসেছে দেখা করতে।

'কি, এনেছ?'

'এনেছি।'

ক্যান-এ ভর্তি করে বিয়ার এনেছে হল। স্ট্র ডুবিয়ে তাই টানল গ্রাউট। আর হল কী করল? হল বসে-বসে গ্রাউটের ফলগুলো খেল—ভাঙা চোয়ালে যা খাওয়া যায় না।

শত্রুতা যায়, বন্ধুতা ফিরে আসে।

ব্যারিংটনের কপালে জুটল কোকোকোলা।

ব্যারিংটন এসেছে ডেক্সটারের দলের হয়ে খেলতে, ভারতের বিরুদ্ধে। বম্বেতে পৌঁছুতেই তার পেটে ব্যথা শুরু হল। কথায় বলে, জল জোলাপ জোচ্চোরি—তিন নিয়ে ডাক্তারি। ডাক্তার ব্যারিংটনকে ডাবের জল খেতে বললে। সামনেই টেস্ট, যেমন করে হোক, চাঙ্গা হতেই হবে। দিনে, অন্য জল নয়, ন-দশটা করে ডাব খেতে লাগল ব্যারিংটন। জোচ্চোরি নয়, রোগ সজুত হল।

বম্বের পর এসেছে কানপুরে। রোগ সারলেও ডাব ছাড়েনি ব্যারিংটন। হোটেলের বয়কে বললে, 'কোকোনাট—কোকোনাট—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

এ আর বোঝেনি বয়? দশ মিনিট পরে সে ফিরল— এক হাতে এক বোতল কোকোকোলা, আরেক হাতে এক ঠোঙা বাদাম।

রাওয়ালপিণ্ডিতে এসেছে পাকিস্থানের সঙ্গে খেলতে। অটোগ্রাফ নেবার জন্যে জনতা খেলোয়াড়দের ছেঁকে ধরেছে। একটি ছেলে খাতা আর কলম বাড়িয়ে ধরল ব্যারিংটনের দিকে। ব্যারিংটন লিখতে গিয়ে দেখল কলমে কালি নেই। কে বললে কালি নেই? কলমটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটি বিরাট এক ঝাঁকুনি দিল। এক থাবড়া কালি ব্যারিংটনের শাদা প্যান্টে-শার্টে ছিটকে পড়ল। এই তো কালি—চকিতে লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল ছেলেটি।

ব্যারিংটন হাসল। বললে, এ আমাকে দেওয়া তোমার অটোগ্রাফ।

লম্বা সফর শেষ করে রাত্রে হোটেলের বিছানায় শুতে গিয়েই দুর্ঘটনা। নিচের দিকে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে ব্যারিংটন। খাটের স্প্রিং ভেঙে গিয়েছে মাঝখানে। রুমমেট পারফিটের কী হাসি! তার খাট নিশ্ছিদ্র, বিছানা নিখুঁত।

মেঝেতে শুলো ব্যারিংটন। ভোরে উঠে হোটেল-স্টাফদের শাসাল—যদি সন্ধের মধ্যে খাট না সারাও তো একটা তুলকালাম করব।

রাত্রে শুতে এসে দেখল খাট সারানো হয়েছে। স্প্রিং-ট্রিং বেকসুর বাদ দিয়ে সমানে তক্তা মেরে দিয়েছে। শুধু ব্যারিং-টনের খাট নয়, পারফিটেরও খাট। কী জানি পারফিটের খাটও যদি উল্টা বোঝে!

দু বন্ধু খুশি হয়ে হাসতে লাগল। তারা ঘুমুবে না নাচবে ভেবে পেল না। তক্তামারা খাটের উপর নাচতেও তাদের আপত্তি নেই কিন্তু ঘুমের দফা রফা।

ঘুমুতে পারে ওরেল। যত্র-তত্র—যখন-তখন—মুহূর্তমধ্যে। প্যাভিলিয়নে ব'সে কখনো সে খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকা পড়ে না বা গল্প করে না। মাঠে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে কোনো ঔৎসুক্য নেই, তার একমাত্র কাজ ঘুম।

এমনও হয়েছে আউট হয়ে গিয়েছে, পরের ব্যাটধারী হয়ে ওরেলের নামবার কথা—কিন্তু ওরেল ঘুমুচ্ছে।

'শিগগির ওঠো ফ্র্যাঙ্ক, ব্যাট করতে হবে।' এমন একটা অবস্থায় ছাড়া ওরেলের ঘুম ভাঙাতে কারুর সাহস নেই।

সেবার জ্যামাইকার সঙ্গে ক্যাভালিয়ার্সের খেলা, ওরেল জ্যামাইকার ক্যাপটেন। শেষ দিনে জ্যামাইকা ব্যাট করছে, লাঞ্চের সময় থেকেই বোঝা গেল এখন যদি ওরেল ডিক্লেয়ার করে দেয় তবে ক্যাভালিয়ার্স ব্যাট করতে নেমে অল-আউট হলেও হয়ে যেতে পারে।

কা কস্য পরিবেদনা। মিনিট ঘন্টায় ডুবতে চলেছে-তবু ডিক্লেয়ার করার উদ্যোগ নেই। টি এসে গেল তবু জ্যামাইকা ব্যাট ছাড়ছে না। সবাই তাজ্জব ব'নে গেল। ব্যাপার কী?

ব্যাপার, ওরেল ঘুমুচ্ছে। কারু সাহস নেই তাকে জাগায়। দুই চোখে ক্ষমার প্রার্থনা নিয়ে ওরেল নিজেই জাগল অবশেষে। তক্ষুনি-তক্ষুনি ডিক্লেয়ার করল, কিন্তু ক্যাভালিয়ার্সদের

হারাতে-হারাতেও হারাতে পারল না।

কিন্তু হানিফ যখন ব্যাট করছে তখন ওরেল ঘুমুক দেখি। তখন মনে হবে হানিফই ঘুমুচ্ছে।

নশো নিরানব্বুই মিনিটে অর্থাৎ ১৬ ঘন্টা ৩৯ মিনিটে হানিফ ৩৩৭ রান করলে। ছ দিনের ম্যাচ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আগে পিটিয়ে ৯ উইকেটে ৫৭৯ করল। উত্তরে পাকিস্থান ১০৬—হানিফ মোটে সতেরো। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৭৩ রান পিছিয়ে থেকে আবার ব্যাটিং শুরু করল পাকিস্থান। হানিফ দাঁড়াল পাহাড় হয়ে। কার সাধ্য তাকে ভেদ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা গড়িয়ে যেতে লাগল—দিনের পর দিন—হানিফ বিনিশ্চল। প্রথম উইকেটে ইমতিয়াজের জুটিতে ১৫২, দ্বিতীয় উইকেটে আলিমুদ্দিনের জুটিতে ১১২, তৃতীয় উইকেটে সৈঈদের জুটিতে ১৫৪ ও চতুর্থ উইকেটে তার বড় ভাই ওয়াজিদের জুটিতে ১২১—পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম ও মন্থরতম ইনিংস। চতুর্থ উইকেটে ৪৭৩ পেরিয়ে ইনিংস পরাজয়ের বিপদ কাটাল আর ৬ উইকেটে মোট ৬৫৭ রানে ব্যাট ছাড়ল হানিফ। হানিফের নিজের রান ৩৩৭—তার মধ্যে চব্বিশটা বাউণ্ডারি।

হানিফ ব্র্যাডম্যানের ৩৩৪-কে ছাড়াল বটে কিন্তু হাটনের ৩৬৪-র থেকে ২৭ রান কম পড়ল। হানিফের ৩৩৭ ষোল ঘন্টা উনচল্লিশ মিনিটে আর হাটনের ৩৬৪ তেরো ঘন্টা কুড়ি মিনিটে। সকলকে টেক্কা দিল সোবার্স। তার ৩৬৫ করতে লেগেছে মোটে দশ ঘন্টা।

কিন্তু দীর্ঘতমতার রেকর্ড হানিফের। এতক্ষণ ধরে একটানা ব্যাট হাতে কেউ টিকতে পারেনি। যেমন নেগেটিভ বোলিং আছে তেমনি আছে ডিফেন্সিভ ব্যাট। শুধু আগ্নেয় বিষুবিয়সই নয়, আছে আবার নিষ্কম্প বিন্ধ্যাচল। ব্যানিস্টার লিখছেঃ রোদে পুড়ে-পুড়ে হানিফের পায়ের চামড়া উঠে গেছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হচ্ছে চোখের উপর আর পাতা নেই। এ বুঝি জাগা চোখে ঘুমুনো, কিংবা ঘুমন্ত চোখে অপলক চেয়ে থাকা।

দর্শকেরা মন্তব্য করছে, এমনি চলবে কল্পান্ত পর্যন্ত। আসুন আমরাও ঘুমুই।

কিন্তু 'হাউ'-এর জ্বালায় ঘুমুনো অসাধ্য। হাউ-এর চিৎকার মাঠ ছেড়ে গ্যালারিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সব ফিল্ডার একত্রে 'হাউ' করাটা ক্রিকেট নয়। আম্পায়ার ফ্র্যাঙ্ক চেস্টারের মতে এল-বি-র অ্যাপিল শুধু বোলার আর উইকেট কিপার করবে। কভারে বা লংফিল্ডে যে দাঁড়িয়ে আছে সে-ও দু হাত তুলে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে উঠবে এটা সমীচীন নয়। সবাই মিলে সমস্বরে চেঁচানোর অর্থই হচ্ছে জোর ফলানো—আমরা এতজন এক সঙ্গে যখন চেঁচাচ্ছি তখন দাবিটা যথার্থ। হাউ-নৃত্যের এই জবরদস্তিটা ক্রিকেট নয়।

তেমনি নেগেটিভ বোলিংও অ-ক্রিকেট। আইন করে বাম্পার বন্ধ করা যায়, নেগেটিভ বল-এর বেলায় কী করবে? কোনো রাক্ষুসেপনা নয়, এমন দূর-দূর দিয়ে বল দেব ব্যাটসম্যান তার নাগাল পাবে না—তখন কী হবে? স্রেফ অভদ্রতা হবে।

ম্যাঞ্চেস্টারে ১৯৫৩-র থার্ড টেস্টের শেষ দিনের খেলার চেহারাটা একবার ভাবো। ইংল্যাণ্ড ১৭৭ রানে এগিয়ে আছে—অস্ট্রেলিয়ার হাতে সময় প্রায় দু ঘন্টা। ইংল্যাণ্ডের বোলার বেডসার আর লক হয়রান হয়ে যাচ্ছে, সুবিধে করতে পারছে না। অস্ট্রেলিয়া বুঝি বাজি মেরে দিল। খেলা শেষ হতে বাকি আর ৪৫ মিনিট, আর রান করতে হবে ৬৬—অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অসাধ্য নয়। এখন উপায় কী? এই টেস্টটাও কি খোয়াবে ইংল্যাণ্ড?

তখন বেইলি ক্যাপটেন হাটনকে বললে, আমাকে একবার বল করতে দিন।

উপায়ান্তর নেই। বেইলি বল করতে লাগল। প্রত্যেকটা বল লেগ-স্টাম্পের বাইরে—এতো বাইরে যে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাট-ধারীরা তার নাগাল পায় না। করো রান করো।

নেগেটিভ বোলিং। আউট করা উদ্দেশ্য নয়, রান করতে না দেওয়া উদ্দেশ্য। আমি না পারি তুমিও যেন না পারো। বেইলির কাণ্ড বেআইনি বলা যায় না কিন্তু এটা অক্রিকেট।

অস্ট্রেলিয়ানরা রেগে কাঁই। আর ত্রিশ রান করতে পারলেই তারা জিতে যেত। কিন্তু বেইলি পশ্চিম-দুয়ারী বল দিয়ে-দিয়ে কম পড়িয়ে দিল। বীরের মতো বল করে আউট করে দিয়ে কই নিজেরা জিতবে, তা নয়, চোরের মতো বল করে ওদেরকে নিরস্ত রেখে কোনোমতে ড্র করে নেওয়া।

এতে কার কী বলবার থাকতে পারে? আম্পায়ারও বা কী করবে?

এ কী ড্র! ড্র যদি দেখতে চাও চলো ১৯৬০-এ ব্রিসবেনের টেস্ট দেখতে।

দিনের শেষ ওভার। হল-এর হাতে বল—ক্রিজে খেলছে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাউট আর বেনো। আট বলে ওভার। যদি আর ছ রান করতে পারে জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া। সময় আর চার মিনিট। অবশ্য সময়ের প্রশ্ন আর ওঠে না—ওভার যখন সময়ের মধ্যে শুরু হয়েছে, শেষ করতেই হবে। অস্ট্রেলিয়ার হাতে এখনো তিন উইকেট।

হল বাম্পার ছাড়বে—এ আর বিচিত্র কী।

প্রথম বল গ্রাউটের পেটে এসে লাগল। পেট ফেটে গেল মনে হচ্ছে, তবু পেট চেপে ধরে একটা রান করল গ্রাউট।

আর পাঁচ রান—সাত বল। বেনো একাগ্রতন্ময় হয়ে একটি বাউন্ডারির ধ্যান করতে লাগল। একটা চার মারতে পারলেই কেল্লা প্রায় ফতে। তারপরে আরো পাঁচটা বল থাকবে। সেই পাঁচ বলে আর দুটি মাত্র রান। ভাগ্য কি এতই কৃপণ হবে?

হল আবার বাম্পার ছাড়ল। ক্যাপটেন ওরেল বলে দিয়েছিল আর যেন বাম্পার না ছাড়া হয়। ক্যাপটেনের আদেশ অগ্রাহ্য করল হল। নইলে উপায় কী। বেনো যে ক্রিকেট বলকে ফুট-বলের মতো বড় দেখছে। বাম্পার ছাড়া ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে কী করে?

বেনো হুক করল। মার জুৎসই হল না, ক্যাচ উঠে গেল। উইকেট কিপার আলেকজান্ডার ধরে ফেলল। বিপক্ষদলের সে কী সলম্ফ উল্লাস। আরো ছ বল পাঁচ রান—হাতে আরো দুই উইকেট।

এল মেকিফ। প্রথম বলটা খেলল—রান নেই। আর পাঁচ বল—নিতেও হবে পাঁচ রান। পরের বলটা 'বাই' হল। এখন বাকি চার বলে চার রান।

গ্রাউট বলের মুখোমুখি হয়েছে। বাম্পার হুক করতে সে ওস্তাদ, হলের তা জানা। কিন্তু হল এবার বাম্পার না দিয়ে লেংথে বল ফেলল। হিসেবে ভুল করল গ্রাউট। কানহাইয়ের মাথার উপরে ক্যাচ উঠল। কানহাই ধরতে যাবে, আপন ব্যস্ত-তায় হল গেল ধরতে। দুজনে সঙ্ঘর্ষ হ'ল বল হ'ল ভূমিসাৎ। হল হাহাকার করে উঠলঃ ভগবান, তুমি কি আছ?'

এই ফাঁকে একটা রান করে নিল গ্রাউট। আর তিন বল—তিন রান। তিন রান হলে অস্ট্রেলিয়া জিতে যায়, কম পড়লে জিতে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

পরের বল মেকিফ মেরে পাঠাল লেগ-এ বাউন্ডারির দিকে। এক রান—দু রান করল—তৃতীয় রান সম্পূর্ণ করার আগে হান্ট বল কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ল স্টাম্পে। আশি গজ দূরে থেকে ছোঁড়া বল গ্রাউটকে আউট করে দিল।

স্কোর এখন সমান-সমান।

এখনো দু বল বাকি। শেষ ব্যাটসম্যান ক্লাইন এসেছে। কোনোরকমে একটা রান করতে পারলেই অস্ট্রেলিয়া জিতে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেতার আশা আর নেই। এখন ড্র করতে পারলে রক্ষে।

'দেখো যেন নো-বল করে ফেলো না।' ওরেল হলকে সতর্ক করে দিলঃ 'নো-বল করলে দেশে আর ফিরতে পাবে না।'

তবে হল কি নেগেটিভ বল দেবে? কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানরা এখন মরীয়া, নেগেটিভকেই পজিটিভ করে ছাড়বে। বুকের ক্রুশকে গোপনে স্পর্শ করল হল। কী হ'ল, বল পেয়েই স্কোয়ার লেগ-এ পাঠাল ক্লাইন। শেষ রানটা নিতে ছুটল সে প্রাণপণে। বুঝি জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সলোমন পলকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটা ধরে ফেলেই স্টাম্প তাক করে ছুড়লো। অমনি লাগ ভেলকি লাগ—অপর প্রান্তে মেকিফের পেঁছুবার আগেই স্টাম্প চৌফাঁক। রান আউট মেকিফ।

উচ্ছিন্ন স্টাম্পের দিকে তাকিয়ে মেকিফ কালো মুখে বললে, 'এ রকমও হয় নাকি?'

সত্যি এ রকমও হয় নাকি? দু পক্ষেরই সমান স্কোর—৭৩৭—শুধু ড্র নয়, টাই। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। বাঁ থেকে ডাইনেও যা, ডাইনে থেকে বাঁয়েও তাই।

খেলার শেষে সেই শেষ খেলার বলটা কী হল? রামাধীন পেয়েছিল, কিন্তু মাঠ থেকে বেরুবার সময় ভিড়ের চাপে হাত ফসকে পড়ে গেল মাটিতে। কে যে পেল কোথায় গেল তা কে বলবে।

দু বছর পরে হদিস পাওয়া গেল। এক 'পি-নাট' চাষী সেটা কব্জা করেছে। সেলাইয়ের দিকে ফাটা ছেঁড়া বলটা হল পারল ঠিক সনাক্ত করতে। এ বল আমি ছাড়ছি না—বললে সেই চাষী। এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার পঞ্চাশ পাউন্ড দিয়ে কিনতে চেয়েছিল—দিইনি। আমি জানি এ বলের অনেক বেশি দাম। কি বলেন, তাই না?

হল সমর্থন করলঃ অনেক বেশি দাম।

কী মজা! চাষী উদ্বেল কণ্ঠে বললে, এ আমার এক বিত্ত হয়ে রইল।

শুধু বলের মজা নয়, আছে আবার স্কোরবোর্ডের মজা। লিডসে ১৯৫২ সালের টেস্টে ভারতের সেই স্কোরবোর্ডটা দেখ একবার মানসনেত্রে। চার উইকেটে শূন্য। পঙ্কজ রায়, ডাটু গায়কোয়াড়, মাধব মন্ত্রী আর মাঞ্জরেকার প্রত্যেকে শূন্য। চার নম্বর ব্যাটসম্যান শূন্য, তিন নম্বর ব্যাটসম্যান শূন্য। লাস্ট প্লেয়ার শূন্য, লাস্ট উইকেট শূন্য। টোটাল শূন্য।

ক্রিকেটের সর্বত্র মজা—রানে মজা, রান-আউটে মজা, ক্যাচ ধরতে মজা ফেলতে মজা, টেস্টে প্রথম নেমে গোল্লা করায় মজা, সেঞ্চুরি করায় মজা, শুধু আম্পায়ারকে নিগ্রহ করাই বিসদৃশ।

শুধু খেলোয়াড়দের মুখের কটু কাটব্য নয়, নয় বা পত্র-পত্রিকায় সমালোচকদের গালাগাল—কখনো-কখনো আম্পায়ারের উদ্দেশে থান ইঁট ছোঁড়া, বোতল ছোঁড়া, সশরীরে ধাওয়া করা। আম্পয়ার মেজিস কেন ম্যাকওয়াটাকে রান-আউট দিল কেন? মারো মেজিসকে। স্যাং-হিউ কেন গ্রিফিথকে নো-বল করল? ধরো স্যাং-হিউকে। আর পাকিস্থানের ইদ্রিস বেগ কেন এম-সি-সির ব্যাটসম্যানদের খুশি মতো আউট দিচ্ছে, ইদ্রিস বেগের মাথায় জল ঢালো।

হাউ! এখন আম্পায়াররাই অ্যাপিল করছে চেঁচিয়েঃ এটা কী?

এ কি ক্রিকেট?
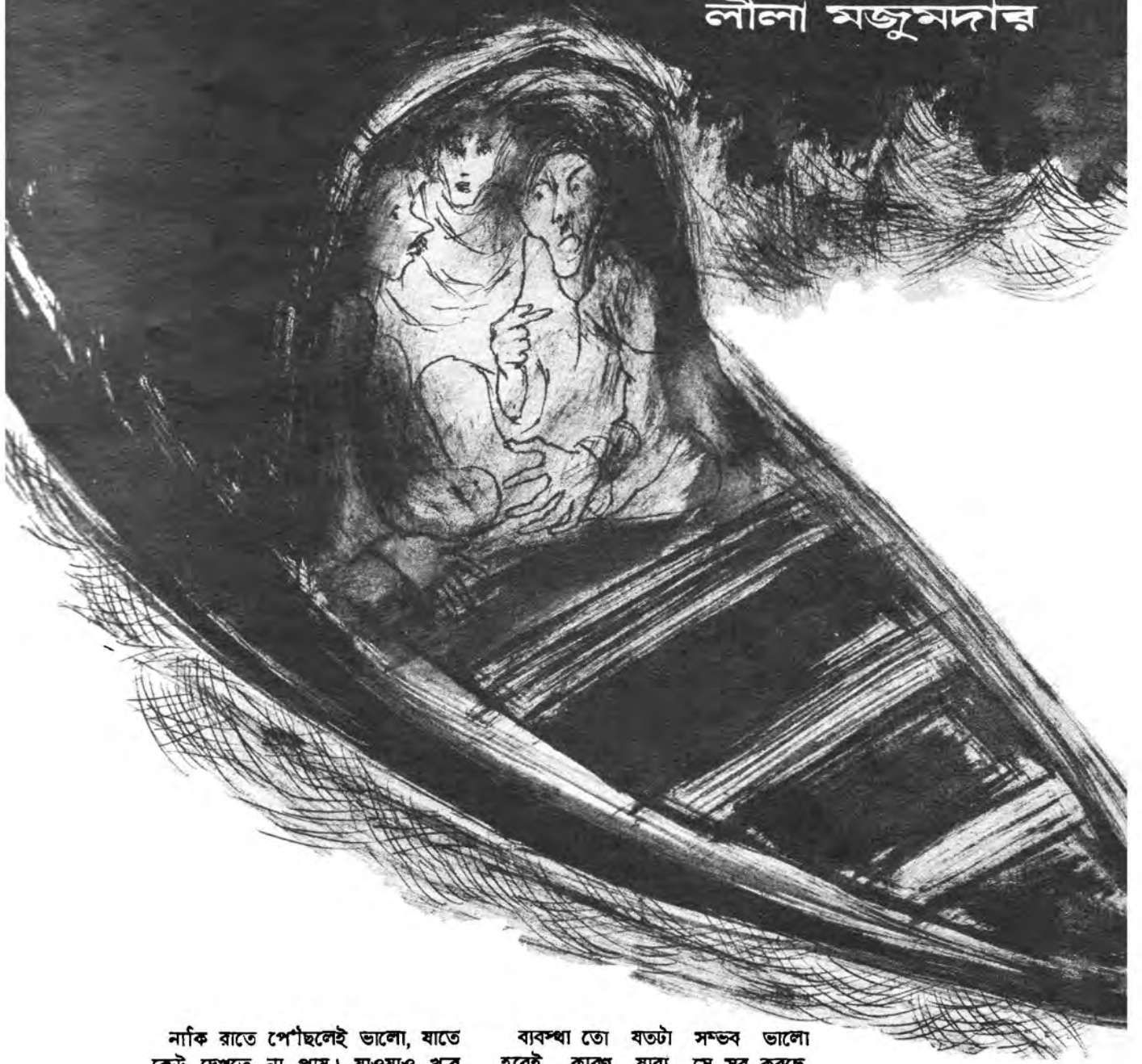
নাকি রাতে পেঁাছলেই ভালো, যাতে কেউ দেখতে না পায়। যাওয়াও খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়; প্রথমে লড়ঝড়ে বাস, তারপর নৌকো। সে যা নৌকো সে আর কহতব্য নয়। তবে বিনা পয়সার ব্যবস্থা, অন্য লোকে সব ঝামেলা পোয়াচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ভালো; কাজেই কিছু বলা উচিত নয়। তবে খালেতে নদীতে কুমীর নাকি থিক-থিক করছে।

ব্যবস্থা তো যতটা সম্ভব ভালো হবেই, কারণ যারা সে সব করছে, তাদেরি গরজ। তবু বড় বেশি সরু খাল দিয়ে নৌকো তিনটে চলছিল। থেকে থেকে জলে ঝপাং করে কিছু পড়ছিল। নাকি বেশ গভীর দু পাশের গাছগুলোর ডালে ডালে ছোঁয় আর কি। যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। ছোটমামা শেষ অবধি থাকতে না পেরে বললেন, "বাবাঃ, গা

শিরশির করে।" পাশের লম্বা-চুল পান-খাওয়া ছোকরা দাঁত বের করে হেসে বলল, "তা করবে না? এটা যে ইতিহাসের শ্মশান।" তার পাশের লোকটা বলল, "কিম্বা আশা-ভরসার গোরস্থান।এখান থেকে গঙ্গা-সাগর অবধি কম করে ২৪২টা জাহাজ-ডুবির লিখিত প্রমাণ আছে।"

ছোটমামার আপিসের চৌধুরী সাহস দিয়ে বলল, "ও কিছু না। আগে এ-সব জায়গায় নরবলি হত। সামনের ঘাটটার নাম নুমুণ্ডের ঘাট।" চৌধুরীর ওপাশে ছোটমামার মক্কেল বটুকবাবু বললেন, "আর বাঘের পেটেই কি কম গেছে।" মক্কেল চৌধুরীকে চেনে না। ওদের আপিসের কেউ অন্য কারো মক্কেলকে চেনে না।

ছোটমামা একটু রাগরাগ ভাব করে বললেন, "দিনের বেলা এলেই হত। এরকম রহস্যজনকভাবে আসার মানেটা কি?—ই-ইক!" লম্বা মতো কি একটা ফোঁস শব্দ করে ছোটমামার প্রায় গা ঘেঁষে জলের উপর দিয়ে ছুটে গেল। লম্বা-চুল বলল, "ভয় পেলেন নাকি? ও কিছু না, ও নোনা জলের ভোঁদর। মাছ খেয়ে ওদের পেট ভরে না, বড় জানোয়ার-ও খায়।"

পারলে ছোটমামা হয়তো নুমুণ্ডের ঘাটেই নেমে যান আর কি। বটুকবাবু শাঁসালো মক্কেল, তাঁকে অবিশ্যি চটালে, সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের কর্তা এবং মালিক মিঃ সমাদ্দার কি করতে কি করে বসবেন। ছোটমামার চাকরি রাখা দরকার। দু বছর পুরো হলে, সার্টিফিকেট পাবেন, তখন সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে ঢুকবেন।

নৌকোতে আরেকজনও ছিল, যে একটাও কথা না বলে নাক অবধি কাশী সিল্কের চাদরে জড়িয়ে পানুর গা ঘেঁষে বসেছিল। নাকি চৌধুরীর কে হয়, পিলুদা নাম, তবে তার সঙ্গে কথা বলতে চৌধুরী মানা করে দিয়েছেন। সে লোকটা গুপির কানে কানে বলল, "কেয়ারফুল। বটুক একটি ঘুঘু। কিছু ফাঁস না করাই ভালো।" শুনে গুপি হাঁ, পুজোর ক' দিন আমোদ করতে এসেছে। নাকি ঝুমুর-দহের আশেপাশের দশ বারোটা বন-গ্রাম নিয়ে পাঁচ বছর অন্তর এ অঞ্চলে একবার করে "গিরীশচন্দ্র নাট্য প্রতি-যোগিতা" হয়। সে এক এলাহি ব্যাপার। নিয়মকানুন খুব সহজ। এই অঞ্চলের পাঁচ-পুরুষের বাসিন্দা হওয়া চাই আর একই নাটক সবাইকে করতে হবে। এ বছর নাকি এ-অঞ্চলের নাম-করা ব্যবসাদার ফটিক সরকারের "রাবণ বধ" পালা হবে। এক মাস আগে থাকতে 'হীট' শুরু হয়েছে, ফাইনেল হবে বিজয়ার পরদিন। শেষ প্রতিযোগিতা ঝুমুরদহের সঙ্গে কালিয়াগ্রাম। এক দিনেই দুবার নাটক হবে, একই বিচারক মণ্ডলী সব নাটক বিচার করছেন। তাঁদের সঙ্গে শুধু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পছন্দ করা বাইরের দুজন প্রধান বিচারক ফাইনেলে থাকবেন। ছোটমামাদের বস্ ঝুমুরদহের স্বার্থরক্ষার জন্য ছোট-মামাকে আর কালিয়াগ্রামের জন্য চৌধুরীকে আলাদাভাবে পাঠিয়েছেন। আলাদা বলা হল এইজন্য যে বটুক-বাবু যে ছোটমামাকে এনেছেন সেটা পিলুদা জানে না, আবার পিলুদা যে চৌধুরীকে এনেছেন সেটা বটুকবাবু জানেন না। দুজনেই সমাদ্দারের মক্কেল; সমাদ্দার বলে দিয়েছেন যেন অবশ্যই উভয় দিক রক্ষা হয়। এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায় গুপি পানুর কেউ বুঝতে পারল না। তবে হ্যাঁ, উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদক পাইয়ে দেওয়া একটু শক্ত।

নুমুণ্ডের ঘাটে চৌধুরী, পিলুদা আর গুপি নেমে যেতেই, বটুকবাবু পা মেলে দিয়ে বললেন, "বাবা! এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ও ব্যাটা থাকতে একটা কথা বলতে পারছিলাম না। বুঝলেন চাঁদুবাবু, আমি টিকটিকি এনেছি খবরদার ফাঁস করবেন না। সমাদ্দার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সব সমস্যার সমাধান করেন আপনারা। যেমন করে পারেন ঝুমুরদহকে গিরীশ পদকটা পাইয়ে দিতে হবে। গতবার কালিয়াগ্রাম পেয়ে ছিল, সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। জানেন মুরলীর মেয়ের বিয়েতে ঝুমুরদহের লোকদের আলাদা বসিয়েছিল!"

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, "কি ব্যাপার মশাই, খুলে বলুন তো।" "কি আবার ব্যাপার—ঝুমুরদহের দলে যে লোকটা রাবণ সাজে তার তুলনা হয় না, কিন্তু রামটা ক্যাবলার এক শেষ, খালি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচায়। অথচ ওর বাবা পুজো কমিটির চাঁই।" ছোটমামার কানদুটো অমনি খরগোশের কানের মতো খাড়া হয়ে উঠল। "আর কালিয়াগ্রামের দল?" বটুকবাবু হাস-লেন, "ওদের রাম ভালো হতে পারে, কিন্তু রাবণটা যেন ভাঙ খায় সদাই ঝিমুচ্ছে।" "আর হনুমানরা?" প্রশ্ন শুনে বটুক অবাক হলেও, পানু খাড়া হয়ে উঠে বসল। ব্যাস্, আর ভয় নেই, ছোটমামার বুদ্ধি খুলেছে। বটুকবাবু বললেন, দুই হনুমানই নাকি ভালো। আরে ওরা সবাই তো একই গাঁয়ের ছেলে। নুমুণ্ড-ঘাট হাইস্কুলে সবাই পড়ে; ওদের হেডমাস্টার আগে অ্যাকটর ছিল, সে-ই শেখায়। কিন্তু গাঁয়ের নিজের দল নেই। মোড়লের গুরুর বারণ আছে। তার ছেলে বখে যাবার ভয়।

এই অবধি শুনে ছোটমামা নোট-বুকে কিছু লিখে রাখলেন। উত্তেজনায় পানুর লোম খাড়া হয়ে উঠল। বটুক-বাবু বললেন, "আপনার পরিচয়টা দাদা ঐ পিলু হতভাগাকে দেবেন না। ও ব্যাটা ক্যায়সা চালাক দেখলেন? কোত্থেকে এক ছুঁচোমুখো ধরে এনেছে দেখলেন? ভাবছে বুঝি সার্ট পেন্টেলুন পরালেই শেয়াল চেনা যাবে না! ছোট ছেলেটাকে পর্যন্ত দলে ভিড়িয়েছে, ওকে দিয়েই দুষ্কর্ম করাবে নিশ্চয়।" পানু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, ছোটমামার চিমটি খেয়ে "উঃফ্!" বলে থেমে গেল।

বটুকবাবু বললেন, "কি হল?" তারপর নৌকোর ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে পানুকে ভালো করে দেখে নিয়ে, খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক হয়েছে। আপনার ভাগ্নেটির যে রকম কচিপানা মুখ, ওকে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।" ছোটমামা বললেন, "শ্—শ্ লণ্ঠনেরও কান আছে। ও-সব কথা পরে হবে।"

একটা ভালো যে নৌকোর ঘাট থেকে বটুকবাবুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। আম জাম সুঁদরি গাছের বনের মাঝে একটা কোঠা বাড়ি, বাকি টিনের চালের পাকা ঘর। আগুনের ভয়ে এদিকে কেউ নাকি খড়ের চাল করে না। ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, "সে কি, এ-সব জল-ঝড়ের দেশেও দাবানল হয় নাকি?" বটুকবাবু নাক দিয়ে ফোঁস শব্দ করে বললেন, "দাবানল কেন হবে? গৃহ-প্রস্তুত আগুন মশাই, এই নাটকের ব্যাপার নিয়েই যেমন হতে পারত। কালিয়া-গ্রামের এমনি আস্পর্ধা যে অত ভালো রামটাকে আগে থাকতেই বাগিয়ে নিল! ওদের যদি একদিন—" ছোট-মামা ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, "শ্—শ্ অত উত্তেজিত হবেন না! সে এতক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে।" বটুকবাবু সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছো গেলেন।

সুখের বিষয় ততক্ষণে দালানের দোর গোড়ায় এসে গেছিলেন, কাজেই এখুনি উঠেও পড়লেন। উঠেই ছোট-মামার পায়ের বুড়ো আঙুলের জায়গাটাতে মাথা ঠুকতে লাগলেন। লাগল কি না কে জানে। ছোটমামা

বললেন, "সমাদ্দার সাহেবের পরি-কল্পনাতে কোনো খুঁৎ থাকে না, মশাই। আপনারা গিরীশ পদক না পেলেই আশ্চর্য হব। কিন্তু এখন মুখে চাবি। সমাদ্দারের চররা ইতি-মধ্যেই কাজে লেগে গেছে।"

মশালের আলোতে কুয়োর ধারে ঠান্ডা জলে স্নান; এই মুস্কো চেহারার দুটো লোক গায়ের ওপর হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। তারপর চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া এক বাটি করে ঘন দুধ খাওয়া। বটুকবাবু বললেন, সূর্যাস্তের পর চা খেলে নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ওদের জন্য আলাদা একটা সুন্দর ঘর দেওয়া হয়েছিল, বাঁশের দেয়াল, লাল টালির ছাদ। রাতে খাবার আগে সেখানে বটুকবাবু আর সেই লম্বা-চুল পান-খাওয়া ছোকরা, তার নাম বেন্দা, আর তার পাশের কালো লোকটা, তার নাম কেস্ট, এরা সবাই এক। এরা নাকি নাটক করবে। অমনি ওরা নাটকের পাট বলতে আরম্ভ করে দিল। সে কি ভালো অ্যাকটিং, পানু শুনে অবাক একশোবার মহড়া দিয়ে আর আটবার একই নাটক শুনে সব পাট সবার মুখস্থ। হঠাৎ বটুকবাবু সোনার চেন ঘড়ি দেখে বললেন, "ন'টা বেজে গেছে। এ্যাঁ, পদু এল না কেন?"

ঠিক সেই সময় উঠি পড়ি করতে করতে ছুটে এসে একটা বেঁটে মোটা লোক সেখানে আছড়ে পড়ল। তার বুকটা হাপরের মতো উঠছে পড়ছে, চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে, বড়কর্তা, পদুকে পাওয়া যাচ্ছে না।" পানু উঠে এসে বলল, "বাঘে নিল বুঝি?" সে লোকটা রেগে গেল, "বাঘে নেবে কি! কাগজ পড় না? মাত্র সাতচল্লিশটা বাঘ বাকি আছে, তাদের অনেকেই নিরামিষ খায়, এই হরিণ টরিণ। বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্করে নিয়েছে!"

বটুকবাবুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা! "কি হবে মশাই? সর্বনাশ হয়ে গেল যে!" ছোটমামা মুচকি হেসে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। রাত হয়েছে, খিদে পেয়েছে।" "কিন্তু—কিন্তু—গিরীশ পদক—" "এতে কোনো কিন্তু কিন্তু নেই। বলেছি তো গিরীশ পদক পেয়ে যাবেন। গোলমাল করে সব পন্ড করবেন না।"

দিব্যি খাওয়া হল। আটার লুচি, বেগুন ভাজা, পাঁঠার কালিয়া, কুমড়োর চাটনি, পায়েস। খেয়েই ঘরে এসে

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ছোটমামা শুয়ে পড়লেন। ঘুমোবার আগে শুধু বললেন, "চৌধুরী, গুপি এদের আমরা চিনি না, মনে থাকে যেন।"

কি করে দিনগুলো কাটল পানু ভেবে পেল না। কোনো লুকোনো জায়গায় রোজ নাটকের মহড়া হত। ছোটমামা ঘরে বসে কি-সব পরামর্শ দিতেন। সকলের সে কি উত্তেজনা। কালিয়াগ্রামেও কি হচ্ছে কে জানে। তাদের সেরা অভিনেতা আগেই গায়েব হয়েছে। ঝুমুরদহই বা বিনা-রাবণে কি করছে কে জানে।

দেখতে দেখতে পুজো হয়ে গেল; সে কি ঘটা, সে কি বাজনা বাদ্যি, সে কি খাওয়া-দাওয়া, এই বড় বড় পোনা মাছের চাকলা, সে আর ভাবা যায় না। বিজয়ার দিন ঝুমুরদহের বড় বিলে ঠাকুর ভাসান হল। নদীতে খালে ভাসান দিলে জোয়ারের জলের সঙ্গে ভাঙ্গা ঠাকুর ফিরে আসে। মা ঠাকুমারা কান্নাকাটি করেন, তাই এই ব্যবস্থা।

তারপর সেই বহু-প্রত্যাশিত একা-দশীর সন্ধ্যা এল। প্রায় সারা রাত নাটক হবে। সাতটা থেকে দশটা এক দলের অভিনয়। দশটা থেকে এগারোটা টিফিনের ছুটি। সাড়ে এগারোটা থেকে আড়াইটে অন্য দলের অভিনয়। একটা মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখ দেওয়া মোটা রুপোর টাকা ছুঁড়ে ঠিক হল কারা আগে অভিনয় করবে। যেমন প্রত্যেকবার হয়ে এসেছে।

বড় চাঁদমারির মাঝে প্রকান্ড কানাতের নিচে অভিনয়। এক মাস ধরে কানাত পড়েছে। সব অভিনয় এখানে হয়েছে। ফুটবল খেলার মতো জোড়ায় জোড়ায় বাছাই হয়ে, এই শেষ দুটিতে দাঁড়িয়েছে। গিরীশ ঘোষই এই ব্যবস্থা করে গেছিলেন। ফুটবলের মাঠেও তখন এ ব্যবস্থা হয় নি। কে জানে ও'র কাছেই ওরা শিখেছিল কি না।

কালিয়াগ্রাম 'টসে' জিতে আগে অভিনয় করল। পানু দেখল ওদের পান্ডাদের দলে মেনি-বেড়ালের মতো মুখ করে চৌধুরী আর গুপি বসে যখন তখন মিছিমিছি হাত তালি দিচ্ছে। দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। তবু স্বীকার করতেই হবে যে অভিনয় ভালো হয়েছিল। প্রত্যেকটি অ্যাকটর ভালো অভিনয় করেছিল। রাবণের জয়-জয়কার, কি তেজ, কি গর্ব, আকাশ-বাতাস গুম-গুম করতে থাকল। মরবার সময়ও রাবণ বুকে কীল মেরে হা-হা করে হেসে মল। সকলের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। দলে দলে লোক মেডেল, পুরস্কার ইত্যাদি ঘোষণা করল। কে একটা রাম সেজেছিল কেউ চেয়েও দেখল না। তারপর যে যার আস্তানায় ফিরে গিয়ে খাওয়া। তারপর সাড়ে এগারোটায় ঝুমুরদহের দল মঞ্চে উঠল। রাত বেড়েছে, চারদিক

থমথম করছে। উঁচু উঁচু গাছ থেকে বড় বড় ফোঁটায় হিম পড়ছে, যেন গাছরা মনের দুঃখে কাঁদছে। একই দৃশ্য, একই কথা, তবু মনে হতে লাগল যেন একেবারে নতুন একটা নাটক হচ্ছে। তার বাহাদুর রাবণ নয়, সে রাম। সে কি দুঃখ, সে কি ব্যথা, সীতা হারানোর সমস্ত হতাশা দলা দলা পাকিয়ে মেঘ হয়ে যেন মঞ্চের ওপর জমা হয়ে রইল। দর্শকরা কেঁদে কেটে একাকার। কে রাবণ সাজল সে-কথা কারো মনেও হল না। পিলুদা গোড়ায় দুবার শেম শেম বলে চ্যাঁচালেও শেষে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। সেই যথেষ্ট। তাছাড়া ওদের অভিনয়ের সময় বটুকবাবুও তো দুবার পচা টমেটো ছুঁড়েছিলেন ভুলে গেলে চলবে না। রাত আড়াইটায় নাটক শেষ হলে, চারদিকে চুপচাপ, কারো মুখে কথা নেই। রাবণ মরে গেছে, তবু সীতার দুঃখ ঘোচে নি, রাম কড়া কথা বলেছেন। কে কি বলবে? কার কি বলার আছে?

এমন সময় জেলা কমিটির সভাপতি নিজে উঠে চিৎকার করে ভাঙা গলায় ঘোষণা করলেন, "এ বছরের গিরীশ পদক একটির জায়গায় দুটি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পদকের খরচ সরকার বহন করবেন।" এই বলে দু-একবার চোখ-নাক মুছে বসে পড়লেন। তখন সে কি আনন্দ, সে কি উল্লাস। বটুকবাবু পিলুদাকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করলেন। শোনা গেল ও'রা নাকি ভায়রাভাই, অর্থাৎ ও'দের স্ত্রীরা দুই বোন।

সেই বিপুল আনন্দোল্লাসের মধ্যে, সেই গায়েব হওয়া দুই অ্যাকটরের কথা লোকে ভুলেই গেল। দেখা গেল তারাও এসে চোখে মুখে কিছু কিছু রং-মাখা অবস্থাতেই বেজায় নাচানাচি করছে। তাই শুনে গুপি পানু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না।

তার পরদিন সবাই বেলা দশটা অবধি ঘুমিয়ে উঠে, কলকাতার দল ফিরবার জন্য গোছগাছ করতে লাগল। বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি ও সহ-সভাপতি নাকি বর্ধমানে থাকেন; তাঁরা চা জল-খাবার খেয়েই জেলা কমিটির মোটর-বোটে চড়ে বিদায় নিলেন। বাকিরা দুপুরের ভূরি ভোজের পর আধ ঘুমন্ত অবস্থায় নৌকোয় উঠলেন।

স্থানীয় লোকদের তখনো অনেক কাজ বাকি, কানাত তোলানো, কর্মী বিদায়, হিসাব মেটানো ইত্যাদি, কাজেই ছোটমামা তাঁদের সঙ্গে যেতে বারণ করলেন। প্রথম নৌকোটিতে রইলেন ছোটমামা, পানু, চৌধুরী, গুপি আর ডেকরেটর কোম্পানির চারজন ভদ্রলোক।

দিনের বেলায় খালের অন্য চেহারা। কত বাড়ি-ঘর। একটু পরেই পানু বলল, "আমাদের রাবণ গায়েব হয়ে কোথায় গেছিল?" চৌধুরী বলল, "কেন, সে আমাদের রাবণ হয়েছিল।" গুপি বলল, "আর আমাদের রাম?" ছোটমামা বললেন, "সে আমাদের রাম হয়েছিল। আর আমাদের আগের রাম আমাদের রাবণ হয়েছিল আর তোমাদের রাবণ তোমাদের রাম হয়েছিল। হবেনা কেন? সবার সব পার্ট মুখস্থ, ক্ষতিটা কি হল? সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্স দুজনকেই গিরীশ পদক পাইয়ে দেবে বলেছিল, দিয়েছেও তাই। তবে—"

গুপি পানু এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল "তবে কি?" চৌধুরী বলল, "ঐ পিলুদা আর ঐ বটুকবাবু দুজনেই গোপনে যদি মিঃ সমাদ্দারকে বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি আর ও'র শালাকে সহ-সভাপতি না করত তা হলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না। যাই হক, সব ভালো যার শেষ ভালো।

কর্ণেল মিত্র

বিমল মিত্র

ছোটবেলায় আমার বিশ্বাস ছিল না যে ভূত বলে কিছু আছে। বইতে ভূতের গল্প পড়েছি, দিদিমার কাছে কত রাত ভূতের গল্প শুনেছি। কিন্তু সে-গল্প পড়ে বা শুনে কখনও মনে ভয় পাইনি।

দিদিমাকে বলতুম—দিদিমা, একটা ভূতের গল্প বলো না—

দিদিমা বুড়ো মানুষ, সন্ধ্যে হতে-না-হতেই ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসতো। তবু আমি বার বার গল্প শুনতে চাইতুম। বিশেষ করে ভূতের গল্প।

দিদিমা বিরক্ত হতো।

বলতো—না, রাত্তিরে ভূতের গল্প শুনতে নেই, ভূতে ঘাড় মটকাবে, তুই ঘুমো এখন, ঘুমিয়ে পড়—

কিন্তু তবু আমি ছাড়তুম না। ভূতের গল্প আমার শোনা চাই। ভূতের গল্প শুনে আমি ভয় পেতুম না বটে কিন্তু শুনতে বড় ভালো লাগতো। গল্পের ভূতের হাঁউ-মাউ-খাঁউ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার কল্পনা অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছুতো। এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে যেখানে লেখা-পড়া নেই, পরীক্ষায় পাশ করার ভয় নেই, বাবা-মা-মাষ্টার মশাই-এর চোখ রাঙানি নেই, শুধু আছে একটা ভাঙা পোড়ো-বাড়ি আর তার ভেতরে কয়েকটা ভূত আর পেত্নী। এই ভূত-পেত্নীদের জগতের স্বপ্ন দেখতেই আমার ভালো লাগতো।

তারপর একটু যখন বড় হলুম তখন ভূত-পেত্নীর জগত থেকে একেবারে বাস্তব জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ বাস্তব জগতে মাষ্টার-মশাইয়ের বেত খেতে হয়, পড়া না-পারলে কানমলা খেতে হয়। আর তারপরে পরীক্ষায় ফেল করার দুঃখ-লজ্জা তো আছেই।

এখন যেমন পরীক্ষায় ফেল করলে লজ্জা হয় না তখন কিন্তু তা ছিল না। যেবার পরীক্ষায় ফেল করেছিলুম বাবা সমস্ত দিন আমাকে একটা ঘরের মধ্যে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে
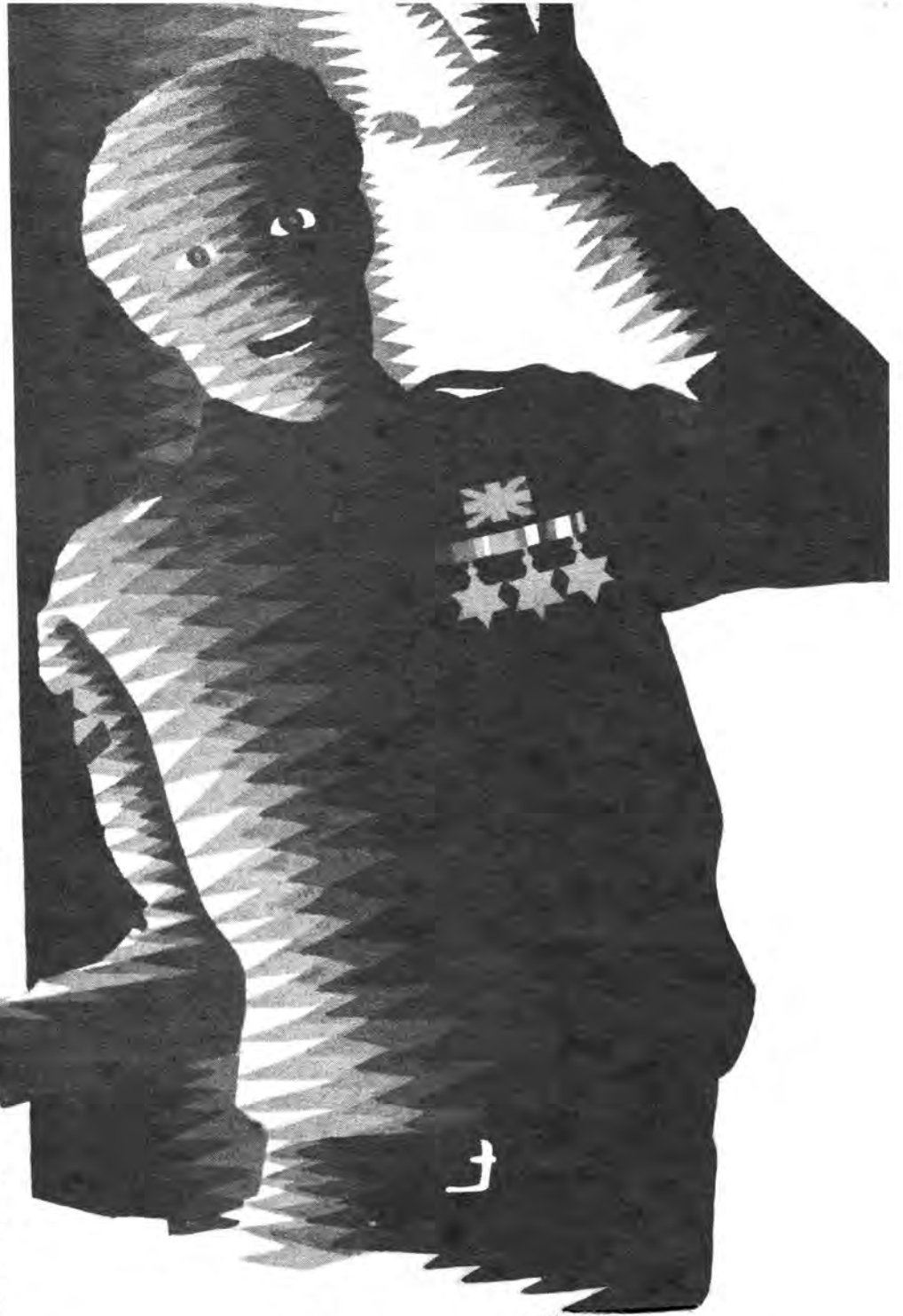
-দিয়েছিলেন। ভাত তো দূরের কথা, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে পাইনি।

সন্ধ্যেবেলা বাবা দরজা খুলে দিতেন। বলতেন—এবার ভালো করে লেখা-পড়া করবি তো?

বলতুম—হ্যাঁ করবো—

—পরীক্ষায় আর ফেল করবি না তো?

বলতুম—না—

—তবে নিজের হাতে দু'কান মোল—

আমি নিজের হাতে কান মলতুম। বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো এই প্রতিজ্ঞাও করতুম। তবু সব বছরে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারতুম না। কতবার যে আমি জীবনে ফেল করেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার ক্লাশের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছিল—ফেলু-মাষ্টার, মানে ফেল-মাষ্টার।

কিন্তু আমার বড়দা ছিল যাকে বলে সত্যিকারের ভালো ছেলে। প্রত্যেকবার বড়দা এগজামিনে ফার্স্ট হতো। কতবার যে মেডেল পেয়েছে, প্রাইজ পেয়েছে বড়দা তার গোনা-গুণ্‌তি নেই। বাবা-মা সেই মেডেল-গুলো আর প্রাইজের বইগুলো একটা কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছিল। আত্মীয়-স্বজন-পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এলেই সেগুলো সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখানো হতো।

তারা বড়দার ক্ষমতা দেখে তারিফ করতো আর বড়দা'র সম্মানে আমার বাবা-মা'র বুক গর্বে দশ হাত হয়ে যেত!

তারপর আমার দিকে দেখিয়ে বলতো—আর এটি? এটি লেখা-পড়ায় কেমন?

বাবা বলতেন—এই এর কথা বলছেন? এর কিস্যু হবে না, এর মাথায় গোবর পোরা—

লজ্জায়-ধিক্কারে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসতো। কিন্তু আমি কী করবো? আমার মাথায় যে গোবর পোরা তার জন্যে কি আমি দায়ী?

তা আমার কথা থাক। আমি বড়দার কথাই বলি। বড়দা'কে নিয়েই আমার এই কাহিনী। বড়দাই ছিল বাবা-মা'র ভরসা, বড়দাই ছিল বাবা-মা'র একমাত্র নির্ভর-স্থল। বড়দার মতো ছেলে যাদের তাদের আর ভাবনা কী?

বড়দা যখন কলকাতার কলেজ থেকে গরমের ছুটির সময় বাড়িতে আসতো তখন তার জন্যে বাবা স্পেশ্যাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। সেদিন ঝি-চাকর কেউ বাজারে গেলে চলবে না। বাবা নিজে বাজারে যাবেন।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো—এ কি, মিত্তির মশাই, আপনি যে বাজারে?

বাবা বলতেন—আজ যে নীলু আসছে, গরমের ছুটি হয়েছে তো—

সেদিন বাবা বড়দার জন্যে বেছে বেছে সেরা মাছ কিনবেন, সেরা আম, সেরা পটল, সেরা সব জিনিস। সকাল থেকেই বাড়িতে একেবারে রান্নার ধুম পড়ে যেত। বড়দা খেতে ভালোবাসতো বলে মা ভালো ভালো রান্না করতো। বড়দা এলেই বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। আমরা দুটি মাত্র ভাই। তার মধ্যে একজন বাপ-মায়ের আদরের দুলাল, আর, আর একজনের জন্যে একেবারে শূন্য। আমার ভাগে সত্যিই একেবারে শূন্য।

তা তার জন্যে কারোর দোষ নেই। কারণ আমার মাথায় যে গোবর পোরা।

বড়দা খেতে বসলেই মা সামনে বসতো, মাথার ওপর পাখাটা জোরে খুলে দেওয়া হতো।

বলতো—ভাত ফেলে রাখলি কেন, ও-ভাত ক'টা খেয়ে নে—

বড়দা বলতো—না মা, বিলুকে দাও, ওকে তো তোমরা মোটে দেখছো না, ওকে তো তোমরা কেউ খেতে বলছো না। আমি আর খেতে পারবো না, আমার পেট ভরে গেছে—

বাবাও সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যেন তিনি নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে বড়দার অযত্ন হবে।

বাবা বলতেন—সে কী, ইলিশ মাছ আরো দু'টো দাও ওকে,—

বড়দা বলতো—বা রে, আমার কি রবারের পেট, আমি তো চারটে ইলিশ মাছের পিস্ খেয়েছি, আর খেলে বমি হয়ে যাবে—

—না বমি হবে না। কলেজের হোস্টেলে তোদের যা হাল, আধ পেটা খেয়ে খেয়ে তোদের পেটের নাড়ি শুকিয়ে গিয়েছে। আরো দু'টো খেতে হবে, আমি নিজে গিয়ে তোমার জন্যে বাজার করে নিয়ে এসেছি, একেবারে আসল গঙ্গার ইলিশ। খাও। তারপর ল্যাংড়া আম এনেছি, তাও দাও দু'টো—

বড়দাকে এই রকম করে খাইয়ে-খাইয়েও যেন বাবা-মা'র তৃপ্তি হতো না। আর শুধু কি খাওয়া? বড়দা যখন ঘুমোবে তখন কেউ শব্দ করতে পারবে না। বড়দা যখন পড়বে তখন কেউ কাছে যেতে পারবে না, বড়দা'র যদি একদিন একটু সর্দি-কাশি হয় তো তার জন্যে শহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তার দেখতে আসবে। বড়দার পরীক্ষার আগে মা, মা-কালীর কাছে জোড়া-পাঁঠা মানত করবে। আর বড়দাও তেমনি ছেলে। কখনও কি পরীক্ষায় সেকেন্ড হতে নেই রে! বরাবর কি ফার্স্টই হতে হয়! অথচ একই বাড়িতে আমরা একই বাবা-মায়ের দুই ছেলে।

আমি মনে মনে ভগবানকে অভিশাপ দিতুম ভগবান কেন এত এক চোখো। দিতে হলে একজনকে কি এমন উজাড় করেই দিতে হয়?

তা তারপরে দাদা বি-এস-সি পাশ করলে অনার্স নিয়ে। একেবারে ফার্স্ট।

সেদিন আমাদের বাড়িতে একেবারে লোকে লোকারণ্য! যেদিন পরীক্ষার ফলটা বেরোল সেদিন বড়দার ছবি ছাপা হলো খবরের কাগজের পাতায়। বড়দার ছোট্ট জীবনী বেরোল। বাবার নামও তার সঙ্গে উল্লেখ করা হলো। শহরের গণ্য-মান্য সমস্ত লোককে বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হলো। লুচি, পোলাও, মাছ, মাংস, চপ, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ, চাটনী কিছুরই আর কমতি ছিল না। সবাই খেয়ে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো বড়দাকে।

বড়দার বড় লজ্জা করতে লাগলো কিন্তু গোড়া থেকেই।

বলতে লাগলো—এ আর এমন কী করেছি, প্রত্যেক বছরই তো কেউ-না-কেউ একজন ফার্স্ট হয়ই, এবার যেমন আমি ফার্স্ট হয়েছি, আসছে বছরেও আর একজন হবে—

ভদ্রলোকেরা বলতো—আসছে বছরে যারা ফার্স্ট হবে তাদের বাবা-মায়েরও এমনি আনন্দ হবে। আনন্দ করাটা কি দোষের?

বড়দা কিন্তু তাতেও খুশী হতো না।

বলতো—তার চেয়ে আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন জীবনের শেষ পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হতে পারি, সেই ফার্স্ট হওয়াটাই চরম ফার্স্ট হওয়া—

কিন্তু আশ্চর্য প্রতিভা বড়দার। এম-এস্-সি দিলে কেমিস্ট্রিতে। তাতেও ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

বাবার আর মা'র আনন্দ তখন দেখে কে।

কিন্তু শুধু পাশ করলেই হবে না। ভালো করে পাশই করো আর ফেলই করো, আসল কথাটা তো বড় চাকরি করে বেশি টাকা মাইনে পাওয়া? তুমি এম-এ পাশই করো আর রাস্তার বখাটে ছেলেই হও, কত টাকা তুমি মাসে উপায় করো সেইটে দিয়েই বিচার করবো তুমি জীবনের পরীক্ষায়

পাশ না করে।

তা ঠিক এই সময়েই যুদ্ধ বাধলো। এমনভাবে যুদ্ধ বেধে যে সব কিছু ওলোট-পালোট বাধিয়ে দেবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যুদ্ধ বেধে গেল ইংরেজ আর জার্মানদের মধ্যে। সে এক মহা যুদ্ধ। বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীই জড়িয়ে পড়লো সে-যুদ্ধতে।

হঠাৎ বড়দা'র চিঠি এল কলকাতা থেকে। বড়দা লিখেছে যে সে যুদ্ধে চাকরি পেয়েছে। প্রথমে দু'হাজার টাকা মাইনে। তারপরে চাকরিতে ভালো কাজ দেখাতে পারলে পরে মাইনে আরো বাড়বে। এমন কি পাঁচ হাজার ছ'হাজার টাকাও হতে পারে।

চিঠি পড়ে তো মা কেঁদে উঠলো। বাবার মাথায় বজ্রাঘাত। শহরের গণ্যমান্য লোক যারা খবরটা শুনলো সবাই এলো।

তারা বললে—মিত্তির মশাই, এরই জন্যে আপনি এত ভাবছেন? জানেন এই চাকরি পাবার জন্যে লক্ষ-লক্ষ ছেলে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। আর আপনার ছেলে সেই চাকরি পেয়েছে বলে আপনি ভয় পাচ্ছেন?

বাবা বললেন—না, তা নয়, যুদ্ধ বলে কথা, যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তাই ভাবছি। যুদ্ধ মানেই তো মারামারি, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মারামারি। কে কাদের কত লোক মারতে পারলো তারই প্রতিযোগিতা—

ভদ্রলোকেরা বললে—তাদের মধ্যে কি সবাই মারা পড়ে? বরং মারা পড়ে তারা যারা আমাদের মত লোক যুদ্ধে যায় না। বোমা তো আমাদের মাথাতেই পড়ে। নিরীহ লোকরাই যুদ্ধে বেশি মারা যায়। কারণ তাদের হাতে বন্দুক থাকে না রাইফেল থাকে না, কিছু না। তাদের বিপদই তো সব চেয়ে বেশি—

আর একজন বললে—আর তা ছাড়া যুদ্ধ তো চিরকাল থাকবে না, বড়জোর এক বছর কি দু'বছর, তারপরে তো গভর্মেন্ট আপনার ছেলেকে মোটা টাকার চাকরি দেবে. সেদিকটাও তো ভেবে দেখবেন আপনি—

যুদ্ধে যাবার আগে বড়দা একবার বাড়িতে এল। মা'কে বাবাকে সব বুঝিয়ে বললে। বললে যে যুদ্ধ বেশি দিন চলবে না। যেই যুদ্ধটা থেমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বড় চাকরি দেবে। এখন সরাসরি লেফ্‌ন্যান্ট্ করে নিচ্ছে বড়দাকে, দুদিন বাদেই ক্যাপ্টেন হবে, তারপরে মেজর, আর তারপরে কর্ণেল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—তা তোমাকে কি জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে নাকি?

বড়দা আশ্বাস দিয়ে বললে—আমি যুদ্ধ করবো না, যারা যুদ্ধ করবে আমি তাদের পেছনে পেছনে থাকবো। ইন্‌-জিনীয়ারিং স্টোর্স-এর ইন-চার্জ হবো আমি।
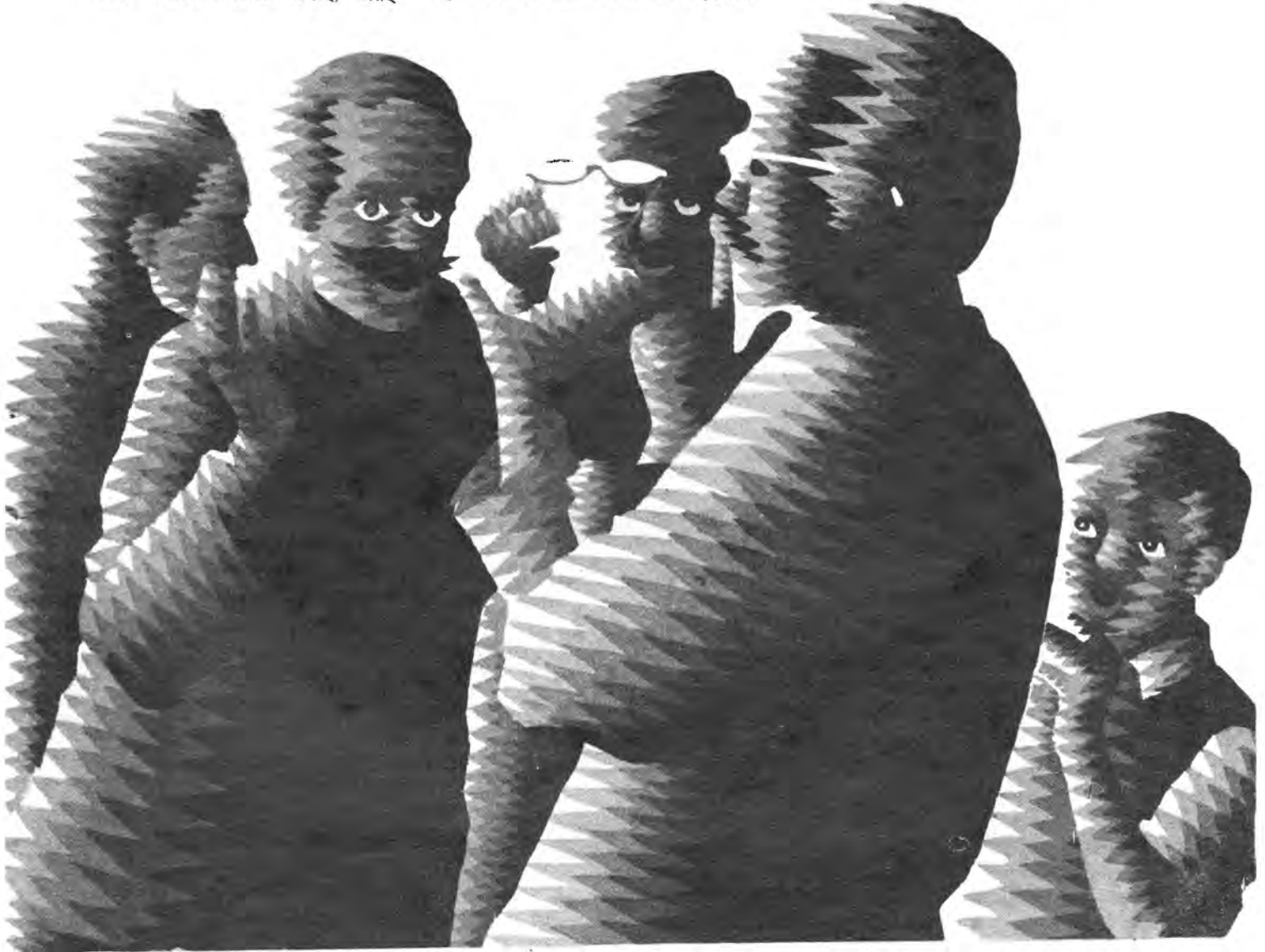
বড়দা সরাসরি যুদ্ধে যাবে না শুনে বাবা-মা একটু আশ্বস্ত হলো। আবার দু'হাজার টাকা মাইনে হবে শুনে খুব আনন্দও হলো। বড়দা যাবার আগের দিন মা কালী-মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এসে বড়দার কপালে পুজোর সিঁদুরের টিপ্ ছুঁইয়ে দিলে। আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো। কী প্রার্থনা করতে লাগলো তা মা-ই জানে। হয়ত প্রত্যেক মা ছেলের ভালোর জন্যে যে-প্রার্থনা করে সেই একই প্রার্থনা করলে। আমি তা জানতে পারলুম না।

বড়দা যুদ্ধে গিয়ে বাড়িতে প্রত্যেক সপ্তাহেই চিঠি পাঠাতো। বেশ ভালো আছে বড়দা, খুব আরামে আছে। কোনও কষ্ট হচ্ছে না। চিঠিটা পড়ে বাবা-মা খুশী হতো।

আর প্রত্যেক মাসে বাবার নামে বড়দার মাইনের টাকাটা চলে আসতো। একেবারে পুরো দু'হাজার টাকা। বাবা সে-টাকাটা বড়দার নামে ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা রেখে দিয়ে আসতেন। আর পাড়ার প্রত্যেকটা লোককে জানিয়ে আসতেন ছেলের চিঠি আসার কথা। যারা বেশি আগ্রহী তারা আবার চিঠিটা পড়তো। পড়াতো। অন্য লোকদের শোনাতো।

কখনও চিঠি আসতো ফ্রান্স্ থেকে, কখনও বা আবার লনডন্। আন্দাজে বুঝে নিতে হতো কোথায় বড়দা আছে। কারণ মিলিটারিতে ঠিকানা দেওয়া বারণ।

বাবাও চিঠির উত্তর দিতেন—আমরা সবাই ভালো আছি, তুমি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিবে, আর যদি কিছুদিনের ছুটি পাও তো একবার বাড়িতে আসিবে। তোমার মা তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল।...

এই রকম চিঠি কিছুদিন ধরে চললো। বাবা প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কাদের জয় হচ্ছে আর কারা হারছে এ নিয়ে গবেষণা করেন, মা'র সঙ্গে, পাড়ার লোকের সঙ্গে আলোচনা করেন। শহরের সবাই যখন চাইছে জার্মানী যুদ্ধে জিতুক, বাবা-মা তখন চাইছে ইংরেজ জিতুক। কারণ ছেলের চাকরি ইংরেজদের দলে।

আর শুধু খবরের কাগজ নয়, রেডিও শোনাও তখন প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন জার্মানদের জেতার খবর আসতো তখন আমাদের খারাপ লাগতো, আর ইংরেজদের জেতার খবর আসতো তখন আমরা খুশী হতুম।

একদিন চিঠি এল বড়দা ক্যাপ্টেন হয়েছে। মাইনে আরো এক হাজার টাকা বেড়েছে।

এক-একবার বড়দার চাকরিতে উন্নতি হয় আর মা, মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে। যেন ছেলের আরো উন্নতি হয় মা, ছেলে যেন আমাদের মুখোজ্জ্বল করে মা, ছেলে যেন সুস্থ শরীরে বাড়িতে ফিরে আসে!

তা মা-কালী মা'র সে প্রার্থনা শুনলো কিনা কে জানে। আমরা শুধু পুজোর প্রসাদ খেলুম।

এর পরে হঠাৎ খবর আসতে লাগলো জার্মানী হারছে। ইটালী হারছে। জাপান হারছে। আমেরিকা ইংরেজদের দলে ভিড়ে পড়েছে।

বাবা তো আনন্দে একেবারে লাফাতে লাগলেন। ইংরেজদের জয় যেন তাঁর নিজের ছেলের জয়।

তখন জিনিস পত্রের দাম দিন-দিন বাড়ছে, দেশে বোমা পড়ছে, কলকাতা শহর থেকে লোকে ভয়ে পালাচ্ছে। কত সব দুর্যোগ গেল সে-ক'বছর। কিন্তু বড়দা'র দৌলতে আমাদের সংসারে তখন কোনও অভাব অভিযোগ নেই, বড়দার মাইনের অজস্র টাকা ব্যাঙ্কে জমে গেছে।

সেই যুদ্ধের শেষের দিকে যখন ইংরেজদের জয়-জয়কার, তখন একদিন বড়দা'র একখানা চিঠি এল। তাতে বড়দা লিখেছে—আমি পনেরো দিনের ছুটিতে দেশে যাচ্ছি। আসছে মাসের দশই সন্ধ্যের ট্রেনে আমি বাড়িতে পৌঁছুবো। স্টেশন থেকে আমাদের মিলিটারি গাড়িতে সোজা বাড়ি পৌঁছুবো, ট্রেন যদি ঠিক সময়ে পৌঁছোয়তো রাত ন'টার মধ্যেই আমি পৌঁছুবো—

চিঠিটা পড়ে খানিকক্ষণ কারো মুখেই কোনও কথা বেরোল না। আনন্দে মানুষ অনেক সময় বোধহয় বোবাও হয়ে যায়। আমার বাবা-মা'র অবস্থাও বোধহয় সেই রকম হয়ে গিয়েছিল।

যখন অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল তখন বাবা বললেন—আজ হলো সাতুই, আর নীলু আসবে দশুই—আর তিন দিন বাকি—

তিনটে দিন। তিনটে দিন যেন তখন আমাদের কল্পনায় তিন বছর মনে হলো। সেই তিনটে দিন যেন আর কাটতে চায় না। বড়দা আসবে! বড়দা এত বছর পরে বাড়ি আসবে। এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ঘটনা। নীলু এলে বাবা যে কী করবেন তারই প্ল্যান করতে লাগলেন। নীলু যা-যা খেতে ভালোবাসে সেই সব জিনিসের তালিকা তৈরি হলো।

তপ্সে মাছ ভাজা। তপ্সে মাছ ভাজা খেতে নীলু বড় ভালোবাসতো।

—আর কী খেতে ভালোবাসতো গো?

মা বললে—ল্যাংড়া আম—

বাবা বললেন—ল্যাংড়া আম এখন কোথায় পাবো?

মা বললে—সরভাজা, সরপুরিয়া—

—কিন্তু সে-সব এখন কোথায় পাবো?

ল্যাংড়া আম তখন বাজারে পাওয়া যায় না। আমের সময় চলে গিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়। এখনও তিন দিন সময় আছে! এই তিনদিনের মধ্যে কলকাতায় চলে গেলে সবই পাওয়া যাবে। কলকাতা শহরে পয়সা ফেললে কী না পাওয়া যায়? চেষ্টা করলে সেখানে ঘোড়ার দুধও পাওয়া যায়।

তা বাবা আর দেরি করলেন না। ন'তারিখে সকাল বেলার ট্রেনেই কলকাতায় চলে গেলেন। সেখানে একদিনে সব কেনা-কাটা করে দশ তারিখে সকাল বেলাই এসে পৌঁছোলেন। ল্যাংড়া আম, তপ্সে মাছ, সরপুরিয়া সরভাজা। আর তার সঙ্গে কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, আঙুর, আপেল, কমলালেবু। সবগুলোই দামী জিনিস।

সকাল থেকেই রান্নার আয়োজন চললো। পাড়ার যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলেন—জানেন চাটুজ্জে মশাই, আমার নীলু আসছে আজ রাত্তিরে—

—নীলু আসছে?

—হ্যাঁ, এখন সে কর্ণেল। কর্ণেল নীলরতন মিত্র। আমার ছেলে কর্ণেল হয়েছে। জানেন তো?

চাটুজ্জে মশাই, গাঙুলী মশাই, বোস মশাই সবাইকেই বাবা খবরটা দিলেন। আমিও খবর দিলুম আমার সব বন্ধুদের। সবাইকেই বললুম—আমার বড়দা আসছে ছুটিতে, এখন কর্ণেল হয়েছে—

নিজেদের ঐশ্বর্যের কথা যদি লোককে জানাতেই না পারলুম তো কীসের আনন্দ। আসলে পাড়ার লোকরা কিন্তু খবরটা শুনে খুব খুশীই হলো। আমার বাবা ছিলেন সকলের প্রিয়। মিত্তির মশাই-এর কিছু ভালো হলে সবারই আনন্দ হতো।

মা তো সেদিন সকাল থেকেই ব্যস্ত। বড়দা কোন্ ঘরে শোবে, কী খাবে, কী রকম দেখতে হয়েছে তাকে এই সব

কথাই হতে লাগলো বাবা-মা'র মধ্যে! শুধু তো সাধারণ ছেলে নয় নীলু, কর্ণেল ছেলে। সুতরাং তার খাতিরই অন্যাদা। খোকা এলে তাকে সকলের বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। চাটুজ্জে মশাই-এর বাড়িতে আগে যেতে হবে। বাবা বলবেন—চাটুজ্জে মশাইকে প্রণাম করো, জ্যাঠামশাই-এর আশীর্বাদেই তুমি এত বড় হয়েছ—

চাটুজ্জে মশাই জিজ্ঞেস করবেন—বেশ বেশ খুব ভালো, ভালো থাকো বাবা, আরো বড় হও, আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হও, আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করো—

তারপর নিয়ে যাবেন মুখুজ্জে মশাই-এর বাড়িতে। এমনি করে সব বাড়িতে গিয়ে বড়দাকে দিয়ে সকলের পায়ের ধুলো নেওয়াবেন।

কত পরিকল্পনা বাবার। মা রান্না করছিল আর বাবা তাঁর এই সব পরিকল্পনার কথা আলোচনা করছিলেন।

একবার বললেন—মাংসতে যেন ঝাল দিও না বেশি বুঝলে, নীলু আবার ঝাল খেতে পারে না—

মা বললে—সে তোমাকে বলতে হবে না, সে আমি জানি—

—আর দেখ একটা ভুল হয়ে গেল।

—কী?

বাবা বললেন—খোকা যে আনারস খেতে ভালোবাসে—আনারসের কথা তো একেবারেই মনে ছিল না—

বলে আবার বাজারে ছুটলেন। এই রকম এক-একটা জিনিসের কথা মনে পড়ে আর সেইটে আনতে ছোটেন। সারা দিন কেবল এই-ই চললো। বাবারও বিশ্রাম নেই, মারও বিশ্রাম নেই। যখন সব কাজ শেষ হলো তখন ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা।

বাবা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন—এইবার বোধহয় কলকাতায় এসে পৌঁছেছে—

তারপর ঘড়িতে আটটা বাজলো। বাবা বললেন—এতক্ষণে বোধহয় রাণাঘাট পৌঁছেছে, আর এক ঘণ্টার রাস্তা।

রাণাঘাট থেকে বাজিতপুরে পৌঁছোতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। পিচের রাস্তা। জিপ-গাড়িতে করে আসবে লিখেছে একেবারে হু-হু করে এসে পৌঁছুবে। রান্না-বান্না সব তৈরি। মুখুজ্জে মশাই, চাটুজ্জে মশাই, গাঙুলী-মশাই, সব বাবার বন্ধুরাও বাড়িতে এলেন। নীলুকে দেখবেন। নীলুকে আশীর্বাদ করবেন। সবাই ঘড়ি দেখছেন।

আটটা বাজলো ঘড়িতে। ন'টা। এইবার আসার সময় হলো। বাবা
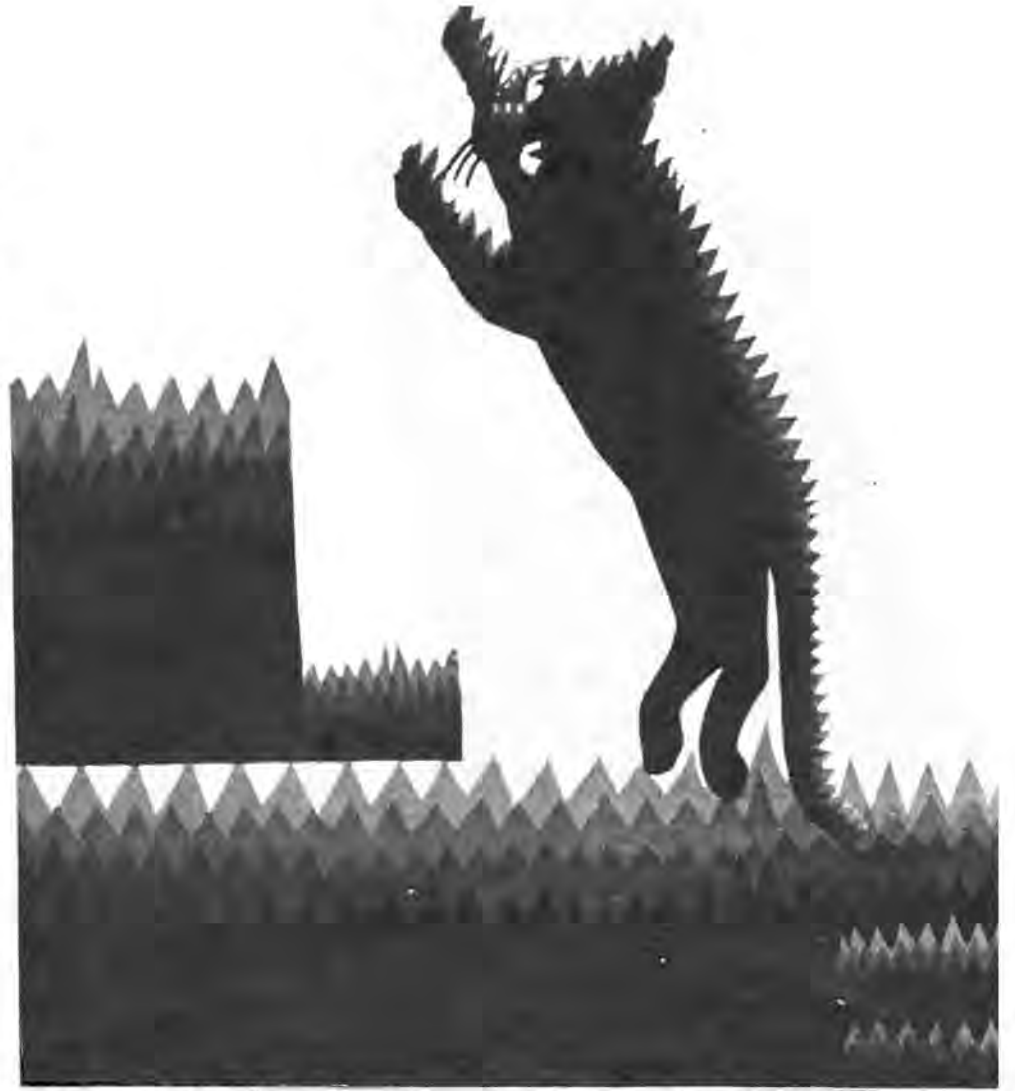
সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিলিটারি-গাড়ি হু-হু করে চলে আসবে। এ তো ট্যাক্সি নয়, বাসও নয় যে থেমে-থেমে আসবে। মিলিটারি গাড়িকে থামাবে এমন ক্ষমতা পুলিশেরও নেই। আর গাড়িতে যে আসছে সে-ও যে-সে লোক নয়, কর্ণেল। একেবারে মাথা! সকলের হেড্।

কিন্তু কোথায় কী? চারদিকে অন্ধকার। ঝাঁ-ঝাঁ অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

চাটুজ্জে-মশাই বললেন—অত ভাবছেন কেন মিত্তির মশাই, ট্রেন হয়ত কলকাতায় দেরি করে পৌঁছেছে—

তা হবে। বাবা ভাবলেন, তা হবে। রেলের তো ব্যাপার সব। আজকাল যুদ্ধের সময় সব কাজ কি আর ঠিক-মত চলছে! হয়ত ট্রেনই দেরি করে আসছে!

শেষকালে রাত দশটাও বাজলো। চাটুজ্জে মশাই, মুখুজ্জে মশাই, গাঙুলী মশাই একে-একে সবাই চলে গেলেন। আজ থাক। হয়ত মাঝ রাত্রে এসে পৌঁছোবে ছেলে। কাল সকাল বেলাই আবার না-হয় আসবো। তখন দেখে যাবো নীলুকে। আশীর্বাদ করে যাবো তাকে।

মা বললে—আরো কিছুক্ষণ দেখা যাক—এখনও আসবার সময় আছে, সে না এলে খাবো না—

বাবা বললেন—তা হলে বিলুকে খেতে দাও, ওর ঘুম পাচ্ছে, ও খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে যাক, নীলু এলে ওকে ডেকে তুলবোখন—

আমি বললুম—না, আমার ঘুম পাচ্ছে না, আমি এখন খাবো না, বড়দা এলে তখন একসঙ্গে খাবো—

তখন এগারোটা বাজলো ঘড়িতে। সারা পাড়াটা নিঝুম হয়ে এল। আমরা তিনজন, আমি বাবা আর মা, তিনজনেই বড়দার আশায় জেগে বসে রইলুম। কোথায় হঠাৎ কিছু শব্দ হয় আর আমরা আনন্দে চমকে উঠি। ভাবি ওই বুঝি বড়দা এলো।

কিন্তু না, একটা বেড়াল ছাদ থেকে ভাঁড়ার-ঘরের টিনের চালের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল, ওটা তারই শব্দ।

কিন্তু আর কতক্ষণ বসে থাকবো। বাবার মুখটা ক্রমেই গম্ভীর হয়ে আসছে। মা'র চোখ দুটো ছল্-ছল্ করতে সুরু করেছে।

বাবা মা'কে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—তুমি অত ভাবছো কেন, নীলু আসবে ঠিক, তুমি ভেবো না। মিলিটারি

না? হুট্‌ করে আসবো বললেই কি আর আসতে পারে? কাজ-কর্ম সব অন্য লোকদের বুঝিয়ে তবে তো আসবে! আর এখনই তো তার ঘাড়ে বেশি দায়িত্ব। এখন তো জাপানীরা যুদ্ধে হেরে গেছে। তোমার ছেলে কি সোজা ছেলে ভেবেছ? ব্রিটিশ রাজত্বটাই তো এখন নীলুর ওপর নির্ভর করছে, বলতে গেলে সে-ই তো সব একলা চালাচ্ছে—

বলতে বলতে হঠাৎ কী একটা যেন শব্দ হলো।

আমরা আবার চম্‌কে উঠলুম। ভাবলাম আবার হয়ত আর একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়েছে ভাঁড়ার ঘরের টিনের চালের ওপর!

কিন্তু না, হঠাৎ দেখি বড়দা!

—খোকা, তুই এলি? কী করে এলি? আমরা তো কই গাড়ির শব্দ পেলুম না।

বড়দা হো-হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো!

হাসি থামিয়ে বললে—আমি তো খিড়কীর পাঁচিল লাফিয়ে ঢুকেছি—

—কেন রে? সদর-দরজা তো খুলে রেখেছিলুম, খিড়কীর পাঁচিল ডিঙিয়ে এলি কেন?

বড়দা বললে—তোমাদের চম্‌কে দেবার জন্যে! যুদ্ধে গিয়ে আমাদের এ-রকম কত বাড়ির পাঁচিল ডিঙোতে হয়েছে, এ-সব অভ্যেস হয়ে গেছে আমার—

—কিন্তু গাড়ির শব্দ শুনতে পেলুম না তো কই?

বড়দা বললে—গাড়িটা মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিলুম। ওকে আবার এখখুনি কলকাতায় ফিরতে হবে, সেখানে অনেক জরুরী কাজ আছে আমাদের, আমি এটুকু হেঁটেই এলুম—

বাবা উঠলেন। বললেন—থাক থাক, এখন আর কথা নয়, তুমি জামা-কাপড় বদলে নাও, চান করবার গরম জল তৈরি, তারপর খেতে খেতে গল্প করা যাবে—

মা'র দিকে চেয়ে বললেন—দাও আমাদের সকলকে খেতে দাও—

আমি বড়দার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিলুম। কী চমৎকার দেখতে হয়েছে বড়দা'কে। ফরসা রং ছিল গায়ের, এখন তামাটে হয়ে গেছে। কিন্তু কী মজবুত শরীর, কী স্বাস্থ্য। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। গায়ে খাঁকি পোশাক। বুকে কতগুলো মেডেল, দু'কাঁধে কতগুলো স্টার। বড়দাকে দেখে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। আমারই তো বড়দা। আপন মায়ের পেটের বড় ভাই।

বড়দা আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—কী রে বিলু, তুই কত বড় হয়েছিস? লেখা-পড়া করছিস তো মন দিয়ে? খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া করবি, আর ফিজিক্যাল একসারসাইজ করবি, শরীরটাকে ফিট্‌ রাখবি। এ-রকম রোগা কেন তুই?

বলে আমার বুকে একটা ঘুঁষি মারলে।

মা বললে—নাও, অনেক রাত হয়ে গেল, তুই চান করে নে, খেতে খেতে গল্প করবি, এখন ওঠ—উঠে পড়—

বড়দা বাথরুমে গিয়ে চান করতে ঢুকলো। ততক্ষণে মা আমাদের সকলের খাবার দিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে বসে খেতে লাগলুম। বড়দা কত গল্প করতে লাগলো। কোথায় প্যারিস, কোথায় লন্‌ডন্‌ কোথায় ইটালী, আফ্রিকা। সব জায়গায় কী-কী ঘটেছে, সেখানে গিয়ে কী-কী দেখেছে তার গল্প বলতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কখন কবে কী বিপদের মধ্যে পড়েছে, কী করে হাজার হাজার জার্মানকে মেরেছে তারই গল্প। কী করে বর্মা মালয় সিঙ্গাপুর দখল করেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলতে লাগলো।

মা বললে—ওরে, গল্প এখন থাক, আগে খেয়ে নে, কাল সকালে উঠে যত খুশী গল্প করিস, শুনবো। ওদিকে রাত বারোটা বেজে গেছে তা জানিস?

কিন্তু বড়দা কি আর থামে? এত বছর পরে বাড়িতে এসেছে, এত বছর পরে ছুটি পেয়েছে। যত গল্প মনে জমে ছিল সব বলতে লাগলো।

শেষকালে যখন রাত একটা তখন বাবা বললেন—না না, আর নয় খোকা, তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে, তোমার ঘরে বিছানা করা আছে. সারাদিন খাটুনি গেছে, এখন ঘুমোও গে যাও—

বড়দা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর মা নিজেও খেয়ে নিলে। আমিও বাবার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আর আমার জ্ঞান নেই—

হঠাৎ সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে আমরা সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠেছি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কে?

—টেলিগ্রাম!

মা'ও অবাক হয়ে গেছে। মা-ও শুনতে পেয়েছে শব্দটা! বাবা মা আমি তিনজনেই জেগে উঠে সদর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছি। রাত তখন বোধহয় তিনটে। সেই অত রাত্রেই কার টেলিগ্রাম? নিশ্চয়ই খোকার! হয়ত খোকার ছুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। হয়ত ওপরওয়ালা সাহেব খোকাকে জরুরী তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। হয়ত যুদ্ধের কোনও জায়গায় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বাবার হাত কাঁপছিল। বাবা টেলিগ্রামের রসিদে সই করে খামটা নিয়ে খুলে ফেললেন।

না, এ তো বাবার নামেই টেলিগ্রাম। এসেছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে। তাতে লেখা আছে—আপনার ছেলে কর্ণেল মিত্র বর্মার রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু-বরণ করেছে—

মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—কীসের টেলিগ্রাম গো, কে পাঠিয়েছে—

বাবার গলা দিয়ে আর্তনাদের মত যেন একটা আওয়াজ বেরোল—ওগো, খোকা নেই—

—নেই মানে? নেই মানে কী? কী বলছো তুমি?

—কিন্তু খোকা যে ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে।

বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে এসে বড়দার শোবার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে মা-ও এল, আমিও এলুম।

কিন্তু কোথায় বড়দা? ঘরটা যে ফাঁকা, বড়দা যে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে, আমরা যে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলুম। তারপরে যে বড়দা ঘরে শুতে গেল। তাহলে কোথায় গেল সে? তাহলে রাত্রে কে এসেছিল? কার সঙ্গে এত কথা বললুম? সবই কি ভৌতিক কাণ্ড?

বাবা আর মা তখন সেখানেই অজ্ঞান অবস্থায় মূর্চ্ছা গেল।

এ সেই কতকাল আগেকার ঘটনা। তারপরে কত মাস কেটে গেছে, কত বছর কেটে গেছে। কত বইতে ভূতের গল্প পড়েছি, কত ভূতের গল্পও বন্ধুর মুখে শুনেছি। কখনও তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু আমার নিজের জীবনের ছোটবেলাকার এই ঘটনাটার রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি, এখনও বুদ্ধি-যুক্তি-বিজ্ঞান দিয়ে এই অলৌকিক ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা করতে পারিনি।

শেষে কী পুলিশ ডাকতে হবে?

কিন্তু পুলিশ এসেই বা কী করবে? এতো ইন্দিরা গান্ধীর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভা নয় যে পুলিশ এসে ভীড় সামলাবে, হট্টগোল থামাবে!

কমই বা কী? যে-পরিমাণ ছবি, ছড়া আর গল্প এসে ভীড় করেছে এবারের প্রতিযোগিতায়, সংখ্যায় তা বুঝি সেই ভীড়কেও ছাপিয়ে যাবে। দু-মাসের উপর কী যে নাকাল হয়েছে সারা দপ্তরের লোক সেই ভীড় সামলাতে।

তারপর শ্রেষ্ঠত্বের বিচার? ভালো করে প্রত্যেকটি ছবি দেখে, প্রত্যেকটি ছড়া গল্প প'ড়ে?

প্রতিযোগিতা

সিকি পরিমাণ দেখে আর পড়েই তো স্বাস্থ্যভঙ্গের অজুহাতে অবসর গ্রহণ করলেন দু-জন বিচারক। বাকী ক-জনকেও ধ'রে রাখা যেত না যদি না সময় মতন খাদ্যের অভ্যাস ও পরিমাণ তাঁদের পাল্টে দেওয়া হোত। সুষম খাদ্যের সতিই কী আশ্চর্য গুণ! শেষের দেড়মাস শুধুমাত্র হিমসিম দ্বিগুণ পরিমাণ খেয়ে তাঁরা কাজ করেছেন এবং তারপর নিচের এই ফলাফল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন।
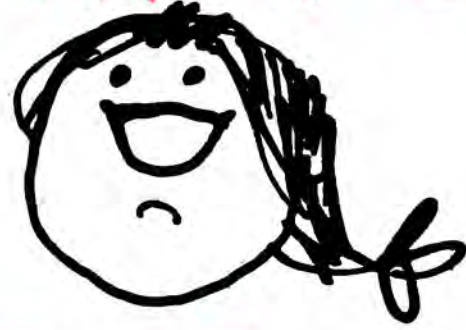
গল্প

১ম পুরস্কার **দুশো টাকা**
সেই লাল পেন্সিলটা
শ্রীমান তারককুমার রায় ॥ ৮ বছর
২য় পুরস্কার **দেড়শো টাকা**
চড়াই পাখির গবেষণা
শ্রীমতী মৌসুমী শেঠ ॥ ১০ বছর ৩ মাস
৩য় পুরস্কার **একশো টাকা**
নূপুর
শ্রীমান নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত ॥ ১১ বছর ১১ মাস
বিশেষ পুরস্কার **পঞ্চাশ টাকা**
স্বপ্ন দেখলাম
শ্রীমতী মহুয়া মিত্র ॥ ১০ বছর

ছড়া

১ম পুরস্কার **দুশো টাকা**
শ্রীমান সৌগত মিত্র ॥ ১০ বছর
২য় পুরস্কার **দেড়শো টাকা**
শ্রীমতী ঝুমুর সোম ॥ ১৫ বছর
৩য় পুরস্কার **একশো টাকা**
শ্রীমতী কেতকী নাগ ॥ ১৪ বছর
বিশেষ পুরস্কার **পঞ্চাশ টাকা**
শ্রীমতী মুক্তি সমাদ্দার ॥ ৯ বছর

রঙ্গীন ছবি

১ম পুরস্কার **দুশো টাকা**
শ্রীমান পরাগ রায় ॥ ৮ বছর ২ মাস
২য় পুরস্কার **দেড়শো টাকা**
শ্রীমতী পুপু রায় ॥ ৫ বছর ৩ মাস
৩য় পুরস্কার **একশো টাকা**
শ্রীমান আবদুল সালাম মহম্মদ নুরুল গণি ॥ ৯ বছর

সাদাকালো ছবি

পুরস্কার যোগ্য কোন ছবি আসেনি

প্রচ্ছদের জন্য বিশেষ পুরস্কার

বর্ণা সেনগুপ্ত ॥ ৯ বছর ৮ মাস
দুশো টাকা

ছবি
১ম পুরস্কার
পরাগ রায় ॥ ৮ বছর ২ মাস

সেই লাল পেনসিলটা

তারককুমার রায়

বিকেল পাঁচটায় ঘ্মটা ভেঙে গেল। চোখ খ্লেই দেখি বাবা গালে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। মা হয়ত বাবাকে সব বলেছে।

মা আজ আমাকে খ্ব মেরেছে। মায়ের কোনও দোষ নেই। আমিই দোষ করেছি। আমি চুরি করেছি—স্ব্রতর বড় লাল পেনসিলটা আমি চুরি করেছি।

প্রথম প্রথম স্কুলে দ্-একটা বড় পেনসিল হারিয়ে ফেলেছি বলে আজকাল বাবা আমাকে বড় পেনসিল নিয়ে যেতে দেয় না। বাড়িতে লিখতে লিখতে খানিকটা ছোট হয়ে গেলে সেই পেনসিল নিয়ে স্কুলে যেতে বলবে,—তার মানে প্রানো পেনসিল স্কুলে, আর নতুন পেনসিল বাড়িতে।

আমার বন্ধ্রা দ্টো তিনটে করে কেমন বড় বড় পেনসিল নিয়ে আসে, আর আমার বেলায় সেই ছোট আধখানা পেনসিল। যখন পেনসিলের মাপ হয় আমি রোজ হেরে যাই।

কয়েকদিন আগে আমি একটা পেনসিল এনেছিল্ম। ক্লাসের মেঝেতে পড়েছিল। মা পরের দিন স্কুলে দিতে গিয়ে দিদিমণিকে জমা দিয়ে দিল! আমাকে বলে দিয়েছে এবার কোনও দিন কিছ্ পেলে দিদিমণিকে জমা দিয়ে দিতে। আর আজই আমি স্ব্রতর পেনসিলটা টিফিনের সময় তার ব্যাগ থেকে নিয়ে নিয়েছি। বাড়িতে এসে ল্কিয়েও রেখেছিল্ম একটা জায়গায়, কিন্তু যত নষ্ট করলে আমার বোন রিন্ট্টা। তাকে পেনসিলটা একবার দেখিয়েছিল্ম, আর তারপরেই আমার মায়ের হাতে এই মার খাওয়া।

খানিকটা পরে শ্নতে পেল্ম বাবা ও মা দ্জনেই রেগে জোরে জোরে কথা বলছে। বাবা একট্ পরেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল: মনটা খ্ব খারাপ হয়ে গেল, আমার কান্না পেতে লাগল। আমি চুপ করে চোখ ব্জে শ্য়ে রইল্ম। মিনিট দশেক পরেই আবার সিঁড়িতে বাবার মত কার পায়ের শব্দ শ্নতে পেল্ম। বাবা আস্তে আস্তে ঘরে ঢ্কল। আমার কপালে হাত রেখে বলল, "দেখ, বাপি তোমার জন্য কি এনেছি!" চেয়ে দেখি এতগ্লো লাল, নীল নানা রঙের পেনসিল। বাবা বললে, "এগ্লো সব তোমার, আর কখনও কারও পেনসিল নিও না। কালই যার ঐ পেনসিলটা নিয়েছ তাকে ফেরত দিয়ে দিও।" এত আনন্দেও চোখ দিয়ে জল বেরোতে লাগল।

ঐদিন রাতেই আমার জ্বর এল। এক সপ্তাহ স্কুলে যেতে পারিনি। প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই শ্নল্ম স্ব্রত আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। তার বাবা দিল্লীতে বদলী হয়ে গেছে।

তারপর অনেকদিন হয়ে গেছে। তখন আমার বয়স ছিল চার—কেজি-তে পড়ি, আর এখন আমার বয়স আট বৎসর, হিন্দ্ স্কুলে পড়ি। আমি ক্লাসের মনিটার, ক্লাসে কেউ কিছ্ কুড়িয়ে পেলে আমাকে জমা দেয়, আমি দিদিমণিকে দিই।

স্ব্রতর সেই লাল পেনসিলটা এখনও আমার কাছে আছে। ওটা দিয়ে আমি একদিনও লিখিনি, কাউকে লিখতেও দিইনি। খ্ব যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি। কেন রেখেছি নিজেও জানি না। সেদিনকার কথাগ্লো মনে পড়লে মাঝে মাঝে মনটা কেমন হয়ে যায়, আর স্ব্রতর ম্খটা মনে পড়ে যায়।

এবারে গরমের ছুটির কয়েকদিন পরে আমি স্কুলে গেলুম। গিয়েই অরিন্দমের মুখে শুনলুম সুব্রত আবার আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঐদিন সুব্রত এল না। পরের দিন স্কুলে যাবার সময় ওর সেই পেনসিলটা নিয়ে গেলুম। সুব্রত আজ এসেছে। টিফিনের সময় আমি ওকে ছাদে নিয়ে গিয়ে সব কথা বললুম, আর পেনসিলটা ফেরত দিতে গেলুম; সুব্রত আমার হাতটা থামিয়ে দিয়ে বললে, "ওটা তোর কাছেই রাখ, আর তোরটা আমাকে দে, এই দুটো পেনসিল আমরা চিরকাল নিজেদের কাছে রেখে দেব।"

আনন্দে আমাদের দুজনের চোখেই জল। লোকে বলে, চুরি করলে পাপ হয়, শাস্তি পায়। আজ আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সেদিন এই চুরি করে আমি যত শাস্তি পেয়েছি, তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশী জিনিস আজ আমি পেয়ে গেছি।

চড়াই পাখির গবেষণা

মৌসুমী শেঠ

একদিন আমি ঘরে বসে পড়াশুনা করছি। এমন সময়ে কট্ কট্ শব্দে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা চড়াইপাখি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার উপর বসে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছে ও লাফাচ্ছে। লাফাচ্ছে বলেই কট্ কট্ শব্দ হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করে দেখে বুঝলাম এই চড়াইপাখিটি স্ত্রী চড়াই পাখি। পুরুষ চড়াই পাখি নয়। কারণ এই চড়াইপাখিটার গলায় কালো দাগ নেই। পুরুষ চড়াইপাখিগুলির গলায় কালো দাগ থাকে।

চড়াইপাখিটি সারাক্ষণ ওইরকম করছে বলে আমি একটা ছোট তোয়ালে দিয়ে শুধু আয়নার উপরটা ঢেকে দিলাম। ভাবলাম এবারে আর চড়াই-পাখিটা বিরক্ত করতে আসবে না। কিন্তু চড়াই-পাখিটার বুদ্ধি আছে। সে তোয়ালের সুতোয় ভর দিয়ে খোলা আয়নার সামনে ঝুলে পড়ে আবার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছে। তখন আমি একটা বড় তোয়ালে দিয়ে পুরো আয়নাটাই ঢেকে দিলাম। তারপর আবার পড়াশুনায় মন দিলাম।

হঠাৎ মা ডাকলেন। মার কাছে যাবার সময় বেসিনের উপরের আয়নাটার দিকে চোখ পড়ল। দেখি চড়াইপাখিটা সেইখানে গেছে। আমি তখন বেসিনের উপরের আয়নাটাও ঢেকে দিয়ে মাকে সব কিছু বললাম। মা বললেন—"হয়ত চড়াইপাখিটা আয়না নিয়ে গবেষণা করছে।"

সেই দিন দুপুর বেলা শুয়ে আছি। ঘুম আসছেনা। হঠাৎ দেখি চড়াইপাখিটা আবার এসেছে। কিন্তু এবারে আর আয়নার উপরে নয়। আয়না-টাকে যে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম সেই তোয়ালেটা আয়নাটার থেকে একটু ছোট ছিল। তাই সম্পূর্ণটা ঢাকা পড়েনি। তলায় একটুখানি ফাঁক থেকে গেছে। দেখলাম সেই ফাঁক দিয়ে চড়াই-পাখি গবেষণা করছে।

তারপরের দিন দেখি স্ত্রী চড়াইপাখিটা একা আসেনি। আরেকটা পুরুষ চড়াইপাখিকেও সঙ্গে এনেছে। বুঝলাম স্ত্রী চড়াইপাখিটা ছাত্রী ও পুরুষ চড়াইপাখিটা শিক্ষক। তারা দুজনে আয়নার উপর পাশাপাশি বসে কিচির মিচির করে কি সব বলছে। আয়নার পাশে একটা জানালা ছিল। আমি সেই জানলাটি বন্ধ করে দিলাম। তখন চড়াইপাখিটা অন্য জানালা দিয়ে আসতে শুরু করল।

তারপর দিন জানালাটি খোলাই ছিল। চড়াই-পাখিটা সকালের দিকে মাঝে মাঝে এলো। কিন্তু পরে আর এলো না। মা বললেন—"আমার মনে হয়, ওদের গবেষণা শেষ হয়ে গেছে। আরেকদিন এসে আমাদের তথ্য জানিয়ে যাবে।"

ছবি
২য় পুরস্কার
পুপু রায় ॥ ৫ বছর ৩ মাস

নূপুর
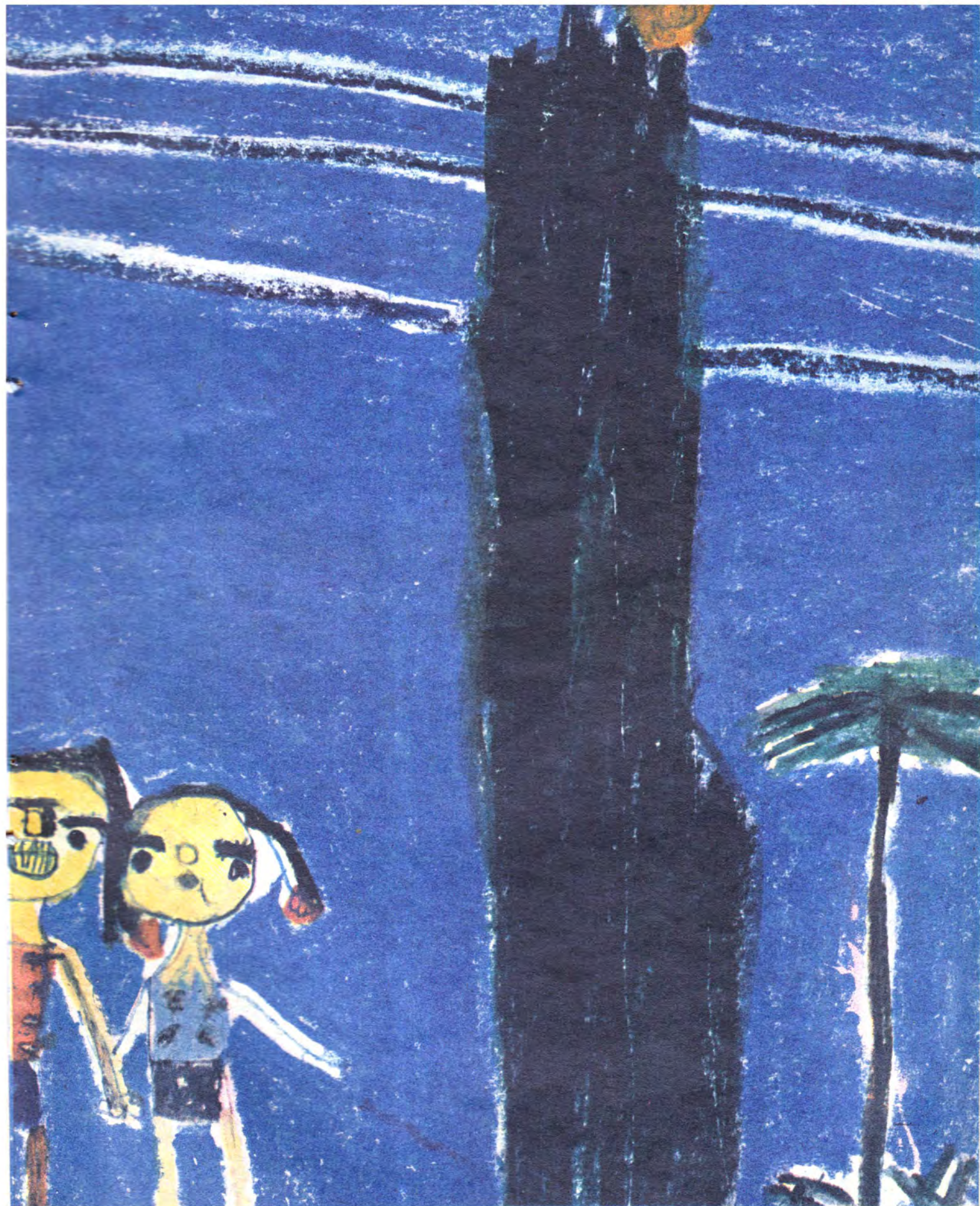
নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত

আমার বাবার বন্ধু শক্তিজ্যেঠুর দুই মেয়ে—টুলটুল আর নূপুর। টুলটুলটা ভালমানুষ গোছের। আমার সঙ্গেই ক্লাস সেভেনে পরে। আর নূপুর! বয়স তার চার বছর, এখনো ভাল করে কথা বলতে পারেনা—সব কথার মধ্যেই ল, ত, ধ, থ আর দ। কিন্তু তার দৌরাত্মি সকলকে টেক্কা দেয়। ওর যে কত সম্পত্তি! কোথায় খাটের কোনায় পলিথিনের প্যাকেটে কয়েকটা ভাঙা পেরেক, কোথায় বালিশের তলায় রুমালে বাঁধা কয়েকটা পয়সা, ভাঙা বাক্সে ভাঙা চক, ভাঙা পেন্সিল, ছেঁড়া পুতুলের হাত পা ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি। কেউ সেগুলো ধরলে পড়েই বাড়ি মাৎ। আমাদের বাড়িতে এলে প্রথম পাঁচ মিনিট বেশ ভদ্রভাবে চেয়ারে বসে থাকে তার-পরেই দৌড়ে স্নো'র শিশি থেকে একথাবলা স্নো নিয়ে সারা মুখে মাখে, যতগুলো, যতরঙের টিপ

আছে সবগুলো নিয়ে কপালে টিপ পরে। এরপর শুরু হয়—

"তাকেল ওপল ঐতা কি? লুদু? আমাকে দাও। ঐতা কি? চাইনীদ চেকাল্? আমি খেলব। ক্যালামেল গুতিগুলো একতু দাও না। ঐ পুতুলটা পেলে দাও। কোলে কোলব।"

আমরা যেটা খেলব সেটাই ওর চাই। শুধু চাই তাই না একেবারে বগলদাবা করে রাখবে। কারোকে ধরতে দেবেনা। নূপুরের দুটো বন্ধু আছে—শমিতা রায় আর শুশিতা রায়। কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে—"তমিতা লায় আল তুতিতা লায়।" আমরা ওকে খেপাবার জন্য বলি—"কি বলালি বমিতা লা আর তমিতা লা?" নূপুর বার বার উচ্চারণ সংশোধন করার চেষ্টা করে। অবশেষে রেগে গিয়ে কোঁকড়া-চুলো ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে—"তোকে থুনতে হবে না দা।" সম্প্রতি নূপুর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার সময় বাক্সটা কারো হাতে দেবে না। কারো হাত ধরেও যাবে না। ওর বন্ধু শমিতা অন্য সেকশানে পড়ে। নূপুর ক্লাসে টাস্ক দিলে চটপট সেটা করে খুব করুণ মুখ করে বলে—"সিস্তাল্ ওই ঘলে একটু তমিল কাতে গিয়ে বতবো?" আমরা গেলেই ওর স্কুলের খাতা নিয়ে এসে বলে—"দেখো ছব ভেলী গুদ্ ভেলী গুদ্ পেয়েথি।" প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব।

—টুলটুল চেঁচিয়ে উঠল—"নূপুর আমার পেন ধরেছিস কেন?"

—তোল মত বল হয়ে গেতি তাই।

—নূপুর পড়তে বস।

—আমি এখন ডাক্তালবাবু, ডাক্তালবাবু কি পলে?

—নূপুর রান্না ঘরে কি করছিস?

—বাবাল পান বানাত্তি।

—নূপুর রান্না ঘরে কি করছিস?

—বাথন ধুত্তি।

—নূপুর লোকজন এসেছে বাড়িতে, ছিছি একটা জামা গায়ে দে।

—আমার লদ্দা কলেনা।

একদিন আমরা ওদের বাড়ি গিয়েছি, সবাই খেলা করছি। ও কিছুতেই আমাদের খেলতে দেবে-না। রাগ করে আমরা জ্যেঠুর কাছে, জ্যেঠিমার কাছে ওর নামে নালিশ করে এলাম। খুব বকুনিও খেল। মুখ ভার করে কিছুক্ষণ বসে রইল। জ্যেঠিমার কাছে গিয়ে বলল—"আমাকে থবাই বকে, কেউ ভাল-বাতেনা।" জ্যেঠিমা বললেন—"তুই কেন কথা শুনিস না, দুষ্টুমি করিস। তাইতো লোকে তোকে বকে।" নূপুর সঙ্গে সঙ্গে বলল—"তুমি তো বকো; তুমি কি লোক? তুমি তো মা।" বলেই জ্যেঠিমার কোলে মুখ লুকিয়ে কি কান্না। এখন নূপুর অনেক ছড়া শিখেছে। আমরা গেলেই শোনায়। আর দিদিদের স্কুলে 'চণ্ডালিকা' দেখে এসে আজকাল সবসময়ই প্রায় কোমরে হাত দিয়ে নাচে আর বলে—"ওকে থুয়োনা থুয়োনা থি, ওহে তণ্ডালিনির ধি। ওর কথা আর কত বলব? আমরা ওকে যেমন ক্ষেপাই তেমন ভালও বাসি। আমরা দুই ভাই। আমাদের কোন বোন নেই তাই নূপুরকে আমাদের খু-উ-ব ভাল লাগে।

স্বপ্ন দেখলাম

মহুয়া মিত্র

হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম আমি ত্রিকূটকে ফোন করে বলছি—ত্রিকূট ভাই আমি একটু তোমার বাড়ি বেড়াতে যাব। ত্রিকূট বলল—বেশতো আসুন না। খুব খুশি হব। ত্রিকূট আমাকে আপনি করে বলল বলে আমার কিরকম যেন অবাক লাগল। বললাম—অমন আপনি করে বলছ কেন, তুমি করে বলবে। ত্রিকূট বলল—আস যদি খুশি হব। রঙ পেনসিল নিয়ে ত্রিকূটের বাড়ি চললাম। তবে রাস্তা দিয়ে নয় বাড়ির সামনের মাঠ ধরে সিধে চলে গেলাম। ত্রিকূটের বাড়ি গিয়ে ত্রিকূটকে বললাম—তোমার রঙটা ভীষণ ফিকে তো তাই একটু গাঢ় করে দিয়ে যাব। ত্রিকূট বলল—আসুন আসুন। ভালই হল আমার নতুন জন্ম হবে। ত্রিকূটকে বলেছিলাম আমাকে তুমি করে বলতে তবুও সে আমাকে আপনি করে বলল। বলল—আপনি বসুন আমি আসছি। আমি বললাম—না ভাই। আমি দেরী করব না। তোমাকে রঙ করে আবার ডিগরিয়ার বাড়ি যেতে হবে। শুনতে পেলাম খুব মিহি গলায় ত্রিকূট বলছে, আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে খুব অবাক লাগল। এতক্ষণ বেশ মোটা গলায় কথা বলছিল এর মধ্যে আবার সরু হয়ে গেল কি করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি—ওমা। আমার সামনে কেউ নেই। আমি নিজের সঙ্গেই কথা বলছি। আমার পাশে ত্রিকূটের সব থেকে ছোট্ট মাথাটা দাঁড়িয়ে আছে ভাবলাম বড় ত্রিকূট আবার কোথায় গেল। খুব জোরে ডাকলাম, বড় ত্রিকূট, ও বড় ত্রিকূট কোথায় গেলো। বড় ত্রিকূট কোন উত্তর দিল না। খালি কোথা থেকে যেন হো হো হো করে হেসে উঠল। একটু পরেই দেখি বড় ত্রিকূট আবার এসে গেছে। আমি বললাম—তুমি কোথায় গিয়েছিলে। সে বলল—এই আপনার জন্য একটু মিষ্টি আনতে। আমি বললাম—না না কোন দরকার নেই। একটু পরেই দেখি এক ঝুড়ি মহুয়া মাথায় নিয়ে কাল কুচকুচে ঘন লোমওলা একটা ভাল্লুক। ভাল্লুকটাকে দেখে আমার ভীষণ ভয় লাগল। ত্রিকূট বল—ভয় পাবেন না। ও আমার চর। শুনে আর ভয় করলাম না। ও বাড়ির দিদার কুকুর মুস্তিককে যেমন করে আদর করি ভাল্লুকটাকেও তেমনি মাথায় হাত দিয়ে আদর করলাম। ভাল্লুকটা দুই হাত উপরে তুলে জিভটা বার করে দাঁড়িয়ে থাকল। ত্রিকূট বলল—খান আমার গাছের মহুয়া। আমি বললাম—না মহুয়া আমি খাইনা। বড্ড মিষ্টি খেলে মাথা ধরে। ত্রিকূট বলল—সেকি আপনি নিজেই তো মহুয়া। খেলে মাথা ধরবে কেন। কিছু হবে না খান। কয়েকটা মহুয়া খেয়ে ত্রিকূটকে রঙ করে চলে আসার সময় বললাম— ত্রিকূট আজকে আর ডিগরিয়ার বাড়ি যাব না দেরী হয়ে গেছে। ত্রিকূট বলল—না না ডিগরিয়ার কাছে একবার যান। ও আপনাকে খুঁজছে। আপনার বাড়ির রাস্তাটা খুব সরু কিনা তাই ও যেতে পারছে না। এবার ডিগরিয়ার কাছে গেলাম। বললাম—সূর্যাস্তর সময় অত গাঢ় রঙ ভাল লাগেনা। তোমার রঙটা ফিকে করে দিচ্ছি। জামা খোল। ডিগরিয়া জামা খুলল। আমি ওর জামাটা কেচে ফিকে রঙ করে দিলাম। ডিগরিয়া সেটা পরে দুটো হাত বার করে ঘাড় ঘুরিয়ে—বাঃ বাঃ বলল। ওমা। ডিগরিয়ার হাত দুটো কত সরু। আমি বললাম—এবার যাই। ডিগরিয়া আমাকে তুমি করেই বলল—না যেও না। এতগুলো পলাশ ফুল দিয়ে বলল আমার তো কিছু নেই। তুমি এই ফুলগুলো নাও। আমি ফুল নিয়ে খুশি মনে বাড়ি চলে এলাম।

এরকম সাজান স্বপ্ন আমি এই প্রথম দেখলাম। আরো দেখতাম হয়তো। কিন্তু—আগুন আগুন—শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি মা ডাকছে, দেখবি আয়। আমরা তিনবোন জানলায় গিয়ে দেখি—শাল বনের ওপাশে পুবের আকাশে আগুন জ্বলছে।

ত্রিকূট আমাদের রিখিয়ার বাড়ির সামনে থাকে। আর ডিগরিয়া বিষ্ণুদের বাগানের পেছনে।

সৌগত মিত্র ॥ ১০ বছর

সাবান মেখে কালো মেঘের
বাচ্চা হোলো সাদা।
শিউলি ফুলে ডাকলো দিদি,
কাশফুলেরে দাদা॥
পুজোর ঢাকে পড়ল কাঠি
টাক্-ডুমা-ডুম্-ডুম্।
তাই বুঝি আজ মেঘ-ছানাদের
ফরসা হবার ধুম॥

ঝুমুর সোম ॥ ১৫ বছর

সাবান মেঘে কালো মেঘের
বাচ্চা হল সাদা,
আচ্ছা করে তাইতো সাবান
মাখল ঠাকুরদাদা!
ছিল বাঁটুল, লম্বা হল,
টাক মাথাতে চুল গজালো,
ঠানদি তবু চিনল, কারণ
নাক ছিল সেই খাঁদা!

কেতকী নাগ ॥ ১৪ বছর

সাবান মেখে কালো মেঘের
বাচ্চা হল সাদা—
ফরসা তবে হয়না কেন
কালো রাতের দাদা?
সূর্যি মামার রঙ যদি হয়
কয়লা মেখে কালো!
কয়লা তবে হয়না কেন
সাবান মেখে আলো?

মুক্তি সমাদ্দার ॥ ৯ বছর

সাবান মেখে কালো মেঘের
বাচ্চা হল সাদা
তাই না দেখে সোনার হরিণ
মাখলো গায়ে কাদা।
তাই শুনে তার মামা
গাইলো সারে গামা
নিজের সাদা বাচ্চাকে মেঘ বলল
'নবাবজাদা।'

ছবি
৩য় পুরস্কার
অবুল সালাম মহম্মদ নুরুল গণি ॥ ৯ বছর
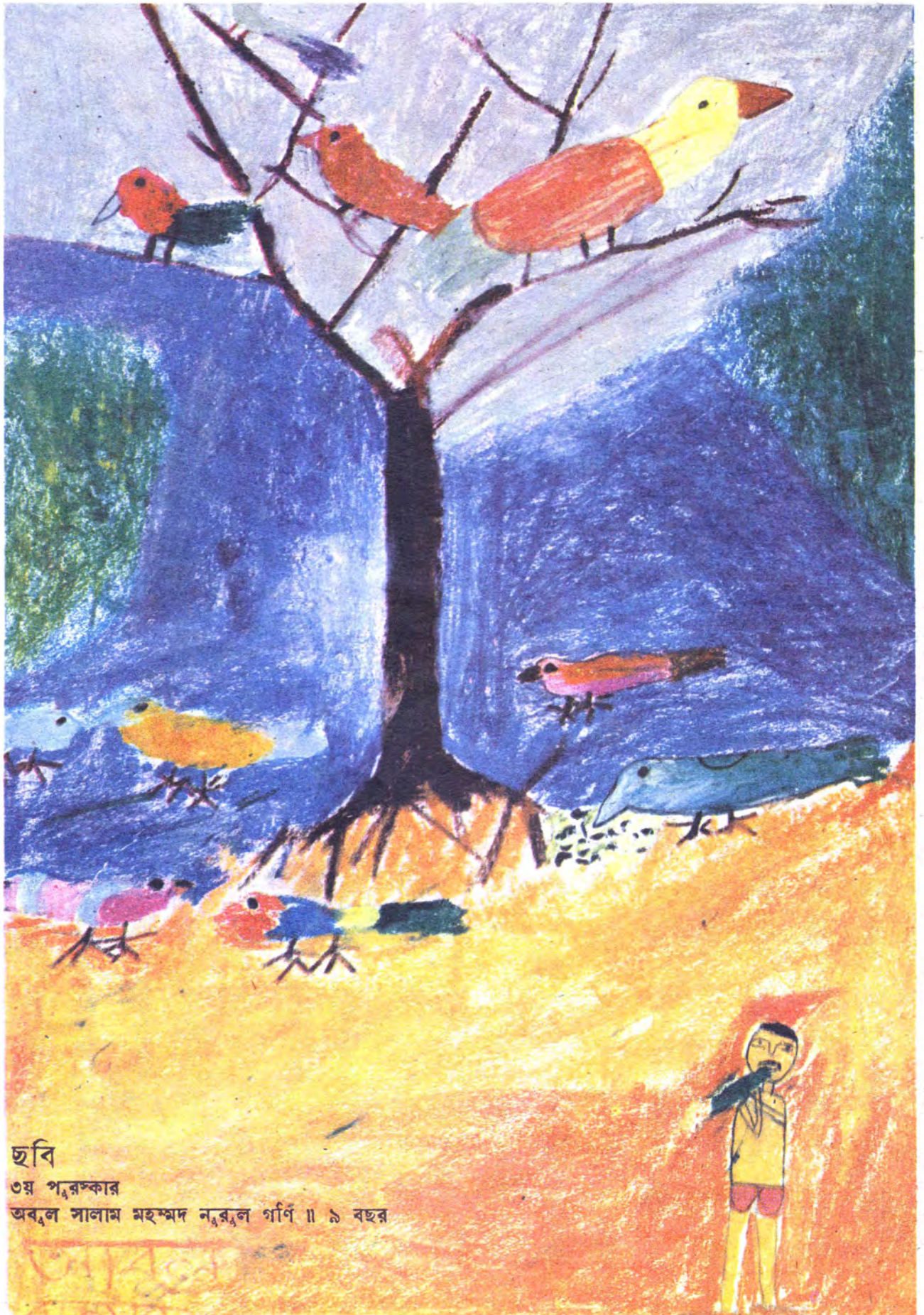
পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতার রাজকাহিনী

এই কলকাতা শহরে এক সময় অনেক রাজা ছিল, জানতো? সত্যি। তবে রূপকথার বইয়ে যে রকম সব রাজার গপ্পো থাকে, সে রকম নয়। তাঁদের সোনার সিংহাসন ছিল না। সোনার মুকুটও ছিল না মাথায়। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সাতমহলা রাজপুরী, কিছুই ছিল না এসবের। সৈন্যসামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে তাঁরা না যেতেন শিকারে না যেতেন যুদ্ধে। অথচ তাঁরা রাজা।

কলকাতার যিনি প্রথম রাজা, তাঁর নাম ছিল নবকৃষ্ণ। দেখতে শুনতে সাদামাঠা মানুষ। মাথাটা একেবারে চেঁছে-পুছে কামানো। কেবল পিছন দিকে এক গোছা টিকি। ঠিক যেন মরুভূমির মধ্যে এক ঝাড় পাম্পপাদপ। বেঁটেখাটো চেহারা। পরণে খাটো ধুতি। কাঁধে চাদর। খালি গা। রোজ গঙ্গাস্নানে যেতেন এই ভাবে। কেবল পিছন পিছন হাঁটতো প্রিয় চাকর কান্ত খানসামা। ছাতা দিয়ে প্রভুর মাথা বাঁচাতে। তবে এই পোশাক পালটে যেত যখন যেতেন রাজ দরবারে। এ রাজদরবার কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণের নিজের নয়। যে রাজার রাজত্বে বাস, তাদের। অর্থাৎ ইংরেজদের। তখন কলকাতায় ইংরেজদের রাজত্ব। ক্লাইভের আমল। ক্লাইভের ডাকেই রাজা নবকৃষ্ণকে যেতে হোতো রাজ কাজে। তখন মাথায় পাগড়ী। পায়ে লপেটা জুতো। মেরজাই বা বেনিয়ানের উপর চাপকান। আর কেবল রাজ-দরবারে যাওয়ার সময়েই ঝালর-ঝোলানো পাল্কী। তখন ইংরেজ কোম্পানী বা ক্লাইভের অনুমতি না পেলে কারুরই ঝালর দেওয়া পাল্কী চড়ার হুকুম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর, ক্লাইভের হাতের মুঠোয় যখন কলকাতার রাজ্যপাট, তখন রাজা নবকৃষ্ণই একমাত্র বাঙালী, যিনি হুকুম পেয়েছিলেন এই পাল্কী চড়ার।

রূপকথার রাজারা রাজা হয়েই জন্মায়। তাদের আর কষ্ট করে রাজা হতে হয় না। কিন্তু কলকাতার রাজাদের সকলকেই রাজা হতে হয়েছে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে, রোদ জল ঘেঁটে, মাথা ঘামিয়ে।

রাজা নবকৃষ্ণ তেমনি করে রাজা হয়েছেন। অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। বাবা রামচরণ দেবের গঙ্গার ধারে, গোবিন্দপুর গ্রামে বাস। নবাবের হেফাজতে চাকরী। হিজলী, তমলুক, মহিষাদল এই সব জায়গার নিমক মহলের কর আদায় করার কাজ। রামচরণের আচার আচরণ কাজ-কর্মে নবাব মহব্বত জঙ্গ ভারী খুশী। মানুষটা স্বভাবে খাটিয়ে। চরিত্রে খাঁটি। এঁকে তো তাহলে আরো উঁচু আসনে বসতে দিতে হয়। রামচরণকে তিনি করে দিলেন কটকের সুবেদারের দেওয়ান। কিন্তু এতটা উন্নতি সইবার মতো কপাল বুঝি ছিল না তাঁর। কটকে রওনা হওয়ার পথেই সুবেদারের দলকে আক্রমণ করল পিণ্ডারী দস্যুর

দল। রামচরণ মারা গেলেন।

রামচরণের সংসার বলতে তখন তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে আর বিধবা স্ত্রী। সংসারে নেমে এল দুঃখের দিনের কালো মেঘ। রূপকথার গপ্পে দুয়োরানীর যেমন করে দিন কাটে ঘুঁটে কুড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, তেমনি করে বিধবার সংসার ভাসতে লাগল টলমল টলমল দুঃখ কষ্টের ঢেউয়ে। ওদিকে ভাগীরথীর ঢেউ-ও আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ধাক্কা মারতে লাগল বাড়ির দরজায়। তখন সে বাড়ি ছেড়ে আবার কোনমতে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই বানানো হল কাছাকাছি। কিন্তু সে বাড়ি তৈরী হতে না হতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা এসে জানালে, এখান থেকে সবাইকে উঠে যেতে হবে। সে কি? উঠ্ বললেই ওঠা যায় নাকি? কোম্পানীর লোকেরা বললে, অত শত বুঝি না। এখানে কেল্লা হবে। ফোর্ট উইলিয়ম। জায়গা দরকার। তবে ক্ষতিপূরণ পাবে, নগদ টাকা। আর জমির বদলে জমিও।

কোথায় জমি? আড়পুলীতে। না, সে জমি পছন্দ হল না। তাহলে ঘর তোলা হবে কোথায়? আবার চলো গঙ্গার কাছেই, এ জমি বেচে দিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে জায়গা পছন্দ হয়ে গেল শোভাবাজারে। শুরু হয়ে গেল নতুন সংসার।

ঝড়ের রাতে মানুষ যেমন করে পিদিমের শিখাকে বাঁচায় দুহাতের আড়ালে, রামচরণের বিধবা স্ত্রী তেমনি করে বংশের কুলপ্রদীপদের বাঁচাতে লাগলেন স্নেহ যত্নের আড়ালে রেখে। বড় ছেলে রামসুন্দর একটু বড় হয়েই হয়ে গেলেন পঞ্চকোটের দেওয়ান। মেজ ছেলে মানিকচন্দ্র একদিন পেয়ে গেলেন নবাবের দরবারে কাজ। দিল্লীর বাদশার নজর পড়ল তাঁর উপর। লাভ হল 'রায়' উপাধি। সেই সঙ্গে এক হাজারী মনসবদারী।

এতদিনে সংসারের গায়ে পড়েছে সুখের আলো। মায়ের এখন ছোট ছেলে নবকৃষ্ণের দিকেই নজর। কি করে মানুষ করা যায়। বয়সে ছোট হলে কি হবে, ছেলেবেলা থেকেই নবকৃষ্ণ মেধায় বড়। দেখতে দেখতে যখন ষোলো বছর বয়স, তখন তিনি বাঙলা, পারসী, উর্দু আর আরবী ভাষায় পটু। সেই সঙ্গে কাজ চালানোর মতো ইংরেজীও দখলে।

কলকাতার নতুন বাজারে থাকেন লক্ষ্মীকান্ত ধর। লোকে বলে নকু ধর। মানুষটার যেন টাকার পাহাড়ে বাস। নামেও লক্ষ্মী। ঘরেও লক্ষ্মী। ইংরেজ কোম্পানী তখন বিপদে আপদে টাকা পয়সা ধার করতো এই নকু ধরের কাছ থেকে। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে খুব মাখামাখি। নবকৃষ্ণ একদিন এই নকু ধরকে গিয়ে ধরলেন যেমন তেমন একটা চাকরীর জন্যে। চাকরী জুটেও গেল কিছুদিনের মধ্যে। হেস্টিংসকে পারসী ভাষা শেখানোর চাকরী। হেস্টিংস তখন কোম্পানীর একজন নামমাত্র কেরানী।

এর তিন বছর পরে হেস্টিংসকে চলে যেতে হলো কাশিমবাজার কুঠীতে। নবকৃষ্ণও চললেন সঙ্গে। কিন্তু বেশীদিন থাকতে হল না। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি লেগেই ছিল। একদিন রেগে লাল হয়ে সিরাজ লালমুখো সাহেবদের তাড়া করলেন কাশিমবাজার কুঠি থেকে। সেই সময় নবকৃষ্ণ পালিয়ে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে, নকু ধরের ব্যবসায় কিছুদিন কাজ করতে না করতেই হঠাৎ একদিন ডাক এলো ইংরেজ কোম্পানীর দরবারে। কি ব্যাপার? না, একটা চিঠি পড়ে দিতে হবে। চিঠি? কোম্পানীর নিজেরই লোক রয়েছে। মুন্সী তোজাউদ্দীন। না, তাকে দিয়ে এ চিঠি পড়ানো বা উত্তর লেখা কোনটাই চলবে না। কারণ চিঠিটা পাঠিয়েছে রাজবল্লভ, মীরজাফরেরা। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চিঠি। মুসলমান মুন্সীকে পড়ালে গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

নবকৃষ্ণ পড়লেন। তার পরদিন থেকেই ৬০ টাকা মাইনের মুন্সিগিরির চাকরী পাকা হয়ে গেল। লোকের মুখে নবকৃষ্ণের নতুন নাম হল, নব মুন্সী।

এরপর ক্লাইভের নজর পড়ল তাঁর উপর। সিরাজউদ্দৌলা এসেছেন কলকাতা জয় করতে। হালসীবাগানে উমিচাদের বিরাট বাগানবাড়ি। সেইখানে নবাবের তাঁবু। ক্লাইভ বিপদ বুঝে সন্ধি করার জন্যে দূত পাঠালেন নবাবের কাছে। ওয়াল্শ আর স্ক্রাফ্টন। সঙ্গে নবকৃষ্ণ। হাতে নজরানা। নজর কিন্তু অন্য দিকে। তাঁবুর আশপাশে। ফিরে এসে নবকৃষ্ণ খবর দিলেন, যতটা ভয় দেখাচ্ছেন, নবাবকে অতটা ভয় করার কারণ নেই। তাঁর সৈন্যসংখ্যা এমন কিছু আহা মরি নয়।

গভীর রাত। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত অন্ধকার দিয়ে মোড়া। মানুষজন, যে যেখানে সে সেখানে ঘুমে অচেতন। ঠিক সেই সময়ে, যুদ্ধের নিয়ম কানুন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে, নবাবী সৈন্যের তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্লাইভ। বলে নয়, বাজী মাৎ করলেন ছলে।

তারপর পলাশীর যুদ্ধ।

একটা পুরনো যুগের সূর্য অস্ত গেল যেন। তার শেষ লাল রশ্মিটুকু লালবাগের আমবাগানে ধুলোয় মাটিতে পড়ে রইল লাল রক্তের ফোঁটা হয়ে।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ।

ইংরেজ সেনাপতিরা চললেন নবাবের রাজকোষের দিকে। লুটের মাল ভাগ বাটোয়ারা হবে। নবাবের রাজকোষ। মনি মুক্তো হীরে জহরতের না জানি কত ছড়াছড়ি। কিন্তু সিন্দুকের ডালা খুলে সকলেরই আকাশে চোখ। এ কি! এতো একরকম ফাঁকা বললেই চলে। সব মিলিয়ে মাত্র দু কোটী টাকার মতো হবে হয়তো। এ যেন গোগ্রাসের বদলে গণ্ডূষ। যাই হোক্, রাজকোষের টাকা রাজ পুরুষেরা যে যার ভাগ করে নিয়ে বিদায় হলেন।

মীরজাফর জানতেন, সিরাজের গুপ্তধনের খবর। ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে গেলে, তিনি চুপি চুপি খুললেন সেই লুকনো কোষাগারের দরজা। সোনা রুপো হীরে জহরত মিলিয়ে প্রায় আটকোটী টাকার মতো ধনরত্ন। ভাগ হল চারজনের মধ্যে। মীরজাফর আর তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর। আমীর বেগম খাঁ। দেওয়ান রামচাঁদ রায় আর মুন্সী নবকৃষ্ণ। রামচাঁদ রায় পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো হাতে পেয়ে গেলেন চাঁদের টুকরো সৌভাগ্য। আনন্দুলে ফিরে গিয়ে তিনি হাঁকালেন পাকা বাড়ি। নবকৃষ্ণ ফিরে এসেই গড়লেন ঠাকুর পুজোর দালান। দুর্গাপুজোর আর মোটে তিনমাস বাকী। যেমন করে হোক এরই মধ্যে নতুন চণ্ডীমণ্ডপ খাড়া করে আরাধনা করতে হবে দেবী দশভূজার। তাই হল।

কলকাতার মানুষ সেই প্রথম দেখল, হ্যাঁ পুজো কাকে বলে। ১৫ দিন ধরে উৎসব। একদিকে পুজো-আচ্চা, চণ্ডীপাঠ, ধূপ, ধুনো ঢাক ঢোল, ব্রাহ্মণ ভোজন, দরিদ্রদের জন্যে দানছত্র। আবার এরই উল্টোদিকে নাচ গান আমোদ আহ্লাদের অথৈ—আসর। মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী থেকে এসেছে বাঈজীরা। হৈ হৈ রৈ রৈ কান্ড। ক্লাইভ পর্যন্ত ছুটে এসেছেন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে নাচ দেখতে, খানা খেতে।

১৭৬০। ক্লাইভ চলে গেলেন স্বদেশে। পাঁচ বছর পরে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কারণ কলকাতায় তখন যে অরাজক অবস্থা কঠোর ক্লাইভ ছাড়া সামলানো যাবে না। বিলেতের ডিরেক্টররা তাই আবার পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

ক্লাইভ কলকাতায় এসে যখন যে কাজ করেন, মুন্সী নবকৃষ্ণ সব সময়ে তাঁর সঙ্গে। দিল্লীর বাদশা শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দীনের সঙ্গে সন্ধি হবে। সন্ধির বয়ান লিখবে কে? নবকৃষ্ণ। দূত হয়ে নবাব দরবারে দাঁড়াবে কে? নবকৃষ্ণ। বেনারসের বলবন্ত সিং, বিহারের সেতাব রায় এদের সঙ্গে কোম্পানীর বোঝাপড়া পাকাপাকি করবে কে? নবকৃষ্ণ।

ক্লাইভ এতদিনে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান। বাদশাকে বছরে খাজনা দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা। মুর্শিদাবাদের নবাব শুধু নাম কা ওয়াস্তে সুবেদার।

কলকাতার নবাব হয়ে ক্লাইভের প্রথম মনে পড়ল নবকৃষ্ণের কথা। লোকটা ইংরেজদের জন্যে কী না করেছে। তার জন্যে ইংরেজদের এবার কিছু করা উচিত।

কলকাতার মানুষ একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খবর পেল, মুন্সী নবকৃষ্ণ চলেছেন রাজা হতে। হ্যাঁ। রাজাবাহাদুর। ক্লাইভ তার জন্যে দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন এই উপাধি, আর সেই সঙ্গে পাঁচ হাজারী মনসবদারী। সেই সঙ্গে পেয়েছেন ঝালরদার পাল্কী আর নাকাড়া ব্যবহারের অধিকার। তাঁর অধিকারে ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী।

বছর পোয়াতে না পোয়াতেই আবার আর এক কাণ্ড। রাজা থেকে মহারাজা। এবার ছ হাজারী মনসবদারী। ৪০০০ হাজার অশ্বারোহী রাখারও অধিকার সেই সঙ্গে।

ক্লাইভ ডাকলেন দরবার। উপাধি বিতরণের উৎসব। কলকাতার যেখানে যত ইংরেজ সবাই সেদিন হাজির। ক্লাইভ নিজের হাতে উপহার তুলে দিলেন একে একে। প্রথমে পারসী ভাষায় নাম খোদাই করা সোনার পদক। তারপর দামী দামী পোশাক আশাক। তারপর হস্তী, অশ্ব, তরবারি, ঢাল, চামর, শিরপ্যাচ, ছত্র, ঝালরদার পাল্কী, ঘড়ি, কুণ্ডল, হীরে, মুক্তো, রত্নখচিত অলঙ্কার।

দরবার যখন শেষ, ক্লাইভ নিজে হাত ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলেন ঝলমলে পোষাকে সাজানো হাতির উপরে, রূপোর ঝিকমিকে হাওদায়। যেন বর চলেছেন বিয়ে করতে। বাজছে কাড়া নাকাড়া। তার সঙ্গে বিলেতী বাজনাও। সামনে পিছনে অশ্বারোহী, পদাতিক, আশা বরদার এমনি কত। পথের দুধার লোকে লোকময়। মানুষে তৈরী সাত সাগর।

রাজা নবকৃষ্ণ ও কান্ত খানসামা

রাজা থেকে মহারাজা। যত মান বাড়ে, তত দানও বাড়ে নবকৃষ্ণর। মায়ের শ্রাদ্ধ। সে এক এলাহি কাণ্ড। গোড়ায় ঠিক ছিল, খরচ করা হবে ন' লক্ষ টাকা। কিন্তু শ্রাদ্ধ যত গড়ায়, দেখা যায় খরচ লক্ষ্যহীন। শোভাবাজার ভরে গেছে গরীব দুঃখী কাঙালী মানুষে। বাজারে আর কেনার মতো চাল ডাল নেই। কলাপাতাও উধাও।

মায়ের শ্রাদ্ধের পর মেয়ের বিয়ে। মেয়ের বিয়ে গেলো তো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। তারপর তো রয়েছে বছর বছরের দুর্গা-পুজো। আর রয়েছে সারা বছর ধরে বাড়িতে গান বাজনার আসর। তখন যাঁরা সব সেরা গাইয়ে, যেমন নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রাজবাড়িতে তো এঁদের নিত্য আনাগোনা।

নবকৃষ্ণ যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর সাত মহলে সাতটি স্ত্রী। এক দত্তক পুত্র। নাম গোপীমোহন দেব। তাঁর ছেলে রাধাকান্ত। আর নবকৃষ্ণের নিজের ছেলে রাজকৃষ্ণ। এঁরাও রাজা হয়েছেন, একে একে রাজকৃষ্ণ যখন শিশু তখনই নবকৃষ্ণ তাঁর জন্যে দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন 'রাজা বাহাদুর' খেতাব। কিন্তু রাধাকান্ত রাজা উপাধি অর্জন করেছিলেন নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বদলে

অনেক পরিণত বয়সে। রাজা হয়েছিলেন আরো অনেকে। যেমন রাজা সুখময় রায়। কলকাতাতে টানা পাখা তিনিই চালু করেছিলেন প্রথম। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এমনি করে কত রাজারই নাম করা যায়। রাজা অনেক। প্রিন্স কেবল ছিলেন একজন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর। যাঁর নাতি রবীন্দ্রনাথ।

এক সময়ে কলকাতায় লেগে গিছল রাজায় রাজায় যুদ্ধ। এদিকে এক রাজা, প্রগতিশীল। ওদিকে আর এক রাজা, রক্ষণশীল। একদিকে রাজা রামমোহন আর একদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব।

রামমোহন মেয়েদের লেখাপড়ার পক্ষে। রাধাকান্ত বিপক্ষে। পুরোপুরি স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে নন। ঘরের মেয়েরা ঘরের মধ্যে বসে লেখাপড়া করুক। পর্দা ঠেলে, দরজা খুলে তারা বাইরের আলো বাতাসের পৃথিবীতে বেরিয়ে আসবে, এতটা সইতে তিনি নারাজ। সতীদাহ, বিধবা বিবাহ এসবেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। থাকলে কি হবে, তখনকার নতুন কাল যেভাবে যেমুখো ডালপালা ছড়িয়ে ফুল ফোটাতে চায়, তাকে অন্য মুখে কি কেউ ঘোরাতে পারে।

তাই কলকাতার নতুন কাল এগিয়ে চলল তার নতুন রাজার হাত ধরে। সে রাজার নাম রামমোহন।

হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের লাগোয়া রাধানগর গ্রামের ছেলে। বংশের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের শাঁকাসা গ্রামে। বংশের আদি পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মুর্শিদাবাদ নবাবের তহশীলদার। উপাধি পেয়েছিলেন রায়। রাজকর আদায় করতে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে চোখে ভাল লেগেছিল খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রাকৃতিক শোভা। আকাশ মাটি গাছপালা নদী নালা সব মিলিমিশে মন কেড়ে নিল তাঁর। বৃদ্ধ বয়সে ঐখানেই গড়লেন বসতবাটি। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন ছেলে। অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ আর ব্রজবিনোদ।

এই ব্রজবিনোদ যখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে নিয়ে আসা হল ভাগীরথীর তীরে। তখন এই রকম রেওয়াজ ছিল। মৃত্যুর দিকে যাঁর পা বাড়ানো, তাঁর পা ছুঁইয়ে রাখা হল গঙ্গাজলে। একে বলা হল 'গঙ্গাজলী'। সেই সময়ে কাছাকাছি চাতরা থেকে শ্যাম ভট্টাচার্য এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। দুহাতে নমস্কার। দুচোখে মিনতি। কি চাই? আজ্ঞে চাই একটা প্রতিশ্রুতি। কিসের? আমার একটা বিনীত প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে আপনাকে। কি প্রার্থনা?

আপনার তো সাত পুত্র। তাদের যে কোন একজনের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিয়ে দেন।

ব্রজবিনোদ সাত ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। কে রাজী আছ? একে একে ছয় ছেলে এক বাক্যে জানিয়ে দিলে তারা কেউ রাজী নয়। কারণ তারা বৈষ্ণব। শ্যাম ভট্টাচায্যিরা শাক্ত। কুল-ধর্মে জল ঢালতে কেউ রাজী নয় তারা। শ্যাম ভট্টাচার্যের মন বিষাদে কালো, সেই সময় এগিয়ে এলো ছোট ছেলে রামকান্ত। বিয়ে হয়ে গেল। কন্যার নাম তারিণী। ডাক নাম ফুল ঠাকুরানী। রামকান্তের এক মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়ে বড়। বড় ছেলের নাম জগন্মোহন। ছোট রামমোহন।

রামমোহন যখন নিতান্ত বালক সেই সময় মায়ের সঙ্গে এসেছেন দাদুর বাড়িতে। দাদু একদিন পুজো-আচ্চা শেষ করে নাতির হাতে দিয়েছেন পুজোর প্রসাদ খেতে। তার মধ্যে ছিল বেল পাতা। বালক রামমোহন প্রসাদের সঙ্গে বেলপাতাও চিবিয়ে খাচ্ছে দেখে তারিণীদেবী ছুটে এসে মুখ থেকে কেড়ে নিলেন সেই পাতা। ফেলে দিলেন দূরে, ছুঁড়ে। আর বকাবকি করলেন বাবাকে। ঐটুকু দুধের ছেলেকে কেউ বেলপাতা দেয় খেতে? শ্যাম ভট্টাচার্য শাক্ত। রাগ জ্বলে উঠল নিমেষে চোখে মুখে। তিনি অভিশাপ দিলেন, যে ছেলের জন্যে তোর এত গর্ব, সে একদিন বিধর্মী হবে। অভিশাপ শুনে মেয়ে লুটিয়ে পড়ল বাপের পায়ের নীচে, মাটিতে। বাবার চোখেও তখন অনুতাপের জল। তিনি বললেন, বিধর্মী হবে ঠিকই, তবে বিখ্যাতও হবে বিশ্বভুবনে।

রামমোহনের লেখাপড়া শুরু হল গাঁয়ের পাঠশালায়। ইয়া বড় মাথা। মাথা ভর্তি বুদ্ধি। যেই না ন' বছর বয়সে পা, রামকান্ত ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন পাটনায়। আরবী আর ফার্সীতে পাকাপোক্ত না হলে রাজকাজ জোটে না। আর ঐ দুটো ভাষা শেখার ব্যবস্থা পাটনাতেই ভাল। তিন বছর ধরে পাটনায় চলল আরবী ফার্সী শেখা। এরই মধ্যে পৃথিবীর সব দিকপাল লেখক যেমন ইউক্লিড, এ্যারিস্টটল, এ'দের বই পড়া শেষ। কোরাণ কণ্ঠস্থ। এদিকে রামায়ণতো জিভের ডগায়। রোজ ভাগবত পাঠ না করে জল খান না। যখন ১২ বছর বয়েস, তখন রামমোহনকে কাশীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল সংস্কৃত শিখতে। সেখানে গিয়ে উপনিষদে হাতে খড়ি। সেইখানেই চোখে পড়ল এক মন্ত্র, একমেবাদ্বিতীয়ম্। কাশী থেকে ফিরেই লাগল বাপ আর ছেলের তর্কযুদ্ধ। বাবা গোঁড়া হিন্দু। ছেলে হিন্দু ধর্মের পুতুল পুজোর ঘোর বিরুদ্ধে। ১৬ বছর বয়সেই রামমোহন লিখে বসলেন একটা বই। হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। রামকান্ত এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে তাড়িয়ে দিলেন ছেলেকে বাড়ি থেকে।

রামমোহন ভ্রূক্ষেপহীন। সোজা হাঁটা দিলেন হিমালয়ের দিকে মুখ করে। সেখান থেকে তিব্বত। তখন সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল হিমালয়ের পরেই পৃথিবী শেষ। তিব্বতে গিয়ে চলল বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ। কিন্তু বিপদ সেখানেও কম নয়। তিব্বতীরা যখন শুনলে রামমোহন বৌদ্ধধর্মের দোষ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, শুরু হয়ে গেল নানান রকম অত্যাচার। বেশী বকলে মেরেও ফেলা হবে প্রাণে। তবু রামমোহন যে মরলেন না, সে হোল তিব্বতী মেয়েদের মমতায়। সেই থেকে রামমোহনের বুকের মধ্যে নারী জাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আর সচেতনতা।

ওদিকে রাজারাম ব্যস্ত। রামমোহন কোথায় গেছে ফিরিয়ে আনো। আহা, ঐটুকু ছেলে। কোথায় ঘুরছে অনাদরে, অনাহারে। ১৬ বছরের ছেলে ঘরছাড়া হয়ে ঘরে ফিরে এল ২০ বছর বয়সে। হারানিধি ফিরে পেয়ে সারা বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। ক'দিন যেতে না যেতেই বেজে উঠল বিয়ের সানাই।

বিয়ে কিন্তু রামমোহনের একটা নয়। তিনটে। প্রথম স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সে। তারপর বর্ধমানের মেয়ে। তারপর ভবানীপুরের মেয়ে উমা দেবী। বিয়ের পর আবার সেই একই ইতিহাস। ধর্ম নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি। আবার তিনি ছেলেকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। কিছুকাল পরে মারা গেলেন রামকান্ত। বিষয় সম্পত্তি তাঁর আগেই ভাগ করা, তিন সন্তানের নামে। ফুল ঠাকুরানী রামমোহনকে দেখেন বিষ-নজরে। তিনি ছেলের নামে মামলা জুড়ে দিলেন সুপ্রীম কোর্টে। পাছে বিধর্মী ছেলে বাপের বিষয় পায়। মামলায় রামমোহনই জিতলেন। জিতলে হবে কি মায়ের নির্যাতন, পাড়া-পড়শীদের উৎপাত, অভদ্র আচরণ, অত্যাচার প্রতিদিন তাড়া করে চলল তাঁর পিছনে। রামমোহন কিন্তু নির্বিকার। মায়ের

প্রাচীন কলকাতার গঙ্গাতীর

জমিদারীর এলাকা ছাড়িয়ে রঘুনাথপুরের শ্মশানের উপর বাড়ি বানিয়েছেন বাড়ির সামনে মঞ্চ। তার গায়ে লেখা 'ওঁ তৎসৎ' আর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ইতিমধ্যে সরকারী চাকরীতে উন্নতি করেছেন অনেক। যে ইংরেজী ভাষা আগে একেবারেই জানতেন না এখন সে ইংরেজীতেও [illegible] নিয়েছেন বড় ছেলে রাধাপ্রসাদের বয়স হয়ে গেছে ৪২। এই সময় চলে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে জড়িয়ে পড়লেন সমাজ কল্যাণের বড় বড় কাজে। প্রথমেই গড়লেন 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা। এখানে আলোচনা হতো নিরাকার ঈশ্বর নিয়ে। সেটা ১৮১৯ সাল। কলকাতার যাঁরা খাঁটি হিন্দু তাঁরা এই আত্মীয় সভার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। একদিন শুরু হয়ে গেল তর্কযুদ্ধ মহাসভা ডেকে। রাজা [illegible] কলকাতার বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের নিয়ে সদলবলে হাজির। তর্ক যখন শেষ, তখন দেখা গেল কলকাতার সেরা পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর মাথা নামানো মাটির দিকে।

১৮২৮-এ রামমোহন গড়লেন ব্রাহ্মসমাজ। ওদিকে চলেছে সতীদাহ প্রথাকে চিরকালের জন্যে তুলে দেবার আন্দোলন। সতীদাহ, বহু বিবাহ, হিন্দু সমাজের যেখানে যত অন্যায়, রামমোহন সবেরই বিরুদ্ধে। তবু বিশেষ করে সতীদাহ-টাকে বন্ধ করার জন্যে যে উঠে পড়ে লাগা তার কারণ ছিল নিজের বৌদিকে তিনি পুড়ে মরতে দেখেছিলেন চোখের সামনে। সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা। একে বন্ধ করবোই। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যেও আগ্রহ উদ্যমের অন্ত নেই। ইংরেজী ভাষায় লোকে লেখাপড়া শিখবে, এটাও ছিল তাঁর গভীর ইচ্ছে।

নিজের প্রাণপণ চেষ্টায় দীর্ঘদিনের সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন জয়ী হলেন রামমোহন। লর্ড বেন্টিংক-এর আমলে, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গেল আইন করে। কলকাতায় একদিকে চলল তুমুল আনন্দ উৎসব। আরেক দিকে চলল নিন্দা আর সমালোচনার কাদা ছিটোনো। সেই সঙ্গে ছড়া, কবিতা, গান লিখে রামমোহনকে ধিক্কার।

এর এক বছর পরেই পা বাড়ালেন বিলেতের দিকে। আর আগেই তাঁর মাথায় দিল্লীর বাদশা পরিয়ে দিলেন 'রাজা' উপাধির মুকুট। রামমোহনের মনে ইচ্ছেটা ছিল অনেকদিনের। বিলেত যাবেন, সে দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের আচার ব্যবহার, ধর্মচিন্তা, রাজনীতির ধারণা—এ বিষয় জানতে বুঝতে। এই ইচ্ছের কথা শুনেই, চিন্তার দিক থেকে যাঁরা সেকেলে, তাঁরা জ্বলে উঠেছিলেন তেলে বেগুনে। ছিঃ ছিঃ! হিন্দুর ছেলে যাবে ম্লেচ্ছদের দেশে! কী অকম্মাটা ছিল তখন দেশের। যেন কালোয় কালোময়।

রামমোহনের বিলেত যাওয়ার বাসনা পুরিয়ে দিলেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ আকবর। ইংরেজ গভর্নমেন্টকে তাঁর ছিল কিছু অভিযোগ জানানোর। ইংরেজরা বছরে বছরে যে টাকা বৃত্তি দেবে বলেছিল, দিচ্ছে না। তারই প্রতিকারের জন্যে লোক পাঠানো।

বিলেতে যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গী হোলেন পালিত পুত্র রাজারাম। আর দুই বন্ধু। আর ছিল দুটি গাই গরু। জাহাজের নাম 'আলবিয়ান'। ৪ মাস ২৩ দিন সমুদ্র সাঁতার দিয়ে আলবিয়ান এসে থামল লিভারপুলে। তারপর শুধু জনসভা, আর প্রশংসা আর নিমন্ত্রণ। লিভারপুল থেকে লণ্ডন। সেখানেও সম্মানের ছড়াছড়ি। যেন ইংল্যান্ড জয় করতে এসেছেন কোন দিগ্বিজয়ী রাজা। ইংলণ্ডের রাজা প্রকাশ্য ভোজসভায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে স্বীকার করে নিলেন তাঁর 'রাজা' উপাধি।

লণ্ডন থেকে ফ্রান্স। সেখানেও একই দৃশ্য। একই রকম সমাদর জানানোর ঘটা। ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপের সঙ্গে ভোজ।

ফ্রান্সে মাত্র এক বছর। তাতেই ফরাসী ভাষা শিখে নিলেন সহজে। ফ্রান্স থেকে যখন আবার ফিরে এলেন ইংলণ্ডে, তখন শরীর গেছে ভেঙে। হঠাৎ একদিন জ্বর দেখা দিল গায়ে। জ্বর থেকে হয়ে গেল ধনুষ্টংকার। হাজার চিকিৎসাতেও বাঁচানো গেল না। দিনটা ছিল ১৮৩৩-এর ১৮ ই অক্টোবর। শুক্রবার। ব্রিস্টল শহরের স্টেপলটন্ গ্রোভ-এর কাছাকাছি খৃষ্টানদের সমাধির জায়গায় তাঁর দেহকে সমাধি দেওয়া হল। পরে এই সমাধি সরিয়ে নেওয়া হয় আরনোস ভেল-এ। সেটা করেন প্রিয় বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, নিজের বিলেত ভ্রমণের সময়। রামমোহন যেন জন্মেছিলেন রাজা হবার জন্যেই। চেহারাতেও

সেকালের সতীদাহের প্রাচীন ছবি
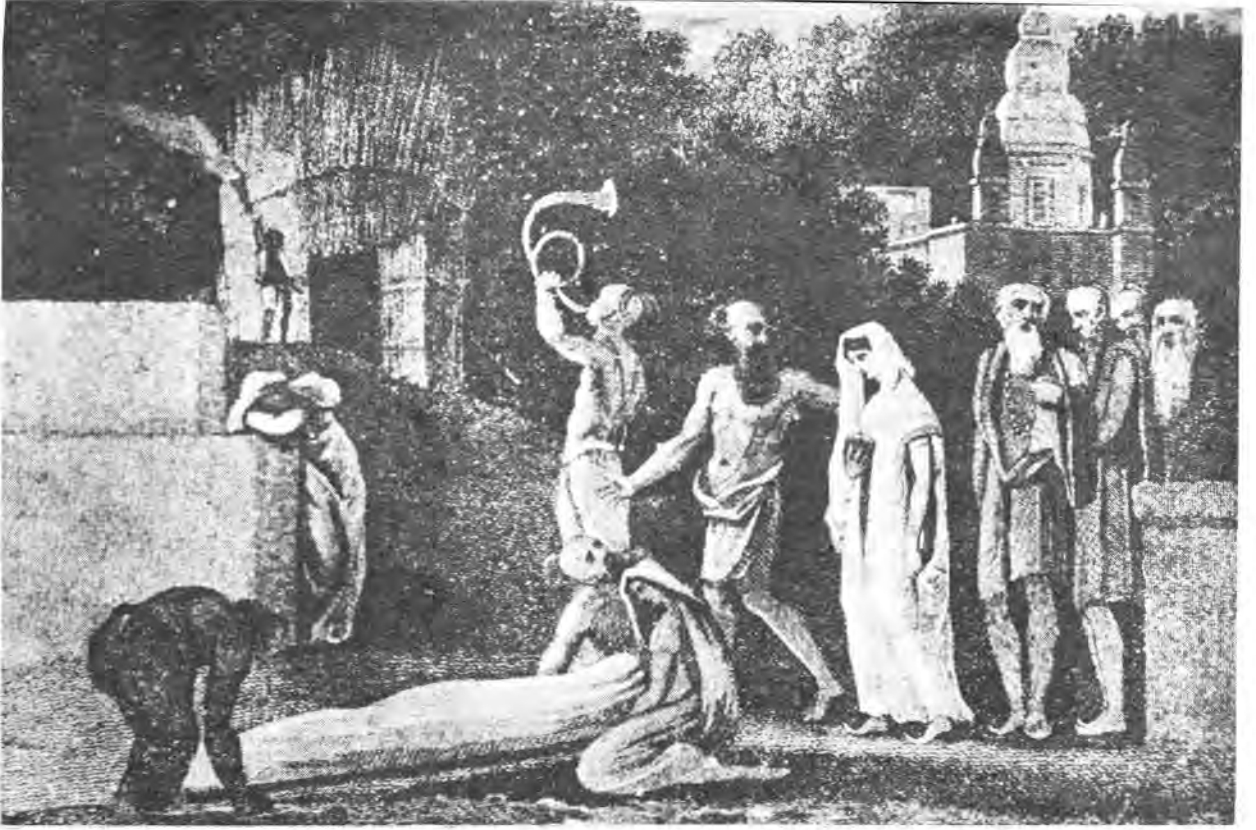
রাজা। চরিত্রেও রাজা। লম্বায় ছ' ফুট। আর যেমন দৈর্ঘ্য তেমনি প্রস্থ। রামমোহন মাথায় যে পাগড়ীটা পরতেন সেটা তাঁর মৃত্যুর পর রয়ে গিয়েছিল ব্রিস্টলেই। যে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন তাঁর কাছে। প্রায় ৬০ বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী যখন বিলেতে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন সেটা। তখন দেখা গেল, কলকাতা শহরে এমন কেউ জোয়ান নেই, যার মাথায় ঐ পাগড়ীটা আঁটবে।

সবচেয়ে মজা তাঁর খাওয়ার গপ্পো। রোজ দুধ খেতেন দশ সের। পাঁঠা খেতেন একটা গোটা। এক সঙ্গে আম খেতেন পঞ্চাশটা। একবার নিজের জন্মভূমি খানাকুল কৃষ্ণনগরে গেছেন বেড়াতে, মোক্তার বন্ধু গুরুদাস বসুর বাড়িতে। বাগানে সার সার নারকেল গাছ। রামমোহন বললেন, ডাব খাওয়া যাক, কি বল? গুরুদাস তখুনি একটা ডাব পাড়িয়ে খেতে দিলেন। তা দেখে রামমোহনের হাসি আর ধরেনা।

'ও গুরুদাস, ওতে আমার কি হবে। কাঁদি শুদ্ধ নারকেল পেড়ে ফেল।'

কেউ এসে যখন তাঁকে বোলতো, অমুক লোক আপনার সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামতে চায়। শুনে রামমোহন বলতেন, আরে, ও কি খায় যে আমার সঙ্গে তর্ক করবে।

ঐ রকম বিশালকায় মানুষ, বাঘের মতো যার মাথা, বৃষের মতো কাঁধ, সিংহের মতো কটি, সেই মানুষ কিন্তু তর্কের সময় পাখির মতো মিষ্টভাষী।

রামমোহনের বাড়ির সামনের বাগান থেকে এক ব্রাহ্মণ রোজ ফুল পাড়তো গাছে উঠে, একদিন হয়েছিল কি, বাড়ির কে একজন দুষ্টুমি করে তাঁর উত্তরীয়টা তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ গাছ থেকে উত্তরীয় না দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ। চীৎকার শুনে রামমোহন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—কি হয়েছে, দেবতা?

রামমোহন ব্রাহ্মণদের দেবতা বলে ডাকতেন।

ব্রাহ্মণ বললে, আমার উত্তরীয় কে চুরি করেছে।

—ঠিক আছে। চেঁচাবেন না। পেয়ে যাবেন।

উত্তরীয় চলে এল। ফিরিয়ে দেবার সময় রামমোহন বললেন, এবার সন্তুষ্ট তো?

ব্রাহ্মণ বললে, এতে সন্তুষ্ট হবার কি আছে। আমার জিনিষ আমিই পেলাম।

রামমোহন তখুনি তাঁকে শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন—

—আপনার হাতে কি?

—পুষ্প।

—কার পুষ্প? কে দিয়েছে?

—দেবতা।

—কাকে দেবেন?

—দেবতাকে।

—তাহলে আর কি লাভ হল। দেবতার জিনিষই তো দেবতাকে দিলেন।

ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

শুধু ঐ ব্রাহ্মণ নয়, যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের সকলকে মাথা হেঁট করতে হয়েছে একে একে। আজ যখন তিনি নেই, সারা দেশের মাথা তাঁর দিকে নত।
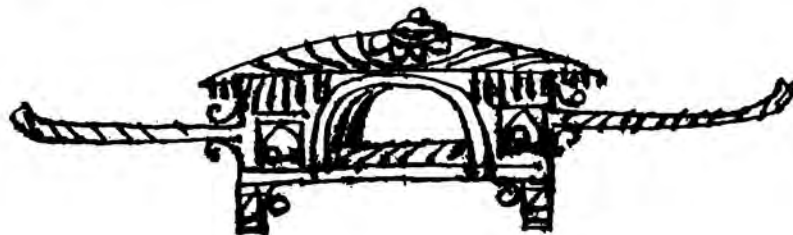
পরবীন বাবী-
তোমার অঙ্গে
অঙ্গে উঠুক ফুটে
সৌন্দর্যের ঝলক।
১00% পলিয়েস্টার শাড়ী
বোম্বে ডাইং
পরবীন বাবী নিজের
স্বপ্ন সার্থক ক'রে তুলতে
ব্যবহার করে বোম্বে ডাইং-
এর অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার। ১০০%
পলিয়েস্টার ও ১০০% পিয়োর
কটন—'আশিয়ানা' আর
'শিফালা' আর 'রেলিকা'।

শক্তি ও পুষ্টির জন্য কিছু লোক চান গরম পানীয়
সতেজ হ'তে কিছু লোকের পছন্দ ঠাণ্ডা পানীয়
এটি এমন এক পানীয় যা শক্তি ও পুষ্টি যোগায়, অথচ খরচ কত কম!
(গরম বা ঠাণ্ডা যেমন খুশী খান)
স্বাদেভরা গ্ল্যাক্সোজ-ডি জল, দুধ, ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে খান, কিম্বা চামচে নিয়ে সোজা মুখে ঢেলে দিন। গ্ল্যাক্সোজ-ডি সতেজ করে, নতুন উৎসাহে ভরিয়ে তোলে। মাত্র দু'চায়ের চামচ-ভরা গ্ল্যাক্সোজ ডি কয়েক মিনিটেই আবার আপনার শক্তি ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনে।
গ্ল্যাক্সোর তৈরী
গ্লুকোজ-ডি
যোগায় নিমেষে শক্তি ও পুষ্টি!
dCP/GL/30 Ben

রামায়ণে নেই

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন শ্রীরামচন্দ্র। গম্ভীর হবার মতনই কথা। প্রথমত, চুরি তাঁর রাজত্বে। যে রামরাজত্বের ন্যায়, ধর্ম ও সততার কথা যুগ যুগ ধরে সবাই আলোচনা করবে বলে ঋষিরা সকলে তাঁকে বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, সে-চুরি আর কোথাও নয়, এই অযোধ্যানগরে। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র সেখানে বিরাজ করছেন, সেই রাজপুরীরই সুরক্ষিত উদ্যান থেকে। তৃতীয়ত, সে-চুরি স্বর্ণসীতার প্রতিমা যা স্বর্ণ সিংহাসনে পাশে বসিয়ে তাঁর অভিষেক হবার কথা আর পক্ষকালের মধ্যে। আজ প্রায় তিন মাস ধরে রাজোদ্যানের একান্ত নিভৃতে বসে অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজভাস্কর সেটিকে প্রায়-সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। কাকপক্ষীর জানবার কথা নয়, আর নানাকারণে জানাতেও চাননি শ্রীরামচন্দ্র। হনুমান যেভাবে তাঁর নামের আগে সীতার নাম উচ্চারণ করে 'জয় সীতারাম' ধ্বনি দেয় তাতে স্বর্ণসীতা দিয়ে তাঁর অভিষেক হবে শুনলে কী কান্ড করে বসবে, কে জানে। অন্তত কিষ্কিন্ধ্যায় তাকে কখনই পাঠানো যেত না অভিষেকের নেমন্তন্ন করতে। সীতাকে বনবাসে পাঠাবার পর থেকে রোজ রাত থাকতে কোথায় সে বেরিয়ে যায়, কাকে আগে প্রণাম করে এসে তবে সকালে তাঁকে প্রণাম করে—সবই বুঝতে পারেন শ্রীরামচন্দ্র। তবে কি হনুমান ফিরে এসেছে আর জানতে পেরেছে স্বর্ণসীতার কথা? আর প্রায়-সম্পূর্ণ স্বর্ণপ্রতিমা নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছে সরযূর জলে?

লক্ষ্মণ অধোমুখে দাঁড়িয়েছিলেন চুরির সংবাদটি দিয়ে। শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্রীমান হনুমান কি ফিরেছে?'

লক্ষ্মণ বললেন, 'আমিও হনুমানের কথাই প্রথমে ভেবেছিলাম। লৌহের থেকে স্বর্ণ অনেক, অনেক গুণ ভারী। ফলে, মানুষের আকৃতির একটি স্বর্ণপ্রতিমার ওজন কত হবে সহজেই

অনুমান করা যায়। চুরি করে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, ঐ প্রতিমা মাটি থেকে তুলতেই সাতজন লোক হিমসিম খাবে। একমাত্র হনুমানের পক্ষেই ঐ প্রতিমা তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু রাজপুরীর উদ্যানে রাজভাস্কর আর তার বালক সহকারীটি ছাড়া আর কেউ যে প্রবেশ করেনি, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর, কারুকে প্রহরীরা উদ্যানে প্রবেশ করতে বা উদ্যান থেকে বের হতে দেখেনি।'

'ভুলে যাচ্ছ কেন লক্ষ্মণ, হনুমান ইচ্ছেমতন যেমন তার আকৃতি বাড়াতে পারে, তেমনি কমাতেও পারে। মশা-মাছির মতন ক্ষুদ্র হয়ে যদি সে উদ্যানে প্রবেশ করে থাকে তো সে কার দৃষ্টিগোচর হবে?'

'কারোরই হবে না! না প্রবেশের সময়, না বেরিয়ে আসার সময়। কিন্তু স্বর্ণমূর্তিটিকে ক্ষুদ্র করার বিদ্যে কি হনুমানের জানা আছে? আমি যত-দূর জানি, নেই। স্বর্ণপ্রতিমা অন্তত তাহলে প্রহরীদের চোখে পড়তো!'

শ্রীরামচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, 'কিন্তু যে গন্ধমাদন তুলে আনতে পারে, তার পক্ষে ঐ স্বর্ণপ্রতিমা উদ্যান থেকে ছুঁড়ে সরয়ূ-র জলে বা আরো দূরে কোথাও ফেলে দেওয়া কি অসম্ভব?'

লক্ষ্মণ বললেন, 'উদ্যানের উপর যে শক্ত জাল দেওয়া রয়েছে, সে-জাল তাহলে অটুট থাকত না, ছিন্ন হোত। আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, সে-জাল অক্ষত রয়েছে। তা ছাড়া হনুমান এখনও কিষ্কিন্ধ্যা থেকে ফেরেনি।'

'কী করে জানছো? এ-রকম মতলব নিয়ে ফিরে থাকলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।'

'গা-ঢাকা দিয়ে যেখানে থাকতো, আমি সেখানেও খোঁজ নিয়েছি—'

'কোথায়?'

'মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে।'

শুনে চুপ করলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর সন্দেহ হতে লাগল, হনুমানের সঙ্গে এ-ব্যাপারে লক্ষ্মণের কোন ষড়যন্ত্র নেই তো? মুখে বললেন, 'কিন্তু স্বর্ণসীতার তো পাখা গজাতে পারে না যে, নিজে থেকে উড়ে যাবে?'

লক্ষ্মণ সায় দিয়ে বললেন, 'উড়লেও উদ্যানের উপরে ঐ জালের বাইরে যে যায়নি, সেটা নিশ্চিত।'

'তবে যাবে কোথায়?'

লক্ষ্মণ চুপ করে রইলেন। তাকে পরীক্ষা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কারুকে তোমার সন্দেহ হয়?'

লক্ষ্মণ একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'কাকে সন্দেহ করব বুঝতে পারছি না তবে সন্দেহজনক একটা ব্যাপার ঘটেছে—'

'কী?'

'ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য রাজপুরীর উদ্যানে যেখানে আপনি ছাড়া কেউ যায় না সেইখানে প্রতিমা তৈরী হচ্ছিল। সেজন্যেও বটে আবার কাজটা যাতে আপনার চোখের উপর হয় এবং নিখুঁত প্রতিমূর্তি হয় সেজন্যেও রাজভাস্কর কাজ করছিলেন রাত্রি জেগে।'

'হ্যাঁ, দিনের বেলা আমি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

'প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রাজভাস্কর তার বালক সহকারীটিকে নিয়ে আসেন আর কাজ সেরে ভোর রাতে চলে যান।'

'হ্যাঁ। আমিও দণ্ডখানেক শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিই।'

'আজও ভোর রাতে রাজভাস্কর তার বালক সহকারীটিকে নিয়ে চলে যান। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার বালক সহকারীটি ফিরে আসে এবং কী একটা ভুলে গেছে বলে উদ্যানে প্রবেশ করে। তারপর অর্ধদণ্ডকাল উদ্যানে কাটিয়ে আবার বেরিয়ে যায়।'

'তাতে কী হয়েছে? সে নিতান্তই বালক। স্বর্ণপ্রতিমা তুলে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি বা সম্ভব হোত, তাহলে প্রহরীদের চোখে তা পড়তো!'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে সন্দেহজনক তুমি কী পেলে?'

'কিছুই নয়। কিন্তু প্রসঙ্গত কথাটা রাজভাস্করের কাছে উল্লেখ করতে তিনি উড়িয়ে দিলেন। বললেন, বালক সহ-কারীটি উদ্যান থেকে বের হবার পর দু-দণ্ড তাঁর কাছছাড়া হয়নি। তাঁকে গৃহে পোঁছে দিয়ে তবে নিজের গৃহে গিয়েছে।'

'হয়তো প্রহরীর সময়ের হিসেবটা ভুল হয়েছে। কিম্বা রাজভাস্করের।'

'দুজনেই শপথ করে বলেছেন—তা হয়নি।'

'সেটা কী ক'রে সম্ভব?'

'সম্ভব নয় বলেই ব্যাপারটা আমার কাছে সন্দেহজনক লাগছে।'

'আসলে কী ঘটেছে সেটা রাজ-ভাস্করের ঐ বালক সহকারীটিকে জিজ্ঞাসা করলেই তো জানা যায়—'

'যায়, কিন্তু তাকে পাওয়া গেলে তবেই। সন্ধ্যার আগে সে রোজ রাজ-ভাস্করের গৃহে আসতো, তারপর তাকে নিয়ে এখানে আসতো। আজ ভোরে গৃহে যাবার সময় সে রাজভাস্করকে বলে গিয়েছে আর সে আসবে না।'

'সহকারী যখন, তখন বালকটিকে নিশ্চয়ই ভালো করে রাজভাস্কর চেনেন! কার পুত্র, কোথায় থাকে, জানেন!'

'না, জানেন না।'

'সে কী?'

'রাজভাস্কর বলছেন, আপনি তাকে স্বর্ণপ্রতিমা গড়ার আদেশ দেবার পর-দিনই নাকি ঐ বালকটি এসে রাজ-ভাস্করকে বলে যে তার মায়ের খুব অসুখ এবং এক ঋষির কাছে সে জানতে পেরেছে যে, রাজভাস্কর এক স্বর্ণ-প্রতিমা গড়বেন, আর সে যদি সেই প্রতিমা গড়ায় সাহায্য করে তবে তার মায়ের অসুখ আর থাকবে না। স্বর্ণ-প্রতিমাও নিখুঁত হবে।'

'কোন্ ঋষি? নাম বলেছে?'

'না। রাজভাস্করও জানতে চাননি। স্বর্ণপ্রতিমার এমন গোপন খবর বালকটি জানে দেখে তাকে বিশ্বাস না করে পারেননি। বিশেষ করে স্বর্ণ-প্রতিমাটি তাহলে নিখুঁত হবে শুনে।'

'হুঁ, ঘটনাটা খুবই সন্দেহজনক। রাজভাস্কর এর মধ্যে জড়িত ব'লে তোমার মনে হয়?'

'মনে হয় না। তবু আমি তার উপর নজর রাখছি। তবে বালকটি যে জড়িত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে করে হোক বালকটিকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

'শুধু বালকটিকে নয়—' সংশোধন করে দিলেন শ্রীরামচন্দ্র, 'সেইসঙ্গে স্বর্ণপ্রতিমাটিও। অভিষেকের আর মাত্র পক্ষকাল বাকী, মনে রেখো।'

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। অযোধ্যানগরীর ঘরে ঘরে সন্ধান করলেন লক্ষ্মণ কিন্তু বালকটির খোঁজ পাওয়া গেল না। স্বর্ণপ্রতিমার জন্যে অযোধ্যানগরীর প্রতিটি সরোবর-পুষ্করিণীতে পর্যন্ত জাল দেওয়ালেন। সব বৃথা। তারপর শ্রীরামচন্দ্রকে এসে বললেন, 'অভিষেকের দিন পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না।'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'অসম্ভব। রাজ-রাজড়াদের কথা ভাবছি না, কিন্তু ধ্যান-তপস্যা স্থগিত রেখে যে-সব ঋষিরা আসছেন, তারা সবাই রওনা হয়ে পড়েছেন। এসে যদি দেখেন অভিষেক পিছিয়ে গিয়েছে তাহলে কী যে সর্ব-নাশ হবে কল্পনা করা যায় না। বিশেষ ক'রে বিশ্বামিত্রের মতন ঋষি যখন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন।'

লক্ষ্মণ বললেন, 'তাহলে রাজ-ভাস্করকে আরেকটি প্রতিমা তৈরী করতে বলা যাক। স্বর্ণলঙ্কা জয়ের পর স্বর্ণের তো আর আমাদের অভাব নেই।'

'এই ক'দিনের মধ্যে? অসম্ভব!'

'তবে কি রথ জুড়তে বলব?'

'কেন?'

'মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম থেকে দেবী জানকীকে নিয়ে আসার জন্য।'

শুনে শ্রীরামচন্দ্র করুণনয়নে একবার লক্ষ্মণের দিকে তাকালেন। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা-ও আর সম্ভব নয়।'

'তবে তো আমি কোন উপায় দেখছি না। আপনি যদি কিছু ভেবে থাকেন, বলুন—'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'শুধু অযোধ্যা-নগরীতে নয়, সমস্ত রাজ্যে, এমনকি আশেপাশের রাজ্যে ঢেঁড়া দিয়ে জানিয়ে দাও অযোধ্যারাজের রাজপুরীর উদ্যান থেকে যে মূল্যবান বস্তুটি খোয়া গিয়েছে, সেটি যে পাঁচদিনের মধ্যে ফেরত দিতে পারবে, তাকে কোন শাস্তি দেওয়া তো হবেই না বরং পুরস্কার হিসাবে বস্তুটির দ্বিগুণ মূল্য স্বর্ণ-মুদ্রায় তাকে দেওয়া হবে।'

লক্ষ্মণ আপত্তি করে বললেন, 'দ্বিগুণ মূল্যের স্বর্ণ?'

শ্রীরামচন্দ্র জবাব দিলেন, 'নইলে কষ্ট ক'রে চোর ফেরত দিতে আসবে কেন?

ঢেঁড়া পড়ল। দেখতে দেখতে তারপরও পাঁচদিন কেটেও গেল। অভিষেকের আর মাত্র ছ-দিন বাকী। নিমন্ত্রিত ঋষি ও রাজারা একে একে আসতে শুরু করেছেন। লক্ষ্মণ বললেন, 'মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে যাওয়া ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না।'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'আবার ঢেঁড়া দাও—তিনদিনের মধ্যে খোয়া যাওয়া বস্তুটি ফেরত বা সন্ধান যে দেবে, সে যা চাইবে রামচন্দ্র তাকে তাই দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।'

দ্বিতীয় দিনে লক্ষ্মণ যখন সমাগত ঋষি ও রাজন্যদের আপ্যায়নে ব্যস্ত—ভরত এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন, 'দুটি বালক আপনার দর্শনপ্রার্থী। বলছে ঢেঁড়া শুনে তারা এসেছে।'

'বালক? দুটি বালক?' অবাক হলেন শ্রীরামচন্দ্র। একটি বালককে তিনি আশা করেছিলেন—রাজভাস্করের বালক সহকারীটিকে। ভরতকে বললেন, 'এখনই পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরেই শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হল দুটি বালক। প্রথমে তাঁর নিজেরই দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে বলে ভেবেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তারপর বালকটি সম্পর্কে রাজভাস্কর আর উদ্যানপ্রহরীদের পরস্পরবিরোধী উক্তির রহস্য জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে।

হুবহু একরকম চেহারা দু-জনের। একজন রাজভাস্করের সঙ্গে চলে যাবার পরই যে অন্যজন ফিরে আসার ভান করে আবার উদ্যানে ঢুকছিল তাতে আর সন্দেহ নেই।

বালক দু-জন শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা আপনাকে স্বর্ণপ্রতিমার সন্ধান দিতে এসেছি। তবে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করতে হবে।'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সেই-রকমই সত্যবন্ধ। তবে আগে বলো, চুরির মতন এই ঘৃণ্য কাজ কেন তোমরা করতে গেলে?'

বালক দু-জন অবাক হল। একজন বলল, 'চুরি? চুরি আমরা করতে যাবো কেন? আমরা কি চোর?'

অন্যজন বলল, 'না-বলে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয়। কিন্তু আমরা তো তা করিনি। আপনার দ্রব্য আপনারই আছে।'

শ্রীরামচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, 'আমারই আছে?'

'হ্যাঁ। যেখানে স্বর্ণপ্রতিমা ছিল, তার তলা খুঁড়ে একটু-একটু ক'রে মাটি সরিয়ে নিতেই স্বর্ণপ্রতিমা নিজের ওজনে ধীরে ধীরে মাটির মধ্যে বসে গিয়েছে। যা ভারী, তুলে অন্য কোথাও নেওয়া তো আর সম্ভব নয় তাই ঐভাবে ঐখানেই ঢুকিয়ে উপরে মাটি চাপা দিয়েছি। উপরে ঘাসের চাপড়া বসানোর কাজটা তারপর খুব সাবধানে করতে হয়েছে। তবে আমরা তপোবনের ছেলে, ওটা আমাদের কাছে কিছুই না।'

'তার মানে স্বর্ণপ্রতিমা ঐ উদ্যানেই আছে?'

'হ্যাঁ। ঐ উদ্যানে, ঐখানেই আছে মাটি সরালেই দেখতে পাবেন।'

বিস্ময়ে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা সরল না। তারপর বললেন, 'কিন্তু এ-কাজ তোমরা করতে গেলে কেন?'

'আমাদের প্রার্থনা শুনলেই সেটা বুঝতে পারবেন।'

'কী তোমাদের প্রার্থনা? বলো, তা পূরণ করতে আমি সত্যবন্ধ!'

'অভিষেকের দিন ঐ স্বর্ণপ্রতিমার থেকে অনেক দামী, অনেক পবিত্র স্বয়ং জানকীকে নিয়ে আপনি সিংহাসনে বসুন, এইটুকুই আমাদের প্রার্থনা।'

শুনে চমকে উঠলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না-না, এ-প্রার্থনা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য কিছু প্রার্থনা করো—'

বালক দুজন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না, আমাদের অন্য কোন প্রার্থনা নেই।'

'স্বর্ণ, রথ, অশ্ব, গজ—এমন কি কোনো রাজ্য? যেটা চাই, বলো—এখনই জয় করে তোমাদের দিচ্ছি।'

'না, মহারাজ, আমাদের ওসব কিছুই চাই না। যা চেয়েছি, এখন তা পূরণ করবেন কি করবেন না, আপনার সত্য রক্ষা করবেন না ভঙ্গ করবেন সেটা আপনার বিবেচনা।'

রীতিমতন ফাঁপরে পড়ে গেলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর গভীর সন্দেহ হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটাই হয় হনুমান নয়তো লক্ষ্মণের ষড়যন্ত্র। তাই ধমকে উঠলেন বালক দু'জনকে, 'কে তোমাদের এই বুদ্ধি দিয়েছে? নিশ্চয়ই হনুমান?'

'আপনি মহাবীরের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। সেই হতভাগাটাই তো?'

মহাবীরের উদ্দেশ্যে দুহাত কপালে ছোঁয়াল বালক দুজন। তারপর বলল, 'আজ্ঞে, না।'

'তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ?'

কপালে আরেকবার হাত ছুঁইয়ে বালক দুজন আবার বলল, 'আজ্ঞে, না।'

'তবে কে?'

'বিশ্বাস করুন মহারাজ, কেউ নয়।'

শ্রীরামচন্দ্র বুঝলেন, সরাসরি প্রশ্নে কাজ হবে না, জেরা করে কথা বের করতে হবে। বললেন, 'মায়ের অসুখ আর এক ঋষির কথা বলে যে ধোঁকা দিলে রাজভাস্করকে—তা স্বর্ণপ্রতিমা তৈরীর কথা তোমরা জানলে কী করে? কার কাছ থেকে?'

শুনে বালক দুজনের একজন যেন রুখে দাঁড়াল। বলল, 'মায়ের নাম ক'রে ধোঁকা দিয়েছি—কী বলছেন মহারাজ? মায়ের আমাদের সত্যিই খুব অ-সুখ। আর ঋষির কথাও সত্যি। তিনি মহর্ষি বাল্মীকি। আপনার অভিষেক সভায় যে রামায়ণ গান হবে, সে-গান তো আমরাই গাইব, তিনি তো আমাদেরই শেখাচ্ছেন। তিনি তো সবই জানেন, তাঁর গানের মধ্যে তাই সব কথাই আছে। আমরা সেই গান থেকেই স্বর্ণ-প্রতিমা তৈরির কথা জেনেছি।'

বলে সে অন্যজনের দিকে ফিরে বলল, 'চল্ কুশ, আর দেরী করলে আজ আর গান শেখা হবে না।'

ব'লে স্তম্ভিত শ্রীরামচন্দ্রের চোখের সামনে হাত ধরাধরি ক'রে দু-ভাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফুটবলের তিন রাজা

চিরঞ্জীব
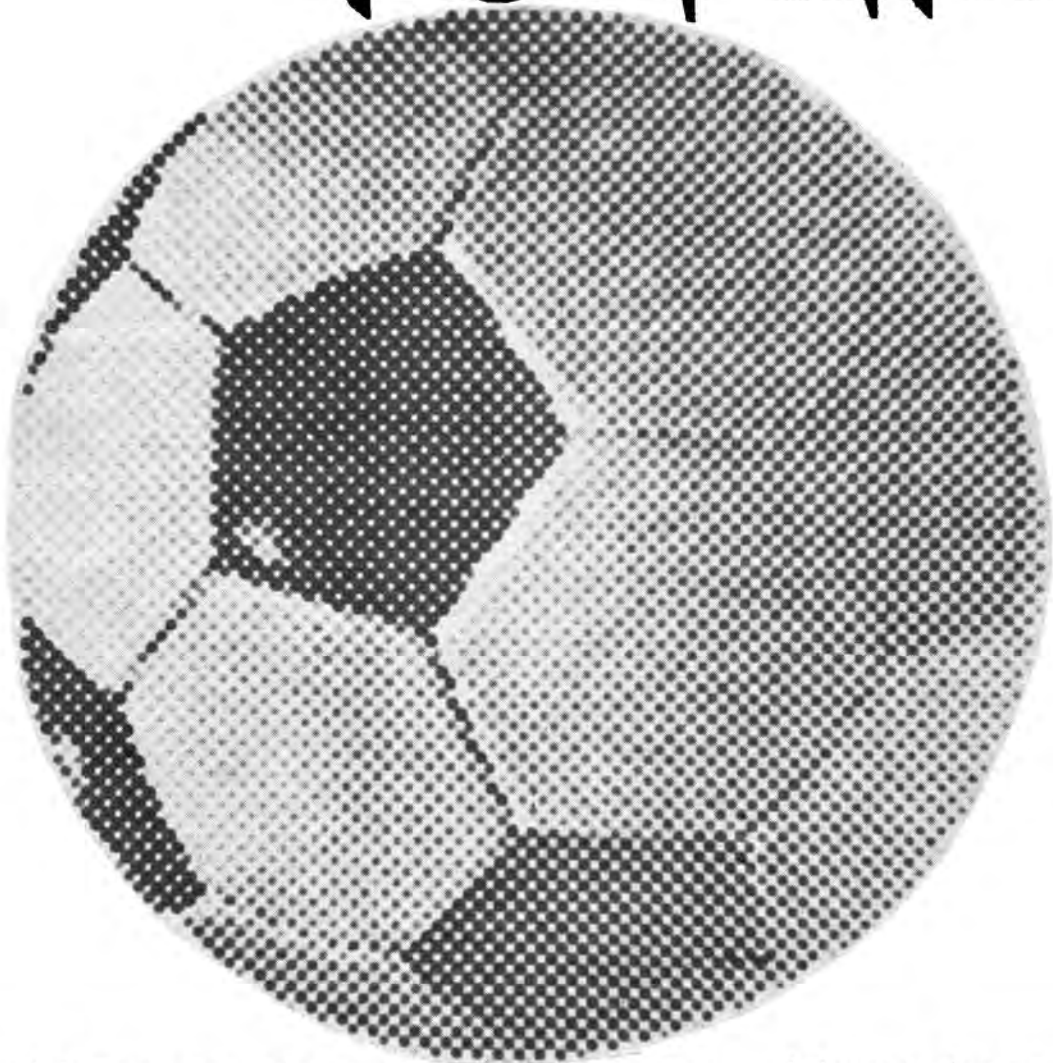
ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের ধারে কাছে আসতে পারে, এমন দল এদেশে এখন নেই। এবার নিয়ে পর পর পাঁচবার লীগ জয় করে তারা যুগ্ম রেকর্ডের অধিকারী হল। এতে প্রথম রেকর্ড ছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। তারা একটানা জেতে ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ও ১৯৩৮-এ। বলাবাহুল্য, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কোনো ভারতীয় দল এই লীগ খেলায় চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। তাই প্রথম লীগ জিতে মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবলের রাজসম্মান পায়। কিন্তু প্রথম রাজা হয় মোহনবাগান ওদের তেইশ বছর আগে ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড জিতে। মোহনবাগানের কৃতিত্বে সেদিন সারা ভারত উছলে উঠেছিল।

ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্ব বোধহয় আরও বেশি। পাঁচবার লীগ ত জিতেছেই। আই এফ এ শীল্ডের ৮১ বছরের ইতিহাসে তার কৃতিত্ব অনন্য। এবার নিয়ে দুই দফায় পর পর তিনবার করে শীল্ড আর কেউ জিততে পারেনি। লীগের সঙ্গে শীল্ডের বিজয়মালা পরায় সে আজ শুধু ফুটবলের তৃতীয় রাজা নয়, স্বাধী-

নতার পর স্বদেশের মাঠে শীল্ডের খেলায় একাধিক বিদেশী দলকে পরাস্ত করে ইস্টবেঙ্গল ভারতের ফুটবল-সম্রাট হতে চলেছে।

প্রথম রাজা

১৮৯৩ সালে যে শীল্ডের খেলা শুরু হয় ১৮ বছর পর প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগান তা জিতল তখনকার দিনের সেরা ইউরোপীয় সামরিক ও বেসামরিক খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে। মোহনবাগানের পক্ষে ওই জয় অভাবনীয় ছিল। সাধারণত ফুটবলে জয়লাভ পৃথকভাবে একটি ক্লাবের পক্ষে গৌরবের বা কৃতিত্বের। কিন্তু মোহনবাগানের ওই জয় শুধু ওই ক্লাব বা বাঙালীদের নয়, ওই জয়ে সারা ভারতে নতুন জোয়ার এনে দেয়, ওই সাফল্য সাহায্য করে স্বাধীনতা আন্দোলনকেও। ওরই মধ্যে যেন নিহিত ছিল ব্রিটিশকে হারাবার অন্যতম অস্ত্র। রাতারাতি সকলেই খেলা-পাগল বিশেষত ফুটবল অনুরাগী হয়ে গেলেন। সারা দেশে নতুন নতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। জয়ের পর মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ বসু বললেন, আমাদের সাফল্য হঠাৎ নয়, প্রতিটি ইঞ্চির জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, তাছাড়া কয়েকটি দল ছিল বেশ শক্তিশালী। ব্রিটিশ মালিকানাধীন খবরের কাগজগুলো একে অন্য দৃষ্টিতে দেখলেন। তারা বললেন, রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া এতদিন বিশ্ব সভায় ভারত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি, কিন্তু মোহনবাগানের জয় সে কাজ করে দিল।

শীল্ড জয়ের জন্য মোহনবাগানকে ছটি ম্যাচ খেলতে হয়েছিল। প্রথম রাউন্ডে হারাল সেন্ট জেভিয়ার্সকে ৩—০ গোলে, তারপর বৃষ্টি ভেজা মাঠে রেঞ্জার্সকে ২—১ গোলে। দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তৃতীয় রাউন্ডে প্রচন্ড লড়ে সেবারের সেরা দল রাইফেল ব্রিগেডকে হারায় ১—০ গোলে। সেমিফাইনাল মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে। সারা কলকাতা সেদিন ময়দান মুখী। মিডলসেক্সের গোলরক্ষক পিগটের দৃঢ়তায় গোলশূন্য (০—০) হল। রিপ্লে ম্যাচে মোহনবাগান ৩—০ জিতলেও বিপক্ষ গোলরক্ষক পিগট মোহনবাগানের অভিলাষ ঘোষের সংগে সংঘর্ষে আহত হন। পরদিন থেকে গোরারা অভিলাষের নাম দিলেন, "ব্ল্যাক জায়ান্ট"। তারপর এল অবিস্মরণীয় ২৯ জুলাই। বর্ষাকাল হলেও নির্মেঘ আকাশ। সকাল থেকে মাঠে মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে পড়ছে। আর তখন থেকেই মাঠে দর্শকদের আনাগোনা। তাদের মধ্যে কানাঘুষার অন্ত নেই। মোহনবাগানের সাফল্য কামনা করে কবিতা, ছড়ার ছড়াছড়ি। সেই শনিবারে কালীমন্দিরে মানত আরও কত কি! কোম্পানি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল, গঙ্গায় আবার অতিরিক্ত লঞ্চ, স্টিমার। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় খেলা। কিন্তু তার অনেক আগেই কাতারে কাতারে মানুষ এল। বালক, বালিকা, পুরুষ, মহিলা সব রকম দর্শক। তখন তো আর গ্যালারি ছিল না। তবে বিশিষ্টদের জন্য বি এইচ স্মিথ অ্যান্ড কোম্পানী কয়েক শো চেয়ার পেতে দেন। মাঠে প্রচন্ড ভিড় হবে এবং দর্শকদের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির আশায় কেউ উঁচু কাঠের বাক্স ভাড়া দিলেন উঁচু হারে। উৎসাহীরা টাকার পরোয়া করলেন না। কিন্তু আশি হাজার দর্শকের মধ্যে ভাগ্যবান মুষ্টিমেয়রা খেলা দেখলেন। তখন রিলের ব্যবস্থাও ছিল না। তা হলে মাঠে সমবেতরা খেলার ফল জানবেন কেমন করে? খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বড় বড় ঘুড়ি উড়ছে একাধিক। ঘুড়িতে দুটি দলের নাম এবং প্রত্যেকের পাশে "০" লেখা। অর্থাৎ ফল গোলশূন্য ড্র।

বল ধরেই পাস দেওয়া এবং চমৎকার বোঝাপড়ার মাধ্যমে খেলছিল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট। মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা যতই ভাল খেলুক বিপক্ষের সেন্টার হাফ জ্যাকসনকে কিছুতেই ভেদ করতে পারছিলেন না। খেলা হচ্ছিল প্রায় তুল্যমূল্য। বিরতির কিছু আগে ফ্রিকিক্ (বিরতির পরে নয়) থেকে ইস্টইয়র্ক দল ১—০ গোলে এগিয়ে গেল। অধিকাংশ সমর্থক বাঙালী, গোলের সংগে সংগে তাদের মধ্যে সোরগোল বন্ধ। সারা মাঠে নিস্তব্ধতা। কিন্তু বিরতির পরে মোহনবাগান যেন দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামল, তাদের স্কিল, শারীরিক সামর্থ, দ্রুত বল দেওয়া নেওয়ার সংগে ইস্টইয়র্ক নাস্তানাবুদ হতে লাগল। শিবদাস ভাদুড়ি একক প্রচেষ্টায় গোল শোধ করলেন সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে। অমনি ঘুড়িতে ফল জানানো হল ১—১। হাজার হাজার দর্শকের উল্লাসে ময়দান কল্লোলিত। মোহনবাগানের প্রত্যেকের দেহে তখন যেন সিংহের বিক্রম। তিন মিনিট না কাটতেই আর একটি সুযোগ এল। আবার অধিনায়ক শিবদাসের পায়ে বল। প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহের বাধা অতিক্রম করতে পাস দিলেন সেন্টার ফরওয়ার্ড অভিলাষ ঘোষকে। অভিলাষ ভুল করলেন না অভীষ্ট সাধনে। সমাপ্তির দুই মিনিট আগে মোহনবাগান ২—১ গোলে এগিয়ে যেতেই ফুটবলের নতুন ইতিহাস রচিত হল। শিবদাসই ছিলেন সেদিন মাঠের সেরা খেলোয়াড়। তাঁর খালি পায়ের কৌশলের কাছে সাহেবরা দাঁড়াতেই পারেনি।

পরদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা হল। প্রত্যেকেই মোহনবাগানের জয়ে অভিনন্দন জানালেন। রয়টার বিদেশে মোহনবাগানের খবর প্রচার করল। লন্ডনের ডেলি মেল, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, সিঙ্গাপুর ফ্রি প্রেস, কলকাতার 'স্টেটসম্যান', 'কমরেড', 'এম্পায়ার', 'মুসলমান' প্রভৃতি সংবাদপত্র বড় বড় শিরোনামায় মোহনবাগানের সাফল্যের সংবাদ ছাপল।

দ্বিতীয় রাজা

এল ১৯৩৪। গতবার (১৯৩৩) দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে দ্বিতীয় হয়েও ১৯৩৪-এ সিনিয়র ডিভিশনে উঠল মহমেডান স্পোর্টিং। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কে আর আর 'বি' দল। যেহেতু কে আর আর 'এ' দল সিনিয়র ডিভিশনে আগেই ছিল, তাই তাদের আর একটি দলকে উন্নীত করা হল না। সিনিয়র ডিভিশনে উঠেই মহমেডান কর্তৃপক্ষ দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য খেলোয়াড় খুঁজতে লাগলেন ভারতময়। আগেই তাদের দলে ভিন্ রাজ্যের খেলোয়াড় ছিলেন, এবার বাঙ্গালোর থেকে রহমৎ, মহিউদ্দীন, ঢাকার ওয়াহার ও ঝাঁসির ইসমাইল হোসেনকে দেখা গেল। এলেন কালীঘাটের বিখ্যাত সেন্টার হাফ অখিল আমেদ। একটানা অনুশীলন চলল দুমাসেরও বেশি। ২০টি খেলা শেষে দেখা গেল ভারতীয় দল সমূহের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম লীগ জিতে ফুটবল ইতিহাসে নব অধ্যায় রচনা করেছে। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর তাদের ক্লাব কখনও এমন গৌরবের অধিকারী হয়নি।

১৯৩৫

লীগের উদ্বোধন দিনে অনেকের ধারণা ছিল কাস্টমস যুঝবে মহমেডানের সঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশই হকি খেলোয়াড় থাকায় ফুটবলে অনুশীলনের সময় পাননি। মহামেডান জিতল ৫—০ গোলে। এবারেও গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলে বিশেষ পরিবর্তন

দেখা গেল না। প্রথম দিনে খেললেনঃ বাখর; সাফি ও সাত্তার; বসির, অখিল, আমেদ ও সাফিক; সেলিম, হাবিব, রসিদ, রহমৎ ও আব্বাস। ড্র ও হেরে পয়েন্ট হারালেও ৩০ মে মোহনবাগানকে ৩—০ গোলে হারিয়ে মহমেডানের আস্থা ফিরে এল। গোল দিলেন রসিদ—২ ও সেলিম মিশ্র। মহামেডানের কাছে এটি মোহনবাগানের প্রথম পরাজয়। গত বছর লীগে এদের দুটি খেলাই অমীমাংসিত ছিল।

এই খেলার পরে মহমেডানের স্থান হল তৃতীয়। শীর্ষে কালীঘাট।

মহমেডানকে এর পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয় মোহনবাগানের সঙ্গে। কোয়েটার ভূমিকম্প প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য এটি হল চ্যারিটি ম্যাচ (উঠল ১১,৯৫৭ টাকা ৮আনা)। মোহনবাগান এই ম্যাচে আশাতীত ভাল খেলে ০—১ গোলে পরাস্ত হল। আব্দুল হামিদের যোগদানে যদিও মহমেডানের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। কে দত্ত-র মতো গোলরক্ষক অত সহজে হার মানবেন—এও অভাবনীয় ছিল। ভুল করেছিলেন হাফ ব্যাক নকুল মুখার্জি, তিনি বিপক্ষের রাইট-ইন রহিমকে (এখন মহমেডানের অন্যমত কর্মকর্তা) চোখে চোখে রাখেননি। যাই হোক মহমেডানের সঙ্গে কালীঘাট ফিরতি খেলাতেও অজেয় রইল (১—১)। শক্তিশালী দল এখন জিততে না পারলে যেমন উগ্র সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হন, তেমনি ঘটনা সেকালেও হত। খেলার মাঝে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি রেফারি বলাই দাস চ্যাটার্জির দৃঢ়তায়। কিন্তু খেলা ভাঙার পরেই দুই দলের সদস্য ও খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি হল। অবস্থা আয়ত্তে আনে পুলিশ। মহমেডানের পক্ষে গোল দেন রসিদ ও কালীঘাটের পক্ষে প্রেমলাল। এরপর ডিভন্স, হাওড়া ইউনিয়ন, ডালহৌসী-র সঙ্গে তারা জিতলেও ই বি রেল বড় রকমের ধাক্কা দিল ২—০ য় হারিয়ে ম্যাক-ডোনাল্ড ও সামাদের গোলে। মহ-মেডানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা ধূলিসাৎ হল। কেননা ইস্টবেঙ্গল ও কালীঘাটের চারটি করে খেলা বাকি, মহমেডানের বাকি দুটি। অর্থাৎ প্রথম দুটি দল সব খেলায় জিতলে মহমেডান অবশিষ্ট দুটিতে জিতেও ওদের নাগাল পাবে না।

মহমেডান স্পোর্টিং তাদের বাকি দুটি খেলায় ব্র্যাকওয়াচ ও ক্যালকাটার সঙ্গে জিতলেও কালীঘাট ও ইস্ট-বেঙ্গলের আশা পূর্ণ হল না। মহ-মেডান স্পোর্টিং উপর্যুপরি দুবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হল।

১৯৩৬

এবার মহমেডান দলে কিছু নতুন মুখ এল। ব্যাঙ্গালোর থেকে কাদের ছাড়াও আফিফ নামে আর একজন। ইস্টবেঙ্গলের নূর মহম্মদ ও কালীঘাটের সিরাজুদ্দীন যোগ দেওয়ায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল এবার আরও শক্তিশালী হল। এবার কলকাতা মাঠে আর একটি নতুন তারকার আবির্ভাব হল, তিনি বর্মার পাগসলে।

মহমেডান প্রথম লীগের শেষ খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলল মোহন-বাগানের বিপক্ষে। এবং ১—০ জেতে রহিমের গোল দ্বারা। খেলার আগে প্রচণ্ড বৃষ্টির দরুণ এদিন তেমন দর্শক সমাগম হল না। এদিন ভাল খেলল মোহনবাগান, তারা যা সুযোগ পেয়েছিল, তার সদ্ব্যবহার হলে জয়ই ছিল অবধারিত। কিন্তু রেফারি সার্জেন্ট পিজিয়নের পরিচালনায় কিছু ত্রুটি দেখা যায়। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে ফ্রি কিক্ দেওয়া হয় তার থেকেই গোল হয়। সাফি-র সট সেলিম ধরে রহিমকে পাস দিলেই গোল হল। মোহনবাগানের গোলে কালীপদ দত্ত (হারাধন) চমৎকার খেললেন। জুম্মা খাঁর ফাউলে সতু চৌধুরীর পেনাল্টি 'মিস' করাটাও হারের কারণ।

ফিরতি লীগে তাদের প্রথম ম্যাচটি হল চ্যারিটি হিসাবে ওলিম্পিক ফাণ্ডের জন্য। রহিমের ১—০ গোলে এবারও ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় ঘটল।

১৭ জুন অ্যাটাচড সেকশনের সঙ্গে হ্যাট্‌ট্রিক (এবং নূরমহম্মদ একটি) করলেও দিল্লির রসিদ গুরুতর আহত হলেন। তাঁকে মেডি-কেল কলেজে পাঠানোর পর চিকিৎসকরা জানালেন, তাঁর সিনবোন ভেঙেছে। রসিদ এই খেলা পর্যন্ত ১২টি গোল দেন। তাঁর আঘাত এতই গুরুতর ছিল যে, গোটা মরশুমে আর খেলতে পারলেন না। তাঁর অভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ও সফরকারী চীনা দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল দুর্বল হয়ে পড়ে।

২২টি খেলায় মহমেডানের হল ৩৬, ব্র্যাকওয়াচের ৩৪।

মোহনবাগান তৃতীয়—২৬ পয়েন্ট করে ও ইস্টবেঙ্গল অষ্টম। উপর্যুপরি তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মহমেডান স্পোর্টিং-এর গৌরব আরও বেড়ে গেল।

১৯৩৭

সাইত্রিশের শুরুতে মহমেডানকে আরও শক্তিশালী মনে হল, রাইট হাফে পেশোয়ারের বাচ্চি খাঁ (জর্জ) যোগ দিলেন। ১২ মে প্রথম খেলায় ওসমান; সাফি ও জুম্মা খাঁ; বাচ্চি-খাঁ, নূর মহম্মদ ও মাসুম; সেলিম, রহিম, সাহাবু, রহমত ও আব্বাস-কে নিয়ে গড়া মহমেডান স্পোর্টিং ৬—০ গোলে কালীঘাটকে হারাল। গোল-দাতা—রহিম ২, আব্বাস ২, রহমত ১ ও সাহাবু ১।

মরশুমের প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে নামল ২১ মে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। মহমেডান ভাল খেললেও মোহনবাগান একাধিক সুযোগের অপব্যবহার করল। মহমেডান-এর রহমত ও সেলিম গোল দিলেও মোহনবাগানের প্রেমলালের মাথায় লেগে একটি বল গোলে ঢোকে। এদিন সেন্টার ফরওয়ার্ড এ দেব আহত হন।

ফিরতি লীগের শুরুতে মহমেডান স্পোর্টিং ৪—১ গোলে কে ও এস বি-কে ও কাস্টমসকে ১—০ হারালেও ১১ জুন ২—৪ গোলে হেরে গেল ইস্ট-বেঙ্গলের কাছে। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় এই খেলা শুরু হলেও বেলা দুটো থেকেই মাঠ দর্শকপূর্ণ হয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল এত ভাল খেলল যে বিরতির আগেই তারা ৩—০ এগিয়ে রইল লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুর্গেশের গোলে। বিরতির পর রহমত ও রহিম পাল্টা দুটি গোল দেন। কিন্তু ১৯৩৪-এর পর কোনো ভারতীয় দলের কাছে মহমেডান এমন শোচনীয়-ভাবে হারেনি।

যে ভবানীপুর প্রথম লীগ শেষে দ্বিতীয়স্থানে ছিল তারা হারল ৩ জুলাই ০—৪ গোলে (সামসের ২, রহিম ও আব্বাস) মহমেডানের কাছে। বিজয়ী দলের তখনও খেলা বাকি মোহনবাগান, কাস্টমস ও ক্যালকাটার সঙ্গে। কিন্তু অন্যদলগুলি এতই পিছিয়ে যে তিনটিতেই মহমেডান হারলেও তারাই চ্যামপিয়ন হবে। ৪০ বছরের লীগ ইতিহাসে পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ডারহামস, মহমেডান স্পোর্টিং সেই রেকর্ড অতি-ক্রম করে নতুন রেকর্ড গড়ল।

১৯৩৮

আটত্রিশের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন দলে কোনো পরিবর্ধন বা পরিবর্তন পরি-লক্ষিত হয় না। উদ্বোধনী খেলায় মহমেডান ২—৫ গোলে হারাল কাস্টমসকে। গোলদাতা রহিম ও মজিদ (পেনাল্টি)।

কালীঘাটের সঙ্গে ০—১ হারের পর মহমেডানের বিপর্যয় ঘটে ৩ জুন ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষেও।

৪ জুন মহমেডান আবার একটি পয়েন্ট হারাল মোহনবাগানের সঙ্গে ১—১ করে। গোলরক্ষক রাজেন ভট্টাচার্য ও লেফট ইন প্রেমলাল রক্ষণ ও আক্রমণে দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে নেন। বাচ্চি খাঁ প্রেমলালকে মারাত্মকভাবে ফাউল করে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে তাঁকে দুই সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। তবে তাদের দলগত খেলায় কোনো ঘাটতি ছিল না।

একুশতম খেলায় মহমেডানের রহিম ও সাহাবুর ২—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল পরাস্ত হল। এই খেলায় জুম্মা খাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে মুর্গেশ আহত হয়ে হাসপাতালে যান। এই চ্যারিটি ম্যাচে ওঠে ১৫,৮৮১ টাকা।

স্বভাবতই মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলা বাকি একটি। খেলাটি কাস্টমসের সঙ্গে। কাস্টমস ও মহমেডানের পয়েন্টের ব্যবধান এমন যে মহমেডান ড্র করলে চ্যাম্পিয়ন হবে, কিন্তু হারলে পয়েন্ট হবে সমান সমান। ২১টি খেলায় মহমেডানের ৩০ ও কাস্টমসের ২৮।

১১ জুলাই অনেকের আশঙ্কা কার্যে পরিণত হল। কাস্টমসের কাছে ০—১ হারল মহমেডান স্পোর্টিং। উভয় দল ২২টি খেলে পয়েন্ট ৩০ করে। গোলের গড়ে অবশ্য কাস্টমস শীর্ষে ছিল। কিন্তু তার দ্বারা লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারিত না হওয়ায় আই এফ এ অতিরিক্ত বিশেষ ম্যাচের কথা ঘোষণা করল।

খেলা শুরুর ১০ মিনিট পরে এক পশলা বৃষ্টিতে মাঠ কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হলেও তাতে খেলোয়াড়দের খুব অসুবিধা হয়নি। কাস্টমস বিরতির পর সম্মিলিত আক্রমণের চেষ্টা করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাদের আবার রানার্স নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

নতুন রাজা

ভারতীয় দলগুলির মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দ্বিতীয় কৃতিত্ব মোহনবাগানের হলেও মহমেডানের সাফল্যের সমান হতে পারেনি তারা। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ এই চার বছর পর পর চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মোহনবাগান সম্পর্কে অনেকের আশা ছিল তারাও ওই গৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে নিয়ে মোহনবাগানকে ওই গৌরব থেকে বঞ্চিত করে। ইস্টবেঙ্গল প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৯-৫০-তে। তাদের নতুন অধ্যায়ের সূচনা ১৯৭০-এ। তিরিশের দশকের মহমেডান ও সত্তরের দশকের ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে বড় পার্থক্য—তখন ছিল ২-৩-৫-এর খেলা। সত্তরে তা হল ৪ ব্যাক, ২ হাফ ও ৪ ফরওয়ার্ডে।

১৯৭০

১৯৬৯-এ মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন ও ইস্টবেঙ্গল রানার্স হল অপরাজিত থেকে। ১৯৭০-এর মরসুমের শুরুতেই অমল দত্ত-র অধীনে আবার মোহনবাগান এবং মহম্মদ হোসেনের নির্দেশে ইস্টবেঙ্গল কঠোর অনুশীলন শুরু করল। ইস্টবেঙ্গল গঠিত হল—পিটার থঙ্গরাজ, কানাই সরকার; সুধীর কর্মকার, শান্ত মিত্র (অধিনায়ক), আর দত্ত, সৈয়দ নায়িমুদ্দীন, সুনীল ভট্টাচার্য; কালন গুহ, কাজল মুখার্জি, প্রশান্ত সিংহ, সমরেশ চৌধুরী; স্বপন সেনগুপ্ত, হাবিব, অশোক চ্যাটার্জি, পরিমল দে, শঙ্কর ব্যানার্জি, শ্যাম থাপা ও কে ভি শর্মাকে নিয়ে।

মরশুমের 'বড় খেলা' ইডেনে ১৪ জুন মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে। ৬০ হাজারের উপর দর্শক। দুই দলে দারুণ লড়ছে, দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্ত গুণছেন। প্রথমার্ধ এইভাবে কাটল। দ্বিতীয়ার্ধের অর্ধেকও কেটে গেল। খেলা হচ্ছে তুল্যমূল্য। ৫৯ মিনিটের সময় পরিমল দে জয়সূচক গোলটি দিলেন।

২১ জুন রবিবার ইডেনে আবার একটি বড় খেলার দিন ধার্য হল। খেলা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানে। দুদিন আগে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই টিকেটের লাইন পড়ল। ইডেনের গ্যালারিগুলো কানায় কানায় পূর্ণ হল দুপুরের পরেই। শ্যাম থাপা বিরতির আগে ১—০-য় ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে রাখলেন রকেটের মত সটে। তারপরই বৃষ্টি শুরু হয়। একে ইডেনের মাটি নরম, তদুপরি প্রবল বৃষ্টি। বিরতির পর আর খেলা হল না। আই এফ এ বললেন, এই খেলা আবার হবে।

এবার আবার সেই বড় খেলা। ২১ জুন বৃষ্টির জন্য স্থগিত থাকা লড়াই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের। এবার ১৪ সেপ্টেম্বর ইডেনে। এদিন শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলের সংহতিপূর্ণ ক্রীড়াধারার কাছে মোহনবাগানের রক্ষণভাগ অসহায় হয়ে পড়ে। ইস্টবেঙ্গলের শক্তির উৎস ছিলেন লিংকহাফ কাজল মুখার্জি এবং বিপক্ষের রক্ষণভাগের সমস্যা ছিলেন শ্যাম থাপা। ১৪ মিনিটের সময় ১—০ করেন হাবিব।

ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী লীগের (সুপার লীগ) খেলা পড়ল ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার। এর তিনদিন আগে তারা আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলল ইরাণের পাস ক্লাবের বিরুদ্ধে ও ১—০ জিতল। স্বভাবতই তারা কিছুটা আত্মতুষ্ট ছিল। সুপার লীগে রাজস্থানের সঙ্গে তাই ০—০ হল। অথচ শীল্ড ফাইনালে দলের শুধু হাবিব এদিন খেললেন না। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা বিক্ষোভ জানালেন ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পয়লা অক্টোবর মহমেডানের সঙ্গে খেলা। রেফারি লাইন্সম্যান এলেন। কিন্তু মহমেডান দল এল না। দুদিন পরে আবার ইডেনে খেলা পড়ল মোহনবাগানের সঙ্গে। এদিনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় ইডেন খেলার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। ইস্টবেঙ্গল যা খেলেছিল তাতে তাদের একাধিক গোলে জেতা উচিত ছিল। এদিন ২১ মিনিটের সময় স্বপনের উঁচু সটে জয়সূচক গোলটি হল।

এই খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দ্বিমুকুট লাভ নিশ্চিত হয়ে যায়। গ্যালারিতে কাঁসর ঘন্টা বাজল, লাল-হলুদ পতাকা উড়ল, মশাল জ্বলল। শীল্ড ত আগেই পেয়েছে। কিন্তু সরকারীভাবে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা হল না সিটি সিভিল কোর্টে মহমেডানের একটি আবেদন থাকায়। উপরন্তু ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের খেলার পুরো পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলকে দেওয়া সম্পর্কে ৩ অক্টোবর আই এফ এ কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। পরে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলকে পুরো পয়েন্ট দেওয়া হয়। এবং তারাই চ্যাম্পিয়ান হল অপরাজিত থেকে।

১৯৭১

একাত্তরে দলবদলের পরে ইস্টবেঙ্গলে বড় রকমের বদল হল একটি। নায়িম এবং এশিয়ার সেরা গোলরক্ষক থঙ্গরাজ মহমেডান স্পোরটিং-এ চলে গেলেন। গোলে অরুণ ও কানাইকে তেমন বেগ পেতে হয়নি রক্ষণ ও আক্রমণভাগের দৃঢ়তায়। অশোক ব্যানার্জি অবশ্য নায়িমের অভাব বুঝতে দেননি। থাপা ও হাবিব বাদে আর সকলেই 'স্থানীয়' খেলোয়াড়। কোচ স্বরাজ ঘোষ লীগ শুরুর মাত্র চারদিন আগে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পেলেন।

১১ জুলাই ইডেনে চ্যারিটি ম্যাচের দিন ধার্য হল মোহনবাগানের সঙ্গে। এবারও একই দৃশ্য। টিকিটের প্রচন্ড চাহিদা। বিভিন্ন কাউন্টার থেকে আগের দিন পৌনে তিনঘন্টাতেই জনসাধারণের জন্য বণ্টিত ২৪ হাজার টিকিট নিঃশেষিত হল।

লিওনোরা ল্যাম্পশেড
আজ থেকে বহু যুগ এগিয়ে

খেলার সময় বৃষ্টি না হলেও তার আগে সকালের বৃষ্টিতে ইডেন কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হল। বালি ও কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে অবশ্য মাঠকে কিছুটা খেলার উপযোগী করে তোলা হয়।

জুলাইয়ের পর অনেকদিন কেটে গেল। বড় দলগুলি 'আলস্যে' দিন কাটাচ্ছিল। অনিশ্চয়তা দেখা দিল। দিন পিছিয়ে দেওয়ার নানা দাবি উঠতে লাগল বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে। ১৪ অক্টোবর অবশেষে আই এফ এ-র লীগ সাব কমিটি স্থির করেন ৭ নবেম্বর লীগের খেলা শেষ করতেই হবে। একই দিনে মোহনবাগানের বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হল তাদের দল ১৫ ডিসেম্বরের আগে খেলতে পারবে না। খেলোয়াড়রা অনেকদিন খেলা থেকে বিরত। প্রয়োজনীয় অনুশীলনের পরই ১৫ তারিখে খেলতে পারেন। ১৫ অক্টোবর তারা আই এফ এ-কে আবার ওই কথা জানিয়ে দিল। কিন্তু ১৬ তারিখে আই এফ এ যথারীতি মোহনবাগানের খেলা দিলেন। তবে মোহনবাগান মাঠে আসেনি। ১৮ অক্টোবর ইস্টবেঙ্গল-টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলায় টালিগঞ্জ এল না, ২০ তারিখে ইস্টবেঙ্গল-পোরট কমিশনার্সের খেলায় পোর্ট অনুপস্থিত থাকেন।

ইস্টবেঙ্গল একাত্তরের লীগে শেষ ম্যাচ খেলল ২৬ অক্টোবর মহমেডানের বিপক্ষে। সেদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে সাকুল্যে দশ হাজার দর্শক আসেন। আসলে কলকাতা ময়দানে ফুটবলের জন্য বোধহয় আলাদা একটি মরসুম আছে! যে মরসুমে তাই সমর্থকদের দেখা মিলল না। তাছাড়া ইস্টবেঙ্গলের গোঁড়া সমর্থকরাও জানতেন—এ খেলার কোনো মূল্য নেই। এদিন ৫৭ মিনিটের সময় সমরেশ চৌধুরীর মাটি ছোঁয়া সটে ১—০ জিতে যায় ইস্টবেঙ্গল। সরকারীভাবে এদিন ইস্টবেঙ্গলকে লীগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা না হলেও সকলেই জানতেন আবার তারা অপরাজেয় লীগ চ্যাম্পিয়ন।

১৯৭২

বাহাত্তরের দল বদলের পালা শেষ হওয়ার পরে দেখা গেল গোলরক্ষক কানাই সরকার নেই, কিন্তু মোহনবাগান থেকে এসেছেন বলাই দে। রক্ষণভাগে আর এলেন চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ, প্রবীর মজুমদার, মোহন সিং ও গৌতম সরকার। ফরওয়ার্ডে হাবিবের অনুজ আকবর এবং অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় মইনের ছেলে লতিফুদ্দীন। সব চেয়ে বড় লাভ হল—ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রদীপ ব্যানার্জির কোচিং-এর দায়িত্ব গ্রহণ। ক্ষতি—রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ প্রশান্ত সিংহর অবসর, শ্যাম থাপার আন্তরাজ্য ছাড়পত্র গ্রহণ, অশোক চ্যাটার্জিও অন্য দলে চলে গেলেন, নাজির, কাজল মুখার্জিও রইলেন না। কিন্তু এসবের জন্য খুব ক্ষতি হল না, অন্ততঃ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভে। প্রদীপবাবু নিজের নানা অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রবীণ ও নবীনের সংমিশ্রণ ঘটালেন। অভিজ্ঞদের সঙ্গে উদীয়মানদের প্রায় একইভাবে গড়ে তুললেন। কোচের সাফল্য তো এখানেই!

২৩ মে লীগের প্রথম খেলায় ৪৫ মিনিট লড়াইয়ের পর ভ্রাতৃসংঘ পরাস্ত হন মোহন সিং-এর আচমকা সটে। বলা হল, ভ্রাতৃ পরাজিত কিন্তু অপমানিত নয়।

এর দুদিন পরে ২৫ মে ভেটারেন্স্ ক্লাব কর্তৃক হাবিব সম্মানিত হলেন ১৯৭১-এর সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ায়।

১৭ জুন মহমেডান স্পোর্টিং লড়াই করবে আশা করেছিলাম। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের ২—০ জিততে মোটেই বেগ পেতে হল না। বিপক্ষের ১১ জনের দলকে সারাক্ষণ চূর্ণ করছিল মাঝ মাঠে মোহন সিং ও গৌতম সরকার। তারা যেমন ফরওয়ার্ডদের বল জুগিয়েছে, তেমনি বিপক্ষের রক্ষণের উপরও চাপ দিতে থাকে। মহমেডানের খেলোয়াড়রা যেন দম নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না। ৩৩ মিনিটে গৌতম ১—০ করে। বিরতির পর সবকিছু বিজয়ী দলের দখলে আসে। ৪৭ মিনিটে আকবর ২—০ করল। এই জয় লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের পথে ইস্টবেঙ্গলের বড় বাধা অতিক্রম।

৩ জুলাই ১৩তম খেলাটি ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে অশুভ হল হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে ০—০ হল। ইস্টবেঙ্গল সুযোগ পেলেও তাদের গোল করার পরিকল্পনায় গলদ। অথচ হাওড়া শুরু থেকে কোনঠাসাই ছিল।

১৫ জুলাই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যোগ্যদল হিসাবেই ইস্টবেঙ্গল ২—০ জেতে স্বপন ও হাবিবের গোলে। গোল বেশি না হলেও মোহনবাগান অসহায়ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। সাধারণত 'বড় খেলায়' খেলোয়াড়দের স্নায়ুর উপর চাপ থাকে। এদিনও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে, পরিকল্পিত বা গঠনমূলক খেলা কোনো দলই দেখাতে পারেনি।

২৭ জুলাই অষ্টাদশ খেলায় উয়াড়িকে ২—০ হারাতেই সমরেশ চৌধুরী ছুটে গিয়ে অধিনায়ক সুধীর কর্মকারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দের বাঁধ ভাঙা প্রবল জনস্রোত তখন মাঠে নেমে এসেছে। মশাল জ্বলছে চারিদিকে। তাদের কাঁধে সুধীর, কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি ও অন্যান্য খেলোয়াড়রা। ইস্টবেঙ্গল তিনবছর অজেয় থেকে লীগ শীর্ষে উঠল। ১৮টি খেলায় তাদের ৩৫ পয়েন্ট।

২৯ জুলাই শেষ খেলায় এরিয়ানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ২—০ জিতল। ইস্টবেঙ্গল একটিও গোল না খেয়ে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল। ১৯০১ সালে কোনো গোল না খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়াল আইরিশ রাইফেলস।

১৯৭৩

তিয়াত্তরের দল বদলের পালায় মোহন সিংকে হারাল ইস্টবেঙ্গল; চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ, লতিফুদ্দীনও চলে গেলেন অন্য দলে, শান্ত মিত্র অবসর নিলেন। এদের অনুপস্থিতিতে যত না ক্ষতি হল, সেই তুলনায় লাভ হল বেশি মোহনবাগান থেকে সুভাষ ভৌমিক ও শ্যামল ঘোষ চলে আসায়। পজিশনে রদবদল বেশি না করে কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির সুবিধা হল প্রশিক্ষণের।

২৩ জুন 'বড় খেলায়' ইস্টবেঙ্গলের প্রথম মিনিটের গোলের ধাক্কা মহমেডান স্পোর্টিং সামলাতে পারেনি। মহমেডানের এটি দ্বিতীয় পরাজয়। এদিন গতিবেগে ইস্টবেঙ্গল সর্বদা এগিয়েছিল। তবুও মহমেডানের রাইট স্টপার আনোয়ার হোসেন প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠে ইস্টবেঙ্গলের বহু আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন পজিশন ও সময় জ্ঞানে। ইস্টবেঙ্গলের সুভাষ, সমরেশ ও অশোক অগ্র, মধ্য ও পশ্চাতের তিন নায়ক ছিলেন। সুভাষ (২) ও স্বপনের গোলে মহমেডান পরাজিত হল ৩—০য়।

৮ জুলাই আবার 'বড় খেলা' ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে। খেলার আগে ১৪টি খেলায় মোহানবাগানের ২৭ ও ইস্টবেঙ্গলের ২৬ পয়েন্ট ছিল।

খেলা শুরু হতে দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল ভীষণ অবহেলা করছে মোহনবাগানকে। ৭০ মিনিট তারা একইভাবে খেলল। ইস্টবেঙ্গল প্রমাণ করতে থাকে ইস্পাত কঠিন সংকল্প এবং প্রাণপাত পরিশ্রমের বিকল্প কিছুই নেই। ১৯৬৯-এ আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের পরে কলকাতার মাঠে তারা মোহনবাগানের কাছে অপরাজেয় রইল।

ইস্টবেঙ্গল দুটি গোলই দেয় বিরতির আগে। গৌতমের থ্রো ইন থেকে স্বপন সোজা বল পাঠান সুভাষের মাথায় এবং তিনি ১—০ করেন। বিরতির দু মিনিট আগে স্বপনের পাস থেকেই ২—০ করেন হাবিব। বিরতির পরে জাত খেলোয়াড় মোহন সিং ২—১ করেন হাফ ভলিতে, প্রবীর ক্লিয়ার করতে গিয়ে পিচ্ছিল মাঠে পড়ে গেল।

ইস্টবেঙ্গলের প্রথম পরাজয় ঘটল ৭ দিন পরে ১৩ জুলাই খিদিরপুরের বিপক্ষে। উচ্চ চূড়া থেকে একেবারে নিচে পতন। খেলা শুরুর ২৫ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ০—২ পিছিয়ে পড়ল তপন দত্ত ও প্রসূন ব্যানার্জির গোলে। এক সপ্তাহ আগে সমর্থকরা যে খেলোয়াড়দের মাথায় তুলেছিলেন আজ তারা বিদ্রূপের সামনে পড়লেন, অভিনন্দন ও করতালি কুড়োলেন খিদিরপুরের জুনিয়াররা। ইস্টবেঙ্গলের অশোক ব্যানার্জি পেনাল্টি থেকে ২—১ করলেন, কিন্তু ৩০ মিনিটের সময় খেলোয়াড়দের আচরণে বিরক্ত হয়ে রেফারি রবি চক্রবর্তী খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।

এরপর বি এন আরকে ৩—০ হারালেও ২০ জুলাই কুমারটুলির বিরুদ্ধে অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা গেল। প্রথম কুড়ি মিনিট ০—০ থাকার পর গ্যালারি থেকে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। কেননা, শুরু থেকে তাঁরা যেন দায়সারা খেলছিলেন। দর্শকরা বলতে থাকেন, "আজ পয়েন্ট ভাগাভাগি হবে।" ২০ মিনিট তাই-ই সত্যি ছিল। ঢিল থেকে তেতে উঠে ইস্টবেঙ্গল ৮—০ জেতে। সুভাষ ভৌমিক ও আকবর হ্যাটট্রিক করেন। বাকি দুটি বিমান লাহিড়ি ও বিকাশ সেনগুপ্তর।
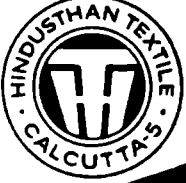
১৪ আগস্ট মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলাটি শেষোক্ত দলের মাঠে হল। সেদিন খেলার মাঠ নরকে পরিণত। ২১ মিনিটে সুভাষের গোলে ইস্টবেঙ্গল ১—০ জেতে। খেলা শেষে খণ্ডযুদ্ধ, মারামারি, ইটপাটকেল, সোডার বোতল, পুলিশের লাঠিচার্জ ইত্যাদি ঘিরে যেন যুদ্ধক্ষেত্র। মন্ত্রী; এম, এল, এ; এম, পি-দের সামনেই এসব ঘটল। রেফারি বিশ্বনাথ দত্ত মোহনবাগানের সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের ঘুষিতে আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেন। খেলার সময় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে যান মোহনবাগানের শঙ্কর ব্যানার্জি ও গোটা মরশুম খেলতে পারলেন না। ফুটবল কত নিম্নস্তরের হতে পারে হাজার হাজার মানুষ তা প্রত্যক্ষ করলেন।

এরপর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ২০ আগস্ট এল না। টালিগঞ্জ অগ্রগামী জানায় তারা আর আসবে না। সুতরাং ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। আই এফ এ কয়েক দিন পরে টালিগঞ্জ ও বি এন আর-এর অনুপস্থিতির জন্য ইস্টবেঙ্গলকে পুরো পয়েন্ট দেয়। দুই প্রধানের খেলায় কেউ মাঠে না আসায় কেউ পয়েন্ট পেল না। ইস্টবেঙ্গলের ৬টি খেলায় ১০ পয়েন্ট ও মোহনবাগানের ৭ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হল।

১৯৭৪

চুয়াত্তরের দলবদলের পর ইস্টবেঙ্গল পেল মোহনবাগানের কাজল ঢালি, সুরজিত সেনগুপ্ত ও নাজিরকে। কিন্তু রেলকর্মীদের রেলেই খেলতে হবে—এই নির্দেশে প্রবীর মজুমদার ইস্টার্ন রেলে চলে গেলেন। তাই রক্ষণ ভাগ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। তবে অধিকাংশ অভিজ্ঞ ও সেরাদের নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গলের ধারে কেউ আসতে পারল না প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির তবুও ট্রেনিং-এর ঘাটতি ছিল না। গোটা লীগ মরশুমে দারুণ খেললেন সুধীর কর্মকার। হাবিব বয়সের ভারে একটু ঝিমিয়ে এলেও

কোচ এমনভাবে খেলার পরিকল্পনা নিলেন যে, বুঝতেই দিলেন না তাঁর দুর্বলতা। মহমেডান স্পোর্টিং-এর রেকর্ডের সমান হওয়ার জন্য প্রদীপবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে চললেন, প্রতি খেলার শুরুতে তাতিয়ে দিলেন খেলোয়াড়দের।

তবে ২৫ মে মহমেডান স্পোর্টিং প্রতিজ্ঞা নিয়ে খেলল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এবং ০—০ করল। ইস্টবেঙ্গল জনে জনে ত বটেই দলগতভাবেও শক্তিশালী। তাদের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে দারুণ আক্রমণ করে আগের রেকর্ডধারীদল। মহমেডানের ১১ জন শপথ করে নেমেছিল মাঠে বিপক্ষকে রুখবে। তাদের রক্ষণ ও আক্রমণের কাছে কিনা জানি না প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধে তারা আক্রমণ করে, কিন্তু রক্ষণ-ব্যূহ ভেদের পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি। ৮ জুন দুই অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান মুখোমুখী হল। ইস্ট-বেঙ্গল মাঠ দর্শকে কানায় কানায় পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ইস্টবেঙ্গল এদিন চ্যাম্পিয়নের মতই খেলে। তারা ৭০টি মিনিট দৃঢ়তা ও সূক্ষ্মতার পরিচয় দেয়। অতুলনীয় খেলেন সুধীর কর্মকার ও গৌতম সরকার। আকবর (২) ও সুরজিতের গোলে ইস্টবেঙ্গল ৩—০ জিতল।

এবারের লীগে ইস্টবেঙ্গলকে মোহন-বাগানের সম্মুখীন হতে হয়নি মোহনবাগান দুই সপ্তাহের জন্য মাঠ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। ওই দুই সপ্তাহে নির্ধারিত খেলাগুলির পুরো পয়েন্ট পায় বিপক্ষ দলগুলি।

চুয়াত্তরের ২৮ জুন বাটার সঙ্গে ৫—০য় জেতার (হাবিব ২, সুভাষ, আকবর ও সুরজিত) পর স্পষ্ট হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলই লীগ চ্যাম্পিয়ন।

ত্রিশের দশকে মহমেডান স্পোর্টিং-এর পর উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ জিতে ইস্টবেঙ্গল এখন বাংলার ফুটবল গৌরব। তারা পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলের রাজা। ইস্টবেঙ্গল দাপটে সম্মান অর্জন করেছে, ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয়নি। দিনটি শুক্রবার, সাড়ে পাঁচটার কিছু পরে খেলা শেষ হতেই কাঁটা তার টপকে হাজার হাজার দর্শক মাঠে নেমে আসেন। গ্যালারিতে মশাল, পটকার আওয়াজ। সর্বপ্রথম চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন সমর্থকরা সুভাষকে। কাঁধে তুললেন তারা কোচ প্রদীপবাবুকে।

২ জুলাই শেষ খেলা ছিল পোরট কমিশনার্সের সঙ্গে। ২—১ গোলে এগিয়ে থাকার ৪৯ মিনিটের সময় বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দুদিন পরে আবার খেলা হল। এদিন কোনো পক্ষই গোল দিতে পারেনি। লীগে ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত রয়ে গেল।

ইস্টবেঙ্গল কলকাতারই আর একটি ক্লাবের মতই লীগে গৌরবের অধি-কারী হল সন্দেহ নেই। কিন্তু লীগ শেষে ইস্টবেঙ্গলের ত্রিশ দশকের কয়েকজন খেলোয়াড় মন্তব্য করলেন— ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অনেকটা এক তরফা। ত্রিশের দশকে মহমেডান যেমন বিপক্ষের কাছে বেগ পেয়েছিল। সত্তরের দশকে ফুটবলের ছক বদলালেও পাঁচ বছর ধরে ইস্টবেঙ্গলকে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়তে হয়নি। আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য থাকবে নিশ্চয়ই আবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন রেকর্ড গড়ার দিকে। শীল্ডে ১৯৭১-এ ইরানের পাস ক্লাবকে ও ১৯৭৩-এ দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং-কে হারিয়ে তারা সম্রাট হওয়ার সোপান তৈরি করেছে, কিন্তু সিংহাসন পাবে উপর্যুপরি ষষ্ঠবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হলেই।

নিত্যনূতন
সিরিজের
মানেই
রঙীন স্বপ্নের রাজ্যে....
‘আনন্দমেলা’র পড়ুয়াদের জন্যে, সাত থেকে
সাতাত্তর বছর বয়সীদের জন্যে ডজন-ডজন গল্প। ছবির
মতো গল্প। গল্পের মতো ছবি। সংরক্ষিত বিশাল জঙ্গলের
করোটি-গুহা থেকে হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমে
বেতালের (তথা অরণ্যদেবের) দুষমণ-দমন অভিযান। পিগমী-
ব্যাণ্ডরদের বিষ-তীর অথবা জঙ্গুলে অলিম্পিকের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
গল্প পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। এদিকে আবার,
ম্যানড্রেকের যাদুর জগতেও একবার ঢুকে পড়লে শেষ না দেখে
শান্তি নেই। এক নিঃশ্বাসে অথবা দমবন্ধ করে পড়বার মতো
সব আশ্চর্য কাহিনী—পাতায় পাতায় পাতায় রঙীন ছবির
সঙ্গে চমকপ্রদ গল্প একেবারে স্বপ্নের রাজ্যে
পৌছে দেয় আমাকে, তোমাকে,
ওকে, তাঁকে—সব্বাইকে!
অফ্
টাকা

ANANDAMELA PUJA NUMBER, 1974.
Regd. No. WB|CC-183